

বিদ্যাসাগর ।

RARE BOOK

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ।

"The man to whom I have appended has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother."

Michael M. S. Dutt.

(The right of translation, retranslation, reproduction, using any portion of the book, or any information not published before, are reserved.)

চতুর্থ সংস্করণ

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

১৯১৪



প্রকাশক—শ্রীমতীশচন্দ্র মিত্র,
এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান প্রেস,
কলিকাতা।
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

এলাহাবাদ, 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' হইতে শ্রীঅপরূপক বসু দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

বিশ্বরাজের বিচিত্র বিধান—ভারতের ভাগ্যচক্রের সঙ্কটময় পরিবর্তনে

—যখন চারিদিক অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আবৃত—জাতীয়

জীবন মৃত—মৃত্যুর করালগ্রাসে প্রবিষ্টপ্রায় লোকমণ্ডলীর

মধ্য হইতে যে মহাত্মার অভ্যুদয়ে ভারতে নবযুগের

সূচনা হইয়াছে—ভবিষ্যৎশ উপাস্ত দেবতাবোধে

যাঁহার চরণে প্রণত হইবে—ভাবী

ইতিহাস লেখক বর্তমান জাতীয়

জীবন স্রোতের উৎপত্তি ও

স্থিতি নির্দেশ করিতে

গিয়া যাঁহার

বিরিাট

মূর্ত্তি সমক্ষে

লেখনী ত্যাগ করিয়া

করযোড়ে ভক্তিভরে মস্তক

অবনত করিবে—যিনি ভারতের

পরমধন লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ন:

প্রতিষ্ঠায় জীবন দান করিয়া গিয়াছেন, সেই

মহাত্মা রাজশি রাগমোহন রায়ের

চরণে গ্রন্থকারের পূজার নৈবেদ্যরূপে এই গ্রন্থ নিবেদিত

হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

আজ বাঙালা সাহিত্য শোভা ও সৌন্দর্যে বিভূষিত হইয়া আমাদের নয়নের তৃপ্তি ও মনের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছে, যাহারা সেবকরূপে তাহার এই শোভা ও সৌন্দর্যের সূচনা করিয়াছেন, সেই ভক্তদলের অগ্রগীগণের মধ্যে বিভাগ্যগর মহাশয় অতি উচ্চস্থানে আসীন। দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে সেই লোকপ্রবরের জীবনচরিত পরিসমাপ্ত হইল। এই গ্রন্থখানিকে বঙ্গীয় ও বিদেশীয় পাঠকমণ্ডলীর করে অর্পণ করিবার সময়ে আমার অনেক বলিবার আছে, কিন্তু সকল কথা না বলিয়া কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

ভারতবর্ষের বীর-কাহিনী পৃথিবীবক্ষে যে অক্ষয় কীর্তিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তথায় অমর-পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র মানব-সুহৃদরূপে, অবলাবান্ধবরূপে উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া দিক্‌সকল আলোকিত করিয়াছেন। আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, এতাদৃশ গুণবান মহাজনের চরিতকাহিনী বর্ণন করা পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও, বহু পুণ্যের ফল হইলেও, মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের পক্ষে সে সৌভাগ্যের অভাব, সে পুণ্য সম্ভোগ নিতান্তই স্পর্ধার কথা। তাহার জ্ঞান মহাজনকে সম্পূর্ণরূপে, আরক্ত করিতে ও উপভুক্তরূপে তাহার গুণাবলী বর্ণন করিতে সক্ষম হওয়া সম্ভব নহে। খজোত কখনও গগনবিহারী জ্যোতির্মণ্ডলের গৌরব অমূল্য করিতে পারে না—গোপস্বয়ং* বার্লিবিলু কখনও অনন্ত পারাবারের তরঙ্গলীলা কল্পনা করিতে পারে না; ক্ষুদ্র মানবও তদ্রূপ আপনার ক্ষুদ্রত্বে বিশ্বব্যাপী প্রেম প্রবাহকে ধারণ করিতে পারে না। তাহার সকল আয়াসই বিফল হইবার কথা।

বিভাগ্যগর মহাশয় পণ্ডিতসমাজের বরপুত্র; চূর্তাগ্রবশতঃ তাহার বর্তমান জীবনচরিতপ্রণেতা তাহার তুলনার মূর্খের অগ্রসর। তিনি সমুদয় লোকবৎসল মহাপুরুষ, তাহার জীবনীপ্রণেতা সঙ্গীর্ভতার ক্ষুদ্র প্রান্তরে আবদ্ধ—বদ্ধ জীব! এমন স্থলে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এরূপ বিসদৃশ অবস্থায় বামন

হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস কেন? তদুত্তরে আমার একটি মাত্র কথা বলিবার আছে। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহবান ছিলেন, এবং শত শত ঘটনার তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আমিও সে অল্প আমরণ ভক্তিতে তাহার পূজা করিব। সেট পূজার আয়োজনেই এই জীবনচরিতের সূচনা এবং তাহার সুপরিচিত জীবনকাহিনী বর্ণন করিবার ইহাই আমার এক মাত্র অধিকার। তাহার শেষ জীবনের দীর্ঘকাল, তাহার পবিত্র সহবাস স্মৃতি আমি নানা প্রকারে উপভুক্ত। কিন্তু এই হৃদয়গা উপভুক্ত জন সাংসারিকসম্পদে বঞ্চিত, স্মৃত্তরায় অল্পখিন উপায়ে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। অল্প কোন-মহাত্ম্যব বাক্তি তাহার জীবনচরিত প্রণয়নে অগ্রসর হইলে, আমার বহুবন্ধ রক্ষিত উপকরণগুলি তাহারই করে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার ছাত্র ক্ষুদ্রগ্রাণ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোককে এই সুকঠিন কর্তব্যভার কেবল প্রাণের আবেগে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এরূপ স্থলে এমন দুঃস্থ কার্যে পদে পদে অপরাধ হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থকারের দীনতা স্বরণ রাখিয়া, মহাপুরুষের গুণগরিমার সন্মান করিলেই আমি আমার পাঠক-মণ্ডলী ও স্মৃতিদর্পণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।

বিজ্ঞানাগর মহাশয় বাজালার সামান্ত পল্লীগামের দরিদ্র পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ইংরাজাধিকৃত ভারতে গণনীয় ও পূজনীয় হইয়াছিলেন। তাহার লোকান্তর গমনে যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাক্সেবা, সন্মাত্র বন্ধুসেবা ও দরিদ্রসেবা একটি জীবনে সমভাবে স্থান পাওয়া ভারতবাস্য; কিন্তু তাহার জীবনে তাহাও সম্ভব হইয়াছে। দেশের ইতর ভ্রষ্ট, ধনী দরিদ্র, অসমতাভব সমবেদনা প্রকাশ করিতে দলবদ্ধ হইতে পারেন, এরূপ অষ্টপূর্ণ ঘটনা ঐশ্বরচন্দ্রের লোকান্তর গমনেই পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহার উপযুক্ত মর্যাদা আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না। কখনও পারিব কি না সন্দেহ। আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ, সে কৃতজ্ঞতা-জপ অপরিশোধ্য; সেই অপরিশোধ্য জপ স্বীকার-মানসে এই স্মৃতিগ্রন্থ রচনা, এই জপ স্বীকার করিতে গিয়া আমি বন্ধুসৈন্য আরও অনেকগুলি মর্যাদার নিকট স্বর্ণপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলাম।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন কার্যে যদি আমি আংশিক ভাবেও কৃতকার্য হইয়া

থাকি, তবে সে জন্ত আমার কোন প্রশংসা নাই। আমার ভক্তিতাজন বরোজ্যোষ্ঠ হিতাকাজিকরণ, আমার সমবয়স্ক সুহৃদগণ, এবং অপর বহুসংখ্যক পরিচিত অপরিচিত স্বদেশবাসীগণই প্রকৃত প্রশংসার পাত্র; কারণ তাঁহাদের স্নেহ উৎসাহ ও নানা প্রকার সাহায্য দান ভিন্ন আমার জ্ঞান অযোগ্য ব্যক্তি এরূপ বৃহদুচ্চানে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না। বাহাদুরের নিকট এই প্রহ্ন প্রণয়নের জন্ত আমি নানা প্রকারে ঋণী, তাঁহাদের সুদীর্ঘ নামাবলীর উল্লেখ করা সম্ভব নহে, তাই সকলের নিকট করযোড়ে কমা প্রার্থনা করিয়াও কয়েক জন সদাশয় মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

আমি এই কার্যে ত্রুটি হইবার সূচনার মাননীয় অজ্ঞ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ ও সহায়ভূতিপূর্ণ উৎসাহবাক্যে যে কিরূপ উপকৃত হইরাছি, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করিবার নহে। তাঁহার পরামর্শ ও সহায়তা লাভে কৃতকার্য হইতে না পারিলে, আমার পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার হইত, সুতরাং আমি ইহার নিকট চিরকণ্ঠে আবদ্ধ।

এই জীবনী যদি কোন অংশে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবক ও পাঠকদের সমাদরের জিনিষ হয়, তবে সে জন্ত বিশেষ ভাবে প্রশংসার পাত্র বিভাগাগর-পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিহার্য। তিনি বেরূপ আগ্রহ ও আকিঞ্চনের সহিত তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবনীবিষয়ক উপকরণাদির দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত উল্লেখ নিশ্চয়োজন; কারণ পুস্তক পাঠ করিতে করিতে পাঠক তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় পাইবেন। সুতরাং তিনিও আমাকে এইরূপ নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া অপরিশোধ্য ঋণ-জালে জড়িত করিয়াছেন। তৎপরে বিভাগাগর-সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ ঐবত মহাশয়ও বহুবিধ উপকরণদ্বারা এবং বিভাগাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ‘সাহিত্য’ সম্পাদক আমার পরম রেহতাজন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রব্রুত সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত নানাবিধ পরামর্শ ও পারিবারিক জীবনীবিষয়ক উপকরণাদির দ্বারা বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাকে অহুগৃহীত করিয়াছেন।

যে সকল ঘটনার সমাবেশ না হইলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইত না, জ্ঞাহার একান্তের উল্লেখ করিলাম। অপরাংশের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। সংস্কৃত-প্রেস ডিপজিটরীর প্রধান কর্মচারী আমার সহোদর-

প্রথম বহুবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তা ও সহায়ত্বিত
প্রদর্শন ব্যতীত পুস্তক প্রকাশ অসম্ভব হইত। অবিনাশ বাবু পুস্তকের মুদ্রণ-
কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতার ধ্বংস আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে
সকল নরন-রঞ্জন লিখো চিত্রের সমাবেশে পুস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইরাছে, সেগুলি
পত্ৰপত্রের আর্টবুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বাগ্‌চি কর্তৃক
অঙ্কিত হইরাছে। তিনিও এই কার্য্যে বিবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে
অনুগৃহীত করিয়াছেন। পুস্তক ও পুস্তকান্তর্গত চিত্র সকলের ব্যয়বাহন্য নিবন্ধন
আমি নিতান্ত বিপন্ন হইরা পড়িয়াছিলাম, সেই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার
পক্ষে :—

শ্রীমতী মহারানী স্বর্ণময়ী সি. আই।

শ্রীযুক্ত মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত স্তর রমেশচন্দ্র মিত্র।

শ্রীযুক্ত মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সি. এন্স. সি. আই. ই।

শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় (নলডাঙ্গা)।

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী)।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এন্স. এ., বি. এন্স.। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার যতনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকার।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিজয়রত্ন।

ইহারা সহায়তা করিয়া আমাকে উপকৃত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে, কলিকাতা।

২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সাল।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়বারের ভূমিকা।

“বিভাগাগর” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বক্তৃতা সম্বন্ধে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করিয়া গ্রন্থখানিকে পাঠক মণ্ডলীর করে অর্পণ করিতেছি।

দ্বিতীয় সংস্করণ বহু পূর্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। কারণ প্রথম সংস্করণের এক সহস্র পৃষ্ঠক ছয় মাস মাত্র সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী পীড়া নিবন্ধন উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্যের অভাবে পুস্তক প্রকাশে এত বিলম্ব হইল। তাহা হইলেও এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে যে বিভাগাগর জীবনীর পুনর্মুদ্রণে আমি সক্ষম হইলাম, ইহাই আমার চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার বলিয়া মনে করি এবং একান্ত বাজালা পাঠকমণ্ডলীর নিকট আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমার এই প্রকাশিত হওয়ার পর বিভাগাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিভাগর মহাশয় ভ্রমনিরাস নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক স্থলেই আমার ভ্রমনিরাকরণ করিতে গিয়া তিনি নিজের ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পাঠক মহাশয় বর্তমান সংস্করণের কুট নোট ও পরিশিষ্টে প্রাপ্ত পত্রাদি ও সংবাদ পত্রাদির মন্তব্য পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীযুক্ত বিভাগর মহাশয় কত অজ্ঞান ও অসার কথা বলিয়াছেন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠাগ্রন্থের জীবন চরিত সঙ্কলনে যদিই আমার কোন বিষয়ে ভ্রম বা ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা আমাকে দেখাইয়া দিলে, আমি প্রাপ্ত মতকে ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহা স্বীকার করিতাম, স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রচার করিয়া আমার দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের পুরস্কারের বর্ধিতসাধনে অগ্রসর হওয়া অন্ততঃ তাঁহার পরিচয়ের উপযুক্ত কার্য হয় নাই। বিশেষতঃ তিনি ঐ সমালোচনা পুস্তকে তাঁহার চিরপূজনীয় স্বর্গগত জ্যেষ্ঠাগ্রন্থকে বেরূপ হুণিত ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিবরণ। বিভাগর, সহোদর হইরা, আটপন্থ্য দেহ সন্তোষ ও অহুগ্রহ লাভ করিয়া এক নিজে জ্যেষ্ঠের চরিতাখ্যায়ক হইয়া শেষে সেই দৃঢ় মহাত্মাকে

বেরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কার্যের পোষকতা করিলে, বিভাগাগর মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধার পরিবর্তে ঘৃণা প্রদর্শন ও পূজার পরিবর্তে চরণে দলন করিতেই লোককে প্রোৎসাহিত করা হয়। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না বলিয়া কেবলমাত্র এই বলি যে, ভ্রমনিরাস প্রকাশ করিয়াও তিনি আমার উপকার সাধন করিয়াছেন। যে ২১৪টি ক্ষুদ্র বিষয়েও আমার অসাবধানতা ঘটিয়াছিল, সেগুলির সংশোধনের সুযোগ পাইয়া আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার ১ম সংস্করণের ভূমিকা, তাঁহার পুস্তক হইতে সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকারে, অমার্জনীয় ভ্রম নিবন্ধন যে তিরস্কার পুরস্কার পাইয়াছি, তাহা নত মন্তকে গ্রহণ করিয়াও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, যে যে বিষয়ে অন্য সূত্রে প্রাপ্ত প্রমাণ ভিন্ন তাঁহার উক্তি গ্রহণ করিয়াছি, সে সকলের অনেক স্থলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছি। আমার ভ্রম প্রদর্শনের জন্য ভ্রমনিরাসের কোন কোন স্থলে তিনি নিজের রচিত জীবনীর ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন।* এক্ষণে একটা কথা বলিয়া এই অগ্রিম বাপারের পরি-
সমাপ্তি করিতেছি। যখন তিনি সাহোদর হইয়া, দীর্ঘকাল জ্যেষ্ঠ সাহোদরের কার্যে সহকারিতা করিয়া, নিজের গ্রন্থে ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ কথা বলিতে পারিয়াছেন, তখন আমার পক্ষে কোন বিষয়ে ঐরূপ ভ্রম হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। এইটি মনে রাখিয়া আমাদের বহু ভ্রমকর কার্যাবলি প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে এবং সম্বন্ধ বিস্তৃত হইয়া, বিভাগাগর মহাশয়কে গানি না দিয়া, বহু ভ্রমপূর্ণ ভ্রমনিরাস প্রকাশ না করিয়া, পিতৃহানীর ব্যাকির ছায় আমাকে সাবধান করিয়া দিলেই আমি কৃতজ্ঞ হইতাম। আমাকে তিনি বাহাই বলুন, আমার তাহাতে হুঃখ নাই। হুঃখ এত যে, তিনি অলোকসামান্য গুণসম্পন্ন মৃত জ্যেষ্ঠের প্রতি যে সকল কটু কথা ব্যবহার করিয়াছেন, আমি তৎসমুদায়ের প্রত্যেকের দানে বাধা। এত জনা আমার বর্ণিত নারকচরিতের বাখ্যার্থ রক্ষার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছি। সে প্রয়াস যদি ত্রীভুক্ত বিভাগর মহাশয় জন সাধারণকে অবজ্ঞার পাত্র হন, সে জন্য তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পিতার মান রক্ষার পুর পিতৃবীর প্রতি যেরূপ কঠোর তাব প্রকাশ করে, আমি তদতিরিক্ত কিছুই করি নাই।

বিভাগসমূহ প্রথম সংস্করণ করেক মাসের মধ্যে নিঃশেষ হইলেও তাহার ব্যয়
বাহ্য্য নিবন্ধন আমার অর্থের অনটন পূর্ববৎ ছিল। সেই জন্য ২য় সংস্করণের
মুদ্রণকালে আমি পূর্বের ভাৱ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কলিকাতাবাসী
কোন সুহৃদয় সুহৃদ স্বতঃপ্রস্তুত হইয়া এ কার্যে সহায়তা না করিলে ২য় সংস্করণ
প্রকাশিত হইতে আরও বহু বিলম্ব হইয়া পড়িত। আমি এই অবাচিত উপকার
লাভের জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম। বলা বাহুল্য যে
ইনি মাতৃভাষাসেবক অশেষগুণসম্পন্ন বহুবর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সাহিত্যসেবাসুত্রে আমি শত প্রকার উপকার-রূপে ইহার নিকট আবদ্ধ।

৫৬১ স্কিকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।

১৫ই শ্রাবণ ১৩০৩।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা ।

অসংখ্য বিষ বাধা অতিক্রম করিয়া মৎপ্রসিদ্ধ বিভাসাগরজীবনীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। এলাহাবাদের ভারতীয় মুদ্রাব্যয়ের স্বত্বাধিকারী বাবু চিত্তামণি ঘোষ ও কলিকাতার তৃতীয় প্রবান কৰ্মচারী বাবু চাকচক্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এত অল্প সময় মধ্যে এই বর্তমান সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া আমার মধ্যস্থতা রক্ষার সহায়তা করিয়া আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইরাছেন। আমি ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় সংস্করণ কুয়াইরা বাওয়ার পর দীর্ঘকাল আমি নানা বিড়ম্বনা-আলে-জড়িত হইরা এই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারি নাই। এতটা সময় অতীত হইরাছে যে, ঐ দীর্ঘ কালের মধ্যে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইতে পারিত। অনেক সময়ে পুস্তকের অভাব নিবন্ধন আমার জন সমাজে বিচরণ বিরক্ত হইরা দাঁড়াইরাছিল। ভগবানের রূপায় আমার স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্রের এই শুষ্কতার বিষ বাহাদের বস্ত্রচেষ্টার দূরীভূত হইল, আমি সর্বাঙ্গতঃ করণে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি।

বিভাসাগর জীবনীর ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর স্বর্গীয় মহাত্মার তৃতীয় সহোদর ৮শকুচর বিভারত মহাশয় অতি অভাবরূপে আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁহার সেই আক্রমণের বখাবখ আলোচনার দ্বারা সহস্র দিবা আমার বর্ণিত নারকচরিত্রের বাখার্য রক্ষার দয়বান হই। সে চেষ্টা এতদূর ফলবতী হইরাছিল যে, বিভারত মহাশয় তাহাতে নীরব হইরা বান। অধুনা তিনি লোকান্তরিত। আমার চিরপূজ্য উপসেটা মহামাভ্য তর শুক্লাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ ও পরামর্শে আমি দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট বাদ প্রতিবাদ অংশগুলি তৃতীয় সংস্করণে পরিভাষা করিলাম, কারণ সে

সকলের সহিত আমার বর্ণিত বিষয়ের সম্বন্ধ অল্প এবং সেগুলি দ্বারী সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য নহে। যাহাদের কোতূহল বৃদ্ধি চরিতার্থ করিবার আয়োজন হইবে, তাঁহারা বিভাগাগর জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া উৎকর্ষা নিবারণ করিবেন।

পূর্বাগেষ্কা এবার নির্ভুল গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, ইহাও সামান্য স্মৃতির বিবরণ নহে। ইতি নিবেদন।

৩১ শিবনারায়ণ দাসের গেন, কলিকাতা। } ত্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৭ই আষাঢ় ১৩১৬।

চতুর্থবারের ভূমিকা ।

বিভাগাগর জীবনী চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল । গ্রন্থ জন-সাধারণের নিকট যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে, আমি ইহাতেই ধন্য হইয়াছি । আর সেই জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীর নিকট কৃতজ্ঞ ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাদ্যলাভাবা স্বত্ত্ব পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হওয়াতে বি. এ. পরীক্ষার বিভাগাগর জীবনীখানি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অল্প পাঠ্যরূপে পরিগৃহীত হয় । তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পর পর ১৪, ১৫ ও ১৬ সালের জন্য এই গ্রন্থকে পাঠ্য তালিকার স্থান দিয়া আমাকে প্রচুর উৎসাহ দান করিয়াছেন, এজন্য আমি তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম ।

নানা কারণে সাংসারিক অসচ্ছলতার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইতেছে । এই অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে সাহিত্য সেবাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া নিরুপস্থিত করের মহোদয়ের নিকট বর্তমান সংস্করণের প্রচারকরে গ্রন্থকাররূপে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি :—

সামন্তরাজ বাম্ভাধিপতি শ্রীযুক্ত সচিদানন্দ ত্রিভুবনদেব ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বিভাগরঞ্জন বাহাদুর ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত এন্স. পি. সিংহ । শ্রীযুক্ত সত্য আর. এন্স. সুখার্জি ।

শ্রীযুক্ত এন্স. আর. দাস । মাননীয় শ্রীযুক্ত এন্স. বি. মিত্র ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা শনিকান্ত শ্রীযুক্ত ডাক্তার শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর । রায় বাহাদুর ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী । শ্রীযুক্ত প্রহরনাথ ঠাকুর ।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দে ।

প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকট সাহায্যপ্রার্থির জন্য কদমের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ।

৪১ শিবনারায়ণ দাসের গেন,

কলিকাতা ।

১লা পৌষ ১৩২০ ।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সূচীপত্র ।

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

...

...

...

১—৮

ভারতের ভৌতিক বিচিত্রতা ও ঐক্য—আধ্যাত্মিক উন্নতি—বৈদিক, পৌরাণিক ও আধুনিক বীরকাহিনীর ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ—স্বাধীন ও পরাধীন ভারতের বিশেষত্ব—ইংরাজ রাজত্বের রামসোহন ও বিদ্যাসাগর ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্বপুরুষ ও জন্মবিবরণ

...

...

...

৯—২৩

জন্ম ও জন্মবিবরণ দুই একটি ঘটনা ও জনপ্রতি—কৃষ্ণিষ্ঠ হওয়ার দিন শিশুর পিতার সহিত পিতামহের ঐহিক—জন্মস্থান বীরসিংহ—শৈশবকাল বাসস্থান বনমালীপুর—বীরসিংহে বাসস্থান পরিবর্তনের কারণ—পিতামহীর পিতালয়ে দুঃখ কষ্ট—সে কালের বিপন্ন ভ্রাতৃ পরিবারের অবস্থা—ঠাকুর দাসের গৃহভ্যাগ ও বোড়পু বর্ষ বয়সে কলিকাতা যাত্রা—তথ্যর অনন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ—বিদ্যালয় ও অর্থোপার্জনের চেষ্টা—২, টাকা বেতনের কর্পস্রাণ্ডি—একত্র গৃহে আনন্দোৎসব—নিরুদ্দেশ পিতামহের গৃহে প্রত্যাপন—কলিকাতা যাত্রা ও, পুত্রের অবস্থা দর্শন—ঠাকুর দাসের বিবাহ ও অবস্থার ক্রমোন্নতি—সে সময়ের হিন্দুপরিবারের সামাজিক অবস্থা—লোক লৌকিকতা ও অভ্যাগত পরিচর্যা—ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃমাতুল—ভাষার কাব্য কলাপ—সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের উক্তি—ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহের আচার আচরণ—ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন পারিবারিক অবস্থার কলাকল ।

তৃতীয় অধ্যায়

শৈশবকাল

...

...

...

...

২৭—৩৭

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হইতে পারিবারিক অবস্থার উন্নতি—শিশুর দৌরাঙ্গা-প্রসঙ্গের গুহা—বিদ্যালয়িকার পুতলা—ভরষাশয়—দুর্যোগ্য রোগে দীর্ঘকাল ক্রমভোগ—শেষে মাতৃমাতুলের যত্নে রোগমুক্তি—পুনরায় বিদ্যালয়—বিদ্যালয়িকার অনুপ্রাণ—পিতামহের লৌকান্তর পন্থা—ঈশ্বরচন্দ্রের কলিকাতা যাত্রা—পথে ইংরাজী অঙ্ক পণ্যের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান—পরদিন সেই বিষয়ে পরীক্ষাদান—হিন্দুকালেজে প্রবেশের প্রস্তাব—বিবেচনে বালকের উৎকর্ষ—বড়বাজারে সিংহ পরিবারের ব্রীলোকবিশেষের স্নেহ দৃষ্টি—সে বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের উক্তি—রাজ্যান্তর প্রতি ভক্তির পুতলা—কলিকাতার পীড়া—পিতামহীর কলিকাতা যাত্রা—বালকের গৃহে প্রতিপন্থ—রোগ মুক্তি ও পুনরায় কলিকাতা যাত্রা—পথে পুত্র লইয়া পিতার বিশদ—কলিকাতার বিদ্যালয় প্রবেশের প্রস্তাব ।

চতুর্থ অধ্যায়

বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর

...

...

...

৩৮—৭০

সংস্কৃত কালেজে প্রবেশ—প্রবেশের দিন হইতে শেষ পর্যন্ত সকল শ্রেণীরই পরীক্ষার প্রাধিকার—বিদ্যালয়ে বালকের উপর সকলের স্নেহদৃষ্টি—শিক্ষা বিষয়ে পিতার যত্ন—সহান্যাতী-দিশের নির্ঘাতন—গৃহে প্রতিদিন পিতার নিকট গঠিত বিষয়ের পরীক্ষা দান—নিষ্ঠা নিবন্ধন পাঠে অধোনোযোগিতা ও পিতার গীড়ন, তৎক্ষণ সিংহপরিবারের বিরক্তি—ভাঁহার পঠদশার দারিত্র্য-বিবরণ—সমগ্রশিক্ষণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ—বিদ্যালয়িকার বিষয়ে অসাধ্য সাধন—সামান্য সাধনায় বিষয়ে দারুণ দৌরাত্ম্য—বয়সের অল্পতার জন্য সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশের সময় অধ্যাপকের আপত্তি—নিজ হইতে পরীক্ষাপত্রের প্রস্তাব ও তাহাতে সর্বোচ্চ-স্থান অধিকার—মধ্যম সহোদরের কলিকাতার বাসায় অবস্থান ও বিন্যাসিকার। বাসায় দাস-দাসী ও পাঠ্যকথ কার্যে প্রবৃত্ত—সর্বকর্মে সাবধানতা—অসাবধানতার পিতার গীড়ন ও প্রহার—উত্তর কালে ভাঁহার জীবনে এই সকলের কল—গ্রামে চতুষ্পাঠী করিবেন বলিয়া বুড়ির চাকার হইতে হস্ত লিপিত সংস্কৃত পুঁথি ও ভূমিসম্পত্তি ক্রয়—যেখানে এক সমারোহ প্রদেয় নিমন্ত্রণের লোক রচনা করায় ভাঁহার প্রশংসার বিবৃতি—দেশ বিদেশ হইতে কন্যাদানের প্রস্তাব—বিবাহে অনিচ্ছা—বিবাহ—অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবেশ—অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—বালকের প্রবেশের দর্শনে ভাঁহার মন্তব্য—কঠোর শ্রমে খাড়া হানি—গৃহে গমন—যোগমুক্তি—সহোদরদিগের প্রতি অমুরূপের একটি দৃষ্টান্ত—ঈশ্বরচন্দ্রের সৌজন্য ও বাল্যভাব—জয়নারায়ণ একপকাননের মত—অতি অল্প বয়সে “ল” পরীক্ষা দান—সংস্কৃত পদ্য ও গদ্য রচনা—মধ্যম সহোদরের বিবাহ—উচ্চাধ্যাপকবৃত্তি—বাসায় আহারের রেশ—উত্তরশ্রেণীর পরীক্ষাজন—বাসায় সমস্ত কাব্য একাকী সম্পন্ন করা—কলিকাতার তাত্‌কালিক অবস্থা—ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষিতার ভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত—অধ্যাপকের সহ্য মমতা—শত চন্দ্র বাচস্পতির পুষ্পবাসল্য ও এক বয়সে বিবাহ—গুরু শিষ্যে মনোহর—গুরুপত্নী দর্শন ও ক্রন্দন—ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের নারীজাতির প্রতি করুণা সৎকারের যত্ন কারণ নির্দেশ—বৃত্তি ও অস্থায়ী চাকরীর বেতনের চাকার পিতার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সাহায্য দান—বিদ্যাসাগর উপাধি—সমবেত শিক্ষকগণের অংশগা পত্র দান ইংরাজী-শিক্ষার ইতিহাস—ইহার প্রথম কল—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সমস্তার সূচনা ও মোহাংসা।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর

...

...

...

৭১—১৪৩

ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে কর্ম গ্রহণ—শিক্ষকরূপে নিষ্ঠা ও বাবীন ভাবের পরিচয়—মার্শেল সাহেবের আত্মহত্যা—কর্ম গ্রহণ করিয়াই কর্ম হইতে পিতার অবসর গ্রহণে অনুরোধ ইংরাজী ও হিন্দী শিক্ষার আয়োজন—রাজকৃষ্ণ বাবুকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য লুডন পণ্ডিতের উদ্বোধন—সংস্কৃত কালেজের পরীক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা—পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবিশেষের জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট অনুরোধ—হাতিজা শুল সংস্থাপন—তর্কালঙ্কার, তর্কবাচস্পতি মহাপণ্ডিতের কর্মপ্রাপ্তিতে সাহায্য দান—অন্যান্য বহুদেয় কর্মকাজের সুবিশাসাদন—আত্মতৃষ্ণার দৃষ্টান্ত—সাহেব জাতদিগের সহিত আত্মীয়তা—সংস্কৃত লোকরচনা—পরীক্ষক হইয়া ন্যায় বিচারের অনুরোধে আবিচার—সহকারী সম্পাদক-রূপে সংস্কৃতকালেজে প্রবেশ—কালেজের নানাবিধ উন্নতি সাধন—হিন্দু কালেজের অধ্যাপক কার সাহেবের অদ্বৈত ব্যবহারের প্রতিশোধ—তর্কালঙ্কারের কাজকর্মে আরও

সহায়তা—এক সহোদরের মৃত্যু—সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ—কিছুদিন অর্থাভাবে ক্লেশ-ভোগ—এই সময়ে লোকশ্রুততার পরিচয়—পুস্তকের কোর্ট উইলিয়ম কালেজে কর্তৃক গ্রহণ—সংস্কৃত কালেজে পুনঃপ্রবেশ—এ সময়ে তাঁহার নিজের উক্তি—সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকের পদপ্রাপ্তি—সংস্কৃত কালেজের আবুল পরিবর্তন—সংস্কৃত কালেজে ব্রাহ্মণের জাতি সকলের শিক্ষালভের সুচনা আন্দোলন—জরলাভ—এই সময়ে একটি সহোদরের মৃত্যু—পুত্রলাভ—উপক্রমণিকা—প্রকাশ—সম্রাট বুদ্ধি—বন্ধুশতাব্দী—পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি—মর্দানুল প্রতিষ্ঠা—সেখানে তাঁহার কর্তৃত্ব ও বুদ্ধিমত্তার উন্নতি পথে সহায়তা—বেশুন্দের মৃত্যু—বিদ্যালয়গণের শোক—চারকাবাথ মিত্রের সহিত পরিচয়—কালীচরণ বোম মহাপণ্ডের শিক্ষকতা ও বালকগণের অভ্যাচার—বিদ্যালয়গণ মহাপণ্ডের শাসন—বিদ্যালয়গণের বিবরণ ও কক্ষ প্রার্থনা—তাঁহার বুদ্ধি-পরিবর্তনের কথা—শিক্ষা বিভাগের আবুল পরিবর্তন—শিক্ষাবানের পরিসর বৃদ্ধির চেষ্টা—ডাইরেক্টর ইরাসাহেবের সহিত মনান্তরের সূত্রপাত—কালেজের ঘর লইয়া বিবাদ ও মনান্তর বৃদ্ধি—বিদ্যালয়গণের সৃষ্টি—তাঁহার সমস্ত নিয়োগ—তাঁহার পঠন কাণ্ডে তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা—পরীক্ষক সমিতি গঠন—তাঁহারও সত্য পদপ্রাপ্তি—সিবিলিয়ানদের পরীক্ষক গণের প্রধানরূপে নিযুক্ত হওন—জালিতে সাহেবের সহিত আত্মীয়তা—নানা প্রকার গল্প—বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লইয়া ইরাসাহেবের সহিত কলহ—কর্তৃক পরিত্যাগের সঙ্কল্প—এক বৎসর-কাল পদত্যাগ পত্র লইয়া সোলযোগ—কর্তৃত্বত্যাগ—এই সময়ে ১৪ খানি চিঠি।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বাকী সাহিত্যে বিভাগ

...

...

১৪৪—১৪১

জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যিকতা—বাকী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত অর্থ ধারাবাহিক ইতিহাস—পুরাতন গদ্য প্রবাসির নমুন—বাকী গদ্যরচনার সময় সময়ে মতভেদ—জীহরঙ্গদাস শাস্ত্রী মহাপণ্ডের পত্র—রাজা রাধাকান্ত রায়ের সাহিত্য সেবা—বিদ্যালয়গণ মহাপণ্ডের লেখনী ধারণ—তাঁহার প্রথম গ্রন্থ রচনা—সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম চেষ্টার ব্যাঘাত—পরে অতিষ্ঠার সূত্রপাত—ক্রমে পূর্ণপ্রতিষ্ঠা—তাঁহার প্রবাসিনী ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—সাহিত্য ক্ষেত্রে গুণগ্রাহন লেখকগণের প্রতি তাঁহার বন্ধু ভাব—উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র প্রচারের পথ প্রদর্শন—অক্ষয় বাবু সম্বন্ধে মতামত—তাঁহার সাহিত্য সেবা বিষয়ে বিজ্ঞ জনগণের মত—তাঁহার আরও কিত্ত অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের বিবরণ—তাঁহার লাইব্রেরী।

সপ্তম অধ্যায় ।

ত্রিণিকার বিভাগ

...

...

...

১৪২—১৪৭

বঙ্গদেশে ত্রিণিকার সুচনা হইতে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—রাজা রাধাকান্ত বোমের সহকারিতা—তাঁহার প্রবাসিনী—ত্রিণিকারের বেশুন্দের আবির্ভাব—বিদ্যালয়গণ মহাপণ্ডের সহকারিতা—ত্রিণিকার অত্যন্ত দ্রুত—বেশুন্দের অর্থ সাহায্য—বেশুন্দের মৃত্যুর বিবরণ—ইব্রাহিমের শোক প্রকাশ ও বেশুন্দের সত্য প্রতিষ্ঠা—ত্রিণিকার সেতালে ও একালে আপত্তিকারীদের মত বক্তব্য—বেশুন্দের সম্বন্ধে বিদ্যালয়গণ মহাপণ্ডের একদিনের দৃষ্টি—ত্রিণিকার আগ্রহ—প্রশংসা ও কতিবাকীর—ত্রিণিকার বিভিন্ন ও অত্যন্ত সাহেব বন্ধুদের সাহায্য প্রাপ্তি—মিস কার্পেণ্টারের ভারতে আগমন—বিদ্যালয়গণ মহাপণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ ও আত্মীয়তা—উত্তরপাড়ার গমন—গাড়ী

হইতে পঠন—দ্বারী পীড়ার স্তম্ভপাঠ—সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য নাপ—কুমারী কার্পেটীরের কিসেল
নর্দালবুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব—সে প্রস্তাবে অনেকের সহানুভূতি—বিদ্যালয়গর মহাশয়ের আপত্তি—
কৃষিকারিগণের বিদ্যালয়গর মহাশয়ের মত ও সে বিষয়ের প্রমাণ—বিদ্যালয়গর মহাশয়ের সম্বন্ধে বঙ্গ-
মহিলাগণের কর্তব্য—কৃতজ্ঞতা ও স্মৃতিচিহ্নরক্ষার লক্ষ্য চেষ্টা।

অষ্টম অধ্যায়।

সমাজ-সংস্কারে বিদ্যালয়গর

...

...

২১৮—৩৫১

সতীদাহ নিবারণ—নুতন পরিবর্তনের অভাবে সমাজমধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা—বহুকাল
হইতে বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টার প্রমাণপ্রদ বিষয়—সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গর
মহাশয়ের অত্যাশ্রয়—সমাজ সংস্কার চেষ্টা—শাস্ত্রালোচনা—পাত্র প্রকাশ—বিধবা বিবাহ প্রচলন ও
বহু বিবাহ নিবারণ চেষ্টা—ঐহার বন্ধুগণের সহকারিতা—ইংরাজরাজসমীপে বিধবা বিবাহ আইন
সিদ্ধ করিবার জন্য আবেদন—আপত্তি—যোর আবেদন—পরিণেবে জরাজীর্ণ—ঐশচন্দ্র বিদ্যা-
রত্নের বিবাহ—তৎসংবাদিনী হইতে উদ্ধৃত বিবাহের বিবরণ—অক্ষর বাবুর পত্র—বিদ্যালয়গর
মহাশয়ের নানা প্রকার নিষেধা সচরাচর ঐহার প্রাণসংহারের চেষ্টা—পরবর্তী বিধবা বিবাহ
সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—এই ক্ষেত্রে অনেক স্কন্ধের পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও পলায়ন—অনেকে সাহায্য
দানে বিমুগ্ধ হইয়াতে অর্থাভাবে ও বিপদ সম্মুখীন—দুর্গামোহন বাবুকে এই বিধবা বিবাহ
বিষয়ে সাহায্য পত্র প্রেরণ—রানমারায়ণ বাবুর সহকারিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—রাজকুমার
সর্দাধিকারী মহাশয়ের পত্র—নুতন করিয়া কাজ কর্তব্য চেষ্টা—পুত্র ঐশ্বর্য নারায়ণ চন্দ্র
বিদ্যারত্নের বিবাহ উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ ও সহোদর শঙ্করচন্দ্রকে পত্র প্রেরণ—বিধবা বিবাহ
সংস্কৃত লোকদিগের লক্ষণ ও তত্ত্ববন্ধন মনের ক্ষোভ—শাস্ত্রার্থী দ্বীকার বিষয়ে এদেশীয় লোক-
দিগের উদাসীন—বিধবা বিবাহ বিষয়ে ভারতের অন্যান্য দেশে চেষ্টা—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞ মণ্ডলীর
মত—এত বিবাহের পুরাতন ও আধুনিক তালিকা—বহু বিবাহ বিষয়ক কয়েকটি ঘটনা—ঐহার
অজ্ঞতা বহু বিবাহ নিবারণের জন্য দ্বিতীয় বার চেষ্টা—বিকলমনোরথ—সর্দারী বিবাহ
প্রচলন চেষ্টা—বহু বিবাহ প্রবন্ধে ইংরাজী অনুবাদ—অমুবাদসহ ইংলও গমনের ও মহারাজার
সহিত সাক্ষাৎ করিবার সঙ্কল্প—অন্য বহুবিধ সমাজ সংস্কার চেষ্টার তালিকা—পারীচরণ
সরকার মহাশয়ের দাব্য সেবন নিবারণের চেষ্টা—তাঁহাতে সহায়তা—পারী বাবুর মৃত্যুতে
সজীর হুগে প্রকাশ ও পত্র প্রেরণ—যক্ষ বাজবগণের মধ্যে নানা প্রকার কলহিত ও কুঅভ্যাস
দূরীকরণ চেষ্টা—নিজের হৃদয়ে দ্বারিগণের লোকদিগের মতামত বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ—সম্পত্তি
আইন সম্বন্ধে মন্তব্য—প্রস্তাবিত ঐ আইনের সংশোধন চেষ্টা—ঐহার হিন্দুতাব ও হিন্দু
আচার—হিন্দুসমাজে ঐহার স্থান কত উচ্চ—আহাবান হিন্দুগণের বিদ্যালয়গর-পূজা—ঐহার
প্রমাণপ্রদ পত্রাদি।

নবম অধ্যায়।

জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে

...

...

৩৫২—৬৮৫

বিদ্যালয়গর মহাশয়ের জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারের কল—বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুপ্রাণ—বীরসিংহ
প্রাণের সর্গবিধ উন্নতি সাধন চেষ্টা—সংস্কৃতভাষা স্থাপন—সংস্কৃতপ্রাণ ডিপজিটরী স্থাপন—
মেট্রপলিটন স্কুল ও কালেক্টর বিষয়ক বিবরণ—১৮ বাবেই আণ্ডারীত কল দর্শনে কল্লের আনন্দ
প্রকাশ—বিদ্যালয়গর কলোজিতির সমগ্র বিবরণ—ঐহার লোকান্তর গমনের পরবর্তী মেট্রপলিটন

কালেজ সংক্রান্ত ২১৩১ কথা—বর্ষবার ইংরেজীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার বক্তাবৃত্ত—সে বিষয়ে ২১৩১টি পদ—সেন্টাল টেক্সট বুক কমিটি গঠন কালে নিজের সভা হওয়ার বিরুদ্ধে বক্তব্যপ্রকাশ—বেট পলিটন কলেজের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সকলের উল্লেখ ।

দশম অধ্যায়

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ... ৩৮৬—৪৭৬

বাসর ঘরের বিবরণ—রসিকতা—সন্তানদের ভালিকা—বীরসিংহের পারিবারিক বিবরণ—পিতা মাতা অজ্ঞাত আত্মীয়স্বদের প্রতি কর্তব্য—পিতৃমাতৃভক্তি—হারিসন সাহেবকে বাড়ীতে নিষরণ করিয়া আনা—বিদ্যালয়গর-জনবীর সঙ্গে সাহেবের আলাপ—হারের ছবি তুলাইবার বিবরণ—হারের ধর্মবৃত্ত—পিতার কাশীবাসের সন্ধান—তাঁহার নিষারণ চেষ্টা—বিদ্যালয়গরের সহিত সহোদর দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব—তাঁহার বিচারকল—তাঁহার প্রতি অজ্ঞাত আত্মীয়স্বদের ব্যবহার—সেজন্য তাঁহার দারুণ বন্যতাপ—পিতা মাতা, স্ত্রী ও সহোদরস্বদের নিকট পত্রাদি দ্বারা চির-বিনয় প্রার্থনা—তাঁহার কারণ নির্দেশ—পুত্রের পত্র—লোকের ব্যবহারে একেবারে হৃদয়ভঙ্গ—শেখদশার কিঞ্চিৎ পারিবারিক জ্ঞান—মাতৃবিয়োগ—পূর্ণ একশতসরকাল ব্রহ্মচর্য—জ্যেষ্ঠ ভাণ্ডারীর মৃত্যু—জ্যেষ্ঠ কস্তার দারুণ বৈষম্য-বিবাহে সহস্র পিতার কর্তব্য—পিতার পত্র—পিতৃবিয়োগ—উইল বিবরক বিবরণ—প্রভাবতী সভাবণ—নিজ গৃহে ও অজ্ঞাত বন্ধু সেবা—সে সময়ে কতকগুলি পত্র ও ঘটনা—ব্রহ্মচরিত্রতা—একটা কারবন্দল—সরিফুতার পরিচয়—কুত্র কুত্র গমন ।

একাদশ অধ্যায়

লোকসেবার বিভাগগর ... ৪৭৭—৫২০

লোকসেবার মূঢ়তা—মাইকেল বধুস্বয়ন ও বিদ্যালয়গর—বহুস্তরের বিদ্যালয়গর—বর্ধমানে ম্যালেরিয়াতে বিদ্যালয়গর—বর্ধমানে বিদ্যালয়গর—হোমিওপ্যাথিতে বিদ্যালয়গর—হিন্দু-পারিবারিক নৃত্তি-ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠার বিদ্যালয়গর—বধুস্বয়নের কণ পরিপোষণার্থে সম্পত্তি বিক্রয়—তিপজিটরী দান—ভাণ্ডার সরকারের বিজ্ঞানমন্ডিরে দান—একত্রিশ সহস্র সহস্র মরিচ মৌকির সর্কবিধ অজ্ঞাত মোচন—লোকের প্রবন্ধনা বিবরক গল্প—বিদ্যালয়গর বর্ধমানে একজন লোকের গল্প—প্রবন্ধকারের প্রতি তাঁহার ভালবাসার পরিচায়ক ২১৩১ ঘটনা—এদেশ সময়ে তাঁহার গারগী—পণ্ড পক্ষীর প্রতি তাঁহার প্রেমের সূচক ।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ বিষয়ে বিভাগগর ... ৫২১—৫৩৮

ডগার্স ইনস্টিটিউশন—সেখানে কর্তব্য—তাঁহার জ্ঞানের কারণ—রাঙ্গা প্রতাপজন্মের মৃত্যুর পর তাঁহার দাবালকস্বদের সর্কবিধ দ্ব্যবস্থা সাধন—মহারহোশাখ্যার ভারতীয় মহাপ্রব্রের উন্নতি সাধন—এসিয়াটিক সোসাইটির সহিত বিনাব্যবহারক কলহ—হিন্দুপেট্রিট—এসমুখ্যার সর্কবিধকারী মৃত্যুগরের পথভ্রমণ বিষয়ে সর্কবিধকারীর সহিত পত্রাদি এইরূপ আরও অনেকগুলি ঘটনা—ব্রাহ্মসমাজ সময়ে তাঁহার বক্তাবৃত্ত ও ইহার সহিত সম্বন্ধ—সন্ন্যাস বন্যসন্ন্যাস-স্বদের বিদ্যালয়গর-পুণ্ডার নিষরণ—সর্কবিধকারীর প্রবন্ধ সঙ্গম ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম মতে বিদ্যাসাগর ৫৩৯—৫৪৪

বোধোদয়ে লিখিত ধর্মমত—রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আলাপ—অখিলদ্বীন নামে এক কবিরের গান ।

চতুর্দশ অধ্যায়

স্বর্গারোহণ ৫৪৫—৫৫৫

সহস্রাব্দীর লোকান্তর প্রাপ্তি—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়াবৃদ্ধি—চিকিৎসার ঘন ঘন পরিবর্তন—চিকিৎসার সকলের নিরাশা—স্বর্গারোহণ ।

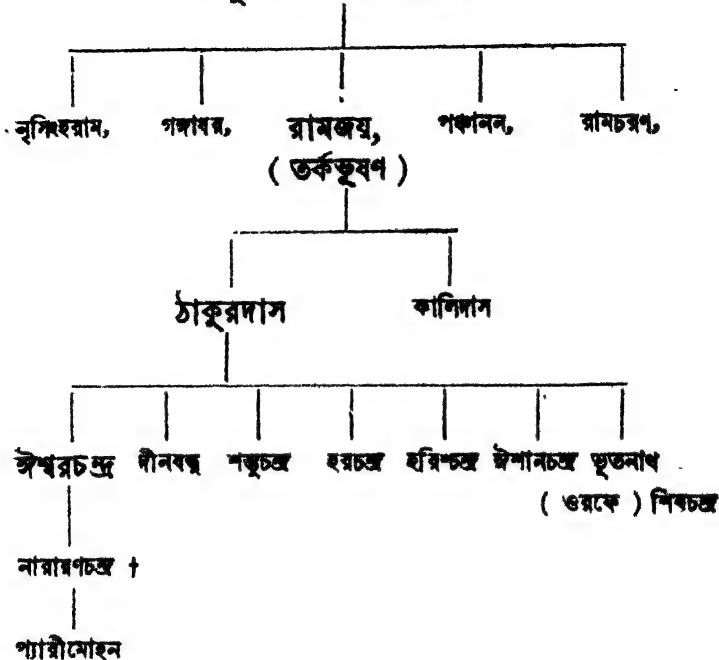
উপসংহার ৫৫৬—৫৬৪

জাতির উন্নতি—উন্নতি সাধকদল—ভারতের ঐশ্বর্য—সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান—তাহার কাণ্ডোঃ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

পরিশিষ্ট— I—XXVI

বংশাবলী :

ভুবনেশ্বর বিদ্যালয়



• ঠাকুরদাসের এই সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটি অতি শৈশবে ব্রহ্মানুবে পতিত হয়। শঙ্করচন্দ্রের অশ্রীত জীবনোত্তেও এই শিশুর নানোন্মেষ নাই। প্রতিবাদে সহোদরের যে নামকরণ করিয়াছিলেন, অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ঐ নামে শঙ্করচন্দ্রের এক পুত্রের নামকরণ হইয়াছিল, সহোদরের নামে পুত্রের নাম রাখা এদেশে অচলিত নাই। কল কথা ঠাকুরদাসের কনিষ্ঠ পুত্র কোনও নামে পরিচিত হইবার পূর্বেই দীনা সঞ্চার করে। তাহাকে বার্টার সকলে ভূতো বলিয়া ডাকিত। শঙ্করচন্দ্রের বার্ডিকা নিবন্ধন অক্ষত্রে পুত্রের নামে সহোদরকে জনসমাজে পরিচিত করিয়াছেন।

† আবার এত্রে নারায়ণে কিভাবে চন্দ্র পদের যোগ হইল শঙ্করচন্দ্র তাহার তত্ত্বজিজ্ঞাস হইয়াছেন। যত্নের কথা বাহিরের লোককে জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজের আত্মপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেই পারিতেন। নারায়ণ বাবুর রচিত অবলাচরিত ও সংশোধিত বোধোদয়ের কৃত্তিকা দেখিলেও তাহার সে অভিজ্ঞতা কমিত। আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইত না। তাই বা কেন? যে বৃহৎ গ্রন্থের তিনি পুথ্যানুপুথ বোধানুসন্ধান করিতে আরম্ভ পাইয়াছেন, সেই গ্রন্থের আরম্ভেই সংক্ৰান্ত রসে ভিপজিটারীয় শ্যামেশ্বর ঈশ্বরক অবিনাশচন্দ্র সুবোধোদায় নাম সংযুক্ত প্রকাশকের নিম্নরূপে নারায়ণ বাবুর স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবাদ লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ কালে আত্মপুত্রের স্বাক্ষরে কি তাহার সৃষ্টি পড়ে নাই? ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।

চিত্র-সূচী

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| বিজ্ঞানাগর মহাশয় | | | | |
| যৌবনকালে ... | ... | ... | ... | ১১০ |
| বার্দ্ধক্যে ... | ... | ... | ... | ৪১২ |
| শ্মশানে ... | ... | ... | ... | ৫৫১ |
| বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের | | | | |
| পিতৃদেব ... | ... | ... | ... | ৪০১ |
| জননী দেবী ... | ... | ... | ... | ৩৯৯ |
| সহধর্মিণী ... | ... | ... | ... | ৫৪৫ |
| মহাত্মা বেথুন ... | ... | ... | ... | ১৯৫ |
| মিস্ কার্পেন্টার ... | ... | ... | ... | ২০৮ |
| প্যারীচরণ সরকার ... | ... | ... | ... | ৩৩৬ |
| গ্রামাচরণ দে ... | ... | ... | ... | ৪৫২ |
| রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ... | ... | ... | ৪৫০ |
| ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ... | ... | ... | ... | ৪৩৯ |
| শ্রীশচন্দ্র বিজয়ারত্ন ... | ... | ... | ... | ২৬৭ |
| সংস্কৃত কালোজের কর্ণপঙ্কীরের প্রদত্ত উপাধি পত্রের লিখোচিত্র | | | | ৬৬ |
| লিখো বাজালা পত্র ... | ... | ... | ... | ২১৫ |
| লিখো ইংরাজী পত্র .. | ... | ... | ... | ৩৭২ |

বিদ্যাসাগর ।

প্রথম অধ্যায় ।

উপক্রমণিকা ।

চিত্র-কৰ্মা বিধাতার ঐন্দ্রজালিক বিধানে ভারতভূমি রত্ন-প্রসবিনী । তাঁহার নীলাপরম্পরা—সৃষ্টির প্রথম হইতে একাল পর্য্যন্ত, ভারতের সুপবিত্র ক্ষেত্রে অসম্ভব ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ ও সকলতা সন্দর্শন করিয়া মানবমন নিয়ত মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে । এই সেই ভূমি, যাহার উর্বরতা, যাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, যাহার চিরতুষারাবৃত অত্যাশ্রিত পর্বতমালা, যাহার নিবিড় বনরাজি, যাহার শাস্ত্রসাম্পদ উপবন-সমূহ, যাহার নিস্তর ও নীরব গিরিগহ্বর, যাহার নির্জন প্রান্তরপ্রদেশ সকল, যাহার প্রাণপ্রদ সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ নদ নদী ও হ্রদ সকল চিরশোভাময় হইয়া লোকচক্ষুর পরিভ্রমণ সম্পাদন করিতেছে । এই সেই দেশ, যাহার ধনি সকল অনন্তকাল ধরিয়া নানা রত্নের আকর হইয়া সমগ্র পৃথিবীর লোকমণ্ডলীর সুখ ও সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে । এই সেই দেশ, যাহার সমুদ্রকূল, চিরকাল অতিথি অভ্যাগতের

পদার্পণে ও বিদেশীয় বণিকগণের কোলাহলে চিরশঙ্কায়মান হইয়া রহিয়াছে। এই শোভা ও সৌন্দর্যের রত্নখনি ভারত ষড়্‌ঋতুর ক্রোড়াক্ষেত্রে হইয়া আরও অধিকতর প্রীতিপ্রদ ও সুখকর হইয়াছে! কেবল প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যের আশ্রয় হইলে এ শ্যামলা সুজলা সুফলা ধরিত্রীর এত আদর হইত না। আরণ্যকুসুমসম নির্জনে সে শোভা লুকাইয়াই থাকিত। এ সুখপূর্ণ, এ সৌন্দর্য্যপূর্ণ চিরশোভা-ময়ী ভারতজননীকে সুকোমল অঙ্গে অনেক বীরশিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সকল সম্পদের আধার এই কল্পতরু-মূলে দণ্ডায়মান হইয়া, এই অক্ষয় বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, পাঠক! তুমি কি প্রার্থনা কর? যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। এমন কি অমূল্য ধন আছে, যাহা এই সর্ব্বফলপ্রদ কল্পতরু-শাখায় না ফলিয়াছে? এমন কি দুর্লভ বস্তু তুমি কামনা কর, যাহা এই সুমহান অক্ষয় বট-বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া পাও না?

তোমার স্মৃতি যদি একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া থাকে, তবে সময়স্রোতের আবর্জনা সরাইয়া ফেল, সেই গৌরবান্বিত-স্মৃতিপূর্ণ মধুর 'পুরাতন কীর্তিকাহিনীর' অম্লত হিলোল এখনও তোমার প্রতিগোচর হইবে। বহুকাল ধরিয়া তোমার চক্ষের উপর কালের যে ধূলিকণা সকল সমষ্টি-ভূত হইয়াছে বলিয়া তোমার দৃষ্টিশক্তি ক্লীণ হইয়াছে, সাধনসহকারে তৎসমুদায় অপসারিত কর, দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া দেখিতে পাইবে :—

এই সেই দেশ, যে দেশের পবিত্রে বেদগানে আকাশ

প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মপরায়ণ মহাবিগ্ণের বিচরণে এই ভূমি চিরপবিত্রে হইয়া রহিয়াছে, কত শত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে সত্য, তথাপি মানব-স্মৃতি সে শোভন দৃশ্য, সে পবিত্র চিত্র, সে স্মৃতি কল্পনা সমস্তে রক্ষা করিতে ও ভক্তিসহকারে স্মরণ করিতে নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে। এই সেই পুণ্য-ভূমি, যাহার তপোবনসমূহে মহাযোগী শুকদেব ও নারদ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, বায়্বাকি ও ব্যাস প্রভৃতি মহাবলসম্পন্ন মহাত্মাগণ বিচরণ করিয়াছেন এবং যাহার রাজসিংহাসনে রাজর্ষি জনক, প্রজাবৎসল রামচন্দ্র, সত্যধর্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় নরপতিগণ উপবেশন করিয়াছেন। সমরধর্মপরায়ণ বিচিত্র বলশালী মহানুভব ভীষ্ম, অর্জুন, কর্ণ প্রভৃতি বীর-পুরুষগণ—তৎপরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভারতে পৃথ্বীরাজ প্রতাপসিংহ—ও তদীয় সম্ভানগণের শোণিতস্রোতে যে ভূমি সিক্ত হইয়াছে, পূত হইয়াছে, ধোত হইয়াছে, এই সেই পবিত্র ভূমি ভারতবর্ষ। এই দেশেই রাজকুমার শাক্যসিংহ সন্সার স্রবের অসারতা দর্শন করিয়া সারতত্ত্বের অনুসন্ধানে জীবন কয় করিয়াছিলেন—এই পুণ্য-ভূমিই তাঁহার মানবপ্রেম প্রচারের মহাতীর্থ। শকরের সুবিশাল কীর্তিস্তম্ভ বেদান্তাদিত্য ভারতেরই মহিমার পরাকার্তা প্রদর্শন করিতেছে। কবি-কুল সম্রাট মহামতি কালিদাস যে মহাসভার রাজকবি ও যে রত্নমণ্ডলীর প্রধান রত্নরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, মহারাজ বিজয়াদিত্যের সে অক্ষর কীর্তিমন্দির উজ্জয়িনী-বক্ষে অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,

সে কীর্তিগাথা অনন্তকাল ধরিয়া ভারতের গৌরব ঘোষণা করিবে ।

ধর্মনীতি, সমাজতত্ত্ব ও জনহিতকর অনুষ্ঠানাদির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া অবশেষে যখন ধর্ম-বিহীনতা ও সামাজিক অবনতির প্রবল আঘাতে আর্ধ্যজাতি মগ্ন হইল, যখন তাহাদের স্বদেশ পরকীয় হস্তে ক্ষুণ্ণ হইল, যখন তাহারা স্বগৃহে পরের অর্থে প্রতিপালিত হইতে শিখিল, তখনও সেই নিরাশার ঘন অন্ধকারে, সেই মৃতপ্রায় নরনারীমণ্ডলীর মধ্য হইতে নানক ও গুরুগোবিন্দ, নাদু ও কবির, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ, হরিদাস ও রামপ্রসাদের ন্যায় ধর্মপ্রাণ ঈশ্বরপরায়ণ সাধুগণের অভ্যুদয় কি বিধাতার বিচিত্র বিধান নহে ?

তৎপরে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিতপ্রায়, বিস্মৃতির অগাধ সলিলে মগ্নপ্রায়, ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন পূর্ব প্রান্তে, পুরুষপ্রবর মহাত্মা রামমোহন রায়েব অভ্যুদয়ও বিধাতার বিচিত্রতার আর এক অঙ্ক । যখন তাঁহার স্নগস্তীর আহ্বানে ভারতসন্তানের বহুকালের নীরবতা ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহাদের গাঢ়নিদ্রার অবসান হইয়াছিল, তাহাদের জড়প্রায় হস্ত পদে চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল, বহুকালব্যাপী ঘন অন্ধকারের অবসানে যখন নব্যভারতের ভাবী শুভদিনের প্রথম উষার আভাস দেখা দিয়াছিল, ভারতের পূর্বপ্রান্তে যখন মেঘমালায় ঘন আবরণ ভেদ করিয়া সূর্যপ্রভাত সমাগত হইয়াছিল, তখন মর্ত্যে ঋষিগণ ও স্বর্গে দেবতারা স্নায়োচ্ছারণ-পূর্বক ভারতসন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন । যখন

আশাতরসার প্রথম প্রভাতকিরণে বঙ্গজননীর বিবাদময় মুখমণ্ডল পরিলক্ষিত হইতেছিল, অজ্ঞতা, আলস্য, জড়তা ও সঙ্গীর্ণতা যখন কীটরূপে বঙ্গসমাজের জীবনীশক্তি কয় করিতেছিল, যখন পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর উভয় তীরে জীবন্ত নারীদেহ সকল জলন্ত হুতাপনে ভস্মীভূত হইত এবং সেই সকল অসহায় হিন্দুবিধবাকুলের আর্তনাদ আকাশ পূর্ণ করিত, যখন জড় ও জীব মিলিত হইয়া এই নারীহত্যা-কার্য্যে রত ছিল, * যখন কোমল পুষ্প-কোরক সদৃশ অসহায় শিশুসন্তানসকল সাগর-বক্ষে প্রকিপ্ত হইত এবং তাহাদের শোকসন্তপ্ত জনকজননী শূন্য হৃদয়ে—শূন্য প্রাণে—শূন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাত্যাহত বৃক্ষের, শ্মায় ভূতলশায়ী হইয়া হাহাকার রবে চারিদিক পূর্ণ করিত, † যখন সুশিক্ষা ও সুশাসনের অভাবে ধনী দরিদ্রের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিত, একজন অশ্রু জনের সর্বস্ব আত্মসাৎ করিতে নিরন্তর প্রয়াস পাইত, যখন অবলা অসহায় নারীজাতির পক্ষ সমর্থনের জন্ত ও দরিদ্র প্রজাকুলের স্বার্থ রক্ষা ও সুখবৃদ্ধির জন্ত দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মাত্মা রাম-মোহন ইংলণ্ড-যাত্রা করিয়াছিলেন, যখন ভারতের আশা ভরসার প্রভাতরবি ক্রমে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, ক্রমে যখন বঙ্গ-সূর্য আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর গর্ভে চিরদিনের তরে মগ্ন হইয়াছিল, তখন কে জানিত যে আর এক

* পতির প্রতি হিন্দুস্ত্রীর প্রগাঢ় অহুরাগ হইতেই সহমরণের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। সেরূপ সহমরণ কোন কালে কোন দেশে আইনের সাহায্যে নিবারণিত হয় না।

† কেবল বঙ্গদেশেই আর্থনিকভাবে এ প্রথা প্রচলিত ছিল।

বীর-শিশু জন্মভূমির ভাগ্য-ললাটে আর এক অঙ্কপাত করিবে ? তখন কে জানিত যে সংস্কৃতকালেজের নিম্নতর শ্রেণীর দশম-বর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র, মহাত্মা রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন ? কে জানিত যে, রামমোহন যে সমাজ-সংস্কার কার্যের সূচনা করিয়া অসময়ে আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে বিদেশে জীবনলীলা সমাপ্ত করিয়াছিলেন, সে সদনুষ্ঠানের সূক্ষ্ম সূত্রে, তিনি বালক ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তে রাখিয়া গিয়াছিলেন ? কে জানিত যে, হুগলীর দক্ষিণসীমান্তে স্থিত ক্ষুদ্র পল্লী রাধানগর, মেদিনীপুরের উত্তরপ্রান্তস্থ বীরসিংহ পল্লীর সহিত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে একই সূত্রে গ্রথিত হইবে ? বিধিলিপি কে জানে ? দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সাধুজনেই বিধাতার অঙ্গুলিসংস্পৃষ্টে বুঝিতে পারেন, অন্নের কি সাধ্য যে, সে গৃঢ় অভিপ্রায়ের কঠিন আবরণ উন্মোচন করে ?

ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালার শুভদিনের সূত্রভাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমাজবিপ্লব, সমাজসংস্করণ ও সামাজিক পরিবর্তনের সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন বীরসিংহের কুটীর-প্রাঙ্গণে জননী-ক্ৰোড়ে শৈশবকাল অতিবাহন করিতেছিলেন, তখন কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড্‌ হেয়ার, দেওয়ান রামকমল সেন ও স্তর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার ভাবী কর্মক্ষেত্রে প্রস্তুত করিতেছিলেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন পল্লীগ্রামের প্রান্তরে জৌড়া কৌড়কে রত ছিলেন এবং অত্যধিক ছরস্তু প্রকৃতি বশতঃ প্রতিবেশিগণের নানা প্রকার ক্লেণ উৎপাদনে আনন্দ অনুভব করিতেন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে পল্লীগ্রামের পর্ণকুটীরবাসী

দরিদ্র জাঙ্গলসম্মান নিজের অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা গুণে —গৌরব ও প্রতিভার পরাক্রমে বঙ্গসমাজকে আন্দোলিত ও কম্পিত করিয়া তুলিবে? কে জানিত যে প্রস্তরবৎ শৈশবনিষ্ঠুরতার অন্তরালে আর্ন্ত ও বিপন্ন লোকমণ্ডলীর জন্ম স্নিগ্ধ স্নেহকণা লুকায়িত ছিল, যাহা কালক্রমে হৃদয়-গামিনী ভাগীরথীর দ্বায় প্রবাহিত হইয়া জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নিবিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করিয়াছে—শীতল করিয়াছে—জুড়াইয়াছে !

বিদ্যাসাগর-চরিত বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জপূর্ণ এবং সেই সকল ঘটনা এতই চিত্তমুগ্ধকর ও এতই উপদেশপূর্ণ যে তাহার আলোচনায় ক্ষুদ্রাশয় ও ক্ষুদ্রজ্ঞানবিশিষ্ট লোকমণ্ডলীর বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা । দরিদ্রের গৃহে জগদ্বিখ্যাত, মহাপণ্ডিত, তেজস্বী ও সর্বগুণসম্পন্ন হুসন্তানের জন্মগ্রহণ পাশ্চাত্য দেশসমূহে নিতান্ত বিরল না হইলেও, অধুনাতন ভারতবর্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না । দুঃখ দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, একাহার ও অনাহারে জীবন যাপন করিয়া, পরিশেষে জনসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হওয়া, এই অলস ও উদ্বিগ্নবিহীন দেশে, বিশেষতঃ বর্তমান বঙ্গসমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া অনুভূত হইলেও, পরলোকগত মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র জীবন কাহিনীতে সে দৃষ্টান্ত পূর্ণরূপে প্রতিকলিত হইয়াছে ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দরিদ্রোদ্বাপি দরিদ্রের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়া উত্তরকালে সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষ-রত্নে পরিণত

হইয়াছিলেন, ইহার গোপন তত্ত্ব কোথায় ? কেহ কি অস্তি-
 নিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, কেন দরিদ্র
 ব্রাহ্মণকুমার ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগরে—দয়ার সাগরে পরিণত
 হইয়াছিলেন ? কেহ কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া-
 ছেন, কোন উপাদানে মহামনা মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের
 মহচ্চরিত্র গঠিত হইয়াছিল ? বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোক
 দেখিতে পাইবেন যে, বিদ্যাসাগররূপ পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা
 ও অভিনয়ে তাঁহার চিরপূজনীয় পিতৃদেব দৃঢ়চিত্ত ও উদারহৃদয়
 ঠাকুরদাসের—বিশেষ ভাবে তদীয় চিরপূজনীয়া জননী—সেই
 পুণ্যবতী সহৃদয়া বঙ্গললনা ভগবতী দেবীর কোমল হস্ত দুখানি
 নিরন্তর পশ্চাৎ হইতে খাটিয়াছে । সেই দয়াবতী সাক্ষীর
 কোমল হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু ক্ষরণে বিদ্যাসাগররূপ মহাসাগরের
 স্রষ্টি হইয়াছিল । সেই হিন্দুবধু পরম যত্নে ঈশ্বরচন্দ্রকে
 লালনপালন করিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী জাতির
 মুখত্ৰী উজ্জ্বল করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন । তাঁহার পুণ্য-
 কাহিনীর গীতধ্বনিতে সমগ্র ভারত প্রতিধ্বনিত হইতেছে ।
 স্মরণ্য যে সকল পারিবারিক ঘটনাপরম্পরায় বিদ্যাসাগর
 মহাশয়ের জীবন গঠিত হইয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গে আমরা সংক্ষেপে
 তাহারই উল্লেখ করিব ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্বপুরুষ ও জন্ম বিবরণ।

শকাব্দ: ১৭৪২, সন ১২২৭, ইংরাজী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার দিবা ত্রিপ্রহরের সময়, ঈশ্বরচন্দ্র, বেলা বেদিনীপুরের অন্তর্গত বীর-সিংহ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইহার পিতামাতার প্রথম সন্তান। এই ক্ষুদ্র পরিবার দরিদ্র হইলে কি হয়, এ গৃহে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণজনোচিত সদহুঠান সকলের অভাব ছিল না। যে যে আচার, আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শনে বালকবালিকা শ্রুতিকা লাভ করিয়া উত্তরকালে উৎকৃষ্ট জীবন বাশন করিতে সক্ষম হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃগৃহে সে সকল আরোজনই ছিল।

যিনি উত্তরকালে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তিভাজন হইতে, আপনার বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ দ্বারা নিজের ও অসংখ্য জনগণের সুখ ও সফলতা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন, তাঁহাকে পৃথিবীর লোকে সহজেই আপনাদিগের হইতে পৃথক করিয়া দেয়; আবার যদি তিনি অপর দশ জনের জ্ঞান, জ্ঞানান্তর বিচারশূন্য হইয়া চিরাগত পদ্ধতির অনুসরণ না করিয়া, নিজে নিজের গম্যপথ নির্দেশ করেন, এবং অপর দশ জনের সে পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে সহায়তা করেন, তাহা হইলে পৃথিবীর লোকমণ্ডলী কেবল যে তাঁহাকে সন্তর করিয়া দেয়, তাহা নহে, তাঁহাকে দৈববল-সম্পন্ন মহাপুরুষ, ঈশ্বরজামিত লোক বলিয়া মনে করে; লোকে বলে ঐ ব্যক্তি ভগবানের বিশেষ রূপালাভ করিয়া সিদ্ধপুরুষ হইরাছেন। এক্ষেপিত মানবসন্তানের জন্মকৃত্যন্ত সীমারপত: কিছু কিছু অসাধারণ ও অপ্রতাপূর্ণ ঘটনাপূর্ণ বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে এবং কোন কোন হলে,

সে সকল অলৌকিক আধ্যাত্মিক যে সত্যমূলক, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণও থাকে না।

বিভাগাগর মহাশয়ের জন্মরহস্যও ঐরূপ কিছু বিচিত্রতাপূর্ণ বলিয়া গণিত পাওয়া গিয়াছে। তিনি যখন জননীপুত্রের অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জননী উন্মাদিনী। নানাপ্রকার ঔষধাদি সেবন করাইয়া কেহ তাঁহাকে বোগমুক্ত করিতে পারিল না। কিন্তু বিভাগাগর মহাশয় ভূমিষ্ট হইতে না হইতেই প্রগতি আরোগ্য লাভ করিলেন, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ ভাব সমস্তই ফিরিয়া আসিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইল। কথিত আছে যে, উদয়গঞ্জনিবাসী জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই আসন্নপ্রসব বঙ্গের কোমল গণনা কবিতা বলিয়া দিয়াছিলেন যে, বধুমাতার কোন প্রকার পীড়া হয় নাই। তিনি সূত্র শরীরে নিরাপদে কালাতিপাত করিতেছেন। জন্মরহস্য-গুণীত কোন মহাপুরুষ তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই তেজঃ-প্রভাবে প্রগতি অধীরা হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ বিশিষ্টরূপ শক্তিশালী শিশু ভূমিষ্ট হইবামাত্র প্রগতি সূত্র হইবেন। যখন সকলেই দেখিলেন শিরোমণি মহাশয়ের কথাটা সত্য হইল, তখন কথিত মহাপুরুষের সমাগমও কিয়ৎপরিমাণে লোকের মনে বরমূল হইয়া রহিল। লোকের মনে একরূপ সম্ভাব জন্মিবাব আরও একটা কারণ ঘটয়াছিল, সেইটী এই যে, জৈশ্বরচন্দ্রের শিষ্টামৃত মর্দপরাগ যোগী তীর্থপর্যটনকারী প্রবাসী রামজয় তর্কভূষণ এক সময়ে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশে এক শক্তিশালী অকুতকর্মী মহাপুরুষের আগমন হইবে, সে শিশু উত্তরকালে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাঁহার কার্যকলাপে দেশের গৌরব বর্ধিত হইবে, সে দ্বারা অবতার হইয়া তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে। স্বপ্নে তাঁহার প্রতি বেশে কিরিতা আসিতে, পরিবার-সদস্যদের সংবাদ লইতে এবং ঐ সূসন্ধানের শুভাগমন প্রত্যাশার অপেক্ষা করিতে আদেশ হইল। রামজয় তর্কভূষণ তদনুসারে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বপ্নান্বিত বিষয়ের সকলতার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপেই আরও একটা বিবীর উল্লেখ আবশ্যক। শিশু ভূমিষ্ট হইবামাত্র উক্ত মহাপুরুষ রামজয় তর্কভূষণ শিশুর জিহবার তলে আলতার

কিছু লিখিয়া দিয়া * বলিয়াছিলেন, এ শিশু উত্তরকালে সকলকে পরাজয় করিবে, ইহার প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চারিদিকে কশ্মিত হইবে, ইহার দরদারাক্ষিপে সকলে মুগ্ধ হইবে। আমিই ইহার দীক্ষাগুরু হইলাম, এ বালক আর অস্ত গুরু গ্রহণ করিবে না; আমার স্বপ্নদর্শন আজ সকল হইল, আমার বংশ পবিত্র হইল।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্যোপাধায় গৃহে ছিলেন না। নিকটবর্তী কোমরগঞ্জ নামক স্থানে মঙ্গলবার ও শনিবার সন্ধ্যাবে চাই দিন হাট হইত। মঙ্গলবার আহাৰান্তে তিনি হাটে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ পুত্রকে এই শুভ সমাচার দিবার জন্ত কোমরগঞ্জ অতি-মুখে গমন করিতেছিলেন, পথে পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইলে, তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে বলিলেন, “এক এঁড়ে বাছুর হইরাছে।” সেই সময়ে তাঁহাদের গৃহে একটা আসন্নগ্রসবা গাভীও ছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা গৃহে পদার্পণ করিয়া সন্ধ্যাবে গোবৎস দেখিবার জন্ত গোশালার দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার পিতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ও দিকে নয়, এদিকে এস, আমি তোমার এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।” এই বলিয়া পুত্রকে লইয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং শিশুকে দেখাইয়া বলিলেন, “ইহাকে ‘এঁড়ে বাছুর’ বলিবার কারণ এই যে, এ বালক এঁড়ে বাছুরের মত এককণ্ঠে হইবে। গাহা ধরিবে, তাহাই করিবে, কাহাকেও ভয় করিবে না। এই বালক কণজন্মা, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ও পরম দরালু হইবে, ইহার বশোদ্বিতে চারিদিক পূর্ণ হইবে, ইহারি জন্মগ্রহণে আমার বংশের অন্ধর কীৰ্ত্তিলাভ হইল। এই-জন্ত ইহার নাম রাখিলান ঈশ্বরচন্দ্র।” বিভাসাগর মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইয়া, সূতিকাগৃহে পিতামহ কর্তৃক যে নামে অভিহিত হইরাছিলেন, সেই “ঈশ্বর-চন্দ্র” নামেই তিনি উত্তরকালে জনসমাজে পরিচিত হইরাছেন, নামান্তর হয় নাই।

বিভাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান বীরসিংহ। বীরসিংহগ্রামের বন, উপবন, খাজুক্ষেত্র, জলাশয় ও অপরূপের সামান্যতর প্রাকৃতিক শোভা তাঁহার শৈশবস্মৃতি

* কি লিখিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও বলেন নাই।

অধিকার করিয়াছিল সভা, বাগ্যাকালের জীড়াকোটুক, আমোদ প্রমোদ, বালাকলহ, বাণাসোহান্য এসকলই বীরসিংহের ক্ষুদ্র সীমার আবদ্ধ থাকিলেও, বীরসিংহ তাঁহার অতি প্রিয় স্থান হইলেও, ইহা তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের বাসভূমি নহে। হুগলী জেলাব অন্তঃপাতী জাহানাবাদের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বনমালীপুর নামে এক গ্রাম আছে, উহাই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহের বাসস্থান। কি কারণে বনমালীপুরের বাসস্থান বীরসিংহে উঠিয়া আসিল, নিয়ে তাহা নিবেশ করা যাইতেছে।

বনমালীপুরে অবস্থানকালে বিভাগসাগর মহাশয়ের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিভাগসাগর মহাশয়ের অবর্তমানে তৃতীয় পঞ্চপুত্র (জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ) একত্র বাস করিতে-ছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতৃদ্বয় সংসারের সমস্ত কার্যভার গ্রহণ করিয়া পরিশেষে অতি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া একরূপ গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতেন এবং তাঁহাদের তৃতীয় সহোদর, বিভাগসাগর মহাশয়ের পিতামহ, রামজয় তর্কভূষণের এতটাই অবমাননা করিতেন, তাঁহাকে এতই ক্রেশ দিতেন যে, তিনি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া কিছুকাল অতি কাষ্টে যাপন করিয়া পরিশেষে ছুইটা পুত্র ও চারিটা কন্যাসহ পত্নী দুর্গাদেবীকে গৃহে রাখিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে দেশত্যাগী হইলেন।

বীরসিংহ গ্রামে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন। রাত্রেই তিনি অধিতীয় বৈয়াকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন। একরূপ কথিত আছে যে, মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ধনৌচন্দ্রশেখর ঘোষের মাতৃশ্রদ্ধ উপলক্ষে যে ‘অধ্যাপকমণ্ডলী’ নিমন্ত্রিত ও সমাগত হইরাছিলেন, তাহাতে নববোপের সে সময়ের প্রধান নৈসর্গিক সুপ্রসিদ্ধ শব্দর তর্কবাগীশও উপস্থিত ছিলেন। তিনি উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দর্শনে, প্রীত হইয়া, সর্বসমক্ষে তাঁহার অচূর সাধুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া সে সময়ে তাঁহার প্রতিপত্তি ও সম্মান আরও বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই ঘটনা দ্বারা তিনি সর্বসাধারণের অধিকতর সম্মান ও সমাদরের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ গৃহত্যাগের সময়ে যে পত্নী দুর্গাদেবীকে সম্মানসহ বনমালীপুরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি ঐ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের

তৃতীয়া কস্তা । তর্কভূষণ মহাশয়ের দেশত্যাগের পর হুর্গাদেবী কিছুকাল অতি কষ্টে স্বশ্রমালয়ে বাস করিয়া, অবশেষে অসহনীয় বয়স্কার ভাড়াদার ত্যক্তবিরক্ত হইয়া বীরসিংহে শিড়ালয়ে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন । হুর্গাদেবীর দুই পুত্র ও চারি কস্তা । জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস, কস্তাগণের জ্যেষ্ঠার নাম মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দমণি, কনিষ্ঠা অম্বপুর্ণা, এই সন্তানদের সর্ব জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, শিড়ালগর মহাশয়ের জনক ।

হুর্গাদেবী পুত্রকস্তাসহ পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর তাঁহার শিতা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বহু সমাদরে কস্তা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগুলিকে গ্রহণ করিলেন এবং পরম যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন । অল্প কয়েক দিনের জন্ত হুর্গাদেবীর মনে এই আশার সঞ্চার হইরাছিল যে, পুত্রকস্তাসহ তিনি কিছুকাল কথঞ্চিৎ নিরুদ্বেগে কালবাণন করিতে পারিবেন । কিন্তু পরিভ্রমের বিষয় এই যে, তাঁহার সে আশা অনতিকাল মধ্যে নিরাশার গভীর অন্ধকারে আবৃত হইল । একে স্বামী নিরুদ্বেগ, তাতে কয়েকটি অপোগণ্ড বালকবালিকার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর । শিড়ালয়ে শিতামাতার অত্যধিক বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তদীয় পুত্র ও পুত্রবধূর উপর সংসারের সমস্ত ভার স্তম্ভ হওয়ার, হুর্গাদেবীর হুঃখ ও লাহুনা ভোগের সীমা রহিল না । তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ অনির্দিষ্ট কালের জন্ত এইরূপ সাতজন লোকের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত ছিলেন না এবং সেই কারণে সর্বদাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার অশ্রীতিকার বচসা ও কলহের অবতারণা করিতেন । সময়ে সময়ে অত্যধিক মর্শ্মশীকার কারণ উপস্থিত হইলে, কস্তা তাহা বৃদ্ধ শিতামাতার গোচর করিতেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইত না, কারণ উমাগতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ও তদীয় পত্নী সম্পূর্ণরূপে পুত্র ও পুত্রবধূর অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কোন বিষয়ে কোন প্রকার কর্তৃত্ব খাটিত না । এজন্য কিছুদিনের মধ্যেই হুর্গাদেবী বুঝিলেন, পুত্রকস্তাসহ শিড়ালয়ে শিতার সঙ্গে দেহ ধারণ করা হারাণা মাত্র । অবশেষে শিতার আদেশে পিতৃগৃহের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র কুটার নির্মাণ করাইয়া তাহাতেই পুত্রকস্তাসহ অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন ।

সেকালে নিরুপায় ভদ্র পরিবারের অসহায়্য স্ত্রীলোকেরা টেকুরা ও চরখায় সূতা কাটিয়া অন্তের সাহায্যে সেই সূতা বাজারে বিক্রয় করিয়া অতি দীনভাবে আপনাদের ভরণপোষণ কার্য্য নির্বাহ করিতেন। দুর্গা-দেবীও সেই পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি একাকিনী হইলে, হয় ত এই সামান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ কায়ক্লেশে তাঁহার দিনপাত করা সম্ভব হইত। এতগুলি সম্ভান লইয়া এ উপায়ে কোনক্রমেই অন্ন সংস্থান হয় না, একান্ত পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতি কষ্টে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস জননীর অসহনীয় যন্ত্রণা দর্শনে নিরতিশয় কাতর হইয়া অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্ষায় বালাকালেই গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। জননীর অনুমতি লইয়া বালক ঠাকুরদাস অর্থোপার্জনের জন্ত যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র।

সে সময়ে তাঁহাদের অতি নিকট জ্যাতিপুত্র অগম্যোহন জ্ঞায়ালঙ্কার মহাশয় সুবিধা ও সুযোগক্রমে কলিকাতায় সম্মানিত ও প্রতিপন্ন ব্যক্তি হইয়া ছিলেন। সুসময় ও সহৃদয়তাগুণে তিনি অকাতরে অন্ন দান করিতেন। জ্যাতিপুত্র ঠাকুরদাস বিপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করায় জ্ঞায়ালঙ্কার মহাশয় বালক ঠাকুরদাসকে পরমযত্নে গৃহে স্থান দিলেন। ঠাকুরদাস ইতিপূর্বে বনমালীপুরে ও তৎপরে বীরসিংহে সংক্ৰান্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি জ্ঞায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুর্ঙ্গাষ্ঠাতে যথারীতি সংস্কৃত বিজ্ঞা শিক্ষা কারিবেন এইরূপ স্থির হইল এবং তিনিও তাহাতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, দীর্ঘকালব্যাপী সংস্কৃত অধ্যয়নে আশ্রয় অর্থোপার্জনের আর কোন আশা ভরসা থাকে না, তখন জননীর হৃৎকষ্ট স্মরণ করিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। এক দিকে বিভাগ্যশিক্ষা করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অত্র দিকে নিরুপায়্য জননী ও ভাইভগিনী-গুলির অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্ত মনের উত্তেজনা; এই উভয়বিধ চিন্তার মধ্যে পরিশেষে শেষোক্তটীরই জয় হইল। অন্ন সময় মধ্যে কোন প্রকার অর্থকরী বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া জননীর হৃৎকষ্ট দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ঐ সময়ে মোটামুটি ইংরাজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদের আফিসে সহজেই কর্ম্য কাজ হইত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষা করাই পরামর্শ সিদ্ধ ভাবিয়া সকলেই ঠাকুরদাসকে সেইরূপ পরামর্শ দিলেন । কিন্তু এতদুপকার মত সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষার কোন প্রকার সুবিধা ছিল না । পড়িবার পুস্তক ছিল না, পড়াইবার লোক ছিল না । তখন এখনকার মত পাড়ার পাড়ার বিদ্যালয়ও হয় নাই । সে কালে লোকে ইংরাজী কতকগুলি শব্দ কর্তৃক করিয়া রাখিত । মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সময় হয়ত দুই তিনটা বিশেষ্য পদ বা দুই তিনটা ক্রিয়াপদ একত্র যোজন করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিত । সাহেবেরা কোন প্রকারে তাহার অর্থ বুঝিয়া লইতেন । অনেকে অধিকাংশ স্থলে মনের ভাব কতক ইংরাজী, কতক হিন্দী, আর অবশিষ্ট আভাস ইঙ্গিতে প্রকাশ করিত । একজন লোক খুব ভাল ইংরাজী শিখিয়াছে বলিয়া যখন প্রশংসাপত্র পাইত, তখন তাহার এই অর্থ বুঝিতে হইত যে, সে বাক্তি পাঁচ শত, কি হাজার, কি দুই হাজার শব্দ কর্তৃক করিয়াছে । এই রূপেই সে সময়ে ইংরাজী বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইত । ঠাকুরদাস এইরূপ ইংরাজী শিক্ষার আয়োজন করিলেন । জায়াগড়ার মহাশয়ের এক বন্ধু কাজ চাগাইবার মত ইংরাজী জানিতেন, তিনিই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধে ঠাকুরদাসকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন । সেই ভদ্রলোকটা বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে সমস্ত দিনট বাহিরে থাকিতেন, সুতরাং সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদাসকে তিনি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন ।

ঠাকুরদাস সেই ভদ্রলোকের বাসায় গিয়া ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন । কিছু দিন অতীত হইলে পর, একদিন সন্ধ্যার সময় সেই ভদ্রলোক ঠাকুরদাসকে অভ্যস্ত শীর্ণ ও দুর্বল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুরদাস, তুমি এত রোগা হইতেছ কেন ?” ঠাকুরদাস কি উত্তর দিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন । তখন সেই সদাশয় মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে বলিলেন, “মহাশয় ! ইংরাজী পড়ার সূচনা হইতে আমি একাহারে দিন যাপন করিতেছি । জায়াগড়ার মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যার পরেই উপরি লোকের আহাৰাদি শেষ হয় । আহাৰের অন্ত বিলম্ব করিলে প্ৰভা হয় না, আবার পড়িতে আসিলে, রাত্রিতে গিয়া দেখি, সকলের আহাৰ হইয়া গিয়াছে । অগত্যা রাত্রিতে আর আহাৰাদি হয় না । সেই জন্যই

শরীর দিন দিন ক্লশ হইয়া যাইতেছে।” এই সময়ে সেই শিক্ষকের এক দয়ালু আত্মীয় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই শিক্ষালোলুপ বাগকের ক্লেশের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন, “দেখ, ঠাকুরদাস! বাহা শুনিলাম, তাহাতে তোমার আর ওখানে থাকা হইতে পারে না, যদি তুমি রাখিয়া থাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার বাসায় স্থান দিতে পারি।” ঠাকুরদাস এই প্রস্তাবে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। এই ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি তাহার পরদিন হইতে তাহার বাসায় গিয়া রহিলেন এবং দুই বেলা আহারের সংস্থান হওয়াতে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত মনে লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দয়ালু ব্যক্তির যেরূপ সদাশয়তা ও সৌজন্য ছিল, অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল ছিল না। তাহাকেই সর্বদা অর্থানভাবে ক্লেশ পাইতে হইত, এজন্য ঠাকুরদাসকে অনেক সময় কুখ্যার ছটফট করিতে হইত; কিন্তু তথাপি এই ব্যক্তির স্নেহ মমতা ও মিষ্ট কথায় সে ক্লেশ কথঞ্চিৎ সহ্য কবিত্তে সক্ষম হইতেন, কিন্তু এপর্যন্ত দুই বেলা দুই মুষ্টি খাইতে পাইয়া, নিশ্চিন্ত মনে লেখা পড়া করিতে অবসর পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই ভ্রমলোকটী দালালীর কার্য্য করিতেন। মহা ইহার আয়ের এত হ্রাস হইল যে, দিন চলা ভার হইল। তিনি সামান্য অর্থোপার্জনের জন্য সমস্ত দিনই বাহিরে থাকিতেন, সন্ধ্যার সময়ে কোন দিন কিছু আনিতেন, কোন দিন বা শূন্য হস্তে বাসায় ফিরিতেন। যে দিন কিছু আনিতেন, সে দিন সমস্ত দিনের পর রাত্রিতে দুইজনের আহার হইত, যে দিন কিছু পাইতেন না, সে দিন হয়ত উপবাসেই যাইত। এইরূপ আকস্মিক বিপৎপাতে ঠাকুরদাসের ক্লেশের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাহার পক্ষে হইল—“অভাগা যত্নপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।” অনেক সময়ে সমস্ত দিন অনাহারে কাটাইতে হইত। কুখ্যার কাতর হইলে কোখায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না। তাহার একখানি সামান্য পিতলের থালা আর একটা ছোট ষটী ছিল, তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, এক পরসার শালপাতা কিনিয়া রাখিলে, দশ বার দিন তাহাতে আহার চলিতে পারিবে; এমন অবস্থায় থালাখানি বিক্রয় করিয়া যে পরসা হইবে, তাহা দ্বারা যে যে দিন দিনের বেলায় আহার না হইবে, সেই সেই দিন এক পরসার কিছু কিনিয়া খাইলে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি সেই থালাখানি নুতন বাজারে কাঁসারিদের দোকানে বিক্রয় করিতে গেলেন, একে একে

সকল কাঁসারিই বলিল “আমরা অজ্ঞানিত লোকের নিকট পুরাণ বাসন কিনিয়া শেষে কি বিশেষ পড়িব ? সময়ে সময়ে পুরাণ বাসন লইয়া বড় ক্যাসাতে পড়িতে হয় । আমরা তোমার ও থালা লইতে পারিব না ।” যখন কোন দোকানদারই থালা লইল না, তখন নিরুপায় হইয়া বিব্রণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন । ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হইয়া থালা বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন, আহােরের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া শেষে দাক্ষণ যন্ত্রণায় সে দিনও উপবাসে কাটিল ।

আর একদিন মধ্যাহ্ন সময় ক্ষুধার জ্বালায় আর গৃহে ভিত্তিতে পারিলেন না । অস্ত্রমনক হইয়া ক্ষুধার জ্বালা ভুলিবার অভিপ্রায়ে তিনি সেই রোজে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি তাঁহার অভিপ্রায়ে বিপরীত ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইলেন । বড়বাজারে তাঁহার আশ্রয়দাতার বাসা হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত আসার পর তিনি চক্কে সরিষাকুল দেখিতে লাগিলেন । সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল । এমন সময় তিনি এক দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ! সেই দোকানে একটি মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোক মুড়িমুড়কী বেচিতেছিল । সেই বিধবা ঠাকুরদাসকে ঐকপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন ?” ঠাকুরদাস পানার্থে একটু জল চাহিলেন । সেই বিধবা ঠাকুরদাসকে সম্মুখে ও সমাদরে বসিতে বলিয়া জল আনিয়া দিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে সুধু জল দেওয়া অস্তায় বোধে কিছু মুড়কীও দিল । ঠাকুরদাস মুড়কী করটা যেরূপ ব্যগ্রভাবে ভক্ষণ করিলেন, তাহা দেখিয়া সেই বিধবা বুকিতে পারিল যে তাঁহার সে দিন অর্হা হইয়াছে নাই । তখন সেই স্ত্রীলোকটি কহিল, “বাবাঠাকুর, আজ বুকি তোমার খাওয়া হয় নাই ?” ঠাকুরদাস বলিলেন, “না, মা, আজ এখনও আমি কিছুই খাই নাই ।” তখন সেই স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিল, “বাবাঠাকুর জল খাইওনা, একটু অপেক্ষা কর ।” এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে দুই কিনিয়া আনিলা । মুড়কী ও দুই দিয়া ঠাকুরদাসকে ফলার করাইল । আহার করাইয়া তাঁহার নিকট তাঁহার অবস্থার কথা শুনিলা এবং বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া বলিয়া দিল, “দেখ, যে দিন তোমার খাওয়া না হ’বে, সেদিন উপোস করিয়া থাকিও না আমার এইখুঁনে আসিয়া ফলার করিয়া বাইবে ।” এই বিধবা যে কেবল অহু-বোধ করিয়াছিল তাহা নহে, অন্যাহারে না থাকিয়া, দোকানে আসিয়া ফলার

করিয়া যাইতে ঠাকুরদাসকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত অসম্পূর্ণ শৈশব-চরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন :—“পিতৃ-দেৱের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীস্বাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়া প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না ; যাহা হউক, যে যে দিন দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন ঐ দরাময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।” বাহার বাচিয়া থাকার প্রয়োজন, বাহার দ্বারা সংসারের কল্যাণ সাধিত হইবার কথা, তাঁহাকে বিধাতা এইরূপ দুঃখকষ্টেও রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি এরূপ দুঃখ দারিদ্র্যে পেষণে পিষিয়া গিয়াও সৎপথে চলিতে প্রয়াস পান, বিধাতা তাঁহাকে সকল সুখের অধিকারী করিয়া নিজের মহিমা প্রকাশ করেন। ঠাকুরদাসও উত্তরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র প্রাপ্ত হইয়া সংসারে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ অপরিসীম ক্লেশে যখন ঠাকুরদাসের দিনগুলি কাটিতে লাগিল, তখন তিনি প্রায়ই তাঁহার আশ্রয়দাতাকে বলিতে, কোন সুযোগে আমাকে কোথাও একটু কর্ম কাজ করিয়া দিন। আমি ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, প্রাণ-পণ শ্রম করিয়া প্রভুর কার্য করিব, প্রাণান্তেও অধর্ম্মাচরণ করিব না। আমার উপেক্ষার করিয়া আপনাকে কখন কোন কথা শুনিতে বা লজ্জিত হইতে হইবে না। দেখুন, আমার মা ভাই বোনের কথা যখন মনে হয়, তখন আর মুহূর্ত্তের জন্ত জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। যখন ঠাকুরদাস আর্ন্তভাবে এই সকল দুঃখের কথা বলিতেন, তখন চক্ষুর জলে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইত। তাঁহার এই কাতরতা দর্শনে আশ্রয়দাতার হৃদয়ে বিশেষ দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি মাসিক দুই টাকা বেতনে ঠাকুরদাসকে এক স্থানে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই দুই টাকা বেতনে ঠাকুরদাসের আর আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্ব্বের ছাত্র আশ্রয়দাতার বাসায় থাকিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ সহ করিয়াও বেতনের দুইটা টাকা বাড়ীতে পাঠাইতে লাগিলেন। ঠাকুরদাস বুদ্ধিমান, দৃঢ়চিত্ত ও কার্য-কুশল লোক ছিলেন ; যেখানে যখন কর্ম করিতেন, তখন সেখানকার প্রভু তাঁহার

দৃঢ়তা, শ্রমপটুতা ও নিপুণতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন । এই জন্ত তিনি কখনও কাহারও বিরাগভাজন হন নাই ।

আমরা বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে, যখন তাঁহার শিক্ত-ঠাকুরের এই মাসিক দুই টাকা বেতনের কর্তব্য হয়, তখন তাঁহার শিতার গৃহে আনন্দোৎসব হইয়াছিল । দুই টাকা বেতনের কর্তব্য হইয়াছে শুনিয়া, বাড়ীর সকলে আহ্লাদে দিশাহারা হইয়াছিলেন । দুই তিন বৎসরের মধ্যে ঠাকুরদাস নিজের শ্রমশীলতাগুণে দুই টাকার স্থানে পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন, ইহাতে জননী ও ভাইভগিনীগুলির অন্নকষ্টের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হওয়াতে, ঠাকুরদাস অধিকতর আগ্রহাতিশয়সহকারে কাজ করিতে লাগিলেন ।

দুই টাকা বেতনের কথা শুনিয়া দিশাহারা হইবারই কথা । সেকালে আট আনা দশ আনার একমণ চাউল পাওয়া যাইত । এক টাকার একমণ দুধ মিলিত । শাক সজ্জি ও তরিতরকারী প্রায় ক্রয় করিতে হইত না । সেকালে দরিদ্র লোকে টাকা প্রায় দেখিতে পাইত না, দেখার দরকারও হইত না ! বিনা টাকার দিন চলিত । বন্ধের কি চরদৃষ্ট ! আমাদের কি পোড়াকপাল ! এমন সুখের দিন দরিদ্রের জোড় হইতে চিরদিনের জন্ত অপহৃত হইয়াছে । জন্ম-ভূমির দক্ষভাগ্যে কি সে শুভদিন আর আসিবে না, যখন অল্পের কাজাল দীনহুঁখী জনগণ গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটারে বসিয়া অবাধে অল্পের গ্রাস মুখে তুলিতে পারে ? দয়ারসাগর বিজ্ঞানাগর মহাশয়ই কেবল এই কঠিন সমস্তার মীমাংসা করিতে সক্ষম ছিলেন । কাজে ও কথায় তিনিই ইহার সত্ত্বর দিয়া গিয়াছেন ।

এই সময়ে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের পিতামহ স্বামজরী তর্কভূষণ গৃহে প্রত্যায় গমন করেন । তিনি প্রথমে বনমালীপুরের বাটীতে আসিয়া সেখানে পত্নী ও তনয়তনয়ীগণের কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া বীরসিংহে গমন করেন । এখানে আসিয়া প্রথমে কাহারও নিকট পরিচয় দেন নাই । ছদ্মবেশে পরিবার ও সন্তানগণের অবস্থা দর্শন করিতেছিলেন । তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা অল্পপূর্ণাই সর্বাগ্রে পিতাকে চিনিতে পারিয়া বাবা বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করত সবার কাছাকাছি আসিয়া পিতাকে চিনিতে পারিলেন । তিনিও আশ্চর্য্যপরিচয় দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন । কয়েকদিন বীরসিংহে বাস করিয়া পত্নী ও পুত্রকন্যা

লইয়া বনমালীপুরে যাইবার মানস করিলেন। কিন্তু পত্নীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের কথা শুনিয়া সাতিশর মন্দিরগীড়া পাইয়া শেষে বাধ্য হইয়া বীরসিংহেই বাস করা স্থির করিলেন। এইরূপে বীরসিংহ বিভাগাগর মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান হইয়াছে।

তর্কভূষণ মহাশয় কয়েকদিন বাটীতে অবস্থান করার পর, ঠাকুরদাসকে দেখিবার জ্ঞাত, কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা, জায়পরতা প্রভৃতি সঙ্গুণের পরিচয় পাইয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারে ভাগবতচরণ সিংহ নামক একজন সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। ইহার সহিত ঠাকুরদাসের পিতার বিশেষ পরিচয় ছিল, সিংহ মহাশয় অতি দয়ালু ও ধার্মিক লোক ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তাঁহার দেশত্যাগ ও নানাদেশ পরিভ্রমণ ও নানা তীর্থ পরিদর্শন বস্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ঠাকুরদাসকে তাঁহার গৃহে রাখিবার জ্ঞাত তর্কভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর পিতার আদেশমত ঠাকুরদাস, সিংহ মহাশয়ের গৃহে নিশ্চিন্ত মনে ছুবেলা উদয় পূরিয়া আহার করিতে পাইয়া, পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহার বোধ হইয়াছিল, যেন পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন। এই-পান হইতে বিভাগাগর মহাশয়ের পিতৃগৃহের সুখ এবং সুবিধার স্তূত্রপাত হইয়াছিল। সিংহ মহাশয়ের গৃহে ঠাকুরদাসের যে কেবল অন্নকষ্ট দূর হইয়াছিল তাহা নহে, সিংহ মহাশয়ের সহায়তায় তিনি মাসিক আট টাকা বেতনে কোন স্থানে কর্মে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের বেতনবৃদ্ধির সংবাদ শুনিয়া জননী ঈর্ষাদেবীর আর আত্মাদের সীমা ছিল না।

এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইবে। তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন এবং গোষাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাসদৃশী এই ভগবতীদেবীই বিভাগাগর মহাশয়ের জননী। ভগবতীদেবীর পিতা তর্কবাগীশ মহাশয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্মচিন্তা, ধর্মালোচনা ও সাধন ভঞ্জে সর্বদা নিযুক্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন। বিষয় কর্মে মনোযোগ দেওয়া এবং সংসার সুখ সম্ভোগ করা অকিঞ্চিৎকর

বোধে তিনি সর্বদাই তাহা পরিহার করিতেন। তিনি বহুকাল শবসাধনে নিযুক্ত থাকায় শেষে উন্মাদগ্রস্ত হন। একজ্ঞ পত্নী গঙ্গাদেবী লক্ষী ও ভগবতী নারী কস্তাঘর ও উন্মাদ স্বামীকে লইয়া পাতুল গ্রামে পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রাপ্ত হন। ভগবতীদেবী আশৈশব মাতুলালয়ে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। এই আদর্শ হিন্দুগৃহের ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি ও ভাবভক্তি ভগবতীদেবীর চরিত্রগঠনের প্রধানতম উপকরণ হইয়াছিল। ভগবতীদেবীর মাতামহ পঞ্চানন বিভাবাগীশ মহাশয়ের অবর্তমানে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিভাভূষণ অজ্ঞাত সহোদর ও সহোদরাদের লালনপালনের ভার নিজ স্বন্ধে গ্রহণ করিয়া পিতার স্মনাম রক্ষার জন্ত নিয়ত যত্ববান থাকিতেন। হিন্দু-গৃহে একান্নবর্তী পরিবারে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে সকলেই সুখে কাল যাপন করিতে পারে, এই পরিবার ত্রাহার আদর্শস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বিভাবাগীর মহাশয় তাঁহার পুর্কোন্নিখিত ক্ষুদ্র জীবনচরিত্তের প্রথম অধ্যায়ের শেষাংশে লিখিয়াছেন :—“সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্তী ভ্রাতাদের অধিক দিন পরস্পর সন্তাব থাকে না ; যিনি সংসারে কর্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকেন, অজ্ঞ অজ্ঞ ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, সেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকা, কোনও মতে ঘটয়া উঠে না, একজ্ঞ অজ্ঞ দিনেই ভ্রাতাদের পরস্পর মনাস্তর ঘটে ; অবশেষে, মুগ্ধ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া পৃথক হইতে হয়। কিন্তু সৌজ্ঞাত ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারি সহোদর সমান ছিলেন, একজ্ঞ কেহ কখনও ইহাদের সঙ্গি জ্ঞানের মধ্যে মনাস্তর বা কথাস্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনের, ভাগিনেরীদের পুত্র-কস্তাদের উপরও তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেরীরা পুত্র কস্তাসহ মাতুলালয়ে গিয়া যেরূপ সুখে সমাদরে কালযাপন করিতেন, কস্তারা পুত্র কস্তা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া, সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর গ্রাপ্ত হইতে পারেন না।”

“অতিথির সেবা অভ্যাগন্তের পরিচর্যা এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অজ্ঞাত প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঐ অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের স্তায় অতিপতি লাভ করিতে পারেন নাই। কল কথা এই, অজ্ঞ প্রার্থনার,

রাধামোহন বিজ্ঞানভূষণের দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইরাছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক ইউক, লোকের সংখ্যা যতই ইউক, বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের আবাশে আসিয়া সকলেই, পরম সমাদর, অতিথি-সেবা ও অভ্যাগত-পরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।”

“বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায় এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্তী বহুতর গ্রামে আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের আজ্ঞাবর্তী ছিলেন। অকুণ্ঠ গ্রামবন্দের লোকদের বিবাদ-ভঞ্জন, বিপদ-মোচন, অসময়ে সাহায্য দান প্রভৃতি কার্যই বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্ব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু সেই অর্থের সঞ্চয় অথবা স্বীয় পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, একদিন একক্ষণের জন্তেও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত নিরোজিত ও পর্যাবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রান্তঃস্বরণীয় রাধামোহন বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের মত, অমায়িক, পরোপকারী ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।”

“রাধামোহন বিজ্ঞানভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে নাই, আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, মাতৃদেবী পুত্র কন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন, কিন্তু এক দিনের জন্তেও ঘেঁহু, যঙ্গ ও সমাদরের ট্রাফি হইত না। বস্তুতঃ ভাগিনেরী ও ভাগিনেরীর পুত্র কন্যাদের উপর এরূপ স্নেহ প্রদর্শন অদৃষ্টের ও অশ্রুপূর্বক ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনেরীর মৃত্যু হইলে, তদীয় একবর্ষীয় দ্বিতীয় সন্তান, বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিচলিত স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।”

আত্মীয়স্বজনের সেবা, জ্ঞাতীগোষ্ঠীর ভারগ্রহণ, মৃত আত্মীয় স্বজনের অনাথ ও নিরাশ্রয় পুত্রকন্যার লালন পালনই এই পরাধীন ও প্রাণহীন বঙ্গসমাজের পরম সম্পদ ও অমূল্যধন বলিয়া চিরকাল কীৰ্ত্তিত হইয়া আসিতেছে এবং বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের লেখনীগ্রস্ত

উপরোক্ত করেক পংক্তি সেইরূপ আদর্শ হিন্দুগৃহের প্রকৃত চিত্রের পরিচায়ক । এমন এক সময় ছিল, যখন লোক বিবর সম্পত্তি লাভ ও অর্থোপার্জন করিয়া কেবল নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার পরিবর্তে আত্মীয় স্বজন ও অপর দশজনের সুখ সাধন করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেন । সে কালে লোক দশজনের সুখ বর্দ্ধন করিয়া কৃতার্থ হইতেন, তাহার কারণ এই যে, নিজের সুখের বিনিময়ে অল্প দশ জনের সেবা করাই ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন । ধর্ম বোধে ধর্ম্মাকাজী লোকেরা এইরূপ সদনুষ্ঠানে নিয়ত রত থাকিতেন । এক্ষণে সেই ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্তিত হইয়াছে । এখনকার লোক এক্ষণে ধর্ম্মকর্ম্মের পরিবর্তে আয়সুখের একান্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছে, তাই উপরোক্তরূপ আদর্শ হিন্দুপরিবার এবং রাধামোহন বিদ্যাভূষণের স্ত্রীর সহদয় পরোপকারী ধর্ম্মনিরত লোক অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না ।

সেকালে একদিকে যেমন অল্প আয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত ও অল্প ব্যয়ে লোককে প্রতিপালন করা যাইত, অপরদিকে সম্পন্ন লোকদের নিজের পরিবারবর্গের সভ্যভাসঙ্গত বহুবিধ সুখভোগের বাসনা তত প্রবল ছিল না । সঙ্গতিপন্ন লোকের গৃহেও এখনকার অতি সামান্য লোকের গৃহের অপেক্ষা অধিক অলঙ্কারাদি থাকিত না । অনেক জ্বীলোক ছুচারি খানি রোপ্যালঙ্কার পাইলেই আপুনাদিগকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেন । সেকালে পুঙ্খবেরা যেমন দশজনকে প্রতিপালন করিতে সুখানুভব করিতেন, জ্বীলোকেরা আত্মীয় সাবিত্রীর স্ত্রীর পতিরতা ও সীতার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারিলেই আপুনা-দিগকে ধন্য মনে করিতেন । সেকালে গৃহে পুরাঙ্গনারা অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন বলিয়া, বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রচুর পরিমাণে সুখশাস্তি বিরাজ করিত এবং বিপন্ন আত্মীয়স্বজন, সম্পন্ন গৃহে আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইত । বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ জননীর মাতুলালয়ে হিন্দুগৃহের এক্ষণ উচ্চ আদর্শ দর্শন করিয়াও একান্ত-বর্ত্তী পরিবারের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন । তিনি বলিতেন :—যেখানে পুঙ্খ স্বীয় কথায় মরে বাচে, সেখানে সহোদরে সহোদরে আত্মীয়তা থাকে না, এমন অবস্থায় আর একান্তবর্ত্তিতা রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করা বৃথা । যাহারা দূরে আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া অশান্তির আগুনে দগ্ধ করা

অপেক্ষা, যাহারা একত্র আছে তাহাদের কোন প্রকার মনোমালিন্ধ ঘটিবার পূর্বেই পৃথক পৃথক বাস করা শ্রেয়ঃ, কারণ তাহা হইলে, সহোদর আর কখন সহোদরের শত্রু হইবে না! চিরদিন সম্ভাব ও শাস্তি সুরক্ষিত হইবে। সুখের সংসারে অর্থাগম হইলে, তদ্বারা সহোদরের, তাহার পুত্র কণ্ঠাগণের ও অজ্ঞাত আত্মীয় স্বজনের যথেষ্ট হিতসাধন করা যায়, কিন্তু অশান্তিপূর্ণ সংসারে লক্ষ টাকাতোও কাহারও কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর নহে। এই কারণে বিজ্ঞানাগর মহাশয় চিরদিনই এই প্রকার বিরোধী ছিলেন।

বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অতি তেজস্বী ও স্বাধীন-চেতা পুরুষ ছিলেন। কোন ক্রমে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিত কিংবা লোকের প্রদত্ত অবমাননা ও অনাদর নীরবে সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি চিরজীবন নিজ অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতে শিখিয়াছিলেন। উপকার প্রত্যাশায় কাহারও নিকট হীনতা স্বীকার করিতেন না। সেরূপ নীচ রক্তি অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন, অথচ তিনি অতি অমায়িক ও সদাশয় লোক ছিলেন। ছোট বড় সকল লোকের প্রতি সমভাবে সম্মেহ ব্যবহার করিতেন। যাহারা কথায় এক প্রকার বলে, কার্যে ভবিষ্যীতাচরণ করে, তিনি সর্কাস্তঃকরণে তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। তিনি অতি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবে এই ভয়ে নিজের ঋদ্ধিপ্রায় গোপন করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী, যথার্থবাদী ও হিতবাদী ছিলেন। তিনি যাহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাহারা হীন জাতি হইলেও তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিতেন, ভদ্রবেশধারী নীচমনা লোকদিগকেই তিনি ইতর শ্রেণীব লোক বলিয়া অবাধে নিজের মত প্রকাশ করিতেন। ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু কখনও ক্রোধের পাত্রের অনিষ্টসাধন করিতেন না।

তাঁহার শরীবে প্রভূত বল ছিল। একবার যেদিনীপুরে যাইবার পথে, একটা ভল্লুকের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও, তাহাকে বধ করিয়া, রুধিরাক্ত কলেবরে বহু পথ অভিক্রম করিয়া যেদিনীপুরে উপস্থিত হন! তথায় কিছুকাল রোগভোগ করিয়া তবে গৃহে কিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। সে

সময়ে প্রায় সকল স্থানেই দৃশ্যভঙ্গ ছিল। অনেকেরই একাকী অসতর্কভাবে পথে বাহির হইয়া দৃশ্যহস্তে প্রাণ হারাইত, এজন্য সকলে তাঁহাকে একাকী একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে নিষেধ করিত। কিন্তু এক লোহদণ্ড হস্তে তিনি নির্ভয়ে সর্বত্র গমনাগমন করিতেন। একদিকে যেমন তাঁহার শরীরে প্রভূত বল ছিল, অঙ্গদিকে তাঁহার মনের শক্তিসামর্থ্যও প্রচুর ছিল। অথচ তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, নিষ্ঠাবান ও ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন নিরীহ লোক ছিলেন, এজন্য সকলেই তাঁহাকে ঋষি বা যোগীর ভ্রাতৃ শ্রদ্ধা করিত। গোপনে বনমালীপুরের গৃহত্যাগের পর আট বৎসরকাল তিনি ঝারকা, জালামুখী, বদরিকাশ্রম ও অন্ত্র নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, শেষে স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে, অবশিষ্টকাল গৃহে সন্তানসন্ততিদের মধ্যে অতিবাহিত করেন।*

একণে দেখা যাইতেছে যে, যে সকল ঘটনায় সমাবেশ হইলে, যে সকল কারণ বিद्यমান থাকিলে মানবজীবনের প্রকৃত স্ফুৰ্ত্তি হয়, যে সকল অবস্থার ভিতরে পড়িলে, শিক্ষা করিবার উপযোগী যে সকল দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিলে, মানুষ উত্তরকালে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্যে সে সকল সুযোগ ঘটয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতা ও পিতামহের দৃঢ়তা, ভ্রাতৃপরায়ণতা, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, আত্মনির্ভর ও নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণগুলি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহ তাঁহাকে সংসারের সম্পত্তি কিছু দেন নাই সত্য, কিন্তু এমন কিছু দিয়াছিলেন, যাহাব গুণে ঈশ্বরচন্দ্র, বিভ্রাসাগরে,—গুণের সাগরে পরিণত হইয়াছিলেন। আর তিনি জননীকে নিকট জননীর মাতুলালয়ের দয়াদাক্ষিণ্য, পরহঃখকাতরতা ও পরসেবার ভাব লাভ করিয়াছিলেন। সে গৃহে, যে দয়ার চিত্র দেখিয়া তিনি এবং তাঁহার জননী চিরমুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি যাহা নিজে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার মনুষ্য লাভের মূল মন্ত্র। সেই মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া তিনি দয়ার সাগরে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃকুলের ঐ উত্তরবিধ ভাব মিলিত হইয়া তাঁহাকে এক বিচিত্র ভাবে গঠন

* পূৰ্ণপুৰুষ ও শৈশবচরিত বিষয়ক বিষয়বস্তুর অধিকাংশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খরচিত শৈশবচরিত হইতে গৃহীত হইয়াছে। বর্ণিত বিষয়ের কোন কোন অংশ তাঁহার নিকট শুনিবারও সুযোগ ঘটয়াছিল।

করিয়াছিল। এক দিকে অস্ত্রায়ের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, অন্য দিকে হুঃখীর প্রতি আশ্চর্য্য দয়া, এই উভয়ভাবের মিলন এই উভয়দিক হইতে সম্বটিত হইয়াছিল। পিতার দিক হইতে পৌরষ ভাবের তীক্ষ্ণ রেখা ও জননীর দিক হইতে হুঃখীর হুঃখমোচনের অন্ত কোমলতার স্মৃষ্টি ধারা পরস্পর মিলিত হইয়া দয়ারাগর বিজ্ঞানাগর-চিত্র প্রতিকলিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনচরিতের সুদৃঢ় ভিত্তি এই কোমলতাময় পৌরষ-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুকঠিন প্রস্তরময় পর্বতদেহে স্মৃষ্টি সলিল-ধারা প্রবাহিত হইয়া যেমন সমতল ক্ষেত্র স্নিগ্ধ করে—উর্ধ্বর করে, তেমনি বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের পিতৃকুলের ত্রাণনিষ্ঠা ও দৃঢ়তার শৈলবক্ষে তাঁহার মাতৃকুলের দেবচর্লভ লোকসেবার মন্মাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইয়া বঙ্গসমাজকে উর্দ্ধর করিয়াছে—মিট করিয়াছে। আমরা যতই বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের চরিতবর্ণনে আগ্রসর হইব, ততই পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পিতা, পিতামহ, মাতা ও মাতামাতুলের অভিনয় দেখিতে পাইব।

তৃতীয় অধ্যায় ।



শৈশবকাল ।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পর হইতে ঠাকুরদাসের সংসারের ত্রীয়ক্ষির সূচনা হয়, একজ্ঞ সকলেই বালককে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন । বালকও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত প্রকৃতির পরিচয় দানের সুযোগ পাইয়া বাড়ীর ও প্রতিবেশিগণের ভরানক অশান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল । ইহা দর্শন করিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় পাঠাইবার প্রস্তাব হইল । সে সময়ে বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামক এক গুরুমহাশয় পাঠশালা খুলিয়াছিলেন । কালীকান্ত গুরুমহাশয় বালকগণকে স্নেহসহকারে শিক্ষা দিতেন, অথচ অল্প সময় মধ্যে অধিক শিক্ষা দিতে পারিতেন । এই দুই কারণে গ্রামের মধ্যে অজ্ঞাত গুরুমহাশয় অপেক্ষা তাঁহারই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল । শিক্ষাগ্রণ্য পণ্ডিতবর বিভাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন, “বস্তুতঃ পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয়-দলের আদর্শ ছিলেন ।” বালকগণকে নিজ সন্তানের জায় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অধিক শিক্ষা দিতে পারাই প্রকৃত শিক্ষকের লক্ষণ, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সে ক্ষমতা ছিল বলিয়াই তিনি বিভাসাগর মহাশয়ের গুরুমহাশয় হইয়া উত্তরকালে তাঁহার নিকট একপ প্রশংসাত্মক হইয়াছেন । পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঈশ্বরচন্দ্র কালীকান্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন ।

পাঠশালায় একবৎসর * লেখাপড়া করার পর তাঁহার কঠিন পীড়ার সূচনা হইল। প্রথমে কিছুকাল জ্বর, তৎপরে উদরাময় ও শেষে প্লীহাজ্বর ভোগ করিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। এক সময়ে একরূপ হইয়াছিল যে, সকলেই সে যাত্রা তাঁহার রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্যান্য ছয় মাস কাল এইরূপ রোগ ভোগ করার পর পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নাই শুনিয়া, তাঁহার জননীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিত্তাভূষণ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের চিকিৎসার সুবাবস্থা করিবার মানসে পুত্রসহ ভাগিনেস্বীকে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহার বাসগ্রাম পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামক গ্রামে বহুসংখ্যক সুবিদ্বৎ কবিরাজের বাস। রাধামোহন বিত্তাভূষণ মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে রামাগোপাল কবিরাজ নামক একজন উপযুক্ত কবিরাজের উপর ভাগিনেস্বীপুত্রের চিকিৎসার ভার দিলেন। প্রায় ছয়মাস কাল তথায় অবস্থান পূর্বক সূচিকিৎসাও গুণে ঈশ্বরচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলেন। তৎপরে অধ্যয়নার্থে বীরসিংহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন। বিজ্ঞানসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন, এই পীড়ার সময় তাঁহার উপর বিত্তাভূষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের মেহ ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

ঈহার পর নূতন করিয়া আবার কালীকান্তের পাঠশালায় লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে আট বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঐ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিজ্ঞানভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মেধাশক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রমপটুতা দর্শনে গুরুমহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রে গুরুমহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন, এবং মর্য্যাপেক্ষা তাঁহার উপর গুরুমহাশয়ের অত্যধিক টান ছিল। এই তিন বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালায় শিক্ষা এক প্রকার সমাপ্ত করেন।

এই আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র আপনার বালমূলত চপলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। গ্রামের কোন গৃহস্থের দ্বারে মলমূত্র ত্যাগ করা তাঁহার একটা প্রধান কার্য্য ছিল। ঐ গৃহস্থের নবীন বধূ বালকের এতাদৃশ নিত্যা দৌরাণ্ডো বিরক্ত হইয়া সময়ে সময়ে বালককে ধরিতে ও

* মহোদয় শত্ৰুচন্দ্র শ্রেণীত জীবন-চরিতে তিন বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। স্বরচিত জীবন-চরিতে এক বৎসরের উল্লেখ আছে।

দণ্ড দিতে গেলেন, বৃদ্ধা, গৃহিণী ভবানন্দকথিত ভাবী কীর্তিকলাপের উল্লেখ করিয়া বধুকে নিবৃত্ত করিতেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি, তিনি এই সময়ে ভবানন্দ চরিত্র ছিলেন। লোকে কাপড় কাচিয়া রোদ্রে দিলে, তিনি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা তাহাতে বিষ্ঠা লাগাইয়া দিতেন। ধাতুক্ষেত্রের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে অপক ধানের শীষ তুলিয়া কতক খাইতেন কতক কেলিয়া দিতেন। একবার যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় যবের শীষ ফুটার মত প্রায় হইয়াছিলেন। তাহার পিতামহী ঠাকুরাণী গলায় অল্পলি দিয়া বহুকষ্টে তাহা বাহির করিয়া দেন, তবে সে যাত্রা রক্ষা পান। একপ আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা তাহার বাণ্য জীবনে ঘটিয়াছে, যে সকলের জন্ত সময়ে সময়ে তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

অত্যধিক চরিত্র হইলে কি হয়, লেখাপড়ার ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগের ক্রটি ছিল না। গুরুমহাশয় যাহা কিছু শিখাইতেন, অতিমাত্র আগ্রহসহকারে অত্যন্ত কালমধ্যে তিনি তাহা শিক্ষা করিতেন। একজন্ত গুরুমহাশয় অনেক সময়ে অপরাহ্নে অপরাপর বালকগণকে বিদায় দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে নিকটে রাখিতেন এবং যে সকল পাঠ মুখে মুখে অভ্যাস করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিতেন। বেণী রাত্রি হইলে, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজে ক্রোড়ে লইয়া তাহার পিতামহীর নিকট পৌছাইয়া দিতেন। এই সময়ে গুরুমহাশয় একদিন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতাকে বলিলেন, এখানকার পাঠশালার যাহা শিক্ষা করা আবশ্যিক, ঈশ্বরের তাহা হইয়াছে। ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি সুন্দর; ইহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ঈংরাজী শিক্ষা দিলে ভাল হয়। এ বালক যেক্রপ মেধাবী, ইহার স্মৃতিশক্তি যেক্রপ প্রবল, তাহাতে এ বালক যাহা শিখিবে, তাহাতেই যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে।

ইহার কিছুদিন পরে তাহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের পরলোক প্রাপ্তি হয়। হিরাস্তর বৎসর বয়সের সময় অতিদার রোগে তিনি লোকান্তরিত হন। সেই উপলক্ষে ঠাকুরদাস পিতৃকৃত্য সমাপনার্থে গৃহে গমন করেন। এই কার্য শেষ হইলে পর ঠাকুরদাস কলিকাতার আসিবার সময়ে কোষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসেন। কলিকাতার নিকটে রাখিয়া লেখা পড়া শিখানই পুত্রকে

সঙ্গে আনিবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আসিবার সময়ে গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও সঙ্গে ছিলেন।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র যে উত্তরকালে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও পণ্ডিতগণের অগ্রণী হইবেন, বীরসিংহ হইতে কলিকাতার আসিবার সময় পথে একটি ঘটনা উপলক্ষে তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। সিয়াখালার নিকট সালিখার বাধা রাস্তায় উঠিয়া ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, বাটনাবাটা শিলের মত এক একখানি পাথর মধ্যে মধ্যে পাথর ধারে বসান রহিয়াছে। কোতুল্লা-ক্রান্ত হইয়া তিনি তাঁহার পিতাকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরদাস পুত্রের কথায় হাসিয়া বলিলেন “ও গুলি শিল নয়, ওকে মাইল ষ্টোন বলে।” তিনি বলিলেন, “বাবা মাইল ষ্টোন কাকে বলে কিছুই বুঝিলাম না।” তখন পিতা পুত্রকে বলিলেন, “ওটা ইংরাজী কথা, এক মাইল আমাদের হিসাবে আধক্রোশ, আর ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর। প্রত্যেক আধক্রোশ অন্তর ঐরূপ এক একখানি পাথর পোতা আছে। কলিকাতার একমাইল অন্তরে যে পাথর আছে, তাহাতে এক অঙ্ক গোড়া আছে, আর এই পাথরখানিতে উনিশ অঙ্ক লেখা আছে। কলিকাতা এখান হইতে উনিশ মাইল অর্থাৎ ৯৥ ক্রোশ।” এই বলিয়া তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে ঐ পাথরখানি ভাল করিয়া দেখাইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নামতার হিসাবে পাথরে হাত দিয়া বলিলেন, “তবে কি এটটা ইংরাজীর এক আর এইটা নয়?” পিতা বলিলেন, “হাঁ, তাই বটে।” তখন বালক মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, পথে বাইতে গাইতে ইংরাজী অঙ্ক শিখিবেন। উনিশ ● হইতে দশ পর্যন্ত আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে বলিলেন “বাবা আমার ইংরাজী অঙ্ক শিখা হইল। আমি এক হইতে দশ পর্যন্ত শিখিয়াছি।” তখন পিতা পবীকর জন্তু ক্রমে নয় আট ও সাত জিজ্ঞাসা করার, ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক ঠিক বলিলেন; তবুও ঠাকুরদাসের মনে সন্দেহ বহিল, তিনি ভাবিলেন নয়ের আগে আট, আটের আগে সাত, এটা না জানিয়া চালাকি করিয়াও একজন বলিতে পারে। সে সন্দেহ দূর করিবার জন্ত ঠাকুরদাস চরের অঙ্ক না দেখাইয়া একেবারে শরুমাকে আসিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার হিসাব মত এটা কত হয়?”

তখন ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে বলিলেন, “বাবা এটা হবে ছয়ের অঙ্ক, কিন্তু ভুলে পাঁচ লিখিরাছে।” ঠাকুরদাস আনন্দিত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, “তোমার ইংরাজী অঙ্ক শিক্ষা হইরাছে সত্য। আমি ইচ্ছা করিয়া ছয়ের অঙ্ক গোপন করিয়াছিলাম।” বালকের এতাদৃশ মেধা ও বুদ্ধিকোশল দেখিয়া গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পরম সন্তোষ-সহকারে ছাত্রের চিবুক ধারণপূর্বক আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন “বেশ বাবা বেশ।” তৎপরে তিনি ঠাকুরদাসকে সজ্ঞাষণ করিয়া বলিলেন, “ঈশ্বরের লেখাপড়ার ভাল বন্দোবস্ত করিবেন, যদি বাঁচিয়া থাকে, এ বালক মানুষ হইবে, তাহাতে আর ভিলমাত্র সন্দেহ নাই।” বালক ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ও গুরুমহাশয়ের আনন্দ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আত্মানন্দিত হইরাছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ঠাকুরদাস জগদ্বর্জিত বাবুর কতকগুলি ইংরাজী বিল ঠিক দিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষণকাল নিকটে বসিয়া সেই কাজ দেখিলেন। পরে অতিমাত্র বাগ্ৰতার সহিত পিতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “বাবা, আমিও ঐ সকল ঠিক দিতে পারি।” তখন জগদ্বর্জিত বাবু আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঈশ্বর তুমি কি ইংরাজী জান ?” ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বদিনের মাইলষ্টোনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “আমার ইংরাজী অঙ্ক শিক্ষা হইরাছে, আমি ঠিকের কাজ বেশ করিতে পারি।” তখন ঠাকুরদাস ও জগদ্বর্জিত বাবু উভয়েই কোড়হুলাবিষ্ট হইয়া কয়েকখানি বিল তাঁহাকে ঠিক দিতে দিলেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পরীক্ষাতেও উজ্জীর্ণ হটলেন। তখন সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা পড়ার বিশেষ উপায় করিতে বলিলেন। তাঁহাদের কথার উত্তরে ঠাকুরদাস বলিলেন, “আমি ঈশ্বরকে হিন্দুকালেজে দিব তাবিত্তেছি।” তখন কেহ কেহ বলিলেন, “আপনার ১০ টাকা আর, এরূপ অবস্থায় কিরূপে হিন্দুকালেজে উহাকে পড়াইবেন ?” তখন ঠাকুরদাস দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবাক্য স্বরে বলিলেন, “ঈশ্বরের পড়ার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা যেতন দিব, আর অবশিষ্ট ৫ টাকা সংসার খরচের জন্য বাড়ী পাঠাইব।”

ইচ্ছাসম্বন্ধে অর্থাভাবে ঠাকুরদাস নিজে লেখা পড়া শিখিতে পারেন

নাই, একজু চিরকাল মনে মনে ক্লেশভুতব করিতেন। এমন অবস্থায় যে বহুক্লেশ সহ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে উপবৃত্তরূপ লেখাপড়া শিখাইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ে বস্তুর ত্রুটি করেন নাই। সন ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতার আসিয়া পিতার সহিত সিংহ মহাশয়ের বাটাতেই বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্বেই ভাগবত-চরণ সিংহ দেহত্যাগ করেন। সে সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র জগদম্প্রভ সিংহ সংসারের কর্তা। তাঁহার বয়স তখন ২৫ বৎসর মাত্র। তিনি ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পিতৃব্য শব্দে সম্বোধন করিতেন, তদনুসারে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দাদা ও তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে বড় ও ছোট দিদি বলিয়া ডাকিতেন।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র জননী ও পিতামহীকে ছাড়িয়া আসিয়া যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ বাহ্য্য মাত্র। কারণ বালক বিদেশে পরগৃহে যে ভয়ানক অশান্তি ও অশুবিধা ভোগ করিবে, তাহা আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারি। কিন্তু তিনি বড়বাজারে এই সিংহপরিবারে যে সমাদর ও যত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীতে যেরূপ মধুরভাবে চিত্রিত হইয়াছে, আমরা পাঠকগণকে তাহাই উপহার দিতেছি :—“এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটাতে আছি বলিয়া এক দিনের জ্ঞাত আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণি অদ্বুত স্নেহ ও যত্ন আমি কখন কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদনেকা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমার ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া সৌজন্য, অমায়িকতা, সন্ধিবেচনা প্রভৃতি সদগুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর

হয় নাই। এই দরামন্ডীর সৌম্য-মূর্তি, আমার ছন্দরমন্দিরে, দেবী-মূর্তির স্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, ত্বে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির সেই দ্বা, সৌজন্ত প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সঙ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুলা কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি শিতামহীদেবীর একান্ত প্রিয় ও নিত্যন্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতার আসিয়া প্রথমতঃ কিছুদিন তাঁহার অল্প ঘরপরনাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দরামন্ডী রাইমণির স্নেহে ও বস্ত্রে আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অস্থিরতার অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।”

স্ত্রীজাতির সম্মান করা এবং তাঁহাদের কল্যাণসাধনে কার্যমনোবাক্যে নিবৃত্ত থাকা মহাত্মাদের একটা বিশেষ লক্ষণ। ধর্মপ্রাণ যিশুখ্রীষ্ট পতিত স্ত্রীলোকদিগকে ভাল বাসিতেন এবং সঙ্গে থাকিতে দিতেন, এজন্য অনেকে তাঁহার সধিবেচনার নিন্দা করিত, কিন্তু তাহাতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। সর্বদাই স্নেহসহকারে তাহাদের কল্যাণ চিন্তা করিতেন। ধর্মবীর মহম্মদ মুসলমানের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথার বহুল প্রচার নিবারণার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া স্ত্রীজাতির পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা মহু তাঁহার ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিয়া কুললক্ষীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

“যত্র নার্যাস্তু পূজ্যস্তে রম্যস্তে তত্র দেবতাঃ ।”

স্ত্রীগণ যেখানে সমাদৃত, সম্মানিত ও পূজ্যপ্রাপ্ত হন, সেখানে দেবতারও সন্মত হইয়া থাকেন। এতদ্বশ, শাস্ত্রসম্মত পূজার যোগ্য নারীজাতির পক্ষ সমর্থন করিতে মহাত্মা রামমোহন রায় জীবন ক্ষয় করিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিতের একস্থানে লিখিত আছে :—“তিনি সেই বহুবিহীন দেশে

(ভিক্তবদেশে) মধ্যে মধ্যে অকুতোভয়ে এই ভয়ানক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতেন। তদেশবাসী পুরুষগণ এই ধর্মবিরুদ্ধ কার্যের জন্য তাঁহার প্রতি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইত এবং তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু তিনি কোমলহৃদয়া রমণীকূলের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন; তাহারাই তাঁহাকে এই সকল স্পৃহা হইতে রক্ষা করিত। রাজা রামমোহন রায় চিরদিন নারীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে, বন্ধুবান্ধব সন্নিধানে, স্বদেশে বা বিদেশে সর্বত্র তিনি নারীচরিত্রের মহত্ত্ব কীর্তন করিতেন। ভিক্তবাসিনী রমণীগণের সম্ব্যবহার তাঁহার তরুণকালে এই নারীভক্তির বীজবপন করিয়া দেয়। * * তিনি নিজে বলিয়াছিলেন যে, ভিক্তবাসিনী রমণীগণের স্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।” * বিভাগাগর মহাশয়ও শৈশবে বিদেশে রাউমগির মাতৃস্নেহের আশ্রয় লাভ করিয়া বঙ্গললনাগণের চিরসুহৃদরূপে গঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনাসকল পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি নারীজাতির বিশেষ কল্যাণ সাধনের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়, উপার্জনের অধিকাংশ অর্থ এবং বিভাগ বুদ্ধি ও শাস্ত্রাঙ্গোচনার প্রায় সমগ্র ফল, অবলাকূলের কল্যাণ সাধনে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে এই অবলাকুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। দেবীপ্রকৃতি বাউমগির কোমলভাস্য মধুর বাৎসল্যই ঈশ্বরচন্দ্রকে নারীজাতির কল্যাণসাধনাধি চিবদিনের জন্য ক্রম করিয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাসের চাই টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। পূর্বে আট টাকা পাইতেন, এক্ষণে দশ টাকা বেতনের কর্ত্তে নিযুক্ত হইলেন। যে বাটাতে বাসা ছিল তাহারই নিকটে শিবচরণ মল্লিক নামক একজন ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক বাস করিতেন। তাঁহার সদর বাটাতে এক পাঠশালা ছিল, সেখানে পাড়ার ছেলেরা লেখাপড়া করিত। ঈশ্বরচন্দ্রকে সেই পাঠশালার দেওয়া হইল। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ তিন মাস ঈশ্বরচন্দ্র সেই পাঠশালার পড়া শুন্য করিলেন। শুক্লমহাশয় স্বকৃপাচন্দ্র দাসও

* প্রজ্ঞানন্দ গ্রন্থক বসু সংগ্রহনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনচরিত ২১ পৃষ্ঠা (২য় সং.)।

শিক্ষাদান বিষয়ে বেশ নিপুণ লোক ছিলেন। বীরসিংহ ও তৎপরে কলিকাতার তিন মাস পাঠশালার পড়িয়া ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালার পাঠ শেষ করিলেন। অতঃপর কোথায় কিরূপ লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, সকলে রাখন সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময়ে কান্দুন মাসের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। প্রথমে ঐ পল্লীর চিকিৎসক দুর্গাদাস কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কলিকাতার আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা অল্প, এইরূপ স্থির করিয়া ঠাকুরদাস বাটীতে সংবাদ দিলেন। পিতামহীঠাকুরাণী ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন; মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলিকাতার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন তথায় থাকিয়া বালককে সঙ্গে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। বাটী যাওয়ার পথে বাবু ও স্থান পরিবর্তনে, জননী ও পিতামহীর সহবাসে এবং সমবয়স্কদিগের সঙ্গলাভে সপ্তাহ কালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন। শচী নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যা নিজ্বায়ে বীরসিংহের উত্তর প্রান্তে এক সুবৃহৎ পুকুরিণী খনন করাইয়া দেন। এই পুকুরিণীর নাম “শচী বাম্‌নী”। এই শচী বাম্‌নীর তীরে গ্রাম্য বালকগণের খেলিবার স্থান ছিল। বাটীতে অবস্থানকালে ঈশ্বরচন্দ্র সর্বদাই সহচরদিগকে লইয়া সেই “শচী বাম্‌নী”র তীরে খেলা করিতে যাইতেন। তাঁহার গ্রাম্য সহচরদিগের মধ্যে তুই একজন বিশালদৈহ ও বলশালী ছিলেন। গদাধর পালের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গদাধর নামে, দেহের আয়তনে, এবং শক্তি সামর্থ্যে নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ন অল্প কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। জীড়ান্বেষে ঈশ্বরচন্দ্রের আক্রমণে গদাধর যখন ধরাশায়ী হইতেন, তখন সকল বালকই আনন্দে দিশাহারা হইয়া করতালি ও অট্টহাস্তে পুকুরিণী ও প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিত।*

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যৈষ্ঠমাসে পুত্রকে পুনরায় কলিকাতার

* আমরা শুধুকে “শচী বাম্‌নী” দেখিয়া আসিয়াছি এবং এই বিষয়ও বীরসিংহ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

আনিলেন। প্রথমবার কলিকাতার আসিবার সময় ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য একজন ডৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কতক্ষণ চলিয়া ক্লান্ত হইলে, ঐ ডৃত্য বালককে স্বন্ধে লইয়া চলিত। এবার আসিবার সময় পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ যদি চলিয়া যাইতে না পার, তাহা হইতে একজন লোক সঙ্গে নিতে হয়” ঈশ্বরচন্দ্রের হৃবুদ্ধি ষাটিল, তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন, “না লোক নিতে হবে না, আমি চলিয়া যাইতে পারিব।” তাঁহারই কথা প্রমাণ এবার আর সঙ্গে লোক লওয়া হইল না। পিতা পুত্র কলিকাতা যাত্রা করিলেন। জননীর মাতুলালয় পাতুল পর্যন্ত ছয় জোশ পথ বালক ঈশ্বরচন্দ্র অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া আসিয়া সে দিন সেইখানে বিশ্রাম করিলেন।

প্রাতঃকালে পাতুল হইতে যাত্রা করিয়া তারকেশ্বরের নিকট রামনগর গ্রামে পৌছিয়া সে দিন রাত্রিযাপন করিতে হইবে। অন্ধ পথে এক দোকানে ফলাহার করিয়া পুনরায় যাত্রা করিবার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, “বাবা আমি আর চলিতে পারিব না। এই দেখুন, আমার পা ফুলিয়া গিয়াছে।” ঠাকুরদাস অনেক বুঝাইয়াও কোন মতে বালককে আর এক পাও হাঁটাইতে পারিলেন না। কিছু দূর গেলে, তরমুজ কিনিয়া দিবেন বলিয়াও সম্মত করিতে পারিলেন না। শেষে বিরক্ত হইয়া অনেক তিরস্কার করিলেন। ভয় দেখাইবার মানসে কতদূর চলিয়া গেলেন। তবুও পুত্রকে এক পা চলাইতে পারিলেন না। আর কোন উপায় না দেখিয়া, শেষে আবার ফিরিয়া আসিয়া জোঁক্‌জ্বরে বলিলেন, “যদি চলিতে না পারবি, তবে লোক নিতে দিলি না কেন? লোক নিলে ত আর পথের মাঝখানে এ বিপদ হইত না,” এই বলিয়া দুই একটা খাবড়াও দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিকপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন পিতা অগত্যা পুত্রকে স্বন্ধে তুলিয়া লইলেন। কিয়দূর গমন করিয়া ঠাকুরদাস ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বন্ধ হইতে নামাইয়া বলিলেন, “বাবা! এইবার খানিকদূর চলা, ঐ সূমুখের দোকানে তরমুজ কিনিয়া দিবে।” কিন্তু তরমুজের প্রলোভনে পা ফুলা কমিল না। বরং পা'স্থানি অগ্রকালের জন্ত বিশ্রাম পাইয়া আরও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। ঈশ্বরচন্দ্র একেবারে চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরদাস বলশালী লোক ছিলেন না। অরক্ষণ মধ্যে তিনিও ভারবহনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া

পড়িলেন। কিন্তু সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে, একবার স্বপ্নে একবার ক্রোড়ে লইয়া এবং মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিয়া অতি কষ্টে সন্ধ্যার পর গম্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঠাকুরদাস পুত্রসহ রামনগরে ভগিনীর গৃহে একদিন বিশ্রাম করিয়া পরদিন কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বৈজ্ঞাণী আসিয়া নোকাঘোঁগে কলিকাতা পৌঁছিলেন।

এবার কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরদাস পুত্রের লেখাপড়ার নূতন ব্যবস্থা করিতে উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে সকলেই একবাক্যে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাসের আন্তরিক ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। বংশের সকলেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া অধ্যাপকমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। দারিদ্র্যানিবন্ধন তিনি নিজে সে সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাই ছেলেটিকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন, ইচ্ছাই তাঁহার একমাত্র বাসনা। তিনি মনে মনে একরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বাটীতে চতুস্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের ও অগ্রান্ত নানাস্থানের বালকবৃন্দকে সংস্কৃত বিজ্ঞা দান করিবেন। এই জন্ত স্বজনবর্গের কোন পরামর্শই তাঁহার মনঃপুত হইল না। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃমাতুল রাধামোহন বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের পিতৃব্য-পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি * কলিকাতায় সংস্কৃত কালোজে অধ্যয়ন করিতে। তাঁহারই উৎসাহ ও পরামর্শে ঠাকুরদাস পুত্রকে সংস্কৃত কালোজে ভর্তি করিয়া দিলেন।

* সহোদর শঙ্করচন্দ্র-প্রণীত জীবনচরিতে অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বরচিত শিঙচরিতে কেবল বাচস্পতি মহাশয়ের নামেরই উল্লেখ আছে।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর ।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে, নয় বৎসর বয়সের সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কালেজে প্রবেষ্ট হইয়া ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার সংস্কৃত পাঠের সূচনা হয় নাই। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে তাঁহার শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট বালক হইলেন। হালিসহরের অনতিদূরবর্তী কুমারহট্ট পল্লীনবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপর ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনার ভার ছিল। তিনি বিশিষ্টরূপ আগ্রহসহকারে বালকগণকে শিক্ষা দিতেন এবং শিক্ষা দান বিষয়ে তাঁহার সম্যক পারদর্শিতা ছিল। ছাত্রগণকে পুত্রবৎ স্নেহসহকারে শিক্ষা দান বিষয়ে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের স্মরণশক্তি, অধ্যবসায় ও বিদ্যাশিক্ষার অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কালেজে প্রবেষ্ট হওয়ার ছয় মাস পরে যে পবীক্ষা হয়, ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। পূর্বোন্নিখিত মধুসূদন বাচস্পতিও সর্বদা ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধায় থাকিতেন। পিতা প্রতিদিন বেলা ৯ টার সময়ে বড়বাজারের বাসা হইতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পটলডাকার কালেজ বাটীতে পৌছাইয়া দিতেন এবং বেলা চারিটার সময়ে নিজে আসিয়া বালককে বাসায় লইয়া যাইতেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার উপর স্নেহসহকারে দৃষ্টি রাখিবার লোক ছিলেন এবং পিতা নিজে তাঁহাকে পথে যাতায়াতে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন বলিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র

অল্প বয়সে মন্দ বালকদের সঙ্গলাভের সুযোগ পান নাই। অনেক কোমল মতি, সরলচিত্ত ও বুদ্ধিমান বালক অসং সঙ্কে পড়িয়া সর্বদাই বিনষ্ট হয়, এবং উত্তর কালে সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্র লাভে বঞ্চিত হইয়া আপনার ও আত্মীয়গণের সর্বনাশ সাধন করে। বিশেষতঃ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায় ধর্মশীল কর্তব্যপারায়ণ ও পুত্রবৎসল পিতার অভাবে বর্তমান বঙ্গসন্তানগণ দুর্নীতি, চুরাচার ও 'কুশিক্ষার ঘণিত পথে বিচরণ' করিয়া বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশের সমূহ অকল্যাণ সাধন করিতেছে। ঠাকুরদাসের জায় শ্রমশীল, কষ্টসহিষ্ণু, জায়নিষ্ঠ ও সন্তানবৎসল পিতার সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, আপাততঃ আমাদের সেই দিকেই বিশেষ ভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

ক্রমে ঠাকুরদাস যখন বুঝিলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র একাকী পথে যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং একাকী গেলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, তখন তাঁহাকে একাকী যাইতে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্ন ছিলেন। বালক যখন পথে একাকী একটা ছাতা মাথায় দিয়া পড়িতে যাইতেন, তখন দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইত, যেন পথে একটা ছাতাই যাইতেছে, ছাতার মধ্যে কেহ আছে বলিয়া বোধ হইত না। ঈশ্বরচন্দ্রের মাথাটা আবার এই ক্ষুদ্র দেহের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। সেই অন্নায়তন দেহের পক্ষে মস্তকটা একটা বৃহৎ ভার বলিয়া বোধ হইত; এজন্ত বিভাগলয়ের অজ্ঞাত বালকেরা ঈশ্বরচন্দ্রকে “বস্তুরে কৈ” বলিয়া তামাসা করিত, কখন কখন আবার উন্টাইয়া বলিত, “কসুরে জৈ” আর বালক ঈশ্বরচন্দ্র রাগিয়া যাইতেন। তিনি যতই রাগ করিতেন, বালকেরা ততই তাঁহাকে ঐরূপে ক্লেপাইত। তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধির আর এক কারণ ছিল। তিনি রাগিলে আর কথা কহিতে পারিতেন না। কারণ বালাকালে তিনি ভোৎসা ছিলেন। *

কালেজে প্রবেশের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদিন যাহা পড়িতেন, গৃহে আসিয়া পিতার নিকট পুনরায় তাহার আরাগতি করিতে হইত। একটা কথা এদিক ওদিক হইলে আর নিস্তার থাকিত না। যাহা পড়িতেন

* পিতামহ রায়জয় তর্কভূষণ গুপ্তিকা-গৃহে শিশুর জিজ্ঞাসার তলে আলস্যে কিছু শিখিয়া লিখা বলিয়াছেন যে, এই লেখার প্রসঙ্গ, বালক অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিবে না।

তাহা অবিকল শুনাইতে হইত। ভ্রমবশতঃ একটা কথা বলিতে বিস্মৃত হইলে, ঠাকুরদাস অমন ধরিতেন। ঠাকুরদাস একপভাবে বালকের পাঠ লইতেন যে তদর্শনে, ঈশ্বরচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, পিতা ব্যাকরণে তর্কবাগীশ মহাশয়ের সমান পণ্ডিত। ফলতঃ পিতা, পুত্রের পাঠ শুনিতে শুনিতে ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে তাহার বয়সের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে হইত। সে পরিশ্রমের ফ্রুটি হইলে, পিতার নিকট অত্যধিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কখন কখন তিনি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। পিতা বাত্রিতে কণ্ঠস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতেন যে, প্রদীপ জ্বলিতেছে আর তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে আর তাহার অব্যাহতি থাকিত না। কোন কোন দিন এতই প্রহার করিতেন যে, সে গৃহের স্ত্রীলোকেরা, বিশেষ ভাবে রাইমণি বালকের সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিতেন এবং কোন কোন দিন প্রহারের অসহনীয় দৃশ্যে কাতর হইয়া ঠাকুরদাসকে বাসা পরিবর্তন করিতে বলিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপ প্রহারের ভয়ে, নিদ্রার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত, অনেক সময়ে চক্ষে প্রদীপের তৈল দিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেন। এই উপায়ে রাত্রি জাগরণপূর্বক পড়া শুনা করিতেন। ইহার উপর ঠাকুরদাস শেষ রাতে বালকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও উদ্ভট কবিতা মুখে মুখে শিখাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রকারে পিতার নিকট প্রায় দুই তিন শত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। অপরদিকে শিক্ষক তর্কবাগীশ মহাশয়ও বালকের অত্যাশ্চর্য্য মেধা দর্শনে, বিশেষ যত্নব সহিত বিবিধ বিষয়ক, সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে শিখাইতেন এবং তাহার অর্থ ও অর্থ বলিয়া দিতেন। তিনি তিন বৎসরকাল এই ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠ করেন। দুই বৎসর পরীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফললাভ করিয়াছিলেন। একবার উৎকৃষ্টরূপ পরীক্ষা দিয়াও আশানুরূপ পুরস্কার না পাইয়া একেবারে ভায়েক হইয়া পড়েন। বিজ্ঞানালের উপর বীত-শ্রদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিয়া বাইতে ক্লান্ত হইলেন! তিনি যখন যাহা ধরিতেন, কেহ তাহা হইতে সহজে তাহাকে বিরত করিতে পারিত না। জেদের বশবর্তী হইয়া তিনি বিজ্ঞান পরিভাগ করিয়া দেশে গিয়া সার্বভৌমের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করা স্থির করেন। সহজে

কেহই তাঁহাকে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তর্কবাগীশ মহাশয়ের মেহানুরোধে ও বাচস্পতির আত্মীয়তার বাধ্য হইয়া সার্কভোমের টোলে পড়ার সম্বল ত্যাগ করিয়া পিতার অভিশ্রামমত কালেজেই পূর্ববৎ পড়িতে লাগিলেন। সেইবারকার পরীক্ষার ফল মন্দ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, সেইবার একজন সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের স্মরিত উচ্চারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত ধীরে ধীরে পরীক্ষা দান ও কথা সকল পরস্পর হইতে পৃথক ভাবে বিলম্বে উচ্চারিত হওয়া পরীক্ষক সাহেবের নিকট একটা বিশেষ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ সাহেব স্থানে স্থানে বুঝিতেও ভুল করিয়া থাকিবেন। এই অল্প পরীক্ষার ঈশ্বরচন্দ্র সেবার প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে মনঃক্লেশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তিনি বিভাগরের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইবার অল্প প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কোন বালক শ্রমশীলতার, দৃঢ়তার বা বুদ্ধি প্রকাশে তাঁহাকে পরাজয় করে, ইহা তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না; যেখানে পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক, ঈশ্বরচন্দ্রের জয়লাভের উদ্দেশ্যে ও আয়োজন সেখানে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইত। এই বালক কি শৈশবে, কি পঠদশায়, কি উত্তর কালে কর্মক্ষেত্রে কিংবা অন্ত কোন বিশেষ ঘটনাতে কোথাও কাহারও পশ্চাতে পড়িতে ঘৃণাবোধ করিতেন। চিরদিন সমভাবে আপনার স্বাভাব্য ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং তাঁহার সে চেষ্টা সর্বত্রই তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল প্রদান করিয়া তাঁহার স্বাভাব্য ও প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। কখনও কাহারও অনুগ্রহভাজন হইবার প্রবৃত্তি কেহ তাঁহাতে দেখে নাই। যে আত্মনির্ভরের গুণে তিনি সর্বত্র জয়ী হইয়াছেন, বিভাগরে পঠদশাতেই তাঁহার সে গুণ সমধিক ক্ষুণ্ণিত করিয়াছিল।

সংসারে অল্প দশজনের অনুগ্রহভাজন না হইয়া, অন্তের সহায়তা লাভ না করিয়া, জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া অতীব কঠিন কাজ। বিশেষতঃ নিরস্তর দরিদ্র বালকের পক্ষে এরূপ আত্মনির্ভর আরও বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। উত্তরকালে বহুবল্লু পরিদেষ্টিত হইলেও, তিনি একাকী জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার মত গরিব অতি অল্পই

হয়। তাঁহার পিতা যে ভাবে চুংখ কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনের পথে তিল তিল করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, সামান্য আয়ে বহু পরিবারের ভরণপোষণ সঙ্কলান হইত না বলিয়া, বাল্যকালে তাঁহাকে অনেক সময়ে উদরার্নের জন্ত অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। তাঁহার নিজের বর্ণিত চুংখকাহিনী যে কত হৃদয়বিদারক, তাহা সহৃদয় লোক কেবল অন্তরে অনুভব করিতে সক্ষম। লেখনী সে চুংখের বার্তা বর্ণন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন, কখন অন্ন জুটিত, কখন জুটিত না; যখন জুটিত, তখনও সকল সময়ে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেন না। যখন পেট ভরিয়া অন্ন জুটিত, তখন আবার অনেক সময়ে ব্যাঙ্কনের অভাবে, কেবল মুন ভাতে দিনপাত করিতেন; ধন তরকারী ও মৎস্য পাইতেন, তখন মৎস্যের ঝোল রাঁধিয়া, এক বেলা ভাত আর সেই ব্যাঙ্কনের ঝোল খাইয়া, বৈকাল বেলায় জন্ত তরকারী ও মৎস্য রাখিয়া দিতেন; বৈকালে সেই ব্যাঙ্কনের তরকারীর দ্বারা অন্ন উদরস্থ করিয়া, মাছগুলি পরদিনের জন্ত রাখিয়া দিতেন; পরদিন সেই মাছের অঙ্গল রাখিয়া তাহার দ্বারাই সেদিনকার আহার সমাপন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।* এইরূপ ক্রমশে পড়িয়া, দিবারাত্রি শ্রম করিয়া যে বালক জীবনের পথে অগ্রসর হইতে প্রাণপণ যত্ন করে, বিধাতা প্রসন্ন হইয়া তাহার উপযুক্ত পুরস্কার বিধান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় যে উত্তরকালে দান্য প্রতিমুষ্টি হইয়া সংসারে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অসাধ্য সাধনের প্রথম অঙ্কুর বিজ্ঞানগণে বাল্যসহচরদিগের পরিচর্য্যার মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পিতা দরিদ্র, নিজে সর্বদা উদরপূর্ণ আহার পাইতেন না, অথচ বিজ্ঞানগণে যে বৃত্তি পাইতেন, সময়ে সময়ে তাহারও কিছু কিছু অল্প সহায্যারী-দিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন। কাহারও পীড়া হইয়াছে, শুনিবামাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। নিজে বাড়ীর চরখা-কাটা সূতার প্রস্তুত মোটা চটের মত কাপড় পরিয়া নিজের অর্থে অল্প দরিদ্র বালকদের জন্ত অপেক্ষাকৃত ভদ্রতর পরিধেয় ক্রয় করিয়া দিতেন! বালকের কথা দূরে থাকুক, পরিণত বয়সের সুপ্রবীণ ব্যক্তির পক্ষেও স্বার্থভাগের এমন আশ্চর্য্য

* এই অবস্থা বর্ণন আশ্চর্য্য বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের নিজ মুখে শুনিয়াছি।

দৃষ্টান্ত লোকসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না ।' এইরূপে তিনি সেই বাণ্য-
কাহ্নেই, নিজের দুরবস্থা বিস্তৃত হইয়া, অস্ত্রের সেবার নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন ।
এক দিকে অনাহার ও অনিদ্রাজনিত হুঃখ কষ্ট, শ্রাবণের ধারার ভায় তাঁহার
মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, অল্পদিকে ইহার উপর গৃহের পাকাদি
কার্যের ভার তাঁহারই উপর ছিল ; আবার তাহার উপরে অপর দশ জনের
সংবাদ লইয়া ও সেবা করিয়া বিভাগলয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করা কিরূপ
বালকের পক্ষে সম্ভব, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ভাল করিয়া উপ-
লব্ধি করিতে পারি না । সমগ্র সভ্যজগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনু-
সন্ধান কবিলেও, এরূপ দরিদ্র বালকের এ প্রকাব ক্লেশ ও অনুবিধার ভিতরে
এরূপ পরসেবা ও স্বার্থত্যাগের ভিতরে, আত্মোন্নতি সাধনেব এমন উৎকৃষ্ট
দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় । একান্ত নিরল—অতি দুর্য্যব বলিলেও
বোধ হয় অভ্যুক্তি হইবে না ।

আপামর সাধারণ লোকের পক্ষে যেটা প্রধান দোষ, প্রতিভাশালী ও
ক্ষমতাবান লোকের পক্ষে তাহাই প্রধান গুণে পরিণত হয় । অল্প লোক নিজের
বিজ্ঞা বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, নিজের জেদের বশবর্তী হইলে,
অপর দশজনের অনুরোধ উপেক্ষা করিলে, নিন্দাতাজন হয়, কিন্তু সংসারে
কখন কখন দেখা যায় যে, দশ জনের বা শত জনের বিজ্ঞা বুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শন
একত্র করিলেও প্রতিভাশালী মহাত্মাদের কণামাত্রও হয় না । কাজে কাজেই
তাঁহারা নিজের উপর অধিক নির্ভর করিতে শিখিয়া থাকেন । বাণ্যকাল
হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের এরূপ আত্মনির্ভরের ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল ।
কাহারও সাহায্য না লইয়া, বিভাগলয়ে তিনি সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট
ছাত্র হইবেন, সর্বদা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হইতেন । সর্বোৎকৃষ্ট
বালক হইতে বৃত্ত প্রকার ক্লেশ ভোগ করার প্রয়োজন, ত্রাহতে সর্বদা প্রস্তুত
থাকিতেন । সে বিষয়ে কাহারও বাধা মানিতেন না । অনেক সময়ে অর্ধ
রজনী, কোন কোন সময়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া লেখা পড়া করিতেন ;
এরূপ পরিশ্রমে অনেক সময়ে তিনি অভ্যস্ত কঠিন পীড়ার অনেক দিন ধরিয়া
শয্যাগত থাকিতেন । কিন্তু তথাপি আত্মোন্নতি সাধনে কখনও এক মুহূর্তের
জল্প বিরত ছিলেন না । উত্তরকালে যখন তিনি সম্মান ও সম্পদের উচ্চ

শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, যখন তাঁহার শরীর অল্পহ ও অশটু হইয়া পড়িয়াছিল, যখন তিনি জনসমাজের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য-কলাপের সহিত বড় সংশ্লব রাখিতেন না, তখনও দেখা গিয়াছে, একাহারে, অনাহারে বা ক্ষুধাশরীরে সর্বদা শাস্ত্রালোচনার নিবৃত্ত থাকিতেন। কোন নূতন বিষয় জানিবার জন্য, কোন নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য, কোন নূতন পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য, সর্বদা মুক্ত ভাবে অপেক্ষা করিতেন। কেহ কোন বিষয়ে তাঁহাকে পরাস্ত করিবে, ইহা তিনি কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেন না। এই দুর্দমনীয় আত্মোন্নতির স্পৃহা ও আত্মদানের ভাব বালাকালে বিভাগয়ে অর্জন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আত্মোন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সোভাগ্যবশতঃ তাঁহার দর্শনশাস্ত্রাভ্যাসের বহুসংখ্যক তাঁহার গৃহে গিয়াছিল। কিন্তু কখনও তাঁহাকে চেয়ারে পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিতে দেখি নাই। সুস্থতায় কি পীড়ায়, আহারে কি অনাহারে, সকল সময়েই তিনি সোজা হইয়া বসিতেন, তাঁহার উপবেশনে ক্লাস্তিবোধক চিহ্ন কখন দেখিতে পাই নাই। তাঁহার লোকান্তর গমনের পূর্বদিনেও তিনি আপনার নিত্যস্বতন্ত্র আত্মোন্নয়ন কার্যগুলি নিজে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে আত্মনির্ভরের ভাব উত্তরকালে তাঁহাকে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করাইয়াছে, বালাকালে তাহা বালম্বভাবশূলভ চপলতার অধীন হইয়া তাঁহার বহুবিধ ক্রেশ উৎপাদন করিয়াছে। সে সবক্কে অনেকগুলি আত্মোন্নয়নক আধ্যাত্মিক উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে দিন ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞান করিবার দিন, ঠাকুরদাস বলিতেন, “ঈশ্বর, আজ তোমার জ্ঞান করা হইবে না।” ঈশ্বরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিতেন, “না বাবা, আজই জ্ঞান করিতে হইবে, আজই জ্ঞান করিব।” আর দুই একবার বাধা দিতে না দিতে ঈশ্বরচন্দ্র জানে অগ্রসর হইতেন। ঠাকুরদাসেরও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত। কখন কখন ঈশ্বরচন্দ্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য করিতে জেদ ধরিতেন। জ্ঞান, পরিধেয় ও আহার প্রভৃতি নিজের নিত্য কষ্টেই প্রায় এইরূপ ঘটত। এক এক দিন পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিজের ইচ্ছাসম্মত তত্ত্বপরিচয় করিতেন। কোন কোন দিন ভেল মাখিয়াছেন, এমন সময় যদি বুঝিলেন যে, না বুঝিয়া পিতার অভিপ্রায়ে

রায় দিয়া ফেলিয়াছেন, তখনই বেকিয়া বসিতেন। তখন ঠাকুরদাস তাঁহাকে ধরিয়া গঙ্গার ঘাটে নামাইয়া দিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র জলে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, প্রাণান্তেও ডুব দিতেন না, শেষে অনেক প্রহারের পর অনেক কষ্টে তাঁহাকে বলপূর্বক তান করাইতে হইত।* যে দিন একখানি ময়লা কাপড় পরিতে হইবে, ঠাকুরদাস বলিতেন, ঈশ্বর, আজ একখানা খুব পরিষ্কার কাপড় পরিয়া যাও ; ঈশ্বরচন্দ্র অমনি মনে মনে স্থির করিতেন, সে দিন ঐ ময়লা কাপড়খানা পরিয়া যাইবেন, কার্যেও ঠিক তাহাই করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, প্রত্যেক বিষয়ে আপনার ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন ; কখন কোন বিষয়ে কাহারও অধীন হইয়া চলিতেন না। তাঁহার জীবনচরিতের প্রত্যেক ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ব্যাকরণ শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশবর্ষ মাত্র। সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশকালে তাঁহার উপনয়ন সংস্কারকাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। তিনি যখন সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই শ্রেণীর শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় বালকের বয়সের অন্নতাহেতু তাঁহাকে লইতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐকরূপ সন্দেহ হইয়াছিল যে, এত অল্প বয়সের ছেলে সংস্কৃত সাহিত্য বুঝিতে পারিবে না। ঈশ্বরচন্দ্র ভয়ানক অভিমানী ছিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র বলিলেন, “সাহিত্য বিষয়েই আমাকে পরীক্ষা করিয়া লইলে ভাল হয়, নতুবা আমাকে বিভাগের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।” তৎক্ষণাতঃ তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে ভট্টির করেকটী কঁঠিন কবিতার অর্থ করিতে বলিলেন। তিনি সে সকল কবিতার যেরূপ অর্থ ও অর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলের কেহই সেরূপ সুব্যাখ্যা ও পাঠের সেরূপ অর্থ সাধন করিতে পারেন নাই। তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া বালককে সাহিত্য-শ্রেণীতে গ্রহণ করিলেন এবং চিরদিন পুত্রবৎসল্যের সহিত শিক্ষা দান করিতেন। এই শ্রেণীতে পরলোকগত

এই সকল ঘটনা উপলক্ষে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, তখন বলিতেন, “বা! কি সাধে তোকে ‘এঁড়ে বাছুর’ বলিয়াছিলেন?”

মনমোহন তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিজ্ঞানাগর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ছাত্রেরাই তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্রেণীর প্রথম বর্ষে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও রাঘবপাণ্ডবীর প্রভৃতি সাহিত্য-গ্রন্থের পরীক্ষার সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বৎসরে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্কশী, মৃত্যুবাঙ্কস, কাদম্বরী ও দশকুমারচরিত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থসকল আত্মোপাস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া শেষ পরীক্ষার সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলে তাঁহার পরীক্ষার কল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

সে কালে এখনকার মত রবিবারে সংস্কৃত কালেজ বন্ধ হইত না; প্রতিপদ ও অষ্টমীতে সংস্কৃত চর্চা নিবিড় ছিল। এজন্য প্রতিপদ ও অষ্টমীতে কালেজ বন্ধ থাকিত। ছাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমায় নুতন পাঠ বন্ধ থাকিত, এ কারণ ঐ কয়েক দিবস সংস্কৃত রচনা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন দিন সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অথবা বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত অনুবাদ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। ঈশ্বরচন্দ্র এই সর্বপ্রকার অনুশীলনেই সকল বালক অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইতেন বলিয়া শিক্ষক তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং সর্বদা তাঁহার কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহার রচনা ও অনুবাদে বর্ণাঙ্কিত কিংবা ব্যাকরণ ভুল হইত না, তাঁহার হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল এবং বাহা কিছু পাঠ করিতেন, তাহা সম্যক স্মরণ করিয়া রাখিতেন বলিয়া, কখনই তাঁহাকে কোন বিষয়ে পরাস্ত হইতে হইত না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। বাগ্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের অধিকাংশ ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণন করিতে পারিতেন। আমরা অনেক সময়ে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার বর্ণিত বিষয় হইতে অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।

তিনি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থসকল আত্মোপাস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং নানা বিষয়ক সংস্কৃত পদাবলী সংগ্রহ ও স্মরণ করিয়া রাখিতেন বলিয়া অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি করিতে পারিতেন। সংস্কৃত ভাষায় লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেন। সে সময়কার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার এই বিগাধারণ ক্রমজ্ঞা

কর্ণনে বলিতেন, “ঈশ্বর প্রতিধর, এ বালক দীর্ঘজীবী হইলে, অবিভীত লোক হইবে ।”

এই সময় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মধ্যম পুত্র দীনবন্ধুকে সংরক্ত কালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার মানসে কলিকাতার আনিলেন । কলিকাতার বাসায় ক্রমে পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং ঈশ্বরচন্দ্রের বিভা-
শিক্ষার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গৃহকাৰ্য্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা রন্ধন কাৰ্য্য সমাপন করিতে হইত । বাসায় দাস দাসী ছিল না ; প্রাতঃকালে গন্ধান্নান করিয়া আসিবার সময় কাশীনাথ বাবুর বাজারে গিয়া মৎস্ত ও তরকারী ক্রয় করিয়া লইয়া বাসায় আসিতেন । বাসায় আসিয়া ব্যঞ্জনের ঝাল মসলা নিজেই বাটিতেন, তরকারী ও মাছ নিজেই কুটিতেন । পাকের কাৰ্য্য নিজে একাকীই সম্পন্ন করিতেন । চারি পাঁচ জনের আহারের আয়োজন করিয়া, তাঁহাদিগকে আহাব করাইয়া ও নিজে আহার করিয়া, সে সকল ভোজন পাত্র ধৌত করিতেন, আহারের স্থান পরিষ্কার করিতেন । তৎপরে কালেজে যাইতেন । এ সকলের উপর ঠাকুর-
দাসের নিয়ম ছিল যে, একটি ভাত পাতের পাশে পড়িয়া থাকিবে না, ভোজন-
পাত্র ধুইয়া মুছিয়া যাইত হইত । সে বিষয় কখন ত্রুটি হইলে গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইত । এইরূপ কঠোর ত্রুট্যচৰ্চা ঈশ্বরচন্দ্রের বালা-
জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া, তিনি উত্তরকালে নির্ভরে ও শান্তচিত্তে সকল বিপদভার বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । কেহ কখন তাঁহাকে বিপদে বা বোগে অসহিষ্ণু হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না ।

বাল্যকালে এই সকল রীতিনীতির অধীন হইয়া চলিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া, পরিণত বয়সেও তিনি কখনও একটি ভাত ফেলিতেন না, কাহাকেও ফেলিতে দিতেন না । কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অয়ের আয়োজন করিতেন, নিজে নিকটে বসিয়া নিমন্ত্রিতগণকে আহার করাইতেন, কেহ কিছু ফেলিয়া রাখিলে, তাঁহার পিতৃদেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন :—“একটি ভাত পাতের পাশে পড়িয়া থাকিলে, আমার বাবা আমাকে প্রহার করিতেন, আর তুমি এত জিনিস নষ্ট করিবে ? তা কখন হবে না, ওগো সন্ত খাইতে হইবে ।”

ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুকে তাঁহার শিতা কালেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দিলেন। দীনবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন না। অনেক সময় অলস ভাবে কাল কাটাইতেন, কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি সুরধারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রসম্পন্ন বালক ছিলেন। যাহা একবার শুনিতে, তাহাই তাঁহার স্মরণ থাকিত। ঠাকুরদাস রাত্রি নয়টার পর কৰ্ম স্থান হইতে 'বাসায় আসিতেন, বাসায় আসিয়া দুইটা ভাইকে লেখা পড়া করিতে দেখিলে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। আর যদি দেখিতেন যে ঐদীপ জলিতেছে, আর দুই ভাই ঘুমাইতেছেন, তাহা হইলে আর নিস্তার থাকিত না। শিতার প্রহারে বালকদ্বয়ের জন্মদে কাতর হইয়া সিংহ মহাশয়ের পরিবারেরা দৌড়িয়া আসিতেন এবং ঠাকুরদাসকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর করিয়া অস্ত্র বাসা করিতে বলিতেন। তাঁহার বলিতেন, “ছোট ছোট ছেলে, এত মার খাইয়া মরিয়া যাইবে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা করিয়া আমাদের পাতকগ্রস্ত করিবেন না।” এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যাদি নিত্যকৰ্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যার ক্রমশঃ একরূপ ভাবে দেখাইতেন যেন সন্ধ্যা করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সন্ধ্যা স্মরণ ছিল না এবং সন্ধ্যা করিতেন না। সন্ধ্যাপ্রস্তুত পুস্তক কালিদাস বাল্মীকিপাধ্যায় একদিন বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে সমস্ত সন্ধ্যার আবৃত্তি করিতে বলিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মহা সঙ্কটে পড়িলেন! ধরা পড়িয়া শিতার নিকট অত্যন্ত নিপীড়িত হইলেন এবং সেই দিন আহারের পূর্বে সন্ধ্যা কণ্ঠস্থ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এমন আশ্চর্য্য শক্তিশালী বালক যে, কণ্ঠকালের মধ্যে সমগ্র সন্ধ্যার আত্মোপাস্ত নিতুল আবৃত্তি করিয়া আহার করিলেন।

অনেক দিন হইতে ঠাকুরদাস বাল্মীকিপাধ্যায়ের মনে এই বাসনা ছিল যে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র কালেজের শিক্ষা সমাপন করিয়া বীরসিংহে গিয়া টোল করিবেন, আর গ্রামের ও অজ্ঞাত স্থানের নিরাশ্রয় বালকবৃন্দ সমবেত হইয়া সেই টোলে অধ্যয়ন করিবে। এইরূপ আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া ঠাকুরদাস পুত্রকে বলেন, কালেজে তুমি যে বৃত্তি পাইতেছ, তাহার দ্বারা দেশে কিছু জমি ক্রয় কর, তাহার আর দ্বারা বিদেশীয় বালকগণের ভরণ পূরণের ব্যয়

সম্বলান হইবে । তদনুসারে ঈশ্বরচন্দ্রের বৃত্তির টাকা দিয়া কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করা হইরাছিল । কিছুকাল জমি জমা ক্রয় করিবার পর পিতা পুত্রকে বলেন, অতঃপর বৃত্তির টাকার কিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ক্রয় কর । তদনুসারে পিতার আদেশমত অনেকগুলি হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করা হইরাছিল । অতাপি বিভাগাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে সে পুঁথিগুলি দেখিতে পাওয়া যায় । বিভাগাশিক্ষা শেষ হইলে, গ্রামে অনাথ বালকদিগের অল্প টোল করিতে হইবে, পিতা পুত্র উভয়েরই সেরূপ বাসনা ছিল এবং তাঁহারা পূর্ক হইতে তাহার অয়োজন করিতেছিলেন ।

ঈশ্বরচন্দ্র ইতিমধ্যেই ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বিশিষ্টরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । এই সময়ে অবসরক্রমে যখন বীরসিংহে গমন করিতেন, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কাহারও কোন প্রকার নিমন্ত্রণের, শ্লোক রচনার প্রয়োজন হইলে, তিনি তাহা রচনা করিয়া দিতেন । একবার এক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে আত্মশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কৃত্তী ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বারা শ্লোক রচনা করাইয়া লন । সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী সেই শ্লোকের রচনাপারিপাট্য, শব্দবিভাগ এবং পদগালিত্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কবিতাকারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । তখন কর্তৃকর্তা বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখাইয়া দিলেন । সকলে বালকের এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া গেলেন । কেহ কেহ তাঁহার সহিত ব্যাকরণের বিচার করিতে গিয়া দেখিলেন, বালক অনর্গল সংস্কৃত কথ্য কহিতে ও বিচার করিতে পারেন, তখন সভাহ সকলে বালকের এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া নীরব হইলেন । সেট সময় হইতে বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী নানা স্থানে প্রচার হইল যে, বাল্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন । অল্পকাল পরে এদেশে আর কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না । সে সময়ে এই শিক্ষানবিসী বালক ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশংসাবর্ত্তা নানাদিকে প্রচারিত হইবার প্রধান কারণ এই যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষার মত সংস্কৃত ভাষার অবাধে কথা কহিতে ও যে কোন প্রকার আলোচ্য বিষয়ের বিচার করিতে পারিতেন, কিন্তু সে সময়ের প্রবীণ ও সুবিদ্বান পণ্ডিতগণের পক্ষেও সংস্কৃত ভাষায় সে প্রকার বিচার করা সম্ভবপর ছিল না, তাই সকলে বালককে এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ ও নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন ।

মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলী জেলার নানা স্থানে এই কথা প্রচারিত হওয়ার নানাতান হইতে ঈশ্বরচন্দ্রকে কন্যাদান করিবার প্রস্তাব লইয়া লোক আসিতে লাগিলেন। অনেক স্থান হইতে প্রস্তাব আসিল বটে, কিন্তু শেষে কীরপাই নিবাসী শত্রু ভট্টাচার্য্যের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা স্থির হয়। কীরপাই, গণ্ডগ্রাম। সে কালে কলের কাপড়ের এত আমদানী ছিল না। কীরপাইতে ঐ অঞ্চলের বস্ত্রব্যবসায়ীগণের বস্ত্র বিক্রয়ের গল্প ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানী মহাজনেরাও কীরপাই আসিয়া বস্ত্র ক্রয় করিত, অন্য নানা স্থানের নানা দ্রব্য কীরপাইয়ের গল্পে সর্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকিত। এক্ষণে সম্পন্ন গ্রামের মধ্যে শত্রু ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধনে মানে অনেকের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার কন্যা দীনময়ী রূপগুণসম্পন্ন ছিলেন। এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার দেহে সর্বপ্রকার সুলক্ষণ বিজ্ঞমান ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সন্মোদন করিয়া বলিয়াছিলেন, “বন্দ্যোপাধ্যায়! তোমার ধন নাই, তোমার পুত্র বিদ্বান হইয়াছেন, কেবল এই কারণে আমার প্রাণসমা তনয়া দীনময়ীকে তোমার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলাম।” ঈশ্বরচন্দ্রের সে সময় বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। যাবজ্জীবন লেখা পড়া শিখিবেন, দেশের লোকের হিতসাধন করিবেন, বিপদের চুঃখ দূর ও রোগীর সেবা কবিবেন, এইরূপ বিবিধ কল্যাণকর শুভ চিন্তা সে সময়ে তাঁহার অন্তঃকরে আন্দোলিত করিত; কিন্তু পাছে পিতা মনঃক্ষুব্ধ হন, এই ভয়ে গৌড়ে অল্প বয়সে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইলেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম কেবল চতুর্দশ বর্ষ মাত্র, তখন পিতৃ আজ্ঞায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অষ্টমবর্ষীয়া, সুলক্ষণা ও সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অলঙ্কারের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার এই তিন বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয় সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া বালকেরা সংস্কৃত ভাষার বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিত। অলঙ্কার শ্রেণীতেও ঈশ্বরচন্দ্র সর্বাঙ্গের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু কাজের বেলা সকলের অপেক্ষা ওজনে ভারি হইতেন। এই জন্য শিক্ষক, দর্শক ও অন্যান্য সকলে তাঁহার

বালক ও প্রবীণের মিলন দেখিয়া তাহাকে অকুতকর্ণা। বালক মনে করিয়া অবাধ হইতেন। তিনি এক বৎসরের মধ্যে সাহিত্যদর্শন, কাব্য প্রকাশ ও রসগন্ধার প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন এবং বাৎসরিক পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সময় পরীক্ষার অন্ত্য অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত; সঙ্গে সঙ্গে আবার বাসার সর্বপ্রকার কার্যের ভার তাহার উপর স্তম্ভ থাকায়, তিনি পরীক্ষার পরে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অনবরত রক্ত ভেদ হইতে লাগিল। কলিকাতার থাকিয়া নানা প্রকার ঔষধ সেবনেও পীড়াব কিছুই হ্রাস হইল না। অগত্যা কিছুদিনের অন্ত বিদায় লইয়া বীরসিংহে গেলেন। সেখানেও প্রথমে নানা প্রকার ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। শেষে একজন ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ ওল ঘোলের সহিত মিশাইয়া করেকদিন খাওয়াইয়া সেই কঠিন পীড়া হইতে তাহাকে মুক্ত কবেন। সেই দারুণ পীড়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে না পাইতেই তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্বের স্তায় শ্রমকর কার্যাগুলির ভার নিজেই লইলেন। এই সময়ে এক দিন সহোদর দীনবন্ধুকে সন্ধ্যা সময়ে বাজারে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু বাত্রি একাদশ ঘটিকা অতীত হইতে যায়, তখনও দীনবন্ধু ফিরিল না দেখিয়া, তাহাব অত্যন্ত ভয় ও ভাবনা হইল। ত্রাতার অন্ত উচ্চৈঃস্ববে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অন্তান্ত সকলের পরামর্শমত কাশীনাথ বাবুর বাজারে গিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেখানে কোন সন্ধান না পাইয়া তাহাব আশঙ্কা আরও দৃঢ়মূল হইল। তিনি অতি ব্যাকুলভাবে বড়বাজার হইতে নূতন বাজারে দীনবন্ধুর সন্ধানে গেলেন। সেখানে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, এক দেওয়ালে ঠেস দিয়া বালক নিদ্রা ঘাইতেছে। তখন ঘুম ভাঙাইয়া তাহাকে বাসায় লইয়া গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল হইতে আকর্ষিত করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাই ভগিনীগুলিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সর্বদা তাহাদের কল্যাণ চিন্তা করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই প্রতিমাপুত্রার তাম্র পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আত্মবান হিন্দুগণ যেসকল ভক্তিসহকারে দেবপূজা করিতেন, তিনি সেইরূপ ভক্তিসহকারে নিজ জনকজননীর পূজা করিতেন। তিনি বলিতেন, সংসারে পিতা মাতা জীবন্ত দেবতা। পিতৃ-মাতৃ-পূজা

ভাগ করিয়া বা পিতা মাতার প্রতি—তাঁহাদের নানা প্রকার হুংখ কষ্টের প্রতি—উদাসীন হইয়া, দেব-পূজার ধর্ম হয় না। বাঁহাদের হুংখকষ্টে আমরা লালিত পালিত, বাঁহাদের স্নেহ মমতার আমরা সুরক্ষিত, সেই পিতা মাতাই পরম দেবতা-স্থানীয়। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার পূজার ধর্ম হয় না। বস্তুতঃ আমরা বিভাগাগর মহাশয়ের মত শিশুমানুষ লোক সচরাচর দেখিতে পাই না। তিনি যখন কোন প্রকার কার্যোপলক্ষে বীরসিংহে গমন করিতেন, সর্বপ্রায়ে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় গুরু মহাশয়ের চরণ বন্দনা করিতে বাটতেন। গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের এতাদৃশ লোকবিরল অনুরাগপূর্ণ ভক্তি দর্শনে স্নেহবিগলিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেন। দেশের কি ইতর কি ভদ্র সকল লোকেই তাঁহার সপ্রেম ব্যবহার ও করুণ-রস-পূর্ণ মিষ্ট-কথায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিত। বাটী অবস্থানকালে তিনি ছোট ছোট বালকগণকে লইয়া কপাটি খেলিতেন, সম-বয়স্কদিগকে লইয়া লাঠি খেলিতেন ও কুস্তি করিতেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সম্মান করিয়া চলিতেন। একরূপ সুপ্রকৃতি-সম্পন্ন যুবককে যে আবাগবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই স্নেহ নয়নে দেখিবেন ইহাই স্বাভাবিক! ঈশ্বরচন্দ্র তাস, পাশা প্রভৃতি, অলস ক্রীড়া ও আমোদের পক্ষপাতী ছিলেন না। চকল বালকের প্রকৃতি, উগ্রমণীষ যুবকের স্বভাব, এবং কর্তব্যপারায়ণ তেজস্বী পুরুষের লক্ষণ পর্যায়ক্রমে তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইয়াছে। তিনি সর্বদা সেইরূপ প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া চলিতেই প্রয়াস পাইতেন ও ভাল বাসিতেন।

ঠনঠনিয়ার চৌরাস্তার অনতিদূরে পূর্বদিকে এক বাসার সংস্কৃত কালেজের কারেকজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বাস করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এইজন্য প্রায় প্রতিদিন বিভাগাগরের ছুটির পর তিনি ঐ বাসার উক্ত ছাত্রগণের নিকট বেড়াইতে বাইতেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া সাহিত্য-দর্শন দেখিতেন। এক দিবস সুপ্রসিদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রবেত্তা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ‘ল’ কমিটির পরীক্ষা দিয়া জজ পণ্ডিতের কক্ষ লইবার মানসে তারানাথ তর্কবাচস্পতির সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়া-ছিলেন। তিনি তথায় ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্য-দর্শন আকৃষ্টি করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত অল্পবয়স্ক

বালক সাহিত্য-দর্পণের কি বুঝিবে ?” তর্কবাচস্পতি মহাশয় তত্ত্বস্তরে বলিলেন, “বালক কিরূপ শিখিরাছে, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না।” তর্ক-পঞ্চানন মহাশয় বালকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, বালক এক অসাধারণ পণ্ডিত ! আকারে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বিজ্ঞাবিষয়ে, জ্ঞানের বিকৃতিতে সুপ্রবীণ বটবৃক্ষের ছায় বহুদূর অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনি প্রীতিপূর্ণ হইয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বলিলেন, “এ বালক কালে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অল্প বয়সে সংস্কৃত ভাষার একগুণ ব্যুৎপন্ন লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।” ইহা শুনিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলিলেন :—“আমরা এই বালককে কালেজের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ মনে করি।” অন্ননারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় তদবধি সর্বদা সর্বত্র ঈশ্বরচন্দ্রের এতাদৃশ গুণগন্যার বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

এই সময়ের নিয়মানুসারে বালকগণকে অগ্রে অলঙ্কার, ছায় ও বেদান্ত এবং তৎপরে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, ছাত্রেরা অজ্ঞ পণ্ডিতের পদপ্রাপ্ত হইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তৎপরিবর্তে অলঙ্কার শ্রেণীতে পাঠ করিতে করিতে কালেজের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। বিজ্ঞান-গণের সকল পাঠ শেষ করিয়া ছাত্রেরা ‘ল’ কমিটির পরীক্ষা দিবার জন্ত স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতেন এবং সকল বালককেই দুই তিন বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রমসহকারে মনুষ্যসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে হইত। তৎপরে পরীক্ষা দিয়া কেহ বা উত্তীর্ণ হইতেন, কেহ বা বিফলমনোরথ হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিতেন, কিন্তু বালক ঈশ্বরচন্দ্র অনন্তকরা হইয়া, দিবারাত্রি শ্রম করিয়া, ছয় মাসের মধ্যে সেই সুকঠিন ও দুর্লভ্য গ্রন্থ সকল আয়ত্ত করিয়া কমিটির পরীক্ষার বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এক দিকে নিম্নের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্য দিকে বঙ্গীর বালকগণের সমক্ষে শ্রমশীলতা, একাগ্রতা ও বিজ্ঞানশিক্ষার অনুরাগ প্রদর্শনের অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

কিশোরবয়স্ক অজাতশত্রু বালক ঈশ্বরচন্দ্র ‘ল’ কমিটির পরীক্ষার দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ছয় মাসের মধ্যে সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ

করিয়েছেন শুনিয়া সকলেই একবারে বিশ্বাস-সাগরে মগ্ন হইল। এ ঘটনা এতই বিশ্বাসকর হইয়াছিল যে, সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। যখন ঈশ্বরচন্দ্র উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপ্রদ সার্টিফিকেট পাইলেন, তখন সকলের সংশয় দূর হইল, তাঁহার ‘ল’ কমিটির পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার অল্প দিন পরে ত্রিপুরার জজ পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। সপ্তদশবর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পদ প্রাপ্তির মানসে আবেদন করেন, তদন্তেরে উক্ত পদ গ্রহণের জন্য তাঁহার নিয়োগ পত্র আসিল। কিন্তু পিতার অসম্মতি নিবন্ধন তিনি উক্ত কর্তব্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অন্যান্য পরীক্ষা শেষ করিয়া ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। উক্ত শ্রেণীর অধ্যাপক শঙ্কুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ও বালক ঈশ্বরচন্দ্রের গুণপনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের সন্দেহ হইত বা পাঠের যে সকল স্থল অসংলগ্ন বোধ হইত, সে সকল বিষয়ে শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন অনেক সময়ে একূপ আলোচনায় প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া বাচস্পতি মহাশয় বালকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন, “তুমি ঈশ্বর”।

এই সময়ের নিয়মানুসারে স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার সময় সংস্কৃত পঞ্চ ও গণ্ড রচনা করিতে হইত। সর্বোৎকৃষ্ট গণ্ড ও পণ্ড রচনার প্রত্যেক বিষয়ে একশত টাকার পুরস্কার ছিল। যে বিষয়ে তাঁহার রচনা সর্বাপেক্ষা উত্তম হইত, তিনি উক্ত পুরস্কার পাইতেন। উভয় পরীক্ষা এক দিনে হইত। দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত গণ্ড রচনার এবং একটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কবিতা রচনার সময় নির্দ্ধারিত ছিল। পরীক্ষার্থী বালকেরা সমাগত হইয়াছে, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, এমন সময় অলঙ্কার শ্রেণীর অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে অন্যত্র অপেক্ষা করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে তথায় বলপূর্ব্বক বসাইয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র রচনা বিষয়ে নিজের অনুপস্থিততার কথা উল্লেখ করিয়া অব্যাহতি পাইবার জন্য বার বার মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,

“যা পার লিখ, নচেৎ অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব রাগ করিবেন।” ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, “কি লিখিব?” শিক্ষক বলিলেন,—“সত্যংহি নাম আরম্ভ করিয়া লিখ” সেবার ‘সত্য কথনের মহিমা’ গল্প রচনার বিষয় নির্দিষ্ট ছিল। শিক্ষকের আদেশ ও উপদেশমত ঈশ্বরচন্দ্র রচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য পরীক্ষকগণের বিবেচনার তাঁহার প্রবন্ধই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর পদ্ম রচনা বিষয়েও তাঁহার প্রবন্ধ উৎকৃষ্টতর বিবেচিত হওয়াতে তিনি আর একটি পুরস্কারও প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি ইহার পর বেদান্তের পরীক্ষা দিয়া ত্রায় ও দর্শনের শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। এই শ্রেণীতে এক বৎসর কাল অধ্যয়নের পর পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে একশত টাকা পুরস্কার পাইলেন এবং সেবারের কবিতা রচনার তাঁহার পরীক্ষাদানও অপর সকলের অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হওয়াতে আর একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহামা পুত্র দীনবন্ধুর বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঠাকুরদাস ব্যয়বাহুলা নিবন্ধন কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বীরসিংহের বাটীতে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিয়া কোন ফল দর্শিল না। তখন কলিকাতার অন্ন ব্যয়ে বাসাখরচ চালাইতে লাগিলেন এবং উদ্ভূত অর্থে ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পরীক্ষার ফল ভাল হওয়াতে যে দুই শত টাকার পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তদ্বারা ঋণ পরিশোধের পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য হইয়াছিল।

উক্ত সময়ে কলিকাতার বাসায় সকলকেই আহারাদি বিষয়ে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুধ, মৎস্য ও উৎকৃষ্ট তরকারী প্রভৃতি কিছু কালের জন্য সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। বৈকালে জলধাবারের জন্য আধ পরসার ছোলা ভিজান থাকিত, আধ পরসার বাতাসা আনিয়া সকলে মিলিয়া ঐ ছোলা আর বাতাসার বৈকালের জলবোনের কার্য সমাধা করিতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ ছোলার কিয়ৎকাল রান্নিতে কুমড়ার তরকারীতে দেওয়া হইত। দুইবেলা কুমড়ার তরকারী আর তাতে উষ্মপূর্ণ করিয়া, বাসায় পাচক

ও দাসদাসীর সমস্ত কাজ একাকী সমাপন করিয়া বিভাগরের সমগ্র পাঠ সুন্দর রূপে প্রস্তুত করাতেই যে কেবল তাঁহার শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় সক্ষমতা ও আগ্রহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নহে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দিবারাত্রি এইরূপ ক্লেশকর শারীরিক পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়াও ঈশ্বরচন্দ্র সর্বদা প্রসন্ন মনে কালাতিপাত করিতেন, কেহ কখন তাঁহাকে এই সকল বহুশ্রমের কার্য সম্পাদনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে কিংবা এ সকল কাজ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে শুনেন নাই। সর্বদা প্রসন্নতার পরিচায়ক হাস্তপূর্ণ মুখে সকলের সহিত কথা কহিতেন। তিনি যে এরূপ দুঃসহ দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া মনের স্রুখে কালাতিপাত করিতেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে সেবার পূজার সময় যখন বাটী গিয়াছিল তখন অন্যান্য বারের ন্যায় নিজের ছোট ছোট সহোদর ও পাড়ার বালকবৃন্দকে লইয়া পূর্ববৎ খেলা করিতে লাগিলেন। গ্রামের অল্পকিষ্ট ও পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না। প্রতিবেশিগণের মধ্যে যাহারা বস্ত্রাভাবে জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্রধরে অতি কষ্টে লজ্জা নিবারণ করিতেছিল, তাহাদিগের কাহাকেও দেখিবামাত্র, গামোছা পরিধান পূর্বক নিজের পরিধের দান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, নিজের দুঃখ কষ্টের চিন্তায় কিংবা ঘোরতর অভাবের অবস্থায় তাঁহার চিন্তাবিপর্ধ্য ঘটত না। প্রসন্ন মনে সর্ববিধ ক্লেশই সহ্য করিতে পারিতেন। এই সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা এই স্থানেই উল্লেখযোগ্য এবং তাহাতে ঈশ্বরচন্দ্রের মনের দৃঢ়তা ও নির্বিকার ভাবের অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কলিকাতার এককণ-কারমত মিউনিসিপালিটার শ্রীযুক্তি হয় নাই। তখন সহরের চারিদিকই দুর্গন্ধপূর্ণ ছিল। গুরুশ্রী ও ডোবা সকল পচা ময়লা জলে পূর্ণ থাকিত, ইহাদের এক একটাকে এক একটা নরককুণ্ড বলিলেই ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বের অনাবৃত জল-প্রণালীগুলি দিবারাত্রি নরককুণ্ডের আকার ধারণ করিয়া থাকিত। শতকরা নিরানব্বই খানি গৃহস্থের বাটীতে মলমূত্র ও কুমিপূর্ণ পুত্তিগন্ধময় এক একটা নরককুণ্ড প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখনকার কলিকাতা আর এখনকার কলিকাতার কত প্রভেদ, যাহারা সে দৃশ্য

স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন তাঁহারা, বহুবর্ণনারও তাহার বিন্দুমাত্র স্বীয়কম করিতে পারিবেন না। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা যে গৃহে থাকিতেন, সে গৃহেও এইরূপ নরককুণ্ডের অভাব ছিল না। পার্থানা, পাতকুরা ও তন্নিকটবর্তী স্থানগুলিই এরূপ অবস্থাপন্ন থাকিত। যে ক্ষুদ্র গৃহে ঈশ্বরচন্দ্র দুই বেলা পাক করিতেন, সেই ক্ষুদ্র কুটার এইরূপ নরককুণ্ডের অতি সন্নিকটে সংস্থাপিত ছিল। বিভাগায় মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন ক্রমি সকল দলে দলে তাঁহার ভোজন-পাত্র আক্রমণ করিতে আসিত। তাহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র আহারের সময়ে প্রতিদিনই এক ঘটা জল লইয়া বসিতেন। সেই সকল ক্রমি নিকট হইলেই ঘটা হইতে জল ঢালিয়া দিতেন, আর তাহারা সেই প্রক্ষিপ্ত জল-স্রোতের সহিত দূরে পড়িত। দুর্গন্ধের ত কথাই ছিল না। যে ভ্রুকর-জনক গরলকণা নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে, লোক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে, ঈশ্বরচন্দ্র সেই পরিমল-পয়োধি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নীরবে ভোজন-পাত্র শূন্য করিতেন। এইরূপ বিবিধ শত্রু-সমাকুল স্থানে নেপোলিয়নের জ্ঞায় নিশ্চিন্ত-চিত্তে উপবেশন পূর্বক রন্ধনাদি কার্য সমাপন করিয়া, অপর সকলকে আহার করাইয়া, পরিশেষে নিজের জঠবানল নির্বাণ করিতেন। এই সংশ্লেষে আর একটা বিশেষ ঘটনা এই স্থানেই উল্লেখযোগ্য, সেটা এই যে, এই পাকশালা-গৃহ এমন স্থানে স্থাপিত ছিল যে, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের একটা কিরণও কোন দিন ভ্রমক্রমেও গৃহের সে অঞ্চলে উঁকি মারিত না। সুতরাং ঘন অন্ধকার নীরবে নির্বিবাদে তথায় রাজত্ব করিত। অনেক সময়ে দিনের বেলায় তথায় প্রদীপ জালিয়া পাক কার্য সমাপন করিতে হইত। এজন্য সে কুটারে আরম্মলাকুল পরম সুখে বাস করিত। কেবল বাস করিত তাহা নহে, সময়ে সময়ে বড় দৌরাহ্ম্য করিত। স্বেযোগমত বাহা কিছু পাইত তাহাই ভক্ষণ করিত। কখন কখন অন্ন ব্যঞ্জন পড়িত। এজন্য সর্বদাই তাঁহাকে খুব সাবধানে রন্ধন ও ভোজন কার্য সমাপন করিতে হইত। এক দিবস একটু অসাবধান হওয়াতে ভোজনের সময়ে তরকারীর মধ্যে একটা আরম্মলা দেখিতে পাইলেন। তখন সে কথা প্রকাশ করিলে কিংবা ভোজনপাত্রের নিকট সে পোকা ফেলিয়া রাখিলে, পাছে ভূগাপ্রবৃত্ত অপর সকলের আহারের ব্যাঘাত জন্মায়, এই ভয়ে নিরুপায়

হইয়া ব্যঞ্জনসহ সেই আরম্ভাটিকে মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন এবং অজ্ঞান খাওয়ার সহিত তাহাকে উদরস্থ করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে আপনাকে ও অপর সকলকে রক্ষা করিলেন। সকলের ভোজনের পর যখন আরম্ভা খাওয়ার ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, তখন সকলে তাঁহার এইরূপ বিশ্বাসের আচরণে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। আমরাও তাঁহার সে সময়ের উপস্থিত বুদ্ধি ও কার্যের দৃঢ়তা শ্রবণ করিয়া অবাক হইতেছি। তিনি অতি অল্প বয়সে এতদূর আত্মশাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই উক্ত কালে বাহা ধরিয়াছেন তাহাই সম্পন্ন করিতে—তাহাতেই কৃতকার্য হইতে পারিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিতে গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কি এক আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি ছিল* যে, যিনি একবার তাঁহাকে দেখিতেন, একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, যিনি কয়েক দিন তাঁহার সহিত বাস করিতেন, তিনি আর তাঁহাতে (ঈশ্বরচন্দ্রেতে) আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না! সে সময়ে সংস্কৃত কালেজে যাঁহারা অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রনির্কীর্ণে ব্লেহ করিতেন ও তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেন। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, সুরেন্দ্র রামচন্দ্র বিভাবাগীশ, হরনাথ তর্কভূষণ, শঙ্কুচন্দ্র বাচস্পতি, সুবিখ্যাত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ একবাক্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্বিন্ন তাঁহার সমসাময়িক ও তাঁহার পূর্ববর্তী ছাত্রমণ্ডলী তাঁহাকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছাত্র জানিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। ইহা ছাড়া যখনই কোন সম্ভ্রান্ত লোক কিংবা কোন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তাঁহার সহিত পরিচিত হইতেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চম্ভেষ্ঠ প্রীতি-স্বত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন।* বেদান্ত শ্রেণীতে পাঠকালে অধ্যাপক শঙ্কুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় বয়সে প্রবীণ হইলেও ঈশ্বরচন্দ্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া দিন দিন নিরতিশয় মেহ-স্বত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বয়সে প্রবীণ কেন প্রায় হবিরহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিজের স্নান, আহার, আচমন ও শোচ প্রভাবের জন্ত লোকের সহায়তা

* এই বিবরণ সংগ্রহে শ্রীযুক্ত শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্নের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

আবশ্যক হইত। মেহানুগত ও উপযুক্ত ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র পুত্রহানীর হইয়া অনেক সময়ে বাচস্পতি মহাশয়ের সেবা করিতেন। এই জন্ত তাঁহার প্রতি গুরু পুত্রাদিক বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। সংসারের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কার্যে উপযুক্ত সন্তানের সহিত পিতা যেক্রম পরামর্শ করিয়া থাকেন, বাচস্পতি মহাশয়ও ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তক্রম আচরণ করিতেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া অধ্যাপক মহাশয় প্রায় কোন কাজই করিতেন না। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যখন এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন বাচস্পতি মহাশয় পুনরায় দাবপরিগ্রহের মানস করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের অভিপ্রায় বিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, দেখ, সংসারে আমার কেহই নাই। বড় কষ্ট পাইতেছি। লোকে বলে এত কষ্ট ভোগ না করিয়া পুনরায় দাবপরিগ্রহ করিলেই সকল অসুবিধার অবসান হয়, বিশেষতঃ অনেকগুলি বড়লোক এ কার্যে উজোগী হইয়াছেন এবং একটি সুস্বভাবা, বয়ঃস্থা ও সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গিয়াছে। এখন তোমার মত হইলেই বাবা, আমি এ কার্যে অগ্রসর হইতে পারি। ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে সমস্ত কথা শুনিলেন এবং মনে মনে বৃদ্ধ শিক্ষকের এই অসঙ্গত প্রস্তাবের, এই ধর্ম-বিগর্হিত সঙ্কল্পের স্বপক্ষে বলিবার কোনও কথা আছে কি না, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু গুরু এই নির্যম ও স্বার্থক প্রস্তাবের অসুস্থলে সামান্য প্রয়োজনীয়তাও দেখিতে পাইলেন না। তখন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক স্বাধীন প্রকৃতির অনুযায়ী অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, আপনাব এই বৃদ্ধ বয়সে আর নতুন সংসার করা কখনই কর্তব্য নহে। আপনার আর অধিক দিন বাচিবার সম্ভাবনা নাই।* বিবাহ করিয়া একটি নিরপরাধা বালিকাকে চিরহঃখিনী করিবেন না। বিবাহ দূরে থাকুক, বিবাহের চিন্তাতেও আপনাতে পাপ স্পর্শিবে। সর্প সর্পনে প্রাণ-ভয়ে ভীত ব্যক্তি যেমন দূরে পলায়ন করে, বাচস্পতি মহাশয়ও ঈশ্বরচন্দ্র হইতে সেইরূপ দূরে পলায়ন করিতে করিতে বলিলেন, “লাটু বাবুর চেয়ে উনি বেশী বুঝেন।” ঈশ্বরচন্দ্র নীরবে দণ্ডায়মান। গুরু পুনরপি অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাত চুখানি ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কাদ কাদ স্বরে নিজের অসুবিধার কথা বার বার বলিলেও হিমায়নসম্ভ

অটল বিভাগাগর হিরচিত্তে ও শাস্তভাবে পূর্ববৎ নিজের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, তৎপরে তিনিও বার বার মিনতি পূর্বক অমুরোধ করিয়া কোন ক্রমেই বাচস্পতি মহাশয়কে এরূপ অস্ত্রায় অনুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। বাচস্পতি মহাশয় পরলোকগত রামহুলাল সরকারের বংশধর ছাত্তাবু ও লাটুবাবুদের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং ছাত্তাবু ও লাটুবাবু ও নড়াইলের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু রামরতন রায়ের উজোগে বারশতনিবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরমাম্বন্দরী বালিকার সহিত বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ের দার পরিগ্রহ কার্য সম্পন্ন হইল। ঈশ্বরচন্দ্র এই ঘটনায় দাক্ষণ মন্দ-পীড়া পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তও হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্নেহাধিক্য নিবন্ধন একেবারে সম্বন্ধহীন হয় নাই। একদিন বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন :— “ঈশ্বর, তোমার মাকে একদিনও দেখিতে গেলে না?” ঈশ্বরচন্দ্র এই বাক্য শুনিয়া অজস্রধারে অশ্রুপাত করিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। পরে বাচস্পতি মহাশয় একদিন বলপূর্বক ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। ঘাইবার সময়ে তিনি সংসৃত কালোজের দ্বারবানের নিকট হইতে ছুটা টাকা লইয়া গেলেন। উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বালিকার চরণপ্রান্তে টাকা ছুটা রাখিয়া সম্বরপদে বাহির বাটাতে আসিতেছিলেন, এমন সময় বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, “তোমার মাকে দেখিয়া যাও।” এই নলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন, তখন বাচস্পতি মহাশয়ের নববিবাহিত পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীহানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও সেই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি বালকের শ্রায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয় “অকলাণ করিস্ না রে” বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহির বাটাতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অমুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণজুলা কঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন :—“এ ভিটায় আর

কখনও জলস্পর্শ করিব না।” বলা বাহুল্য যে এই ঘটনার কিছুকাল পরে বাচস্পতি মহাশয় অগ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা পত্নীকে বৈধবায়জ্ঞাণা ভোগ করিতে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন।*

ঐশ্বরচন্দ্রের হৃদয় কেমন কোমল ও কিরূপ পরহৃৎকাতর ছিল, তাহা এই একটা ঘটনার দ্বারা সুন্দররূপে অঙ্গুভব করিতে পারা যায়। তিনি যে উদ্ভবকালে বালিকা বিধবাগণের বিবাহের জন্ত তাঁহার সর্ব্ব্ব পণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই অমুঠানে রত ছিলেন, কে বলিতে পারে যে ব্রহ্ম বাচস্পতি মহাশয়ের এই অমুঠান তাঁহার অন্তরে অবলাকুলের কল্যাণ কামনার উদ্বেক করিয়া দেয় নাই? যে ব্যক্তি একটা বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের দ্বার রোদন করিয়াছিলেন, সে সময়ের ঐ প্রকার শত শত অমুঠান যে তাঁহার চিন্তা আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তিনি যে ক্রমে ক্রমে অসহায়্য অবলাগণের পরম বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মত হৃদয়বান লোকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহার কৰ্ম্মক্ষেত্রে গঠনের পক্ষে এই ঘটনা এবং এইরূপ আরও অনেক ঘটনা বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

পরলোক গমনের কিছুকাল পূর্বে, বিভাগাগর মহাশয় আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, পঠদশায় যখন সময় সময় বাটী গমন করিতেন, তখন বিধবা-জীবনের শোকপূর্ণ হৃদয়বিদারক ঘটনাসকল শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় তালিয়া যাইত। একবার গৃহে গিয়া শুনিলেন, তাঁহাদের পরিচিত কোন সম্ভ্রান্ত গৃহের বিধবা কস্তা সকলের অজ্ঞাতসারে কলঙ্কের পথে পদার্পণ করে। ইহার কলম্বরূপ যখন তাঁহার সম্ভ্রান্ত-সম্ভ্রান্তনা হইল, তখন পিতা মাতা, মানসম্মত ও জাতি রক্ষার জন্ত বৎপরোনাস্তি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এরূপ অবস্থায় সচরাচর যে সকল উপায় অবলম্বিত হওয়ার সম্ভ্রান্তনা, এখানেও তাঁহার বিধিমত চেষ্টা

* এই বিবরণ বিভাগাগর মহাশয়ের লোকান্তরগমনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী হিতবানীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাক্তার অমূল্যচরণ বহু মহাশয় ঐ বিবরণের সম্বলক। ঐহুত শত্ৰুচন্দ্রের সংগ্রহেও ইহার উল্লেখ আছে।

† এখানে বিভাগাগর মহাশয় যে পদটি ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

হইরাছিল, কিন্তু কোন চেষ্টায় আশারূপ ফললাভ না হওয়াতে, যথাকালে সেই হস্তভাগিনী বিধবা এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল এবং আত্মীয় স্বজন ও সামাজিকগণের উৎসাহিত ভয়ে ভীত গৃহকর্তা ও গৃহিণী, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে সেই সন্তঃপ্রসূত শিশুকে হত্যা করিয়া কুল মান রক্ষা করিলেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় যখন এই ঘটনার উল্লেখ করিতেছিলেন, যখন তিনি বলিতেছিলেন যে রাক্ষসী গৃহিণী স্তিকা-গৃহে স্বহস্তে সেই নিরপরাধ শিশুকে টিপিয়া মারিয়া ফেলিল, তখন তাঁহার চক্ষের জল ও মুখের লালা মিশ্রিত হইয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত করিতেছিল। সহসা মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, মনের মানি ও যন্ত্রণার পরিচায়ক উদ্বেজনা তাঁহার সমগ্র শরীরে প্রকাশ পাইল। অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রুজল মোচন করিয়া শেষে পরিধেয় বস্ত্রে মুখ মুছিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি! একি মানুষের দেশ? মানুষের দেশ হইলে, এত দিন ইহার প্রতিবিধান হইত।”

ইহা হইতে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ছাত্রাবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই এই সকল কঠিন সামাজিক প্রশ্ন ও নানা প্রকার দেশহিতকর কার্যের সম্বন্ধ তাঁহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে স্থান পাইতেছিল বলিয়া, তিনি সে সময়ে আদৌ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। কেবল পিতা পাছে ক্ষুধ হন, এই ভয়ে স্বিকৃতি না করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইরাছিলেন। এ ঘটনা হইতেও আমরা অতি পরিকাররূপে অনুভব করিতে পারিতেছি যে, পঠদশাতেই এই সকল সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচারের দৃষ্ট তাঁহার কোমল অন্তরে আঘাত করিত এবং তিনি এই সকল অনিষ্টের প্রতিবিধানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

তাঁহার সমাজের প্রবহমান প্রোত্তের গতি কিরাইতে, সমাজের মনীকৃত গতি খরতর করিতে, সমাজ-প্রোত্তের আবর্জনা সকল উত্তোলন পূর্বক দূরে নিক্ষেপ করিতে বন্ধপরিকর হন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ভাবী কার্য-কলাপের দীক্ষাশুরূপে এক, ছই, তিন বা ততোধিক ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সংসারজীবনের অসারতা, মানবদেহের ক্ষণভঙ্গুরতা ও জীবিবহ দারিদ্র্য সন্দর্শনে মহাযোগী শাক্যসিংহের বৈরাগ্যের সূচনা হইতে এইরূপ একাধিক

দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভক্তাপ্রাণা জীবেতত্ত্বের ধর্মজীবনের সূচনার জন্য একাধিকবার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। ধর্ম ও সমাজসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন রায় যে সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যে প্রথা নিবারণের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিডিকাউশিলে আগিল হইলে পর, তাহার ফলাফল স্বচক্ষে দর্শন করিতে এবং প্রয়োজন হইলে সতীদাহ নিবারণের পক্ষে শাস্ত্রের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে এবং অন্য বিবিধ উপায়ে আত্মগত সমর্থন মানসে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টার অল্প কিশোরবয়স্ক রামমোহনের প্রাণে স্থান পাইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ সহোদরের অকালমৃত্যুতে তাঁহার অল্পবয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃবধূর সহমরণের ভীষণ দৃষ্টে, সেই বালিকার আত্মনাশ ও প্রাণ-রক্ষার আকিঞ্চন দেখিয়া তাঁহার প্রাণে গভীর ক্ষোভ ও দারুণ যন্ত্রণার আগুন জলিয়াছিল। তিনি সেই ক্ষিপ্রচরণ দর্শনে কাতর হইয়া এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, এই কুপ্রথার প্রতিবাদ করিতে এবং সুবিধা হইলে, ইহা রহিত করিবার চেষ্টা করিতে প্রাণপণ করিবেন।*

ঈশ্বরচন্দ্রের যৌবনসমাগম হইতে না হইতে, তাঁহার বিভাগশিক্ষার পরিসমাপ্তি হইতে না হইতে, তাঁহার কোমল প্রাণে বালবৈধব্যের ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল এবং তিনি উত্তরকালে যে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে, তুফল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সমগ্র বঙ্গসমাজ কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহার প্রথম অল্প এই বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ের বালিকা-পত্নীর অকাল বৈধব্য ও তাহার আত্মবল্লিক পরিণাম চিন্তার অনুরূপ হইয়াছিল। পরবর্তী ঘটনা সকল কেবল তাহার সহায়তা করিয়াছিল মাত্র। ইহাই সম্ভব ও সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অনেকের এরূপ ধারণা যে তাঁহার জননীর অনুরোধ ক্রমে তিনি প্রথমে এ বিষয়ের চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ লেখকের ‘মা ও ছেলে’ নামক গ্রন্থে তাঁহার সেই পুণ্যবতী জননী ভগবতী দেবীর পবিত্র চরিত-কাহিনী সম্বন্ধে

কয়েকটা আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে। বিভাসাগর মহাশয় নিজে সেগুলির প্রকৃৎ দেখিয়া দিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ে তাঁহার জননীর কতটুকু সম্বন্ধ ছিল, তাহাও প্রসঙ্গক্রমে সেখানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জননীর অনুরোধের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনি নিজ হৃদয়ের উদ্বেজনা-প্রণোদিত হইয়াই এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারই পূর্ণ আভাস পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে তিনি জনকজননীর পূর্ণ উৎসাহ ও সহায়ত্ব পাইয়াছিলেন।

জ্ঞান ও দর্শনের শ্রেণীতে যখন তিনি পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময়ে দুই মাসের জন্ত ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের উপযুক্ততা স্বরণ করিয়া কালেক্টর অধ্যক্ষ তাঁহাকেই দুই মাসের জন্ত সেই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক চল্লিশ টাকার হিসাবে দুই মাসে আশী টাকা পাইয়া পিতার হাতে দিয়া বলিলেন “এই অর্থ ব্যয়ে আপনি তীর্থ পর্যাটনে গমন করুন।” পুত্রের এতাদৃশ পিতৃভক্তি ও তীর্থ পর্যাটনে অনুরাগ দেখিয়া পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপরাপর সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পিতা, পুত্রের অনুরোধমত ঐ অর্থ ব্যয়ে পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়া যাত্রা করিলেন।

পিতৃদেব তীর্থ পর্যাটনানন্তর জলপথে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া একশত টাকা, সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা রচনার জন্ত একশত টাকা, আইন পরীক্ষার পুরস্কার পচিশ টাকা এবং উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষরের পুরস্কার আট টাকা, সর্বমুগ্ধ মোট ২৩০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই টাকা পিতার হাতে দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে বলিলেন। চারি বৎসরে দর্শনশাস্ত্রের শ্রেণীর শেষ বড় দর্শনের পরীক্ষার বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়া প্রতিপত্তিভাজন হইলেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছিলেন, “এতাদৃশ মেধাবী ও অদ্ভুতকর্মী ছাত্র আর কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই। ইহাকে পড়াইবার জন্ত দর্শন শাস্ত্রে আমার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত, পড়াইবার সময় বোধ হইত যেন ঈশ্বর কতকাল পূর্বে ঐ সকল শাস্ত্র বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন।” এক্ষণে পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন, ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্ররূপে কিরূপ প্রতিভার পরিচয়

নিরাহিলেন! তাঁহার গুণপনা, এবং বিভাচুর্নীলন শক্তির বিচিত্রতা
 নর্ণন করিয়াই তাঁহার শিক্ষক অধিতীয় নর্ণনশাস্ত্রবেত্তা জরনারায়ণ তর্কগণকানন
 মহাশয় ঐরূপ মহামূল্য অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। অনেকের ঐরূপ
 ধারণা যে, পাণ্ডিত্যবিষয়ে বিভাগাগর মহাশয়ের সমসাময়িকদিগের মধ্যে
 অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গণিত ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর
 প্রথম হইতে শেষ পরীক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইয়া পরিশেষে সর্ববিভাগ
 বিশারদ হইতে ঐরূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভাগাগর
 মহাশয় সংস্কৃত বিভাগ সকল বিভাগেই সমানভাবে সর্বোচ্চস্থান অধিকার
 করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কোন এক বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া
 লোকের নিকট পরিচিত হন নাই। কোন এক বিষয়ে বিশেষ ভাবে পারদর্শী
 হওয়ার অর্থ এই যে, অন্যান্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ। বিভাগাগর
 মহাশয় সম্বন্ধে ঐরূপ বৃত্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। তাঁহার ছাত্রজীবনের
 কীর্তিকলাপ লোকের পরিজ্ঞাত না থাকায় বোধ হয় সাধারণ লোকে ঐরূপ
 মনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমাদের ধারণা তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত।
 কারণ পরম্পরপ্রমাণ বাধা বিয় উপেক্ষা করিয়া, বর্ণনাতীত দুঃখ কষ্ট সহ
 করিয়া, সকল বিষয়ে সমান অতুরাগ প্রদর্শন করিতে ও প্রত্যেক বিষয়ে
 সম্পূর্ণরূপে সকলকাম হঠতে পাবা, কেবল লোকবিরল-গুণসম্পন্ন ও প্রতিভা-
 শালী ব্যক্তির গণকেই সম্ভবিত্তে পারে। কেহ ব্যাকরণে, কেহ সাহিত্যে,
 কেহ ন্যারে, কেহ বা নর্ণনশাস্ত্রে, আর কেহ বা ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠান লাভ
 করিয়া নিজ নিজ অধীত বিভাগ গণনীয় ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু যিনি
 এই সকল বিষয়ে সমভাবে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন, তাঁহার
 সম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত দিবার পূর্বে বিশিষ্টরূপে চিন্তা করা আবশ্যিক।
 চতুর্থ বিষয় সেরূপ সম্ভবতাসহকারে চিন্তা করিয়া ঐরূপ গুরুতর বিষয়ে
 মতামত দেওয়ার অভ্যাস আমাদের নাই। বুদ্ধি, আর না বুদ্ধি, অল্প সময়ে
 অধিক কথা বলিয়া বহুদর্শিতার পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রকৃতি-
 গত হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই আমরা অনেক অসম্ভিজ্ঞ লোকের মুখে
 ঐরূপ কথা শুনিয়াছি। কিন্তু আমাদের ধারণার গণকে তদানীন্তন
 সংস্কৃত কালেজের কর্তৃপক্ষগণ ও শিক্ষকমণ্ডলী সমবেত হইয়া সাক্ষ্য দিতেছেন।

কর্তৃপক্ষীরেরা বিভাগাগর উপাধিসহ যে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল। অধ্যাপকগণ সকলে মিলিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে যে প্রশংসা-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এখানে তাহারও প্রতিলিপি প্রদত্ত হইতেছে :—

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগরার প্রশংসাপত্রঃ দীযতে । অসৌ কলিকাতারঃ শ্রীমুতকোম্পানিসংস্থাপতিবিত্তামন্দিরে ১২ ষাদশ বৎসরান ৫ পঞ্চমাসাংশোপহারাধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান ।

| | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|---------------------------|
| ব্যাকরণম্ | ... | .. | . | শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মতিঃ |
| কাব্যশাস্ত্রম্ | | .. | ... | শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মতিঃ |
| অলঙ্কারশাস্ত্রম্ | .. | | ... | শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মতিঃ |
| বেদান্তশাস্ত্রম্ | .. | .. | ... | শ্রীশত্ৰুচন্দ্র শর্ম্মতিঃ |
| ন্যায়শাস্ত্রম্ | ... | ... | .. | শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মতিঃ |
| জ্যোতিঃশাস্ত্রম্ | .. | .. | .. | শ্রীযোগদ্যান শর্ম্মতিঃ |
| ধর্ম্মশাস্ত্রম্ | ... | | .. | শ্রীশত্ৰুচন্দ্র শর্ম্মতিঃ |

স্বশীলতরোপস্থিতৈস্ততস্ত্রৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট । ১৭৬৩
এতচ্ছকাকীর সৌরমার্গশীর্ষস্ত বিংশতি দিবসীয়ং ।

10 December, 1841.

(Sd.) RASOMAY DUTTA,

Secretary.

সকল শ্রেণীর অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির শিক্ষকপদবাচ্য হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধ্যাপিত বিজ্ঞার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত এবং ইহারা সকলে সমবেত হইয়া যে একবিংশতি বর্ষ-ব্যস্ত যুবককে বিভাগাগর উপাধি প্রদান পূর্বক সাদরে বরণ করিয়াছেন, ইহায় দ্বারা এইরূপ বুঝায় যে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার বিশেষত্ব ছিল, সকল বিষয়েই তিনি 'সুগভীর সাগরসদৃশ অতলসম্পর্শ ছিলেন। পূর্বত প্রমাণ বাধা বিয়ের সহিত, বীরোচিত সংগ্রাম সহকারে অধ্যয়নে এতাদৃশ অক্লান্ত্য প্রদর্শন, দরিদ্র বস্তুর প্রত্যেক ছাত্রের অক্লান্ত্যের। অতুতকল্পা বিভাগাগর

মহাশর নিষ্ঠাসহকারে ব্রহ্মচর্যব্রতধারী হইয়া ছাত্রজীবন বাশন করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রজীবন কঠোরতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও ত্যাগবীকারের অত্যাচ্ছল দৃষ্টান্তহল। এতাদৃশ গুণবান বালক যে গৃহে লালিত পালিত হইয়া-
ছিলেন সে গৃহে এতোকেরই ব্রুথ উচ্ছল হইয়াছে, যে দেশীয় বালকনওলী
বিভাগাগর মহাশয়ের ছাত্রজীবনের অনুসরণ করিয়াছে, সে দেশের সোভাগোর
সীমা নাই। যে বিভাগরে তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে বিভাগরের
অস্তিত্ব সক্ষম হইয়াছে। বীরসিংহের কালীকান্ত গুরুমহাশর হইতে মহামহোপাধ্যায়
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশর পর্য্যন্ত সকলেই বিভাগাগর মহাশরের শিক্ষাগুরু-
বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন, ইহা
অপেক্ষা ছাত্রজীবনের উচ্চতম স্নাধার বিষয় আর কি হইতে পারে!

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃতকালেজে প্রবেশ করেন, তখনও
ইংরাজী শিক্ষার সূচ্রচার সাধিত হয় নাই। কলিকাতা ও তন্নিকটবস্তী
বহুসংখ্যক সন্ন্যাস লোক সমবেত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর অনুকরণে
এদেশীয় বালকগণকে শিক্ষা দিবার সূচনা করিতেছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের
২০শে জানুয়ারী সোমবার দিবস গরানহাট্টার গোরাটান বসাকের বাড়ীতে
প্রোতঃস্বর্গীয় বেয়ার, হারিঙটন ও স্তর হাউড্‌ ইষ্ট প্রকৃতি স্কুলদর ইংরাজমওলী
ও বহুসংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আগ্রহে হিন্দুকালেজের সূত্রপাত
হইলেও, ইহার স্থায়িত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল, কারণ তখনও
গবর্ণমেন্ট ইহার উন্নতিকল্পে কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই এবং
উদ্যোগকর্তারাও সে পক্ষে কোন চেষ্টা করেন নাই। এক সময়ে অর্থাভাবে
হিন্দু কালেজ যখন অতীতের স্মৃতিমাত্রে পরিণত হইতে দাটাইতেছিল, অগচ
অপরপক্ষে গবর্ণমেন্ট কেবল সংস্কৃত কালেজের প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা বিষয়ে
আপনাদের কর্তব্যের পরিসমাপ্তি সাধনে উচ্ছত হন, তখন মহারাজা রাজা
স্বামিনোহন সায়ের আবেদনে ও ডাক্তার হোরেল হেম্যান উইলসনের চেষ্টায়
গবর্ণমেন্ট শিক্ষা বিষয়ে নূতন ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।
অবশ্য বেয়ার, রকস্‌মির পঞ্চাতে থাকিয়া বিবিধ উপায়ে সহায়তা করিতে-
ছিলেন। এমন কি তাঁহার প্রাপণ্য চেষ্টা ও উচ্চমতি থাকিলে, বর্তমান
শিক্ষার প্রোতঃ বহুদূর পঞ্চাতে পড়িয়া থাকিত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১,২৪,০০০

টাকা ব্যয়ে, হেয়ারপ্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে সংস্কৃত ও হিন্দুকালেজের বাটীর নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দু স্কুলের বাটীর নির্মাণকার্য শেষ হইলে পর, ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়বিধ বিদ্যালয়ই ঐ বাটীতে স্থাপিত হইল। কিন্তু তখনও অর্থাতাবে হিন্দু কালেজ সময়ে সময়ে নির্মাণপ্রায় হইয়া পড়িতেছিল। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া কালেজের অতিভাবকগণ গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন প্রেরণ করিলেন। শিক্ষাসম্বন্ধীয় নীতির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া, কেবল গবর্ণমেন্ট-প্রদত্ত অর্থের সম্মার সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি রাখিবার অধিকার দিয়া, কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্য লওয়া স্থির হইল। সুতরাং এই সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজী শিক্ষার সুপ্রচার কেবল আরম্ভ হইল বলা গাইতে পারে।

খনচাঁচর মধ্যরজনীর ঘোর অন্ধকারে সুস্থতির সুনিষ্ঠ জোড়ে শায়িত লোকমণ্ডলী সহসা বজ্রার জলে ভাসিলে যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম বজ্র-প্রবাহেও ঠিক তদনুরূপ ব্যাপার ঘটয়াছিল। নতুন ভাব ও নতুন চিন্তার স্রোতঃ বিজ্ঞানের জার তীব্রতাজে চারিদিক চমকিত করিয়া ছুটিল, নব্যালোকে নবাসম্প্রদায় দিশাহারা হইয়া চারিদিকে ছুটছুটি করিতে লাগিলেন। যুবক ফিরিজী-শিক্ষক ডিরোজিও এই নব্য বজ্রের হীরা-গুরু। রুকমোহন বন্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মর্কিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাখানাথ সিকদার মাধবচন্দ্র মল্লিক, গ্যোবিন্দ বাসক প্রভৃতি সে সময়ের যুবকমণ্ডলী চিন্তা ও ভাব বিষয়ে বর্তমান বজ্রের শিক্তানীয়। ডিরোজিওর সহায়তা, বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের মধুর আকর্ষণে বহুসংখ্যক যুবক সমবেত হইয়া, একাডেমি নামক সভার, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব ও অল্প নানাবিধ আলোচনার আপনাদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ডেভিড হেয়ার সর্বদা ঐ সকল আলোচনার যোগদান করিতেন। সময়ে সময়ে গবর্ণর জেনারেল বৈদ্যিক মহোদয়ের আইডেট সেক্রেটারী কর্ণেল বেনসনও সভার উপস্থিত হইয়া উপদেশ ও উৎসাহদানে

* Accounts taken from the Biography of David Hare by Pyari Chand Mittra.

সভ্যদিগকে অহুগৃহীত করিতেন। সে সময়ের প্রবীণ সামাজিকগণের ভর ও ভাবনাজনিত উৎসাহে, এই নূতন চিন্তাস্রোতঃ ভীষণ তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেক ইহার গতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহারা তদ্বারা তাঁহাদের আশার বিপরীত ফলদর্শনে ভীত হইয়া ক্রমে নীরব হইলেন। সর্বপ্রথমে তাঁহারা এই নূতন শিক্ষার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই বিভাগসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক। তিনি যখন বিভাগরে, তাঁহারাও তখন বিভাগরে। তিনি সংস্কৃত কালেজ এবং উপরোক্ত মহোদয়গণ হিন্দুকালেজে লেখাপড়া শিখিতেছিলেন। সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দু কালেজ একই গৃহে অবস্থিত ছিল। সুতরাং ইহাদের অনেকের সঙ্গিত বিভাগসাগর মহাশয়ের যে সখ্য জন্মিবে, ইহাই স্বাভাবিক। রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারত্ন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেকের সঙ্গিত তাঁহার বিশেষ আদ্যোঁত জন্মিয়াছিল। বিভাগসাগর মহাশয় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিভাগর ত্যাগ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বাঙ্গালী ছাত্রমণ্ডলীর পরম স্নেহে ডেভিড্ হেয়ার লোকান্তরিত হন। তাঁহার বিয়োগে সমগ্র কলিকাতাবাসী লোকমণ্ডলী শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার স্মরণার্থে যত প্রকার আয়োজন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রতিবৎসর তাঁহার মৃত্যুদিনে শিক্ষিতমণ্ডলীর একটা সভা এ কাল পর্য্যন্ত আহূত হইয়া আসিতেছে। বিভাগসাগর মহাশয় বঙ্গবাক্য পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক সময়ে, হেয়ার স্মরণার্থ সভার উপস্থিত থাকিতেন। বিভাগর হঠাৎ বিদায় লইবার সময়ে, উৎকৃষ্ট ইংরাজী ভাষা, তাঁহার সম্পূর্ণরূপে আরম্ভ না হইলেও, বহুল পরিমাণে ইংরাজী ভাষা ও চিন্তার সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, একথা বলা বাইতে পারে এবং নিজেও ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া বিভাগর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। এক দিকে অঙ্গ বিশ্বাসের অধীন হইয়া আপনার ভাগ্যের নিলা করিতে করিতে লোক অলসভাবে দিনযাপন করিতেছিল, আর এক দিকে, নূতন ভাব ও নূতন উদ্ভাবের ধরতর স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া সে সময়ের বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীকে কোথায় কোন অজ্ঞাত পথে লইয়া চলিয়াছিল ;

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, কর্মক্ষেত্রের স্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নব্য বিদ্যাাগর দেখিলেন, এক পার্শ্বে আবর্জনাপূর্ণ অঙ্গলময় বনভূমি বহরত্বের আকর হইয়াও অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দৃঢ় নিগড়ে পরিবেষ্টিত, অপর পার্শ্বে বিচিত্র দৃষ্ট তায়কাবলী-প্রতিবিম্বিত সলিলোচ্ছ্বাসপূর্ণ বারিধিবন্ধঃ সুপ্রসারিত হইয়া তাঁহার হৃদয় মন আকৃষ্ট করিতেছে, কিন্তু কত ভীষণকার্ত্তিমি ও মকর সে জগতলে লুকাইয়া রহিয়াছে, বিদ্যাাগর মহাশয় এই উভয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দিবা-নেত্রে তাঁহার ভাবী সম্বন্ধের পথ দেখিতে পাইলেন; তাঁহার মানস-নেত্র তাঁহাকে এই উভয়বিধ বাধা বিয়ের মধ্যে সর্বদা সুপথ দেখাইয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সংমিশ্রণে তাঁহার নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া গেলেন। তিনি প্রাচ্য কুসংস্কার ও পাশ্চাত্য আড়ম্বর পরিহার করিয়া নিষ্ঠাবান ও কঠব্য-পরায়ণ বীরপুরুষের উপযোগী পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার সংযোগে যে কি মহাশূন্য সম্পদের অধিকারী হইতে পারা যায়, বিদ্যাাগর মহাশয় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি উভয় শিক্ষার মঙ্গলভাগ পরিত্যাগ করিয়া, বস্ত্রোত্তোলন দ্বারা তাঁহার জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া আমাদের সম্মুখে বর্তমান সময়ের জীবন-সমস্তার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। * তিনি যেকোন বিবিধ গুণের অধিকারী হইয়া কর্মক্ষেত্রের স্বারদেশে দণ্ডায়মান হন, তৎসম্বন্ধে বহুসম্মানান্বিত ত্রীমুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. এস. সি, আই, ই মহাশয় যেকোন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিদ্যাাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়চরিত্ত পরিসমাপ্ত করিলাম :—

“ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি সকলের ঘটে না। ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞান ওজস্বিতা, মানসিক বল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সকলের সম্ভবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞান অগত্যাগ্রাহী সহদয়তা, বদান্ততা ও উপচিকীর্ষাও সকলের হইয়া উঠে না। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া আমরা বোধ হয় একটু সোজাপথে চলিতে শিখিতে পারি,—একটু কর্তব্য অমুষ্ঠানে টলান করিতে পারি,—একটু ভগ্নানি ত্যাগ করিতে পারি। যেটা সমাজের উপকারী, যেটা প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মের অভিমত, সে প্রথাটি যেন ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিতে শিখি।”*

পঞ্চম অধ্যায় ।

কৰ্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ।

এতদিন আমরা বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। তাঁহাকে বাল্যকালে ভরানক হরস্ত দেখিলাম, বিদ্যালয়ে ছাত্রবেশে তাঁহাকে আদর্শ বালক দেখিলাম। তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণায় পরিতুষ্ট হইয়া সকলেই ধস্তা ধস্ত করিয়াছেন। কিন্তু এতাবৎকাল তাঁহার জীবনঙ্গীকার কেবল প্রথমোক্তমাত্র দেখিতে পাইরাছি, এখনও তাঁহার জীবন-পুষ্প অগ্রক্ষুটিত মুকুলসদৃশ। কিন্তু সেই ক্ষুটনোমুখ পুষ্প-কোরক সোবভে চারিদিক আমোদিত হইলেও, তিনি তখনও বালক। বিদ্যার্থী বালক যাহা করিতে পারে, তিনি তাহার অভুলনীর দৃষ্টান্ত পশ্চাতে রাখিয়া জীবনের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কৰ্মক্ষেত্রে বারদেখে দণ্ডায়মান। তাঁহার জীবনের যে বিভাগে ঘটনার বৈচিত্র্য ভাগ্যস্বীকারের অভাবনীর দৃষ্টান্ত, লোক-সেবার অক্ষয়কীর্তি ও দেবদ্রষ্ট প্রেমের ধনবর্ষণ, সফলতা লাভ করিয়াছে, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও নির্ভীকতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা এক্ষণে তাঁহার জীবনচরিত্রের সেই দিকে অগ্নে অগ্নে অগ্রসর হইতেছি। এই অংশেই বাঙ্গালী-জীবনের অবল্য রত্ন সকল লুপ্তায়িত আছে। ইহারই মধ্যে বর্তমান মুহূর্ত ও মৃতকর বাঙ্গালী জীবনের মৃতসজীবনী অমৃতকণা সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। হৃৎক এই যে, আমাদের ভ্রাতৃ অনুপস্থিত লোকের অকিঞ্চিৎকর আকিঞ্চমে সেই সকল রত্নকণা সংগৃহীত ও স্নানরূপে ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। আমাদের অপেক্ষা উপযুক্ততর লোকের হস্তে এই দেববাহিত পারিজাত-পরিমলপূর্ণ কুসুমনিচয়ের চরনভার স্তম্ভ হইলে, আমি না তদ্বারা তাঁহারা কি চিত্তবুদ্ধকর

পুস্তকমালা রচনা করিয়া বাঙালী সাহিত্যের অনুগম শোভা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইতেন। বঙ্গসম্মানদের কর্তে সে অতুলনীর সৌন্দর্যের আধার রত্নহার কি সুন্দর, সুখকর ও তৃপ্তিপ্রদ হইত, তাবিলেও অন্তরে সুখোদয় হয়; তাই এই বিদ্যাগাগর-বিয়োগকাতর বঙ্গসম্মানদের অন্তরে বিন্দুপ্রমাণ তৃপ্তি সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কেবল এই ভরসায় আমরা পূর্ণাবয়বসম্পন্ন বিদ্যাগাগর-চরিত অঙ্কনে অনুপস্থিত হইয়াও, এই গুরুতর কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মার্শেল সাহেবের অধীনে বিদ্যাগাগর মহাশয় প্রথম চাকরি আরম্ভ করেন। মধুসূদন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে তথাকার প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। উক্ত পদপ্রত্যাশায় অনেকে লাগান্বিত হইয়াছিলেন। এ দিকে বিদ্যাগাগর মহাশয় পাঠসমাপনান্তে কিছুদিনের জন্ত বীরসিংহ গমনপূর্বক বাটীতে জননীর নিকট সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। ইতিপূর্বে যৎকালে মার্শেল সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি ছাত্র বিদ্যাগাগরকে বিশেষরূপে জানিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অনন্তসাধারণ প্রমণীলতা, দুর্দমনীয় অধ্যবসায়, আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা, সুন্দর হস্তাক্ষর, রচনা-নৈপুণ্য এবং সর্ববিষয়ে সমান অনুরাগ দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি এই শূন্যপদে নব্য বিদ্যাগাগরকে নিযুক্ত করিবার মানসে সংস্কৃত কলেজে আসিয়া জয়নারায়ণ ভট্টপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট বালক ঈশ্বরচন্দ্রের সংবাদ লইয়া শুনিলেন যে, তিনি কলিকাতা হইতে বহুদূরে বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। মার্শেল সাহেব তখনই কোন প্রকারে তাঁহাকে সংবাদ দিবার উপায় করিতে বসিলেন। ভট্টপঞ্চানন মহাশয় বড়বাঝারে বিদ্যাগাগর মহাশয়ের পিতার নিকট লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহে গমন পূর্বক বিদ্যাগাগর মহাশয়কে কলিকাতায় আনিলেন। ঐ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাগাগর মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে, পরলোকগত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শূন্য পদে নিযুক্ত হইলেন। বিলাত হইতে আগত সিভিলিয়ানগণ এখানে দেশীয় ভাষা সকল শিক্ষা করিয়া পরীক্ষাদানান্তর কার্য্য প্রাপ্ত হইতেন। বাঁহারা দেশীয় ভাষার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হইতেন, তাহাদিগকে দেশে কিরিয়া রাইতে হইত।

বিলাতে সিভিলিয়ানমিগের জন্ত, এখনকার মত সেকালে প্রতিযোগী পরীক্ষার সৃষ্টি হয় নাই। তখন সিভিলিয়ানগণ হালিবারি কালেজে পাঠ করিয়া এখানে চাকুরি করিতে আসিতেন। ইহামিগের পরীক্ষার ভার বিভাগগর মহাশয়ের উপর অর্পিত ছিল। এই কালেজের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বেক্সপ দৃঢ়তা ও আগ্রহাতিশয় সহকারে কর্তব্য করিতেন, তাহাতে কর্তৃপক্ষ মার্শেল সাহেব দিন দিন তাহার প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া যাহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত, তাহাদিগের মনঃকোভের সীমা থাকিত না, তাই মার্শেল সাহেব বিভাগগর মহাশয়কে পরীক্ষার আটাআটি ভাবটা একটু কম করিতে বলিয়াছিলেন। তদন্তরে যুবক বিভাগগর অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রবীণ কর্তৃপক্ষ মার্শেল সাহেবকে বলিয়াছিলেন “ওটি আমাকে দিবে হবে না। না হয় চাকুরি ছাড়িয়া দিব, তবুও অস্ত্রের প্রশয় দিব না।” উক্তর কালে বিভাগগর মহাশয় যে অকুণ্ঠ-কর্ম্য বীরপুরুষে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহার সূচনা এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। গরিবের ছেলে, কল্লনাভীত দারুণ অভাবের মধ্যে জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর কাটিয়াছে, তাহার পর সেকালের পঞ্চাশ টাকার চাকুরি অস্ত্রের পক্ষে এক মহামূল্য সম্পত্তি হইলেও, তাহার নিকট ভগ্ন কাচখণ্ড অপেক্ষা অধিক মূল্যের বস্তু ছিল না। তিনি সাহেবকে অসম্বোধে বলিয়া দিলেন, বিন্দু প্রমাণ অস্ত্রের প্রশয় দিবার পূর্বে ‘ও ছাই ভস্ম’ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। মার্শেল সাহেব অতি সজ্জন ছিলেন, কেবল বিলাত হইতে চাকুরির প্রত্যাশায় এখানে আসিয়া ইংরাজের পক্ষে বিফলমনোরথ হইয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়া যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহাই স্বরণ করিয়া তিনি বিভাগগর মহাশয়কে ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পক্ষান্তরে বিভাগগর মহাশয়ের জ্ঞাননিষ্ঠা সন্দর্শনে তাহার প্রতি আরও অধিকতর অনুরাগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিভিন্ন ভারতবাসী প্রজামণ্ডলী ইংলেণ্ড গিয়া এরূপ কোন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, নৈরাশ্রের অন্ধকারে তাহার প্রাণ মন মলিন হইয়া যায়, আমাদের দেশের লোকের আর্তনাদে চারিদিক পূর্ণ হইয়া যায়, আর আমরা ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষগণকে কতই না দ্বিরঙ্কর করি। সাহেব

রাজার জাতি হইয়া, সেকালে আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ পূর্বক “সাত সমুদ্র ভের নদী পার” হইয়া ভারতে আসিয়া পরীক্ষার একজন হিন্দু অধ্যাপকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন এবং বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বিবেচনার অনুরোধ হইয়া সময়ে সময়ে সাহেবদিগকে সিবিগিয়ানী স্নেহে বঞ্চিত হইতেও হইত। ইংরাজ, বাঙ্গালীদিগের পরীক্ষা গ্রহণে জ্ঞানের অধীন হইয়া চলিতে পারেন, ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয়ের সমবেত পরীক্ষার বাঙ্গালীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে পারেন, কিন্তু কতটা সাহসী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ হইলে, সদাশয় মেলে বর্ণিত অধম বাঙ্গালী একপ নিতীকতার পরিচয় দিতে পারেন, পাঠক! একবার ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনুভব করিতে পারিবেন। যে স্বাধীন ভাব তাঁহার শৈশবের জীড়াকোড়কে, বালাকালের চপলতা ও দৌরাণ্ড্যে মুকুলিত হইয়াছিল, যাহা ছাত্ররূপে তাঁহাকে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী করিয়াছিল, সেট স্বাধীনচিত্ততাই তাঁহার কর্মক্ষেত্রে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

“কর্তব্য বৃথিব বাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা।” এই মহানত্রে লীক্ষিত হইয়া তিনি সংসারের পথে এক এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন আমরা দেখি, তিনি এই নীতির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়া উপস্থিত হন।

কল্প গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হইল। তিনি ইংরাজী ও তিন্দী উভয় ভাষা এককালে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কলিকাতার ভাগতলানিবাসী সুবিখ্যাত ডাক্তার হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি সর্বদা বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বাসায় আসিয়া নানা প্রকার আশ্রয় আশ্রয় কালান্তিপাত করিতেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় প্রথমে হুর্গাচরণ বাবুর নিকট ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইহাব পর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট কিছুদিন ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে তাঁহার সহিত গভীর আত্মীয়তার সূচনা হয়; এবং সেই আত্মীয়তা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পরস্পরের হৃদয় সরস করিয়াছে। ইহার পর কিছুদিন নীলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে ইংরাজী শিখাইয়াছিলেন। পরে তিনি রাজনারায়ণ গুপ্ত, নামক

জনৈক যুবককে ১৫ টাকা বেতনে ইংরাজী শিখিবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন। হিন্দী শিখিবার জন্য ১০ টাকা মাসিক বেতনে একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি অতি অল্প-কাল মধ্যেই ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ বাবু তখনও ডাক্তার হন নাই। তিনি সে সময় হেয়ারস্কুলে শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড রাইটারের পদ শূন্য হইলে, বিভাগসাগর মহাশয় মার্শেল সাহেবকে অহুরোধ করিয়া দুর্গাচরণ বাবুকে ৮০ টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। ঐ কক্ষে নিযুক্ত থাকিয়া দুর্গাচরণ বাবু মেডিকেল কালেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিয়া শেষে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিহারী মহাশয় বলেন, তাঁহাকে কলিকাতায় স্থায়ী করিবার জন্য বিভাগসাগর মহাশয় বথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবুও তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্যে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার লোক সেবাত্রত পালনে চির দিন সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। নীলমাধব বাবুও ডাক্তার হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বাঁহাদের জন্মগ্রহণে জনসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, বাঁহাদের বিচরণে ধরণীবন্ধ টলমল করিয়াছে, বাঁহাদের আবির্ভাবে সংসারের অবসন্নতা ও আবিলা ভাব বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই সামাজ্যতর অবস্থার জীবননাট্যের প্রথম অঙ্ক অতিবাহিত করিয়াছেন। সামান্য অবস্থার সামান্য আয়োজনে, জীবনের মহৎ কার্যের সূচনা করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মহাত্মা গারফিল্ড, কৃষকসন্তান। জীবনের প্রথমাবস্থায়, তিনি কৃষিকার্যে, কাঠ আহরণে ও জাহাজের সামাজ্যতর কার্যে অনেক সময় কেপণ করিয়াছেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন অবস্থাবৈশিষ্ট্যে নিজের প্রয়োজনীয় ব্রব্যাদির ভার নিজেই বহন করিয়াছেন। ফ্রান্সের লরার্ট নেপোলিয়ন প্রথমে সামান্য সৈনিকের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পান্ডাভ্যাসেনীর দৃষ্টান্তের বা উল্লেখের প্রয়োজন কি? ধর্ম ও সমাজসংস্কারক বান্দিবর কেশবচন্দ্র সেন প্রথমে ২০ টাকা বেতনে কেরানীর কার্যে নিযুক্ত

হইরাছিলেন। বীরপ্রকৃতিসম্পন্ন স্বাধীনচেতা পেট্রুয়ট-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথমে সামান্য কেরানীর কর্মে নিযুক্ত হইরাছিলেন। যে বিভাগাগর মহাশয় শ্রমলীলতা, সহিষ্ণুতা, কার্যকুশলতাগুণে আপনার প্রতিভার পরাক্রমে সমগ্র বঙ্গসমাজ চমকিত করিয়াছেন, তিনিও সামান্য ৫০ টাকা বেতনের কর্মে জীবনের মহাত্রুত উত্থাপনের প্রথম আয়োজন করিয়াছিলেন। বিভাগাগর মহাশয় দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান বলিয়াই আমাদের এত আদরের ধন। তিনি বর্ণনাতীত দুঃখ কষ্টের দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে পতিত হইয়াও শাস্ত্রভাবে জীবনের পথ অতিক্রম করিয়া অতুল কীর্তির স্মৃতি স্তম্ভ প্রাথিত করিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমাদের বিশেষ গৌরবের কথা। যে সকল পুণ্যবান সাধুগণের পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া আমরা আনন্দে দিশাহারা হই, নিশ্চয় তিনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতম। ইহাই আমাদের পরম ভ্রাতার বিষয় মনে করি।

বিভাগাগর মহাশয় কর্ম গ্রহণ করিয়া সর্বাগ্রে পিতাকে দেউ কঠোর শ্রমকর চাকুরি হইতে অবসর লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরদাস অন্যান্য লোকের পরামর্শের অধীন হইয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। নিজের শক্তি সামর্থ্য থাকিতে এক্ষণে পুত্রের অধীন হইতে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। শেষে পুত্রের নিরতিশয় অনুরোধ ও অনুরোধের বশবর্তী হইয়া কর্মত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করেন। কর্মত্যাগের সময়ে তাঁহার বেতন ১০ * টাকা ছিল। বিভাগাগর মহাশয় মাসে মাসে কুড়ি টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিভাগাগর মহাশয় চাকুরিতে প্রবিষ্ট হইয়া সর্বাগ্রে পিতার বহুদিনের ক্লেশ নিবারণে যে ব্যস্ত হইরাছিলেন, ইহাতেই তাঁহার পিতৃভক্তি বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠাকুরদাসের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, ছাত্রাবস্থায় পিতার নিকট থাকিয়া কত প্রকার ক্লেশকর ঘটনা শুচক্ষে নর্শন করিয়াছেন, পুত্রদের মল-মূত্রও পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছেন, এক্ষণ অবস্থায় তিনি যে সর্বাগ্রে পিতাকে সর্বপ্রকার ক্লেশকর ও বহুশ্রমকর কার্য হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াসী

* ইহা পুত্রের বিভাগাগর বলেন, পিতার বেতন ১০ টাকা অধিক কখনই ছিল না। তাঁহার কথা মত ২০ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকার উল্লেখ করিলাম।

হইবেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক বোধ হয়। ইহার অজ্ঞতা হইলে বিভাগাগর-চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা হইত না। পিতাকে প্রতিমাসের প্রায়শ্বে ২০ টাকা পাঠাইয়া অবশিষ্ট ৩০ টাকার কলিকাতার বাসার আপনারা তিনটা সহোদর, দুইটা পিতৃব্যপুত্র, দুইটা পিসতুতো ভাই, একটা মাসতুতো ভাই ও পুরাতন ভৃত্য শ্রীরাম মোট নয়জনের ভরণ পোষণ নিৰ্বাহ করিতে লাগিলেন। সৰ্ব্বাঙ্গোষ্ঠ ও সৰ্ব্বাংশেকা উপার্জনকর হইয়াও পর্যায়ক্রমে রক্তনাদি কার্যে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বড়বাজারের বাসার বহুপরিবারের স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে বিভাগাগর মহাশয় এই সময়ে বহুবাজারের বিখ্যাত হনুমান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সদরবাটা ভাড়া লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিভাগাগর মহাশয় প্রাতঃকালে নয়টা পর্যন্ত শিক্ষকের নিকট ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন; এবং অপরাহ্নে এক সময়ে হিন্দী পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া, কালেক্সের কার্য যথারীতি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাব জ্ঞার স্মৃতিষ্ক বুদ্ধিশালী ও অধ্যবসায়শীল পণ্ডিতের পক্ষে ইহাট যথেষ্ট কার্য নহে। এই সময় ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাবু স্তানচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গুলি সমবয়স্ক বন্ধু সংস্কৃত শিক্ষার মানসে তাঁহার নিকট আসিতেন। বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও আপনার প্রকৃতি গুণে এই সময় হইতে বিভাগাগর মহাশয়ের বিশেষ ঘেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি ইংরাজী পড়া শুনা এক প্রকার শেষ করিয়া বসিয়াছিলেন। বিভাগাগর মহাশয়ের সঙ্গ লাভে, তাঁহার প্রতি দিন দিন জননের অতুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক দিন বিভাগাগর মহাশয়ের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু বেশ মিষ্ট স্বরে মেঘদূত পড়িতেছিলেন; সেই বাল-কণ্ঠনিঃসৃত সুমিষ্ট কবিতা পাঠ শ্রবণ করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। তিনি বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করার বিভাগাগর মহাশয় তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতে সন্মত হইলেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবুর বয়োদিক্য নিবন্ধন প্রচলিত প্রথার বৈধাত্যতির সম্ভাবনা ভয়ে তিনি দুর্যোধ্য ও বহুকালব্যাপী দুঃস্বাদ শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে অন্নাত্মসমাধা কোন নূতন উপায় উদ্ভাবনা করা যায় কি না, এই চিন্তায় বিভ্রত হইয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে

বলিলেন, “তোমাকে একটা সহজ উপায়ে ব্যাকরণ শিখাইতে হইবে।” এই বলিয়া সে দিন তাঁহাকে বিদ্যার দিলেন; পর দিন রাজকৃষ্ণ বাবু আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিভাগসাগর মহাশয় বাঙ্গালা অক্ষরে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত এক নূতন ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। সেই হস্তলিপির সাহায্যেই রাজকৃষ্ণ বাবুর ব্যাকরণ শিক্ষার সূত্রপাত হইল। পরিশেষে ইহাকেই মূল ভিত্তি করিয়া ‘উপক্রমণিকা’র সৃষ্টি হইয়াছিল। ‘উপক্রমণিকা’ বিভাগসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তির আশ্চর্য্য প্রমাণ প্রকাশ করিতেছে, টহার সমগ্র ব্যবস্ফাট নূতন ব্যাপার, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষার ফল সরল ও সুগম্য হইয়াছে। এই একখানি গ্রন্থেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রেক্ষাপট প্রতিপন্ন করিতেছে।

রাজকৃষ্ণ বাবু নিজ সহিকুতা ও অধ্যবসায় গুণে এবং বিভাগসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার প্রণালীর গুণে শীঘ্রই মুণ্ডবোধ পাঠ শেষ করিলেন। অল্পকাল পরে মাস কাল মধ্যে রাজকৃষ্ণ বাবু মুণ্ডবোধ ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াছেন, এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা শ্রবণে সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই কৃতকাৰীতা দর্শনে লোকে বিশ্বাসহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল “এও কি কখন সম্ভব?” ইতিপূর্বে মার্শেল সাহেব কর্তৃক সংস্কৃত কালেজে জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল। বিভাগসাগর মহাশয় রাজকৃষ্ণ বাবুকে জুনিয়ার পরীক্ষা দিতে বলিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুও তাঁহার উপদেশ মত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সহসা এক দিন বিভাগসাগর মহাশয় অনিলেন, এক অসহায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত জুনিয়ার বৃত্তি পাটয়া সংস্কৃত কালেজে বিভাগসাগর ‘শিক্ষা’ করিতেছেন। পরীক্ষার রাজকৃষ্ণ বাবু উত্তীর্ণ হইলে, পরবৎসর হইতে ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লেখা পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। সদয়দয়র বিভাগসাগর মহাশয়ের পক্ষে এ চিন্তা অসহনীয় হইল, তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুকে জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা হইতে অগত্যা বিরত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “তোমার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ার ফলে যখন এক ব্রাহ্মণের অন্ন মায়ী যায়, তখন আর তোমার জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া হইবে না।” রাজকৃষ্ণ বাবুও বিভাগসাগর মহাশয়ের হৃদিত একমন্ত হইয়া জুনিয়ার বৃত্তি লাভের উদ্যোগ

পরিভাগ করিলেন। এই ঘটনার চুই বছরই সন্ধানতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পর বিভাগাগর মহাশয় রাজকৃষ্ণ বাবুকে সিনিয়র রুত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তত্বতয়ে রাজকৃষ্ণ বাবু সফোচ-সহকারে বলিলেন, “আমি কি পারিব?” তাঁহার উৎসাহদাতা বন্ধু অমনি বলিলেন, “কেন পারিবে না? তবে একটু বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে। তুমি প্রতিদিন আহারান্তে আমার সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কালজে বাইতে পার?” রাজকৃষ্ণ বাবু তাহাতেই সন্মত হইলেন এবং প্রত্যহ বিভাগাগর মহাশয়ের সমভিব্যাহারে ফোর্ট উইলিয়ম কালজে গিয়া সমস্ত দিন বিভাগাগর মহাশয়ের সাহায্যে লেখা পড়া করিতে ও সিনিয়র রুত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাত্রিতেও বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট পড়িতে লাগিলেন। এই সময় বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট আরও অনেক সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সন্মার পর সমবেত হইতেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবু অনেক সময়ে অনেক বাত্মি পর্যন্ত পড়া শুনার নিবৃত্ত থাকিতেন। এইরূপে দিবানিশি শ্রম করিয়া আড়াই বৎসরে সিনিয়র পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া রাজকৃষ্ণ বাবু প্রথম বারে সাসিক ১৫ টাকা ও চইবৎসর পরে ১ম শ্রেণীর রুত্তি ২০ টাকা প্রাপ্ত হইলেন। অধ্যাপক মহলে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ৫১৬ বৎসর ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়াও যাহাতে কৃতকার্য হওয়া কঠিন, কেবলমাত্র আড়াই বৎসরে তাহাই সাধিত হইয়াছে শুনিয়া, দলে দলে ছাত্র ও শিক্ষক রাজকৃষ্ণ বাবুকে ও তাঁহার গুরুকে দেখিতে আসিতে লাগিল। সকলে এই ঘটনাকে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করিলেও বিভাগাগর মহাশয়ের শিক্ষা প্রণালীর গুণে ও রাজকৃষ্ণ বাবুর আগ্রহ ও শ্রমশীলতার এই অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পর আর একবার রাজকৃষ্ণ বাবুর শেষ পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এত গুরুতর পরিশ্রমে রাজকৃষ্ণ বাবুর শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়। স্বাস্থ্য লাভের জন্য তাঁহাকে দ্বানান্তরে বাইতে হইয়াছিল। এই জন্য আর পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। *

ঈশ্বরচন্দ্রের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে মননমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের

* এই সকল বিবরণ প্রকৃত রাজকৃষ্ণ বাবু ‘পাখার’ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।

নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত কালেজে ব্যাকরণ শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে জৈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহন পরস্পরে আকৃষ্ট হন। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল গুণভূ-
ষ্ঠানের সূচনা করিতেন, মদনমোহন তাহার প্রত্যেকটিতে আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেন। অনেক সমুদয় উভয়ের একত্র আগ্রহ দেখা ধাইত যে, কে পরিচালক আর কে পরিচালিত তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন হইত। যাঁহার প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার আকৃষ্ট হইতেন, তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সহোদর নির্বিশেষে ভালবাসিতেন ও সর্বদা তাঁহার কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমে কলিকাতা বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে যখন তিনি প্রায় বৎসরাধিক কালের জন্ত বারাণসী গভর্ণমেন্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছিলেন তখন কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সাহেবদিগকে (Civil) সম্পত্তিবিষয়ক আইন পড়াইবার জন্ত ৪০ টাকা বেতনে এক পদ শূন্য হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। * সহাধ্যায়ী ছাত্রগণের গুণানুসারে পদবর্ধাদা ও সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া দেওয়া তাঁহার একটা প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি চোটা ও যত্ন পরতন্ত্র হইয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃন্দ গিরিশচন্দ্র বিহারী ৮মুকতারাম বিদ্যাবাগীশ ৮দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেকেরই কর্ম্ম কাজের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জ্ঞান বুদ্ধিগের জন্ত সর্বদা চিন্তা করিয়া, রাজকুমার বাবুর জ্ঞান বুদ্ধিগের উন্নতিকল্পে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, মাসিক ২০ টাকা সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়া পিতৃদেবকে বিবরকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাইয়া, অবশিষ্ট ৩০ টাকার কলিকাতার বাসায় ২১০ জনের ভরণ পোষণ

* তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত্র-গ্রন্থে তাহার জন্মস্থান বোম্বেতে নাথ বিদ্যাবৃন্দ মহাশয়, বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কার কারিনি বর্ণনাত সর্বত্রই তর্কালঙ্কার মহাশয়কে স্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিছুবার অসৌরভ না হইলেও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গৌরবও তাহাতে বৃদ্ধি পায় নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় জানেন ও শুনে একজন স্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আব্দ সন্দেহ কি? কিন্তু তিনি নিজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি সন্মতা যে আনুগত্যের দাব্য রাখা করিয়া চলিতেন, বিদ্যাবৃন্দ মহাশয়ের লিপিভাষ্যে সে টুকু অঙ্গক হইয়াছে দেখিয়া আমরা কিংবদন্তি হইয়াছি।

নিৰ্মাণ করিয়া রন্ধনের দিন উপস্থিত হইলে বাসার অল্প সকলের সহিত সমান অংশে রন্ধনের ভার লইয়াই যে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তাহা নহে। ইহার উপর নিজের বিভাগচর্চা ছিল এবং সৰ্বদাই কর্তৃপক্ষ মার্শেল সাহেবের কার্যে সহায়তা করিতে হইত। সংস্কৃত কালেক্সের গিনিয়ার ও জুনিয়ার পরীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুত করিবার ভার মার্শেল সাহেবের উপর অর্পিত হইত; তিনি আবার বিভাগাগর মহাশয়কে সে কার্যের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহারই উপর ভার দিতেন। প্রশ্ন সকলও যেমন তেমন নয়। ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য, নৃত্তি, বেদান্ত প্রভৃতি সকলেরই প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। তিনি যে সকল প্রশ্ন দিতেন, সংস্কৃত কালেক্সের বড় বড় অধ্যাপকগণও সে সকল প্রশ্নের কোন দোষ ধরিতে পারিতেন না। তিনি বাহা করিতেন তাহাই এত সুন্দর করিয়া করিতেন যে, কেহ অসুস্থান করিয়াও সহজে কোন খুঁত ধরিতে পারিত না। তিনি পথে চলিতে পটু ছিলেন, পাকশালার উৎকৃষ্ট পাচক ছিলেন, গৃহকাৰ্য্যে শোভা ও সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধি করিবারও উপায় জানিতেন, লোকের সেবায় পিতা মাতা অপেক্ষাও অধিক আত্মীয় হইতে পারিতেন, বিভাগের সুদক্ষ শিক্ষকরূপে বিদ্যাজ্ঞা করিতেন। তিনি যে উত্তর কালে, সৰ্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি বাহা ধরিতেন, তাহা সৰ্বাস্তঃকরণে অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন। যে কার্য্য গ্রহণ করিতেন, তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদৰ্শন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। যে কার্য্য পারিবে না বলিয়া বৃষ্টিতে পারিতেন, প্রাণান্তেও সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আর বাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার পূর্ণতা সম্পাদনে প্রাণপণ যত্ন করিতেন। কর্তব্য-জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে ইহাই তাঁহার ভাবী জীবনাভিনয়ের মূল ভিত্তি হইয়াছিল বলিয়াই, তিনি জীবনে সফলকাম হইয়াছিলেন; ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব, ইহাতেই তাঁহার পুরুষকারের সূত্রপাত ও বিকাশ হইয়াছিল।

বিভাগাগর-জীবনে পরিশ্রমের এখন কি হইয়াছে? এই পরিশ্রমের নুতনা হইয়াছে মাত্র। যখন এইরূপ আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত তিনি কোর্ট উইলিয়ম কালেক্সে কৰ্ম করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন সে সময়ের গভৰ্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিজ বাহাদুর কালেক্স পরিদর্শন করিতে আসিয়া বিভাগাগর মহাশয়ের

সহিত নানা 'বিষয়ে আলাপ করেন। কথাগুলোতে বিভাগাগর মহাশয় বলিলেন যে, গভর্ণমেন্ট, সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের প্রতি মনোযোগ করেন না। একমাত্র জজ পণ্ডিতের পদ ছিল, তাহাও সম্প্রতি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এজন্য সংস্কৃত শিক্ষার লোকের অনুরাগ হ্রাস হইতেছে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রসংখ্যাও ক্রমশঃ অল্প হইয়া যাইতেছে। অতএব গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গের জন্য কিছু না করিলে চলিতেছে না। মহামতি চর্চ হার্ডিঞ্জ বিভাগাগর মহাশয়ের প্রস্তাবমত ১৮৪৬ খ্রষ্টাব্দের প্রারম্ভে সমগ্র বঙ্গদেশে একশত একটা বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা * করিয়া সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্যের ভারপ্রাপ্ত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে একদিকে বিভাগাগর মহাশয়ের কার্যের গুরুত্ব ও পরিশ্রমের ভার বৃদ্ধি পাইল, আর এক দিকে সংস্কৃত কলেজে প্রবীণতর শিক্ষকমণ্ডলীর চর্চার পাত্র ও অজ্ঞাত পণ্ডিতগণের অপ্রিয় হইবার নানাপ্রকার কারণ উপস্থিত হইল। ঐ একশত একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণের পরীক্ষা গ্রহণ ও নিযুক্ত করণের ভার মার্শেল সাহেব ও বিভাগাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। চর্চার কারণ এই যে, তাঁহার অপেক্ষা অধিকবয়স্ক ও অভিজ্ঞ শিক্ষক সকল সংস্কৃত কলেজে থাকিতে, বিভাগাগর মহাশয়কেই পরীক্ষা গ্রহণের ভার কেন দেওয়া হয়? অজ্ঞাত পণ্ডিতগণের অপ্রিয় হইবার কারণ এই যে, তিনি 'আত্মপরিচয়' নিরপেক্ষ হইয়া কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করিতেন। গুণানুসারে পদপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিলে, অনেককেই নিরাশ হইতে হয়। গাঁদারা সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, কেবল তাঁহারাষ্ট কর্ম পাইতেন। সুতরাং অনেকে ব্যর্থকাম হইয়া বিভাগাগর মহাশয়ের নিন্দা রটনার নিজ নিজ রসনাকে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু যে বিভাগাগর মহাশয়, সাহেব ছাত্রগণকে দয়া করিবার প্রভাবে, কর্তৃপক্ষ মার্শেল সাহেবকে বলিয়াছিলেন "ওটি আমাকে দিয়ে হবে না," সেই বীর-প্রকৃতি, ভারপ্রাপ্ত বিভাগাগর মহাশয় চর্চাপ্রকাশে ও নিন্দাপ্রচারে ভয় করিবেন কেন? লোকনিন্দার ভয়ে কর্তব্যের অঙ্গুষ্ঠানে বিরত থাকা, কিংবা

অন্যায় জানিয়াও তাহার প্রেরণ দেওয়া, বিদ্যালাগর মহাশয়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট হার্ডিঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা বিদ্যালয় এখনও কোন কোন স্থানে বিদ্যমান আছে এবং তাহা হার্ডিঞ্জ-বঙ্গবিদ্যালয় নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

এ সকল ত হইল। এইরূপ নানা প্রকারের দারিদ্র্যপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করা ও তৎসমুদায় যথারীতি সম্পন্ন করিতে যত্নবান থাকাই একজনকে পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অতুতকণ্ঠা বিদ্যালাগর মহাশয়ের পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। তিনি দৈনিক নানাপ্রকার অবশ্রম সম্পাদ্য কার্যগুলি সম্পন্ন করিয়া তৎপরে দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে ও গীড়িতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিতে, ব্রণসজ্জার সজ্জিত অথারোহী নেপোলিয়নের ন্যায় দিবারাত্রি প্রস্তুত থাকিতেন। কিন্তু তাহার অল্প সকল অনাবিধ ছিল। সাপ্তাহানা, মিছরী, বেগানা, কিসমিস, বাহিরের অন্ন; আর স্নেহ মমতা, সেবা শুশ্রূষা, ছুটাছুটি, ডাক্তার ডাকাডাকি তাহার মনের অন্ন; এই উভয়বিধ আরোজন তাহার নিত্য বৃদ্ধের সম্বল ছিল, ইহাতেও তাহার পরিশ্রম, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া পেল না। এখনও বাকি আছে। তিনি কোর্ট উইলিয়ম কলেজে সাহেবদিগকে বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত পড়াইতেন। সংস্কৃত পুঁথি রচনার প্রয়োজন নাষ্ট, যাঁরা আছে তাহা অনন্ত সমুদ্রবিশেষ, অনুসন্ধান করিয়া লইলে অনেক অমূল্য রত্ন সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু পড়াইবার মত বাঙ্গালা পুস্তক সে সময় ছিল না। বাঁহা ছিল, হুই একখানি ভিন্ন প্রায় সমস্তই অপাঠ্য। তাহার উপর আবার একশত একটা ‘হার্ডিঞ্জ-বঙ্গবিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাঙ্গালা পুঁথক রচনার চিন্তাও এই সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই সুবিস্তৃত মানস-রাজ্যে স্থান পাইরাছিল। তাহার প্রথম মানস-পুত্র বাহুবল্লভ-চরিত স্মৃতিকাগুহেই অপলভ হইরাছিল, এ পর্যন্ত কেহ সে শিশুর সুখাবলোকন করে নাই। সংপ্রতি সেই অপলভ সন্তানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ১ম ও ২য় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। প্রথম পদের কেতন ছিল ২০ টাকা। শিক্ষাসমিতির অধ্যক্ষ ডাক্তার মরট সাহেব উক্ত পদে একজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবার

জন্য মার্শেল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে যান। পরামর্শে হির হইল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করা কর্তব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ঐ প্রস্তাব উপস্থিত হইল, তিনি উক্ত পদ গ্রহণে নিজের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া মার্শেল সাহেবকে বলিলেন :—“মহাশয় ! টাকার প্রত্যাশা করি না। আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আমি কৃতার্থ হইব। আর আপনার নিকট থাকিলে, আমি নূতন নূতন উপদেশ পাইব।” * যুবক বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবীণ মার্শেল সাহেবের নিকট নিত্য নূতন বিষয় শিক্ষা করিবার প্রত্যাশা করিতেন, এ কথাটা মন্দ নহে, কিন্তু “আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আমি কৃতার্থ হইব।” একরূপ আশ্বাসমান-শূন্য তোষামোদ বাক্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে দিয়া সহোদর বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার গৌরব হানি করিয়াছেন। যিনি বিদ্যালয়ে এক বৎসর পরীক্ষার প্রথম হইতে না পারায় বিদ্যাসয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং উহার পর দুইবার কৰ্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি যে সহজে “অনুগ্রহ” প্রার্থী হইবেন এবং “অনুগ্রহ” লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, আমাদের অন্তর ইহাতে সার দেয় না। তিনি হয়ত এই অবাচিত অনুগ্রহের জন্য মার্শেল সাহেবকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লেখনীর জগ্রে সেই কৃতজ্ঞতা কৃতার্থতার পরিণত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ দুই পদের জন্য লোক নির্বাচন করিয়া দিতে ঐচ্ছিক হইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাসিক ৫০ টাকা বেতনপ্রাপ্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সহজেই ২০ টাকা বেতনের কৰ্ম গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া অন্য লোক আনিতে চাহিলেন। স্বার্থত্যাগের একরূপ উদার প্রস্তাবে মার্শেল সাহেব এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যান্য বন্ধগণ যে আশ্চর্যান্বিত হইবেন হই। বলাই বাহুল্য। মার্শেল সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত করিতে পারিলেন না, অগত্যা শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কাহাকে উক্ত পদ প্রাপ্তির যোগ্যপাত্র মনে কর?” বিদ্যাসাগর মহাশয়, সৰ্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ভক্তারানাথ তর্কবাচস্পতির নামোদ্বোধ করিয়া বলিলেন, “ইনি অধিতীর বৈয়াকরণ।

* ঈশ্বরচন্দ্র ঐশ্বরচন্দ্র ঐশ্বরচন্দ্র, ৫৮ পৃষ্ঠা।

প্রথম পদ তাঁহারই প্রাপ্য, আশনি তাঁহাকেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বলুন।” শুনা যায় যে বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাচস্পতি মহাশয়ের কৰ্ম্মক্ষেত্রে সুবিধা করিয়া দিতে প্রতিক্ষিত ছিলেন। বাচস্পতি মহাশয় সে সময়ে কলিকাতা হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে কালনার অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে দিন এই কথা হয়, সে দিন শনিবার, লোকের প্রয়োজন সোমবার। পত্র লিখিলে উত্তর পাইতে বিলম্ব হইবে। বাচস্পতি মহাশয় কৰ্ম্মগ্রহণ করিবেন কি না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। কাজে কাজেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ দিবস রজনী যোগে এক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া কালনা যাত্রা করিলেন। সমস্ত রাত্রি পথ চলিয়া পর দিবস মধ্যাহ্নে কালনার উপস্থিত হইলেন। বাচস্পতি মহাশয় ও তাঁহার পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ ভাবে পদব্রজে এত পথ অতিক্রম করিয়া কালনার আসিবার কারণ অবগত হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বিষয়ে বিহ্বল হইয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেল সাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের প্রশংসাপত্রগুলি ও আবেদন পত্র লইয়া, সেই দিনই পূৰ্ব্ববৎ পদব্রজে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। পথ চলিতে অসমর্থ সঙ্গীকে নৌকার আসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পথ চলিতে বিশেষ পটু ছিলেন। তাঁহার হৃদয় যেন নিয়ত অক্ষয় শ্রীতির প্রস্রবণ-রূপে প্রতীয়মান হইত। পরহঃখকাতর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশস্ত হৃদয় নিঃশলনীর সরোবরের স্তায় নিয়ত চল চল করিত; পরহঃখের তৃণকণা সে হৃদয়-সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, তাহাতে কাতরতার উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, আবার তাঁহার মনের শক্তি ও সাহসও তদনুরূপ প্রবল ছিল। এমন কোন কর্তব্য ছিল না, যাঁহা করিতে তিনি ভীত হইতেন। বোধ হয় কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইয়া সৰ্ব্বশাস্ত হইতে,—আত্ম-বলি দিতে কুন্তিত হইতেন না। এইরূপ হৃদয় ও মনের অনুরূপ বলশালী দেহও তাঁহার ছিল। তাঁহার মনের সঙ্কল্প, তাঁহার শ্রীতির বারিবিম্ব পাইয়া অকুরিত হইলে, তাহা যত বড় দুৰ্দ্ধর কার্য হউক না কেন, তাঁহার দেহ তাহা সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য ধারণ করিত, এরূপ দৃষ্টান্ত তাঁহার সুবিস্মৃত জীবনক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইবে। এরূপ লোকবিরল পরোপকার সাধন, এই অধঃপতিত বঙ্গদেশে কেবল মহামনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষেই সম্ভব। প্রায়

বিপ্লব অর্থোপার্জনের সুযোগ পাইয়া তাহা গ্রহণ না করা, এবং সেই কল্প অল্প এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিবার জন্য প্রস্তাব করা, তৎপরে দিবারাত্রি পথ চলিয়া ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ব্যক্তিকে বথাসময়ে সংবাদ দেওয়া, সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এই একটা ঘটনাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনের উচ্ছ্বাস ও হৃদয়ের প্রশস্ততার পূর্ণ পরিচায়ক। এইরূপ বিবিধবিষয়ক অসংখ্য ঘটনাবলীর সমাবেশে বিদ্যাসাগর-চরিত্র এক অমূল্য রত্ন-খনিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার অসাধারণ গুণগন্য, তাহার অমানুষিক ক্রিয়াকলাপে তাহাকে আমাদের স্বজাতীয় জীব বলিয়া বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। উচ্চভাব ও উচ্চচিন্তা সর্বদাই তাহার মানস-রাজ্যে বিচরণ করিত। পবিত্র সদহুষ্ঠান-শ্রোতে তাহার হৃদয় নিয়ত বিদু বিদু ক্ষরিত, তিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়াও নিরন্তর কোন অজ্ঞাত উচ্চ লোকে বাস করিতেন।

ইহার পর বাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকের পদ এবং পুস্তকাদ্যক্ষের পদ শূন্য থাকায় নানাস্থানের বড় বড় সুপারিসওয়ারা আবেদনকারীর সংখ্যা নিত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িল দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় পরীক্ষা দ্বারা লোক নির্বাচন করিতে বলিলেন। ম্যেট সাহেব তাহাই করিলেন। পরীক্ষার তাহাবট অতীষ্ট সিক হইল। পদপ্রার্থীগণের মধ্যে ৬৪৭কানাথ বিদ্যাতৃষণ ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যার মহাশয় ক্রমাবধি উক্ত দুই পদে ৫০ ও ৩০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। তাহারই দুইজন বন্ধু সংস্কৃত কালেজে শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃমাতৃবৎসল ছিলেন। তাহার পিতৃপূজার হৃদনা আমরা ইতিপূর্বে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা উল্লেখ করিয়াছি, একটা অদ্বুত ঘটনার তাহার মাতৃভক্তি নিরূপ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, পাঠক! এক্ষণে এক বার স্থির চিত্তে তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। দেখিবে, তাহার লোকসেবা যেমন লোকবিরল ব্যাপার, তাহার বন্ধু-সেবার অন্তরালে দুলভ মিত্রতার সৌম্যভূতি যেমন চির অক্ষিত রহিয়াছে, পিতৃপূজার তাহার পিতৃদেব যেমন চিরসদৃষ্ট ছিলেন, তাহার পাগলিনী মাও তাহার প্রতি যে কারণে চিরপ্রসন্ন ছিলেন, এক্ষণে তাহারই একটু আভাস উপহার

দিতেছি। যে সময়ে কোর্ট উইলিয়ম কালেক্সে বিভাগাগর মহাশয়ের মান সম্মত ও প্রতিপত্তি মধ্যাহ্ন হৃদ্যের জ্ঞার প্রতীকমান হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার তৃতীয় সহোদর শঙ্কুচক্র বিভাগরয়ের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাটী ঘাইতে আদেশ করিয়া পাঠান। বিভাগাগর মহাশয় কালেক্সের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের নিকট ছুটি চাহিলেন। কিন্তু সে সময়ে এত বেশী কাজ বে, বিশৃঙ্খলাভরে সাহেব বিভাগাগর মহাশয়কে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না; সুতরাং তাঁহার আর বাটী যাওয়া হইল না। কলিকাতার বাসার সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল তিনিই আছেন। সহোদরের বিবাহ, জননী গৃহে ঘাইতে বলিয়াছেন, তিনি ছুটি পাইলেন না, জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিয়া মনে দারুণ ক্রেশের সঞ্চার হইল। বর্ষার ঘন মেঘাস্ক্রম রজনীর অন্ধকার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়াকাশও গভীর বিষাদ-মেঘে আবৃত হইল। অন্তর্দাহ ও উৎকর্ষা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি অনিদ্রায় বহু কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া শেষে প্রাতঃকালে মার্শেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, “আমার মা আমাকে বাড়ী ঘাইতে বলিয়াছেন, আমাকে বাড়ী ঘাইতেই হইবে। যদি বিদায় না দেন, আমি কণ্ঠ পরিত্যাগ করিলাম, মজুর করুন, আমি বাড়ী ঘাইব।” সাহেব মাতৃভক্তির এই স্বর্গীয় দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, “তোমাকে কণ্ঠ ত্যাগ করিতে হইবে না, আমি বিদায় দিতেছি তুমি বাড়ী যাও।” তখন বিভাগাগর মহাশয় হঠাৎচক্রে বাসার আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সে সময়ে প্রবল বর্ষা-সমাগমে পথ অতি হুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, বহু কষ্টে এক এক পা অগ্রসর হইতে হইতেছে, এইরূপ ক্রেশে কতকদূর অগ্রসর হইয়া সে দিন দামোদরের পূর্বপারেই রাত্রি যাপন করিতে হইল। পর দিন শ্রীরামকে পথ চলিতে অসমর্থ দেখিয়া পথে কলার করাওয়া ও কিছু পরগা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহাকে বাড়ী ঘাইতে বলিলেন। সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুর আদেশমত বাড়ী গেল। ঈশ্বরচন্দ্রকে সে দিন বে কোন উপারে হটক বাটী পৌছিতেই হইবে। সেই দিন বিবাহ। তিনি জাণিতেন, তিনি বাড়ী না গেলে, জননীর আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তান্ডল

তিনি ক্ষয়িতগমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণকলেবর দামোদর-
 তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামোদরে বর্ষার ঢল নামিয়াছে, একগাছি
 তৃণ পড়িলে শত ধও হইয়া যায়। পূর্ণকলেবর দামোদর, প্রবল তরঙ্গ
 তুলিয়া, নৃত্য করিতে করিতে তীর বেগে ছুটিয়াছে। পারের নোকা পর
 পারে, নোকা আসিয়া তাঁহাকে লটরা গেলে, সে দিন আর গৃহে বাওয়া হয়
 না। কেবল পার হওয়া হইবে মাত্র, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। - মাতৃভক্ত
 বিজ্ঞানাগর কি কবিলেন, পাঠক! শুনিতে চাও? ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া
 উঠে, ভয়ে হাত পা পেটের ভিতর প্রবেশ করে; উপজ্ঞাসে কবিকল্পনার
 এরূপ ঘটনার অবতারণা সম্ভব, কিন্তু সত্য সত্যই যে মানুষ এরূপ করিতে
 পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না; বিজ্ঞানাগর মহাশয় আব্দারে
 মায়েব-আদেশ পালনের জন্ত বর্ষার ভরা দামোদরের অলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ
 ঢালিয়া দিলেন। যাহারা পাবে যাইবে বলিয়া বসিয়াছিল, তাহারা অনেক
 নিষেধ করিল, কেহ কেহ বাধাও দিল, কিন্তু মাতৃআজ্ঞা পালনে বন্ধপরিকর
 জৈশ্বরচন্দ্র কোন বাধাই মানিলেন না। সবলদেহ বীরপুরুষ দামোদরের
 তরঙ্গ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া পর পারে উঠিলেন। যাহারা তাঁহার আরোহণ
 দেখিয়া তাঁহাকে বাতুল বলিয়া মনে করিতেছিল, তাঁহার শমন-সদন সন্নিকট
 ভাবিয়া আকুল হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার সাহস ও শক্তি সামর্থ্য দেখিয়া
 বিস্মিত হইল ও শতপ্রকারে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল। পথে, পাতুলে
 জননীর মাতুলালয়ে মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ
 করিলেন। অপরাহ্নে দারকেশ্বর নদও পূর্ণবৎ পার হইয়া গৃহাভিমুখে
 অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা হইল। যেখানে সন্ধ্যা
 হইল, সেখানে আবার দম্ভভয়। সুবিধামত কোন পথিককে একাকী
 পাঠিলে, প্রায় গৃহে ফিরিতে দেয় না! জৈশ্বরচন্দ্র তাঁহার ইষ্টদেবতা মাতৃপদ
 স্মরণ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় প্রহরার্ধ রাত্রি
 অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে বিজ্ঞানাগর মহাশয় গৃহে পৌঁছিলেন। সেই
 সিন্ধু বস্ত্রে ও স্নান শরীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া, “মা—মা, আমি আসিয়াছি”
 বলিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন। বয় ও বয়বাত্রী চলিয়া গিয়াছে, জননী
 এক ঘরে ঘায় বসে কল্পিয়া জৈশ্বরচন্দ্রের অল্পপরিহেত সর্বাঙ্গ হইয়া, অনাহারে

রোদন করিতেছিলেন। পুত্রের গলার শব্দ পাইয়া জননী অশ্রু নোচন করিতে করিতে দ্বার খুলিয়া পুত্রের নিকট আসিলেন। তখন মা ও ছেলেতে কণকাল একত্র ক্রন্দন করিয়া শেষে নানা প্রকার সুখ দুঃখের কথা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে দুজনে আহার করিতে বসিলেন। পিতামাতার প্রীতি সন্তানের এতাদৃশ অনুরাগ ও ভক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। জননীর আদেশ পালন করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহেন, এরূপ অকৃত্রিম ভক্তির স্বর্গীয় চিত্র, এরূপ পিতৃমাতৃপূজার অদৃষ্টের ও অশ্রুতপূর্ব্ব স্ফূর্ত্ত পৌরাণিক আখ্যানিকাবলীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। দূরদর্শী বাল্যী এরূপ ঘটনাকে বাচুলতা বলিয়া মনে কবে। পিতামাতাতে উজ্জিশ্রুত হইয়াই এ জাতি অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। বঙ্গসন্তান! বিদ্যাসাগরচরণে বসিয়া পিতৃমাতৃপূজা শিক্ষা কর। এমন জীবন্ত সন্দর্ভস্থ আর কোথাও পাটবে না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যে সকল সাহেব দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন, ঠাহাদের মধ্যে সীটনকাব, কষ্ট, চ্যাপম্যান, গ্রে, গ্রান্ট, হালিডে, বিডন, লর্ড ব্রাউন, ইডেন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সিভিলিয়ানগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও সম্মান করিতেন। রবার্ট কষ্ট নামে একজন সিভিলিয়ান ছাত্র এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়িতেন। তিনি অবসর পাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট থাকিতে ও ঠাহার সহিত কথাবর্ত্তা করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। ঠাহার সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা-বন্ধি হইলে পর, কষ্ট সাহেব এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, “আপনি আমার নামে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া দিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।” বিদ্যাসাগর মহাশয় কণকালের জন্ত সাহেবকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তখনই নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন :—

শ্রীমান্ রবার্টকষ্টোদ্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ ।

সৌজন্তপূর্ণৈরালাপনিতরাং মামতোষয়ৎ ॥ ১ ॥

স হি সদগুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা ।

প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবৎকশতং সুখী ॥ ২ ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় সুদূরত্ব মধ্যে ঐ দুটটী শ্লোক রচনা করিয়া সাহেবকে দিলেন। তিনি শ্লোক ও শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট

হইলেন এবং 'দুইশত টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে টাকা নিজে না লইয়া, সংস্কৃত কালোজের যে ছাত্র রচনার সর্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সাহেবকে ঐ টাকা কালোজের অধ্যক্ষের নিকট জমা রাখিতে বলিলেন। সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শমত কার্য্য করিলেন। তদনুসারে চারি বৎসর কাল সংস্কৃত রচনার পরীক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট বালক পঞ্চাশ টাকা করিয়া কষ্ট সাহেবপ্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছে। যেখানে যে কোন প্রকার সত্বপারে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ উপস্থিত হউক না কেন, অর্থের পরিমাণ যতই হউক না কেন, তাহাতে দরিদ্র বিদ্যাসাগরের মন টলিত না। প্রায় অল্প লোকের সে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দিতেন। এই অল্প সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণ তাহাকে বিশেষভাবে সম্মান করিতেন। এই বর্তমান বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক-মণ্ডলীর সমক্ষে নির্লোভ বিদ্যাসাগর-চরিত্ত মহামূল্য আদর্শ !

উপরোক্ত কষ্ট-প্রদত্ত-বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বৎসরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধান সাহোদর দীনবন্ধু স্মায়র ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার সর্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট হন। রচনা দুই জনেরই সমান সুন্দর হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্রের ব্যাকরণ ভুল ছিল, দীনবন্ধুর তাহাও ছিল না। দীনবন্ধুর দুর্ভাগ্য যে পরীক্ষার ফলাফল নিষ্কারণ ও পুরস্কার দানের ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। দীনবন্ধু সর্বপ্রকারে সর্বোৎকৃষ্ট হইলেও পুরস্কার পাইলেন না। প্রবল কারণ এই যে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহোদর; তিনি পুরস্কার পাইলে, পাছে লোকে বলে দুইজনেই সমান হইল, তবে শ্রীশচন্দ্র না পাইয়া দীনবন্ধু কেন পাইবে? ইহাও এক প্রকার বিচার-বিভ্রাট সন্দেহ নাই, কিন্তু এ বিচার বিভ্রাটে নিঃস্বার্থভাবে, ন্যায়ানুষ্ঠান ও মনুষ্যত্বের ভাব অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচারে শ্রীশচন্দ্রই পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া নিষ্কারিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, দীনবন্ধুকে পুরস্কার দিলে, পাছে অজ্ঞাতসারেও স্বার্থপরতা দোষ তাহাকে স্পর্শ করে, পাছে স্বেচ্ছানুরোধের অধীন হইয়া তিনি দীনবন্ধুর প্রতি অন্যায় অগ্রহ দেখান, ইহাই তাঁহার বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়াছিল। স্বার্থে এবং পরার্থে সংগ্রাম হইলে, সাধু ব্যক্তি সর্বদাই পরার্থের পক্ষপাতী হইয়া আপনায়

কতি করিতে কুণ্ঠিত হন না । বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেই শ্রেণীর সাধু মহাত্মা ছিলেন ।

পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কষ্ট সাহেব পঞ্চাব প্রদেশে কর্ম করিতে যান । বেশ সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিয়া শেষে স্বদেশে ফিরিবার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কলিকাতায় আগমন করেন, সাক্ষাৎ কালে কষ্ট সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, যদি আপনার পূর্বের জ্ঞান কবিতার রচনার অভ্যাস থাকে, তবে আমার বিষয়ে আর কয়েকটা কবিতা রচনা করিয়া দিলে আমি বিশেষ সুখী হইব । সাহেবের অহুরোধে ক্রমাগত সুললিত ভাবময় অতি সুন্দর পাঁচটা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । নিজের ইচ্ছা করিয়াও তিনি কখন কখন কবিতা রচনা করিতেন । গদ্য পদ্য উভয় রচনাতেই তাঁহার শক্তি যথেষ্ট ছিল । তিনি দেশ ভ্রমণ, সংস্কার, জ্ঞান, মেধ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । এতদ্বির পৌরাণিক নামানুসারে শাক্তদীপ, কৃষ্ণদীপ, শাক্তদীপ প্রভৃতি এবং পাশ্চাত্য মতে আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আফ্রিকা ও এশিয়া দেশ সম্বন্ধে ৪০৮টা শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন । সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, যে, তিনি সে সকল কবিতা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বাহার নিকট রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অসাবধানতা বশতঃ সে সকল কবিতা হারাইয়া গিয়াছে । বাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা সন ১২২৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেরই প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় জন মিয়র নামক একজন সিলিগুড়ির প্রত্নাবৈ পুরাণ ও স্থূঁসিদ্ধান্তের নির্দেশ মতে এবং পাশ্চাত্য গণনানুযায়ী ভূগোল খগোল প্রভৃতি বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া এক শত টাকা পুরস্কার পাইয়া ছিলেন । এই সকল কবিতাতে তাঁহার রচনাশক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ।

সাময়িক্য বিদ্যালয়কার মহাশয়ের পরলোক গমনে সংস্কৃত কালেকের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয় । শিক্ষা সমিতির কর্তা ডাক্তার মরোট সাহেব উক্ত শূন্যপদে একজন যোগ্যতর লোক নিযুক্ত করিবার মানসে মার্শেল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে যান । তিনি বলিলেন, ইংরাজী ও সংস্কৃত

উভয় ভাষাতেই বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন এবং কালেজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম, এক্ষণে একটী লোকের প্রয়োজন। পরামর্শে স্থির হইল যে ঐ পদে ক্রম্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই নিযুক্ত করিতে হইবে। তদনুসারে তাঁহার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহারদের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু মার্শেল সাহেবকে বলিলেন, “যদি সেখানে কর্মকাণ্ডে মতাস্তর হয়, কিংবা কোন প্রকার কথাস্তর ঘটে, তাহা হইলে আমি অন্ত্রায়ের প্রশয় দিয়া চাকরি করিতে পারিব না। সেখান অধীতিকর ঘটনা ঘটিলে আমাকে কর্মভাগ করিতে হইবে। আমি আমার জ্ঞান ভাবি না। আমি কর্মভাগ করিতে বাধ্য হইলে, পাছে আমার পিতার কোন প্রকার যন্তুবিধা হয়, এষ্ট ভাবনায় আমি একটু ইতস্ততঃ করিতেছি। আমার মদান সহৃদয় দীনবন্ধুও অতি পণ্ডিত লোক, তাঁহাকে আপনি যদি আমার এই কর্মে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আমি সংসৃত কালেজের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে পারি।” মার্শেল সাহেব তাহাতেই সম্মত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উক্ত পদ পলাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন।

আনন্দের আশ্রয় কাল সে সংসৃত কালেজ দেখিতেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণের পূর্বে ইহা এক্ষণে ছিল না। তখন পল্লীগ্রামের অধ্যাপকগণের প্রতিষ্ঠিত টোলের দ্বারা প্রায় এক প্রকার বেবন্দোবস্তী আমল ছিল। সে কালে অধ্যাপক মহাশয়গণের সকলে না হইত, অনেকে চেয়ারে বসিয়া স্থখে নিদ্রা ঘাইতেন, আর তাহাদের বাগল শিশুগণ তালদ্রবের দ্বারা ব্যঞ্জন করিয়া তাহাদের সুসুপ্তিজনিত হৃদয় তৃপ্তি করিতে নিযুক্ত থাকিত। পণ্ডিত মহাশয়রা অনেক সময়ে নিদ্রা স্থখ সন্তোষাগন্তে অপরায় ছাত্রগণকে পড়াইতেন। পূর্বে সময়ের একটা বাধাবোধ নিয়ম ছিল না। শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে কে কখন আসিত, কে কখন ঘাইত, তাহার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। যখন বাহার ইচ্ছা হইত, তিনি তখন আসিতেন, যখন বাহার ঘাইবার ইচ্ছা হইত, তিনি তখন চলিয়া যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কালেজের কার্যভার গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রথমে অধ্যাপক মহাশয়দের নিদ্রা নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণের যাবৎ আমায় সময় নির্দেশ করিয়া দিলেন। পূর্বে

কোন বালক ইচ্ছা করিবামাত্র, যে কোন সময়ে, কালেক্টরের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারিত। তিনি কাঠখোদিত পাস লইয়া বাহিরে যাইবার নিয়ম প্রবর্তিত করেন। পূর্বে যাহার যাহা ইচ্ছা করিত, বিভাগাগর মহাশয়ের আমলে সকলকেই সেক্রেটারীর অনুমতি লইয়া কাজ করিতে হইত। মোট কথা সংস্কৃতকালেজে তাঁহার সহকারী সম্পাদকরূপে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার স্বৈচ্ছাচারিতার স্থানে বিধিবাবস্থার প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়াছিল। তবুও কিছু কিছু অবশিষ্ট রছিল। পরীক্ষা গ্রহণ বিষয়েও তিনি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করায় অদ্ভুত বৎসর অপেক্ষা সে বৎসব অধিকতর সম্ভ্রামজনক ফলপ্রাপ্ত হওয়াতে সম্পাদক বাবু রসময় দত্ত ও শিক্ষাবিভাগের কড়পক্ষ ডাক্তার মর্দেট সাহেব বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। বিভাগাগর মহাশয়ের বিবেচনায় যে সকল কবিতা অম্লীল বোধ হইয়াছিল, পাঠ্য পুস্তক হইতে তিনি তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ব্যাকরণ পাঠে, পূর্বে বহু সময় বায় হইত ও শিক্ষার জটিলতাও নিত্যশ্রম কম ছিল না। তিনি অল্প সময়ে সরলভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তাহার চেষ্টা ও আকিঞ্চন ব্যাকরণ শিক্ষা বালকগণের পক্ষে কণিকা সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি সাহিত্য শ্রেণীর বালকগণের অঙ্কশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফল কথা, তিনি দিন দিন নূতন নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন দ্বারা সংস্কৃতকালেজের শ্রীলক্ষি সাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রবর্তিত নিয়মাবলী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সকল অজ্ঞাপি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় দিতেছে।

এই সময়ে এক দিন বিভাগাগর মহাশয় বিশেষ কার্যোপলক্ষ হিন্দু কালেক্টরের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সাহেব বোধ হয়, বাঙ্গালীর প্রতি তত অনুরক্ততাবাপন্ন ছিলেন না। অধ্যক্ষ কার সাহেব টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া অঙ্কশয়নাবস্থায় চেয়ারে বসিয়া সমাগত বিভাগাগর মহাশয়কে বিনা অভ্যর্থনায় দাঁড় করাইয়া রাখেন। বিভাগাগর মহাশয় একপভাবে অপমানিত হইয়াও, স্বকণ্ঠ সাধন করিয়া, নীরবে প্রত্যগমন করেন। কিন্তু তিনি কার সাহেবের এই আচরণ ব্যবহাব ও অসম্মান প্রদর্শনের কথা সহজে বিস্মৃত হইলেন না। কয়েক দিন ঘটিতে না ঘটিতে অধ্যক্ষ কার সাহেবকে সংস্কৃত কালেজে বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট কার্যোপলক্ষে

আসিতে হইল। তখন বিজ্ঞানাগর মহাশয় সাহেবের অভ্যুদ্যত বাবহারের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সুযোগ পাইলেন। কার সাহেব সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া, বিজ্ঞানাগর মহাশয় তাঁহার সুবক্সিম চট্টরাজ পরিশোধিত সুখ্যাম চরণদ্বয় টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া, সাহেবের হাত চেয়ায়ে হেলান দিয়া অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় অবস্থিত হইয়া, সাহেবকে গৃহ মধ্যে আসিতে বলিলেন। বসিবার আর দ্বিতীয় আসন নাই। সাহেব গৃহে প্রবেশ করিয়া তদবস্থাপন্ন বিজ্ঞানাগরকে দেখিয়া, অপমানিত মনে করিয়া কুপিত হন। বহু কষ্টে আপনার কার্য শেষ করিয়া সদর সেখান ছুটতে প্রস্থান করেন এবং বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের এই অশিষ্ট বাবহারের বিষয় কর্তৃপক্ষ ময়েট সাহেবের গোচর করেন।

ময়েট সাহেব বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কৈফিয়ৎ তলব করেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহা একদা প্রসঙ্গক্রমে আমাদের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহা অতীব আমোদজনক। তিনি কৈফিয়তে বলিয়াছিলেন, “আমি ভাবিয়াছিলাম, আমরা অমত্য, সুসভ্য ইংরাজীমতে লোকের অভ্যর্থনা করিতে হইলে, বুকি ঐরূপই করিতে হয়। আমি হিন্দু-কালোজর অধ্যক্ষ কার সাহেবের নিকট ঐরূপ শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং অবসর পাইয়া সাহেবের প্রতি সে সম্মান দেখাইতে রূপণতা করি নাই। এটা যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, তবে এরূপ বাবহারের শিক্ষাদাতা কার সাহেবই সে জন্ত দায়ী। ঐ ঘটনার আমার বিন্দুগাত্র ক্ষেব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।” শিক্ষাসমিতির কর্তৃপক্ষ ময়েট সাহেব বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের আদ্য-সম্মান বোধ ও ক্ষেজবিত্তা সন্দর্শনে আহলাদিত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই গোলযোগ মিটাইবার জন্ত কার সাহেবকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে অধ্যক্ষ কার সাহেব বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপোসে মোকদ্দমা মিটাইয়া লন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের এই স্বাধীনচিত্ততাই তাঁহাকে সর্বত্র জয়ী করিয়াছে। তাঁহার নির্ভীক হৃদয় কোথাও কখন কোন কারণে নত হইত না।

এই সময়ে সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কালেজের সম্পাদক বাবু রসময় দত্ত ও শিক্ষাসমিতির অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব

বিদ্যালগর মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন । উক্ত পদের অধিক বেতন হইলেও বিদ্যালগর মহাশয় কালেজের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতে আর কোন প্রকার সুযোগ পাইবেন না, এই আশঙ্কায় উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মত হইলেন ; কিন্তু উক্ত পদে যাহাতে একজন সুযোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন, সে বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হইয়াছিলেন । মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় যাহাতে উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, বিদ্যালগর মহাশয় সে বিষয়ে যত্নবান হইয়াছিলেন । সর্বানন্দ বিদ্যাবাগীশ নামে একজন অধ্যাপক সে সময়ে প্রতিনিধিক্রমে কার্য্য করিতে- ছিলেন । অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, উক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে শেষ দশায় স্থায়িক্রমে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয় । কিন্তু বিদ্যালগর মহাশয় কিছুতেই তাহাতে সন্মত হইলেন না । তাঁহার অসম্মতির প্রধান কারণ এই যে, উক্ত পণ্ডিত মহাশয় অধিকাংশ সময় চেয়ারে বসিয়া নিদ্রা ঘাইতেন । বহুবার নস্ত গ্রহণ করিয়াও তাঁহার নিদ্রানির্মালিত চক্ষু পূর্ণরূপে উন্মীলিত হইত না । সুতরাং তাঁহার অধ্যাপনায় বালকগণের শিক্ষালাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না । দ্বিতীয় কারণ এই যে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তিনি সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপকের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করিতেন । এই দুই কারণে তিনি উক্ত শূন্য পদে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় যাহাতে নিযুক্ত হন, সে বিষয়ে ময়েট সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন । তাঁহার আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া কতৃপক্ষ মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কেই উক্তপদে নিযুক্ত করিলেন । মদনমোহন তখন কৃষ্ণনগর কালেজে ৫০ টাকা বেতনে সান্ত্বনের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন । তাঁহার আসিতে যে কয়েক দিন বিলম্ব হইয়াছিল, বিদ্যালগর মহাশয় নিজে সে কয় দিন পড়াইবার ভার লইয়াছিলেন । সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকের ৭২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে, মদনমোহন কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যালগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ও পাঠ্য বিষয়ের যে যে স্থানে সন্দেহ ছিল, বিদ্যালগর মহাশয়ের সাহায্যে তাহা উদ্ধার করিয়া লইয়া তবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । *

* এই সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অন্য বিদ্যালগর মহাশয়' যে বিশেষ ভাবে কি করিয়া-

সম্পাদক বাবু রসময় দত্তের সহিত তাঁহার বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছিল। স্বকীয় ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইল দেখিয়া, স্বাধীনচেতা ও পুরুষপ্রকৃতি-সম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম পরিভাগ করিলেন। সম্পাদক বাবু রসময় দত্ত ও শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব এত অনুরোধ করিলেন, এত বুঝাইলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পণ আর ভাঙ্গিল না। তিনি সেই যে বিমুখ হইলেন, আর কিছুতেই পরিত্যক্ত পদ গ্রহণে সম্মত হইলেন না। বন্ধবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন অনেক বুঝাইলেন, কেহ কেহ বিবাক্ত হইয়া বলিলেন “চাকরি ছাড়িয়া দিলে থাকে কি ? নির্ভীক বীরপুরুষ তীব্রকঠোর স্বরে উত্তর দিলেন, “কেন, আলু পটল বেচিব, মুদিব দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সে পদ গ্রহণ করিতে চাই না।” স্বাধীনচিন্ততার ইহা অপেক্ষা উচ্চতর দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া যায় না। লোকের অধোনে হইয়া চলা বিভাগাগর মহাশয়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কাহাবও তাঁবদাবি করা, কাহাবও মুখাপেক্ষা করা, কাহারও রূপাদৃষ্টি লাভাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করা, তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি দৃষ্টভাবে আত্মসম্মান বক্ষা কবিয়া চলিবার জ্ঞাত, এই স্বর্গীয় উচ্চ আদর্শ আত্মদিককে দেখাইবার জ্ঞাত, আগ্রহের মধ্যে আদিয়াছিলেন। কর্ম পরিভাগ কবিয়া, এক দিনের জ্ঞাত চিন্তিত বা বিষণ্ণ হন নাহ। সর্বদাই প্রসন্ন ভাবে কালান্তিপাত কবিতেন। বাসায় যে সকল অনাগ ছাত্র আগ্রহ কবিত, তাহাদের কাহাকেও বিদায় কবিয়া দেন নাই। বাটীতে গিয়া সকলের সহিত, পূর্ণের ভায় বেলা মধ্যাহ্ন ও নিশ্চিত ভ্রমণ মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখ কোন প্রকার বিষাদের ভাব দেখা যায় নাই। মধ্যম সংসার দিনবন্ধ যে বেতন পাইতেন, তাঁহাতে কলিকাতার বাসভরচ চলাইয়া প্রতি মাস ৫০ টাকা অর্থ করিয়া গৃহে পিতার নিকট পাঠাইতেন। এই ভাবে কিছু কাল কাটিল। এই অবসর কাগে গৃহ প্রদানের দিকে আরও অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই অবসর সময়ে কয়েক মাস ময়েট সাহেবের অনুরোধ, কাপুন বান্ধ নামক একজন ইংরাজকে সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী শিক্ষা দিয়াছিলেন। সাহেবেব শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর, সাহেব পঞ্চাশ টাকার হিসাবে কয়েক মাসের বেতন এককালীন বিভাগাগর মহাশয়কে দেন। কিন্তু এরূপ অনটনের অবস্থায়ও

নির্লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর, সাহেব প্রদত্ত বেতন গ্রহণ করিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, “আপনি ময়েট সাহেবের পরম বন্ধু, তিনি আমারও পরম আত্মীয়, আমি বন্ধুর অনুরোধে আপনাকে পড়াইতে আদিয়া টাকা লইব কিরূপে?” বর্তমান সময়ে এক দিকে ব্রাহ্মণ বংশের যেরূপ অধঃপতন হইয়াছে, অপর দিকে অর্থলালসা যেরূপ প্রবলভাবে লোকের মনের উপর রাজস্ব বিস্তার করিতেছে, তাহাতে এরূপ ভাগ স্বীকারের কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কনিকাতাব বাগায় প্রতিদিন দুই বেলায় প্রায় ৬০।৭০ খানি পাত পড়িত। প্রতি মাসে ঋণ করিয়া পিতাকে ৫০ টাকা করিয়া পাঠাইতেন; আশ্চর্যের বিষয় এত যে, এত অভাবের ভিতর পড়িয়াও সাহেবের প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করিলেন না। সে সময়ে ৩০০, ৪০০ শত টাকায় তাঁহার বিস্তর আত্মকুণ্ডা হইত, এবং এই টাকা গ্রহণ করিতে, সামান্য শিষ্টাচারের অভাব ভিন্ন, অল্প কোন নোষে তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইত না; তবুও বিপন্ন বিদ্যাসাগর সোভের সুমিষ্ট প্রবোচনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার জন্মের উচ্চতা ও মনের দৃঢ়তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কর্ম পরিত্যাগ করাব পূর্ব ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত কোথাও কোন কর্মকাজ করেন নাট। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ভাগতলা নিবাসী চর্চাগাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড্‌ রাইটারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া কর্ম করিতে করিতে, মেডিকেল কালেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি ঐ বৎসর ডাক্তার হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করায়, ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে উক্ত পদ শূন্য হয়। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টাতেই চর্চাগাচরণ বাবু উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মার্শেল সাহেবের নিরতিশয় আকিঞ্চন ও অনুরোধেব বশবস্ত্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ৮০ টাকা বেতনের উক্ত পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন উক্ত পদে থাকিতে হয় নাই। সংরত কালেজের যে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে, চন্দনমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই

পদ শূন্য হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় দুরারোগ্য উদরাময় পীড়ার প্রকোপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।* ঐ সময়ে মুরশিদাবাদে জজ পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। ভারতবন্ধু বেথুন সাহেব তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং কোন প্রকারে তাঁহার হিতসাধন করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার পরম বন্ধু বেথুনের সাহায্যে উক্ত জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তথায় গমন করেন। তাঁহার কলিকাতা ত্যাগে সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যেব অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্ত শূন্য পদ গ্রহণ করিতে বলায়, প্রথমে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাতাকে পুনরায় সংস্কৃত কালেজে আনিবার জন্ত, কর্তৃপক্ষীয়ের অত্যধিক আকিঞ্চন দেখিয়া, তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ ও তৎপরে কি সূত্রে সেধানকার অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন, প্রসঙ্গক্রমে তাহাব বিস্তৃত বিবরণ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাব “বেতাল পঞ্চবিংশতি” নামক গ্রন্থেব একাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ কবিসাছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহাব নিজের কথাগুলি উদ্ধৃত করাটী সর্বাংশে শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়, তিনি বলিতেছেন :—

“তিনি + ১৮ পৃষ্ঠার ‡ লিখিতেছেন—

“সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। একুণ গুনিতে পাট, বেথুন তর্কালঙ্কারকে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন।

তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের যোগ্য বলিয়া বেথুনের নিকট আবেদন করার বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত কবিত্তে বাধ্য হইলেন। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তর্কালঙ্কারের ন্যায় সদাশয়, উদারচরিত্র ও বুদ্ধিহন্তরী ব্যক্তি অতি কম ছিলেন। জন্মের বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অতিবিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।”

* শ্রীমত বোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ প্রণীত তর্কালঙ্কার জীবনী ১০ পৃষ্ঠা।

† শ্রীমত বোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ।

‡ অবদমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত ১৮ পৃষ্ঠা।

“গ্রন্থকর্তার” কল্পনা শক্তি ব্যতীত এ গল্পটির কিছুমাত্র মূল নাই। মদন-মোহন তর্কালঙ্কার, ইংরাজী ১৮৪৬ সাল সংস্কৃত কালেক্সে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন; ইংরাজী ১৮৫০ সালের নবেম্বর মাসে, মুরশিদাবাদের জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, সংস্কৃত কালেক্সে হইতে প্রস্থান করেন। তর্কালঙ্কারেব নিয়োগ সময়েও যিনি (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেক্সেব অধ্যক্ষ ছিলেন, তর্কালঙ্কারের প্রস্থান সময়েও তিনিই (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেক্সেব অধ্যক্ষ ছিলেন। ফলতঃ, তর্কালঙ্কার যতদিন সংস্কৃত কালেক্সে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় মাদ্য, একদিনের জন্তও ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয় নাই। সুতরাং সংস্কৃত কালেক্সে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়াতে বেণুনা সাহেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ঐ পদে নিযুক্ত কবিত্তে উদ্যত হইলে, তর্কালঙ্কার, দেওয়ানগণের আতিশয়া বশতঃ, আমাকে ঐ পদের দোয়া বিবেচনা করিয়া, ও বঙ্গদেশেব বশীভূত হইয়া, বেণুনা সাহেবকে আমার জন্য অনুরোধ করাত, আমি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ইহা কিরূপ সম্ভবিত পাবে, তাহা যোগেশ্বর বাবু বলিতে পারেন।

“আমি যে হাদ্দ সংস্কৃতকালেক্সেব অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হই, তাহাব প্রকৃত বৃত্তান্ত এই— মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃতকালেক্সে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজেব তৎকালীন মোকদ্দমি শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাকার মাসেট সাহেব আমাকে ‘ঐ পদে নিযুক্ত কবিত্তাব অভিপ্রায় পকাশ’ করেন।*

আমি নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রত্যাখ্যাত করি। পবে, তিনি সবিবেশ যত্ন ও আশ্রিত প্রকাশ করাত, আমি কঠিরাছিলাম, যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে শিক্ষাপালন ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি। তিনি আমাব নিকট হইতে ঐ মাস্ত্র এক খানি পত্র লিখিয়া দায়ন। তৎপরে, ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেক্সে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কালেক্সের অধ্যক্ষতা পদ পবিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কালেক্সেব বর্তমান অবস্থা, ও উক্তকালে

কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয় । তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষাসভা আমাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন । সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা কাৰ্য্য সেক্রেটারি ও অসিস্টেন্ট সেক্রেটারি এই দুই ব্যক্তিদ্বারা নির্বাহিত হইয়া আসিতেছিল, ঐ দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল ।

“১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম ।

“যোগেশ বাবুর গল্পটির মধ্যে, “এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়,” এই কথাটি লিখিত আছে । তাহার বহুকাল অবধি, সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত আছেন, অথবা যাহারা কোনও কপে সংস্কৃত কালেজের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও এরূপ জনশ্রুতি কণ্ঠগোচর করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না । যাহা শুদ্ধ মর্মে দৈবাৎ এরূপ অসম্ভব জনশ্রুতি কোনও স্থানে যোগেশ বাবুর কণ্ঠগোচর হইয়াছিল, ঐ জনশ্রুতি অমূলক অথবা সমূলক, তাহার পরীক্ষা করা তাহার আবশ্যক বোধ হয় নাই । আবশ্যক বোধ হইলে, অনায়াসে তাহার সত্যতা ভেদন হইতে পারিত । কারণ, আমার নিয়োগ বৃত্তান্ত সংস্কৃতকালেজ-সংক্রান্ত তৎকালীন বাস্তবিকভাবেই বিগত অবগত আছেন । যোগেশ বাবু সংস্কৃত কালেজের ছাত্র, যে সময়ে তিনি আমার নিয়োগের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, বোধ হয়, তখনও তিনি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতে ন ।

“যদি সবিশেষ জানিয়া যথার্থ ঘটনা নির্দেশ করা তাহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, আমার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত তাহার অপরিচ্ছন্ন থাকিত না ।

“ইংরাজী ১৮৪৬ সালে, পূজাপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয় । সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমার ঐ পদে নিযুক্ত

করবেন স্থির করিয়াছিলেন। * আমি, বিশিষ্ট হেতু বশতঃ, অধ্যাপকের গদ্যে
এখানে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত,
সবিশেষ অনুরোধ করি।† তদনুসারে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদে নিযুক্ত
হইলেন। এই প্রকৃত বক্তব্যটির সহিত যোগেন্দ্র বাবুর কল্পিত গল্পটির বিলক্ষণ
সৌসাদৃশ্য দৃষ্টমান হইতেছে।”

“শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্মা।”

কলিকাতা।

“১লা পৌষ, সংবৎ ১৯৩৩।”

বিভাগাগর মহাশয়ের শেষ কথাগুলির প্রমাণ প্রয়োগ নিম্নরোজন হইলেও
৬শ্রামাচরণ বিশ্বাস (দে) মহাশয়কে বন্ধুবিচ্ছেদজনিত শোকে অভিভূত হইয়া
তর্কালঙ্কার মহাশয় যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাই নিয়ে উক্ত করিয়া আদর্শ
বিষয়ান্তরে হস্তক্ষেপ করিব :—

“ভ্রাতঃ! ক্রমশঃ পদোন্নতি ও ডেপুটি মাজেট্রী পদপ্রাপ্তি যে কিছু বল,
সকলই বিভাগাগরের সহায়তা-বলে হইয়াছে। অতএব তিনি যদি আমার
প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন, তবে আর আমার এই চাকরী করার কাজ
নাই; আমার এখনই ইহাতে ইস্তফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া
উচিত; শ্রাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব; আমি এই সবজিভিঞ্জে
আসিয়া অবধি যেন মহা সাপরাধীর জায় নিভাঁজ্ঞান ও ফুর্ডিহীন-চিত্তে কণ্ঠ
কাঁড় করিতেছি। অথবা আমার অনুরোধ ও মনোপ্রার্থনার পরিচয় আর কি
মাথা-মুণ্ড জানাটব, আমার বালাসহচর, একজনর, অমায়িক, সহোদরাদিক
পরম বান্ধব বিভাগাগর' আজি ৬ ছয় মাস কাল হইতে আমার
সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই। আমি কেবল জীবন্তের জায় হইয়া
আছি। শ্রাম! তুমি আমার সকল জান, এই জন্তে তোমার নিকট এত
দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম।”

বিভাগাগর মহাশয় আশ্চর্য্যকর চিরদিনই সজম ছিলেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে

* এই সময়ে আমি সংকট কালেজে আসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলাম।

† এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলকাতার কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে
নিযুক্ত ছিলেন।

বক্তব্য কিছুই নাই, কেবল হৃৎ এই যে, “একপাশে পাই” ও “এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়” ভিন্ন অন্য কোন বিশিষ্টরূপ প্রমাণ না পাইয়া বিভাগভূষণ মহাশয় কেন যে এমন একটা গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিলেন, ইহাই আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার অতীত ।

বাহা*ইউক ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পরিবর্তে ১৫০ টাকা বেতনে অধ্যক্ষের নতুন পদের সৃষ্টি হইল । এক্ষণে তিনি সংযুক্ত কালেক্সের অধ্যক্ষরূপে ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের সুযোগ পাইয়া কি কি কার্য করিলেন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে ।

এই পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুবিস্তৃত হৃদয়ে গভীর দায়িত্ব-জ্ঞানের সঞ্চার হয় । কি উপায় অবলম্বন করিলে, সংযুক্ত কালেক্সের ও সমগ্র শিক্ষা বিভাগের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়, সেই গুরুতর প্রশ্নের বিশদ মীমাংসার জন্য নিজের সমগ্র বিদ্যা বুদ্ধির নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং শরনে, স্বপনে, স্বজনে ও নির্জনে সর্বদা এই একই চিন্তা তাহার মনের উপর রাজত্ব করিত । উক্ত পদ গ্রহণ করিয়া সৰ্ব্বাঙ্গে অতি আবশ্যকীয় ও চম্পাণ্য সংযুক্ত সাহিত্য পুস্তকগুলির কলেবর পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিলেন । অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের আমলের হস্তলিখিত পলিত গলিত পুঁথিগুলি প্রায় দেহভাগ করিতেছিল, তিনি সৰ্ব্বাঙ্গে তাহাদের মূত্রিত সংস্কার প্রকাশ করাইয়া শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর আশীর্বাদভাজন হইয়াছিলেন । অধ্যাপক ও অধ্যয়নকারী সমভাবে তাহার এই অহুষ্ঠানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । এতদ্বিত্ত তিনি দর্শন-শাস্ত্রের পুঁথিগুলিও পুনর্মুদ্রিত করাইয়াছিলেন ।

শিক্ষকমণ্ডলী অধিকাংশই তাহার শিক্ষক । ‘এই’ জন্ত তিনি সর্বদাই একটু কুণ্ঠিত থাকিতেন, সম্মুখে কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না । কালেক্সের শিক্ষকগণ বাহাতে উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত, হইয়া নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হন, সে বিষয়ে বহু চেষ্টা করিয়াও যখন বিফলমনোরথ হইলেন, তখন বহু চিন্তা করিয়া এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করিলেন । বিভাগাগর মহাশয় সে সময়ে সংযুক্ত কালেক্সের উপর তালার বাস করিতেন । সাত্বে দশটার পর হইতে একটু দূরী রাখিতে আরম্ভ করিলেন । যখনই দেখিতেন, কেহ বিলম্বে আসিতেছেন, অমনি সম্বরণে বিভাগাগর দ্বারদেশে উপস্থিত

হইয়া সমাগত^১ অধ্যাপককে বলিতেন, “এই এলেন নাকি?” সপ্তাহকাল এইরূপ করিত না করিতে সকল শিক্ষকই ষষ্ঠাসময়ে আসিতে আরম্ভ করিলেন।* ক্রমে নিয়মিত সময় উপস্থিত হওয়া এক প্রকার প্রচলিত হইয়া গেল। কেবল অধ্যাপক ৮ জয়নাবারণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে “এই এলেন নাকি” একথাও বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তিনিই আবার সকলের অগেফা অধিক বিলম্বে আসিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গুরুব আগমন প্রতীক্ষায় কালোজব ভারদেব^২ নীরবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। ক্রমাগত এইরূপ করায়, সদ্ধ শিক্ষক একদিন মার্শ্ব মন্দির ধারণ করিয়া ছাত্র-অধ্যাপককে বলিলেন, “তুমি যে কিছু বণ না, এতই সপ্ননাশ করিলে। কথা কহিলে একটা জবাব দিতে পারিতাম, কি জ্ঞান দেনি চয় তাও বলিতে পারিতাম, এমন করে জ্ঞান করিলে আর উপায় কি?” আচ্ছা, নবি তাব মাটি, কাল চউতে ঠিক সময়ে আসিল।”† তৎপূর্বে অধ্যাপকগণের আসিবার সময়ের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি ছিল না।

তিনি মরমা এক নতুন আন্দোলনের কার্য্য হস্তক্ষেপ করিলেন। সংস্কৃত কালোজব সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কেবল ভাষ্কর ও বৈদ্যর সম্মানের শিক্ষাগ্রাভ করিত, বৈদ্য বা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত পাইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন অপর সমগ্র সংস্কৃত শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের সমস্ত জ্ঞাতিকেই দেওয়া যাইবে। কলিকাতা ও অল্প নানা স্থানের অধ্যাপকমণ্ডলী এই প্রস্তাবে গম্ভীরভাবে আশঙ্কিত হইয়া দেবভাষা সংস্কৃতের চর্চায় সকলকে অধিকার দিতে অসম্মত হইলেন এবং প্রাণপণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধ পক্ষ জেবল কবিবাব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাহা ধরিতেন, তাহাই করিতেন, সে কাণ্ড বাধা পাইলে, তাহা সম্পন্ন করিবার জ্ঞান বজ্জার জালব ছায়, বাতাতাড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের ছায় তাঁহার হৃদয়েব আবেগ ও মনের উৎসাহ তত্তত্তা উৎখলি উঠিত। বিরোধী অধ্যাপকমণ্ডলীকে তিনি এ কথাও

১ বঙ্গমহানিবাসী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্তঃসত্ত্ব বন্ধ ডাক্তার গজানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

† এইরূপ পণ্ডিত রামচন্দ্রের স্ত্রীচন্দ্র মহাশয়ের নিকট তর্কপঞ্চানন বিদ্যক ঘটনাটি শুনিয়াছি।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যদি শূদ্রের সংরক্ষণের অধিকার না থাকে, তবে সর্বজন সমাদৃত রাখা রাখাকাত্ত ঘেব বাহাদুর শূদ্রকুলোদ্ভব হইয়া সংরক্ত চর্চার কিরূপে অধিকারী হইলেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীই বা সে প্রকার অনধিকারীর শাস্ত্রালোচনার প্রতিরোধ করেন নাই কেন ? তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া তাঁহার প্রতীক্বেব পোষকতা করিতে ক্রটি করেন নাই । প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, আপনারা (বিরোধী অধ্যাপকমণ্ডলী) যদি শূদ্রাদি নীচজাতীর ছাত্রদিগকে সংরক্ত শিক্ষা দিতে এতই অসম্মত, তবে কোন্ ধর্মবুদ্ধি অনুসারে আপনারা বেতন লইয়া সাহেবদিগকে সংরক্ত পড়াইয়া থাকেন ? এবং বিধ নানা প্রকার প্রবল যুক্তিযোগে বিদ্যাসাগর মহাশয় একাকী হইয়াও শত জনের বলবিক্রম দেখাইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন । তদবধি সংরক্ত কালেজে অল্প জ্ঞানী সকলের প্রবেশ লাভ ও শিক্ষাপ্রাপ্তির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে । বিদ্যা-সাগর মহাশয় যে শিক্ষাবিস্তার ও লোকের জ্ঞানবুদ্ধির পরম বন্ধ ছিলেন, এই এক ঘটনাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল ।

১২৫৬ সালের ৩০শে কার্তিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম সন্তান পুত্র নারায়ণ চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । পত্নীর সন্তান সম্ভাবনার কাল অতীত হওয়ার সকলে চিন্তিত হইয়া পড়েন । নারায়ণের ঔষধ সেবনে সন্তান হওয়ার পুত্রের নারায়ণচন্দ্র নাম রাখা হইয়াছিল । তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মাবধি চারিটী কন্যা হইয়াছে ।

ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদর হরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিখাইবার মানসে কলিকাতার আনিয়াছিলেন । সে বালক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন । দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রূরুণে অপর সহোদর হরিন্দ্রকে লেখা পড়া শিখাইবার মানসে কলিকাতার আনিয়াছিলেন, সে বালকও পূর্ববৎ অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিন্ধুচিকিৎসারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল । বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন । তাঁহার কোমল জন্ম পুনঃ পুনঃ ভ্রাতৃবিয়োগ শোকে রান হইয়া পড়িতে লাগিল । তিনি সর্বদাই অতি বিষমভাবে কান্নাতিপাত করিতেন, একদিকে কালেক্টরের সমগ্র দায়িত্বভার নিজ হস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য পালন করিতে তিনি সदा প্রস্তুত ; সেই সকল দায়িত্বপূর্ণ কার্যকলাপের

মধ্যে এইরূপ দ্বৈতের আধার কনিষ্ঠ সহোদরগুলি এক একটা করিয়া চলিয়া যাউতাহে, ইহাতে তাঁহার ব্রাহ্মবাস্তব্যপূর্ণ হৃদয় ব্যথিত হইবে এবং তাঁহার মানসিক শক্তি ও প্রকৃতিগত সহিষ্ণুতা ক্ষীণ হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? কৰ্ম্মকাণ্ডের অত্যধিক বাস্তবতা ও এবংবিধ মানসিক অশান্তির মধ্যে পড়িয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তাঁহার সুকঠিন শিরঃপীড়ার সূচনা হইল। এই পীড়ায় তিনি অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। বহুকালব্যাপী স্মৃতিকিংসারও তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। পীড়ার প্রকোপের হ্রাস হইল বটে, কিন্তু তিনি একেবারে রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না। যখনই বহুশ্রমসাধ্য কার্যে দীর্ঘকালের জ্ঞান ব্যাপ্ত হইতেন, তখনই সে রোগ-বন্ধি অগ্নে অগ্নে দেখা দিত। এবার ভাইগুলিকে বাড়ী না পাঠাইয়া পুত্রশোকদগ্ধা জননীকে কলিকাতায় নিজের নিকট আনিয়া রাখিলেন। অনেক সময়ে মা ও ছেলেতে একত্র হইয়া রোদন করিতেন। জননী নিজহস্তে রন্ধনাদি করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন এজন্য এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদা আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন এবং জননীর সাহায্য বিধানার্থে বহু অর্থব্যয়ে বিবিধ আয়োজন করিয়া মায়ের রন্ধন ও পরিবেশনে সকলকে আহ্বার করাইতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর, যখন জননীর শোকের তীব্রতার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, তখন জননীকে পুনরায় দেশে পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চির দিনই পিতামাতা, স্নেহোদর সহোদরা ও আত্মীয় কুটুম্বের সেবা শুশ্রূষায় সুখানুভব করিতেন, তাই এই সকল প্রকার বিপদে আপনাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া ফেলিতেন।

এতাবস্থায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃন্দের বেতন লাগিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় নূতন প্রবেশাগিণের পক্ষে বেতনের ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রস্তাবমত নূতন প্রবেশার্থীর বেতন ধার্য হয়। কেহ কেহ এই কার্যের জ্ঞান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কিঞ্চিৎ আশু-প্রসাদ সম্বোধন করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতের নিষেধার্থে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে, অসমর্থ ছাত্রগণের সুবিধার্থে নিয়ম করা হইয়াছিল যে, নির্দিষ্টসংখ্যক দরিদ্র বালক বিনাবেতনে বিদ্যালয়ের পড়িতে পারিবে এবং সে নিয়ম অদ্যাপি বিদ্যমান

রহিয়াছে। আর কটাক্ষকারী উদারচেতা ও দরিদ্র-বদ্ধ মহাত্মাদের কাহান্যও অপেক্ষা তিনি যে দুঃসাহসিকণে ও সহদয়তার নূন ছিলেন না, তাহা বোধ হয় সৰ্ববাদিসম্মত। তিনি দূরদর্শী লোক ছিলেন, তিনি জানিতেন, বেষ্টিক, মেটাক্স, ক্যানিং, সার হাইড, হেয়ার, বেথুন প্রভৃতি প্রান্তঃস্বরণীয় লোক বিদেশীয়দের মধ্যে অধিক পাওয়া যায় না। তিনি বিদ্যাক্ষণ অবগত ছিলেন যে, ব্যয় সঙ্কোচের দিকে রাজকৰ্মচারীদের যখন দৃষ্টি পড়িবে, তখনই এই বিনা বেতনে শিক্ষা দান উঠিয়া যাইবে। কেবল উঠিয়া যাইবে তাহা নহে, রাজসংসারের অভাব হইলে, স্নদসমেত দ্বিগুণ ত্রিগুণ আদায় হইবে। তিনি ইহা বুঝিয়াই, অগ্নে অগ্নে রক্ষা কবিতা গিয়াছেন। “বুদ্ধিমান” লোক মাঝেই ইহাতে তাঁহার “কুনাম” না গাইয়া “সুনাম”ই গান করিবেন।

বিভাগাগর মহাশয় সংস্কৃত কালোজের সৰ্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনকল্পে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং সৰ্বদা চিন্তা কবিতেন কোথায় কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, শিক্ষা সুপ্রাণালীসম্পন্ন ও সহজ হইবে। দেবভাষা সংস্কৃতের প্রবেশদ্বার, ব্যাকরণরূপ সূদৃঢ় লৌহময় কবাট দ্বারা সুবক্ষিত। এই দ্বাব অতিক্রম কবিতা সংস্কৃত সাহিত্যের সুরমা কাননে পরিভ্রমণ করিতে ও কাব্যেব সুমঙ্গল মলয়ানিল বাহিত সুরভি-ভার সন্তোষ করিতে অতি অল্প লোকেই সক্ষম! কি উপায় অবলম্বন করিলে এই লৌহ-কবাট সহজে মুক্ত করিতে পারা যায়, তিনি সেই চিন্তায় বিভ্রত হইয়া পড়িলেন। পাণিনি ও বোপদেব ব্যাকরণ রচনা করিতা যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, বিভাগাগর মহাশয় যে কেবল সেই অমরত্ব লাভ কবিতাছেন, তাহা নহে, পূৰ্ব পূৰ্ব সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রাণেভারা সংস্কৃতচর্চার যে দুঃসহ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার স্থলে বিভাগাগর মহাশয় সুকৌশলসম্পন্ন সহজ দ্বার উপক্রমণিকা রচনা করিতা সংস্কৃত শিক্ষা দান সরল ও সুগম করিয়াছেন এবং তদ্বারা সংস্কৃতভারতী বস্তুত্বমাত্রেরই পরম বদ্ধ হইয়াছেন, এবং সৰ্ব্বাপেক্ষা নিজের বিভা ও বুদ্ধিমত্তার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে নিজের মস্তিষ্ক পরিচালন দ্বারা নিজের উদ্ধাবনী শক্তির সাহায্যে নূতন কিছু করিতে পারেন, তাঁহার রচিত উপক্রমণিকাই তাহার প্রথম ও সৰ্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার যে প্রবল প্রোতঃ এ দেশে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার মূলে বিভাগাগর মহাশয়ের

উপক্রমণিকা ও পরবর্তী ব্যাকরণগুলি বহুল পরিমাণে কার্য্য করিয়াছে। আবার যখন জানা গেল যে, সেই উপক্রমণিকার প্রথম পাণ্ডুলিপি * এক রজনীর করেক ঘণ্টা মাত্র সময়ে রচিত হইয়াছিল, তখন বিশ্ববিস্ময় হইয়া তাঁহার বিচিত্র শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এ হেন বিভাগসাগর মহাশয়কে এক শ্রেণীর লোক কেবল সকলকর্ত্ত অমুমানক বলিয়া অনাদর করিতে কুষ্ঠিত হন না। তাঁহার একটু স্থির চিন্তে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন, স্বাধীন চিন্তাবোগে নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত রামগতি জায়রম মহাশয় লিখিয়াছেন,—“বিভাগসাগর বাঙ্গালাভাষার সংস্কৃত ব্যাকরণের যে উপক্রমণিকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্বারা দেশমধ্যে সাধারণতঃ সংস্কৃত শিক্ষা-বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্বে অনেক দিন হইতে ইংরাজী ভাষার কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত শিখিতে অসিদ্ধা হইত, কিন্তু উহার দ্বারে যে ভীষণমুষ্টি ব্যাকরণ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে দেখিয়া কেহই নিকটে ঘেসিতে পারিতেন না। বিভাগসাগর সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে কি পল্লী, কি নগর সর্ব্বত্রই বিভাগসাগরকে দেখিয়া বলিবে, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই যে কিছু না কিছু সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেছেন, উপক্রমণিকা দ্বারা ব্যাকরণের চর্চ্চাপথ পরিষ্কৃত হওয়াই তাহার মূল কারণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে, এক্ষণকার সংস্কৃতভাষীলনকারীদিগের মধ্যে কল্পনের ভাগ্যে সংস্কৃত শিক্ষা করা ছাড়া উঠিত? ফলতঃ বিভাগসাগরের যদি আর কোন কার্য্য না থাকিত, তথাপি উপক্রমণিকাদি রচনা দ্বারা সংস্কৃত ভাষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, এই একমাত্র কার্য্যের জন্তও দেশীয় লোকদিগের নিকট তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেন সন্দেহ নাই।” + বিভাগসাগর মহাশয় দেখিলেন যে ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া অল্পবয়স্ক ছাত্রগণকে রত্নবংশ প্রকৃতি স্মৃতিষ্টন গ্রন্থ পাঠ করান রূপা সময় নষ্ট করা মাত্র। কোমলমতি বালকগণ

* বিভাগসাগর মহাশয় তাঁহার বহু স্মৃতিস্তম্ভ রাক্ষস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার সোপানরূপে উক্তগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়াছিলেন।

+ বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ১২৭ পৃষ্ঠা।

সহজে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারে না । বিভাগায়ের এই গুরুতর অভাব মোচনার্থে তিনি সহজবোধ্য সংস্কৃত গ্রন্থ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ ও মহাভারত প্রভৃতি হইতে সঙ্কলন করিয়া ঋতুপাঠ নাম দিয়া তিনখানি পুস্তক প্রচার করেন । এতদ্বারাও সংস্কৃতশিক্ষা বালকগণের শিক্ষা লাভের লব্ধ সহজসাধ্য হইয়াছিল । ঋতুপাঠের অসুকরণে অনেকে সরল সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন সত্য, তথাপি তাহার সেই ঋতুপাঠের ভাগ্যবশতই এতাবধিকাল বহল পরিমাণে বালকগণের পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

বঙ্গদেশে সর্বত্র “বিভাগারে যে গ্রীষ্মাবকাশ হইয়া থাকে, বিভাগাগর মহাশয়ই যে, ইহার প্রথম প্রবর্তক অনেকেই তাহা অবগত নহেন । কলিকাতার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্মের অসহনীয় উত্তাপে লোক ছুটু কটু করে । এক্ষণ প্রথর তাপমাত্রা মধ্যাহ্ন সময়ে অত্যধিক পরিভ্রমে বালকগণের শরীর মন নিস্তেজ ও অসুস্থ হইয়া পড়ে ; এই জন্ত বিভাগাগর মহাশয় শিক্ষা সমাজকে অসুস্বাদু করিয়া ছুইমাস গ্রীষ্মাবকাশ মজুর করাইলেন । এই হইতে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ক্রমে ক্রমে গ্রীষ্মের ছুটি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে ।

সংস্কৃত কালেজের অধ্যাক্ষতা কার্যে নিবৃত্ত হইয়া যখন এই সকল নূতন পরিবর্তন দ্বারা কালেজের ও সমগ্র শিক্ষাবিভাগের বিবিধ উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন, তখন তাহার কার্যকলাপের বশঃসৌরভে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল । কালেজে অধ্যাপকগণ ও সহরের অন্ত্যস্ত সম্রাট মহোদয়গণ বিভাগাগর মহাশয়ের কার্যকুশলতা সন্দর্শনে প্রীতি হইয়া তাহার প্রচুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ইংরাজবংশে রাজপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই তাহার সহিত আলাপ করিয়া, তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে এক অসাধারণ লোক মনে করিতে লাগিলেন । মার্শেল এবং মন্টে সাহেব বহুপূর্ব হইতেই তাহার গুণের পক্ষপাতী ছিলেন, এক্ষণে ইহার কিছু পূর্ব হইতে শিক্ষাসমিতির প্রেসিডেন্ট ভারতবর্ষ সভ্যর ডিক্‌গরটোর বেথুনের সক্তি তাহার পরিচয় হয় । ১৭১০ খৃষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর কালের বিভাগাগরবৃত্তি এতই সুন্দর, এতই চিত্তসুন্দর যে, ঐকি ইংরাজ, ঐকি বাঙ্গালী

যিনি দেখিতেন, তিনিই আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার কোমলতাময় বীরত্বব্যঞ্জক, সে মুখমণ্ডলে প্রতিভার পরাক্রম পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহার সে মধুর লাবণ্যভরা স্বর্ভি সন্দর্শনে একদিকে যেমন হার্ডিঞ্জ, ডালহাউসি, ক্যানিং ও অস্তান্ত সম্রাট ইংরাজমণ্ডলী সম্মান সহকারে নতমস্তক হইতেন, অপর দিকে আবার দেশীয় রাজস্ববর্গ ও বকীর লক্ষপতি ভূমিদারগণ তাঁহার আত্মীয়তা ও মেহদৃষ্টির অনুগত হইয়া চলিতে সন্মানভব করিতেন। এক দিকে বেথুন, বিডন, গ্রে, গ্রান্ট, হালিডে প্রভৃতি সম্রাট ইংরাজগণ, অপর দিকে ৮প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা জৈধরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি সম্রাট মহোদয়গণ তাঁহার আত্মীয়তা ও শ্রীতিকর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ের মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত সন্তানাদিহে তাঁহার অত্যধিক মেহ মমতা ও আদরের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। জল দ্বারকানাথ, বক্তা রামগোপাল এবং হরচন্দ্র, রামতনু, কালীকৃষ্ণ, কালীচরণ, জগদীশচরণ, শিবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, প্যারীচরণ ও রাজনারায়ণ প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহার সুবিস্তৃত হৃদয়ে নিরুবেগে বাস করিতে পাইতেন। নিরন্তর দরিদ্র নরনারীমণ্ডলীর সহিত তাঁহার এতদপেক্ষাও দৃঢ়তর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়লাট ও ছোটলাট ভবনে বহুসময়কাল উপবিষ্ট, যে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের পাখুরিয়াঘাটা-‘প্রাসাদে’ বহু সম্মানে গৃহীত ও সমাদৃত, যিনি পাইকপাড়া রাজত্ববনে পুঞ্জিত, সেট বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দরিদ্রের পর্ণকূটারে মূম্বু’ রোগীর শয্যাপার্শ্বে প্রাতঃসন্ধ্যা সেবাসুশ্রীয়া নিযুক্ত। কি অপূর্ণ দৃশ্য! কি মধুর চিন্তা!! ভাবিতেও কি প্রাণে সাগরতরঙ্গসদৃশ আনন্দোচ্ছ্বাসের আবির্ভাব হয় না? তবে একটা ঘটনা শুন। যখন তিনি অত্যধিক অল্পস্থ হইয়া পড়িতেন, তখন কিছু দিন বিশ্রাম লাভার্থে খরমাটাড়ে যাইতেন। কিন্তু যতাবত আর পরিবর্তিত হইবার নহে। লোকের চুঃখ কষ্টের স্বেচ্ছাশ্রমতায় তাহার উদ্দেশ্য গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। একদিন প্রাতঃকালে এক মেথর কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল :—“আমার ঘরে মেথরাণীর কলেরা হইয়াছে,



Shree Guruswami Maharaj

বাবা, তুমি কিছু না করিলে ত আর উপায় নাই ।” তখন বিভাগাগর মহাশয় কি করিলেন পাঠক তুমিতে চাও ? এক ভৃত্যের দ্বারা কলেন্দার ঔষধের বাক্স আর একটা বসিবার মোড়া লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অশুভ ব্যক্তির অপরিস্কৃত তথ্য পৰ্ণকূটীয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সমস্ত দিন সেই মলরাশির মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন । প্রায় সন্ধ্যার সময়ে সে রোগীকে এক প্রকার নিরাশয় করিয়া গৃহে আনিয়া স্থানান্তর করিলেন ।* পাঠক ! একবার চিন্তা কর, দয়াদাক্ষিণ্যের অনন্ত পরিচয় না হইলে, যেহে মমতার জীবন্ত মূর্তি না হইলে কি কখন এরূপ সজবিত্তে পারে ? বিধাতার চক্ৰস্বৰ্ণাই ঘরে ঘরে কিরণ বিতরণ করে, বিধাতার বরপুত্র চক্ৰচক্ৰে ও চক্ৰস্বৰ্ণের স্তায় বজ্রের গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন । এক্ষণে কথা এই যে, লাটদরবারে অনেকেই যার, বড়লোকের বাড়ীতেও অনেক যার, কিন্তু যারা যার, তারা আর গরীবের ঘরে যার না, গরীবের সংবাদ রাখে না । বিভাগাগর-চরিতের মহত্ব ও মাধুর্য এই দারিদ্র্য নিপীড়িত মরনারী-মণ্ডলীর সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপনের মধ্যে লুভ্যস্থিত আছে । এই ভাবেই তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাঁহার এতাদৃশ লোকবিরল ও দেবপ্রকৃতিস্বলভ উদার আচরণেই তিনি বজ্রের চিরশ্রিয় হইয়া থাকিবেন ।

বিভাগাগর মহাশয় কালেক্টর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষের দ্বারা অসুখ হইয়া কালেক্টর সৰ্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনোপযোগী এক রিপোর্ট প্রদান করেন । তদ্ব্যতীত কর্তৃপক্ষ ময়েট সাহেব গভৰ্ণমেন্টকে অসুখের কবিত্বী বিভাগাগর মহাশয়ের বেতন ১৫০০ টাকার স্থলে ৩০০০ টাকা করিয়া দেন এবং তাঁহার পরামর্শমত কালেক্টর বহুবিধ আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করেন । বিভাগাগর মহাশয় কালেক্টর উন্নতি সাধনের জন্য যেমন চিন্তা করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা বিস্তারের সহপায় সকলও চিন্তা করিতেছেন । তাঁহার একত রিপোর্টে বঙ্গ দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভাগের স্থাপন এবং সেই সকল বিভাগের উপযোগী শিক্ষক প্রেরণকরণ জন্য সর্বদা যত্ন স্থাপনের প্রস্তাবও উল্লিখিত হইয়াছিল । তদনুসারে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০০ নত

* আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই ঘটনায় এবং এইরূপ বহুবিধ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি । যে সকল বখানায় একাধিক হইবে ।

টাকা বেতনে বিদ্যাগাগর মহাশয়কে অতিরিক্ত ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত করিয়া গভর্নমেন্ট তাঁহার উপর নবীরা, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই চারি জেলার নানান্থানে বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার পরিদর্শন ভার অর্পণ করেন। এই উক্ত পদের মোট বেতন হইল ৫০০ টাকা। তাঁহারই অনুরোধ মত কলিকাতার সর্বপ্রথম নব্বাল স্কুল স্থাপিত হইল, এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার সংযুক্ত কালেক্টর অধ্যক্ষ বিদ্যাগাগর মহাশয়ের উপর স্তব্ধ হইল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে পর স্বনামধ্যাত অক্ষরকুমার দত্ত মহাশয়কে উক্ত বিভাগের প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগ করেন। বহু পূর্বে সভাবাজার রাজবাটীতে রাখাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা বাবু শ্রীনাথ ঘোষ ও দোহিত্র বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট যাতায়াত উপলক্ষে অক্ষর বাবুর সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। তত্ত্বাবোধিনী সভার নুচনা হইতে বিভাগাগর মহাশয় ও অক্ষর বাবুর মধ্যে গভীর প্রীতি ও আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের প্রীতি ও আত্মীয়তা অক্ষর ভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুরক্ষিত হইয়াছিল। বহু পরিশ্রম নিবন্ধন অক্ষর বাবুর হারারোগ্য শিরঃপীড়ার নুচনা হইল। প্রথমে কিছুকাল বিদায় লইয়া রোগ মুক্তির অস্ত্র চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসার কোনও প্রকার ফল না হইলেও, তিনি আর সে কঠিন পীড়ার আক্রমণ হইতে নিরুত্তি পাইলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া কষ্ট পরিত্যাগ করিলে পর, বিভাগাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার প্রিয়পাত্র ও 'স্বের' পাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্য উক্ত পদ গ্রাপ্ত হন। বিভাগাগর মহাশয়ের বালাসহচর মধুসূদন বাচস্পতিও উক্ত বিভাগের অস্ত্রতম শিক্ষক ছিলেন। ইতিপূর্বে সংযুক্ত কালেক্টে ইংরাজী পড়ার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু কেন প্রকার বাধাবোধ ছিল না; যাহার ইচ্ছা হইত পড়িত, যাহার ইচ্ছা না হইত সে পড়িত না। বর্তমান অধ্যক্ষ নিয়ম করিলেন, প্রত্যেক বালককেই অস্ত্রান্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া যেরূপ নম্বর সাধিতে হয়, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে ইংরাজীতে পরীক্ষা দান এবং সে পরীক্ষার নম্বরও বিশেষরূপে বিবেচিত হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ার বিভাগে সকল বালকেই আগ্রহ সহকারে ইংরাজীও শিখিতে লাগিল। হিন্দু কালেক্টর বেডেলগ্রাপ্ত ও ৫০ টাকা ইতিমধ্যে বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়কে সংযুক্ত

কালেজের ইংরাজী শিক্ষকের অগ্রণীকরণে নিযুক্ত করাইলেন। সর্বাধিকারী মহাশয় কাজকর্ম চেষ্টা করিতে গিয়া প্রথমে অন্ন বেতনে ঢাকার এক কর্ম প্রাপ্ত হন। নিজস্ব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে উন্নতির আশা পাইয়া, ঢাকার গমন করেন, কিন্তু আত্ম উন্নতির আশা তরসার আভাস না পাইয়া, কর্তৃপক্ষের বিনামূল্যে, ঢাকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। এই অপরাধের জন্য তাঁহার শ্রী আর কাজকর্ম ছুটিয়া উঠে নাই। বিভাগাগর মহাশয়ের বন্ধে হিন্দুকালেজের নিম্নতর শ্রেণীর শিক্ষকতা কার্যে পুনরায় নিযুক্ত হন। সেখানে ৪০ টাকা বেতন পাইবেন শুনিয়া প্রথমে কোন মতেই ঐ কর্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। বিভাগাগর মহাশয় অনেক বুঝাইয়া এবং কর্তৃপক্ষের বিরক্তির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত করেন। শেষে তিনি সংস্কৃত কালেজে একশত টাকা বেতনে ইংরাজী পড়াইবার জ্যেষ্ঠ প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে বিভাগাগর মহাশয়ের বহুতা ও আত্মীয়তার বিন্দু বারি-ধারা প্রাপ্ত হইয়া সর্বাধিকারী মহাশয়, ভ্রামদেহ নবীন যুকের জ্ঞান স্বরায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে বিভাগাগর মহাশয়ের পরিত্যক্ত অধ্যক্ষ পদেই নিযুক্ত হইয়া নিজের শক্তি সামর্থ্য ও কার্যকুশলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত কালেজের নূতন বন্দোবস্তে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে গতর্গম্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, সর্বাধিকারী মহাশয়ের নিয়োগের পর ক্রমে বাবু শ্রীনাথ দাস কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, এবং প্রসন্নকুমার রায় ক্রমাগত পরবর্তী ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ঐরূপ নিয়ম হইবার কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। সংস্কৃত কালেজের ছাত্রবর্গ অত্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর সহিত সমকক্ষতার কৃতকার্য হইত। এই সুকল নশনে বিভাগাগর মহাশয় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিভাগাগর মহাশয় এক দারুণ শোকাবহ বহুবিক্ষেপে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পরম বন্ধু ও বন্ধীর লগনাকুলের চিরস্থায়ী বেথুন লোকান্তর গমন করেন।* বিভাগাগর মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

* ইহার বিস্তারিত বিবরণ শ্রীশিক্ষা বিবরণ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে।

ও তাঁহার চাক্ষুশ স্নেহশ্রেণী আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিভাগসাগর মহাশয়ের আশা ছিল, বেথুনের দ্বারা ভারতবর্ষের শিক্ষাবিবরক বিবিধ কল্যাণ সাধিত হইবে। স্বদেশহিতৈষণা-ব্রতধারী বিভাগসাগর, ভারত-স্বক্কেদের বিরোধে কাতর হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? প্রসঙ্গক্রমে যখনই বেথুনের কথা উত্থাপিত হইত, অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ প্রাবিত হইত।

বিভাগসাগর মহাশয় যে সময়ে সংস্কৃত কালেজের দ্বিতীয় গৃহে বাস করিতেন, সেই সময়ে দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ৬ দ্বারকানাথ মিত্র বিভাগসাগর মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আলাপে বিভাগসাগর মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া নব্য মিত্র মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বারিক বাবুকে * বলিয়াছিলেন, “এ কা’কে এনেছিলে হে, এ যে চোখে মুখে কথা কর, আমাকে ‘থ’ করিয়া দিল। আমি ত জানিতাম, যেখানে আমি, সেখানে আর কেহ কথা কহিতে পারে না। এ যে আমার উপরে যায়।” এই সময় হইতে দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়।

এই সময়ে বাবু কালীচরণ ঘোষ মহাশয় বিভাগসাগর মহাশয়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন। বয়স অল্প হইলেও তাঁহার যোগ্যতা দর্শনে প্রীত হইয়া বিভাগসাগর মহাশয় কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজের কোন এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষার ভারার্পণ করেন। শিক্ষকের বয়সের অল্পতা হেতু বাবুকে তাহাকে আপনাদের সমবয়স্ক মনে করিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে সন্মত হয় নাট। কেহ কেহ দল বাধিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার ও তাক্কাইবার চেষ্টা করিতেছিল। বিভাগসাগর মহাশয় ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং কোন কোন ছাত্র এইরূপ কার্যের অনুষ্ঠান ও উৎসাহদাতা তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইলেন। অনুসন্ধান কেহই ধরা পড়িল না, কেহই দোষ স্বীকার করিল না। তিনি এইরূপ মিথ্যাচরণের ঘোর শত্রু ছিলেন। যখন কেহই দোষ স্বীকার করিল না, তখন ঐ শ্রেণীর সমস্ত বাবুকে বিভাগসাগর হইতে তাক্কাইয়া দিলেন। বাবুকে দল বাধিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট

* অবসর প্রাপ্ত সম্বন্ধজ ইংরাজ বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিভাগসাগর মহাশয়ের বিশেষ ভালবাসায় পাত্র। ইহারই নিকট এই ঘটনাসী শুনিয়াছি। পঞ্চম, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একেবারে তাক্কাইয়া দিয়াছেন। আমি এই উপরিচিত ও সম্ভ্রান্ত মহাশয়ের লিখিত পত্রাংশ পরিশীলিত দিলাম।

অভিযোগ করিল। কর্তৃপক্ষ, এ সবকে তাঁহার কিছু বক্তব্য আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। তৎপরে তিনি সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে, কালেক্টর আত্যন্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সবকে অধ্যক্ষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এরূপ বিষয়ে বালকেরা কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিবার সুযোগ পাইলে, তাহাদিগকে প্রেরণ দেওয়া হইবে, আর তাহাদিগকে শাসনে রাখা যাইবে না। কর্তৃপক্ষ বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া সমস্ত কাগজ পত্র বিভাগাগর মহাশয়কে ফিরাইয়া দেন এবং বালকদিগকে বলিয়া দেন যে এ বিষয়ে বিভাগাগর মহাশয় যাচা করিবেন, তাহাই হইবে। বালকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে আবেদন করিয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল, আর বলিতেছিল, “এবার চাকরি ত যার, উপায় কি হবে? ‘দাঁড়ীপাল্লা,’ ধরতে হবে যে।” কিন্তু যখন শুনিল যে, কর্তৃপক্ষ তাহাদের অভিযোগপত্র বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন মাথার উপর ‘আকাশ ভাঙ্গিয়া’ পড়িল, সর্বনাশ হইল, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া সকলে মিলিয়া বিভাগাগর মহাশয়ের চরণে শরণাপন্ন হইয়াই দ্বির করিল। দ্বির করিল বটে, কিন্তু ‘ম্যাও ধরে কে’ কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করে না। সে জ্ঞাননিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞার সুকঠিন বন্দীভূত মূর্ত্তির সম্মুখে অগ্রসর হয় কে? তাঁহার সম্মুখস্থ হইবার সাহস কাহারও হইল না। বালকদের আত্মীয় স্বজনগণ ক্রমে বালকদের এই সকল ছুর্ত্ততা জানিতে পারিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহাদ্বয় প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। বিভাগাগর মহাশয় বালকদিগকে বাবু কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে বসিলেন। বালকেরা পরিশেষে কালীচরণ বাবুর শরণাপন্ন হইয়া পড়িল এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া বিধিমতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কালীচরণ বাবু বালকগণকে সঙ্গে লইয়া বিভাগাগর-সমনে উপস্থিত হইলেন। তখন বিভাগাগর মহাশয় দলের পাণ্ডা হই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে, দাঁড়ীপাল্লা কে ধরবে?” তোরা না আমি?” “পালের গোদারা” দলের পুরোভাগে নত মস্তকে দণ্ডারমান। তখন বিভাগাগর মহাশয় কালীচরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, ইতার তোমার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছে ত?” তিনি বলিলেন, “আমি আসিতে সম্মত

হই নাই, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, তাই সঙ্গে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার বাহা ইচ্ছা হয় করুন।” বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, “তুমি ইহাদিগকে মাণ করিতে বলিলে, মাণ করিব নতুবা করিব না।” তখন কালীচরণ বাবু বিবন বিপদে পড়িলেন, তাহারা চিৎকার বলিলেন, “ইহারা আমার নিকট যে পরিমাণে অপরাধী, তদপেক্ষা” অধিকতর অপরাধী আপনার নিকট; আপনি বাহা ইচ্ছা করুন। আমার উপর তার দিবেন না।” তখন বাগকেরা নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, আর কখন এরূপ অজ্ঞার কাজ করিবে না বলিয়া কাদিতে লাগিল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষমা করিয়া বলিলেন, “হা, পা ছাড়িয়া দে, কুলে যান!”* একদিকে প্রতিজ্ঞার তীব্র পরাক্রম, অপরদিকে ক্ষমার জীবন্ত প্রতিমূর্তি! যে অপরাধ করিয়া নত হইল, তার “সাত খুন মাণ।” “তুমি ইহাদিগকে মাণ করিতে বলিলে মাণ করিব, নতুবা করিব না।” এই উক্তির মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্তৃত্ব শক্তির বখাবথ পরিচালনার জ্ঞান পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

অপরাধী ব্যক্তি অকৃত অপরাধ স্বীকার করিলে, তাহাকে ক্ষমা করা সহজ কাজ, অনেকেই করিয়া থাকে। কিন্তু সর্বাস্তঃকরণে ক্ষমা অতি অল্প লোকেই করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাহাকে ক্ষমা করিতেন, তাহার প্রতি সর্বদা ব্যবহার করিতে সর্বদাই মুক্তজন্মের প্রস্তুত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমা ধরো অপেক্ষা ক্ষমা চাওয়া আরও অধিকতর মনোরম দৃষ্ট! সম্রমশালী স্বাধীন-প্রকৃতিসম্পন্ন তেজস্বী ও উগ্রস্বভাববিশিষ্ট লোকের পক্ষে নত হওয়া বড় কঠিন কাজ, পারে কি ‘না’ সন্দেশ, বিশেষতঃ পদমধ্যাদার আপনার অপেক্ষা নিরন্তর পদবীর লোকের নিকট নত হইতে সচরাচর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে গুণেরও অভাব ছিল না।

একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন এক বিদ্যালী লোকের কথার পণ্ডিত ভাট্টাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের প্রতি কিছু অজ্ঞার করিয়াছিলেন। কবিরত্ন মহাশয় নীরবে, বিদ্যাসাগরকৃত সে অজ্ঞার ব্যবহার সহ করেন। কিছুকাল

* এই ঘটনাস্থি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিরাছি। তৎপরে বাবু কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট এবং ঈশ্বরকৃষ্ণ হালদুজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটও শুনিরাছি।

পরে বিদ্যালগর মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে, বাহার কথা উগর নির্ভর করিয়া কবিরত্নের প্রতি ঐক্য ব্যবহার করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রবন্ধনা করিয়াছে ; যখনই বুঝিলেন, কবিরত্নের প্রতি অত্যন্ত অজ্ঞান ব্যবহার হইয়াছে, তৎক্ষণেই বিদ্যালগর মহাশয় তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, “তোমার প্রতি যে অজ্ঞান বিচার করিয়াছি, কি করিলে তাহার প্রতিবিধান হয় বল।” * প্রয়োজন হইলে যেমন পাষণ্ড বিদীর্ণ করিয়া, স্তম্ভুর ব্যতিক্রম বিন্দু বিন্দু প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ বিদ্যালগর মহাশয়ের প্রতিজ্ঞার পূর্বত দেহ প্রয়োজনানুরোধে বিদীর্ণ হইত ; এবং সে পাষণ্ডসম প্রতিজ্ঞার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া বাল্যস্বভাবসুলভ অশ্রুকাণ্ড ও কোমল ভাব দেখা দিত। কবিরত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন, “বিদ্যালগর মহাশয় আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে করুণায় বলিয়াছিলেন, ‘আমি কি করিলে তাহার প্রতিবিধান হয় ?’” স্থলবিশেষে বিদ্যালগর বালকের অপেক্ষাও সরল ও কোমল ; অবস্থাবিশেষে বিদ্যালগর হিমালয়পেক্ষাও সমুদ্রত, গভীর ও দৃঢ়মূর্তি, কাহার সাধ্য তাঁহাকে অতিক্রম করে।

বিদ্যালগর মহাশয় বহুমূর্তিবিশিষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত কালেজে যখন অধ্যাপকপদে বিরাজ করিতেছেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে, ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সতরসন্মান সহকারে নতমস্তক হইতেন, কেহই তাঁহার সমক্ষে মাথা তুলিয়া উচ্চ কথা বলিতে সাহস করিতেন না। বালকেরা বিদ্যালয়ে তাঁহাতে কেমন এক ছরভিক্রমণীয় গাভীর্ঘ্য মূর্তিমান দেখিত, কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরে বালকুল্লা তাঁহাকে আপনাদের দলের লোক—সঙ্গী বলিয়া মনে করিত। একদিন কোথায় এক বিশেষ কাজে গিয়া, আসিবার সময় ‘বেলা’ অধিক হইয়া যায়। বাটী আসিয়া আহারাদি করিতে গেলে, যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার অসম্ভব। পথে নিকটে গণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের ছাত্রাবাস। সেই বাসায় প্রবেশ করিলেন ; একখানা ভিজা কাপড় পরিয়া পাতকুরা হইতে কয়েক ঘণ্টা জল তুলিয়া মাথায় ঢালিলেন ; বালকেরা আহায়ে বসিয়াছিল,

* সন ১২২৮ সালের গ্রীষ্ম মাসে বিদ্যালগর মহাশয়ের লোকান্তর গমনে সীতাকালেজ গৃহে শোকপ্রকাশার্থে যে সভা আহূত হয়, তাহাতেই কবিরত্ন মহাশয় নিজে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের সঙ্গে 'বসিলেন; সকলের পাত হইতে এক এক খাবা তাত লইয়া উন্নয় পূর্ণ করিয়া সকলের অগ্রে উঠিলেন; সকলের অগ্রে বিদ্যালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন।" * বালকেরা কয়েক মুহূর্তের জন্ত তাঁহাকে সঙ্গে পাইয়া, তাঁহাদের আহার্য হইতে কিছু কিছু খাইতে দেখিয়া এবং চুচুরটা আমোদের কথা কহিতে পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। সেই অল্প সময় মধ্যে 'কত গল্প করিলেন, কত রং তামাসা করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অদৃষ্ট হইলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন, বিদ্যালয়ে গিয়া দেখি, সেই বালস্বভাবমূলক চপলতার মূর্তি বিদ্যালয়গর আর নাই, ক্ষণকাল পূর্বে বালকদের মধ্যে বালকবেশধারী যে বিদ্যালয়গর-মূর্তি দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছিলাম, পরমুহূর্তে শিক্ষকবেশধারী অধ্যক্ষপদারূঢ় সেই বিদ্যালয়গর মূর্তিই আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। এইরূপ মূর্তি পরিবর্তনে যেরূপ আশ্ম-শাসন ও সাধনব্যগ্রয়োজন তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে।

এই সময়ে বিদ্যালয়গর মহাশয়ের পরম বন্ধু ও শিক্ষাসমাজের সম্পাদক ডাক্তার ময়েট সাহেব কিছুকালের জন্ত বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। নতুন প্রতিষ্ঠিত ছোট লাটের পদে সুপ্রসিদ্ধ হালিডে সাহেব নিযুক্ত হইয়া শিক্ষা বিভাগের আমূল পরিবর্তন করিলেন। শিক্ষা সমিতি (Education Council) নামের পরিবর্তে ডাইবেক্টর অব পব্লিক ইনস্ট্রাকশন্স এই নতুন নামে আফিস সংস্থাপন করিয়া, ডাক্তার ময়েট সাহেবের স্থানে ডব্লিউ গর্ডন, ইং নামে একজন যুবক সিভিলিয়ানকে উক্ত বিভাগের নীৰ্ব্বাহনে স্থাপন করিলেন। বিদ্যালয়গর মহাশয় ছোট লাট বাহাদুরকে একজন পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণ লোককে উক্ত পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মাননীয় হালিডে সাহেব তদন্তের বলিয়াছিলেন, "আমি নিজেই সমস্ত করিব, মিষ্টার ইয়ং কেবল উপলক্ষ মাত্র। আপনি তাঁহাকে শিক্ষা বিভাগের কাজকর্ম ভাল করিয়া শিখাইয়া দিবেন।" তদনুসারে বিদ্যালয়গর মহাশয় মধ্যে মধ্যে আফিসে গিয়া ইয়ং সাহেবকে কাজকর্ম বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু বিদ্যালয়গর মহাশয় যে আশঙ্কা করিয়া ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন, অতি দ্রুত সে আশঙ্কার বীজ অঙ্কুরিত হইল।

* পণ্ডিত তারামুখ্য কবিরাজ মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটী শুনিবাহি।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্যে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষীয়েরা ভারতবর্ষবাসী সাধারণ লোকমণ্ডলীর শিক্ষাবিধানের ব্যবহার জ্ঞাত করেক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন এবং সেই অর্থব্যয়ে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত সে বিষয়েরও কতকটা আভাস দিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেকলে ও লর্ড উইলিয়ম বেন্টিনের প্রবর্তিত শিক্ষানীতির অনুসরণে, তদানীন্তন মহাশয় আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তদনুসারে বিভাগাগর মহাশয়, তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক জেলার বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইংলণ্ডীয় কর্তাদের মন্তব্য সন্থকে বিদ্যাাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার ছোট প্রভু ডাইরেটর ইং সাহেবের মতান্তর হইল। ডাইরেটর অপর দুইজন ইংরাজ ইনস্পেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া বিদ্যাাগর মহাশয়ের বিবেচনামত বিদ্যালয় স্থাপন করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিদ্যাাগর মহাশয় তৎপূর্বে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তখনও বিদ্যালয় স্থাপনে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া উক্ত নিষেধাবাক্য কর্তৃপক্ষ ছোট লাটের গোচর করিলেন। এই মতান্তর হইতে মনান্তরের সূচনা হইল। উভয়পক্ষ হালিডে সাহেবকে নিজ নিজ বক্তব্য জানাইলে পর, মাননীয় ছোট লাট কিছুকালের জন্য বিদ্যাাগর স্থাপন প্ৰগতি রাবিতে বলিয়া, বিলাতে কর্তাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া পঠাইলেন। এই শিক্ষা-সংগ্রামে বিলাতী কর্তৃপক্ষদের মতে স্বাধীনচেতা বিদ্যাাগর মহাশয়েরই জয় হইল। তিনি বিশৃঙ্খলিত উৎসাহ সহকারে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ ইনস্পেক্টরপরিচালিত ও বুদ্ধি-বিভ্রাটগ্রস্ত ইং সাহেব বিদ্যাাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দারুণ তীব্রভাবে পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিদ্যাাগর মহাশয় এরূপ সুবিবেচনা সহকারে কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিতেন যে, সহজে কোন প্রকার ত্রুটি পাওয়া যাইত না। তবুও সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া সময়ে সময়ে ভয়ানক মন্তভেদ উপস্থিত হইত। উভয় পক্ষই ছোট লাট হালিডে সাহেবের সহায়তায় আরম্ভ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই বিদ্যাাগর মহাশয়ের সুবিচারসঙ্গত মীমাংসাই ছোট লাটের অনুমোদিত হইত। এই ভাবে তিনি ছোট লাটের পৃষ্ঠপোষকতার ডাইরেটর ইং সাহেবের প্রতিপক্ষতা উপেক্ষা করিয়া নিজের কর্তব্য পালন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইয়া নানা স্থানে মডেল স্কুল ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন; মডেল স্কুল স্থাপন লইয়াই ছোট প্রভু ইয়ং সাহেবের সহিত অনাস্থ্যীয়তার সূত্রপাত হয়। কিন্তু সে সময়ে শিক্ষা বিভাগ কার্যে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষীদের বিশেষ সহানুভূতি থাকায় বিভাগাগর মহাশয়ের কার্যের পোষকতা হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে সহস্রা* ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভার পরিবর্তনে ভারতবর্ষীয় শিক্ষাবিষয়ক নীতিও পরিবর্তিত হইল। ছোট লাট স্থানিডে মহোদয়ের বাচনিক আদেশে বিভাগাগর মহাশয় উপরোক্ত চারি জেলায় বহুসংখ্যক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্ম প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেব ঐ সকল বিদ্যালয়ের ব্যয়বিষয়ক বিল মঞ্জুর করিলেন না। শিক্ষা বিষয়ে ঐরূপ অর্থব্যয় বর্তমান শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ঐরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিলেন। * ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেব এই এক ঘটনায় বিভাগাগর মহাশয়কে কষ্ট দিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ইন্সপেক্টরের কার্যে সহায়তার জন্য তাঁহার অধীনে চারিজেলায় চারিজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি তারাসন্দর ভট্টাচার্য্য, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উক্ত চারিজেলায় ডেপুটি ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত করাইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কালেজের স্থায়িত্ব লইয়া সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষদের মধ্যে বড়ই তর্ক বিতর্ক হইত, এবং কখন কখন কালেজ উঠাইয়া দেওয়া আর স্থির হইয়া যাইত। কেবল বিভাগাগর মহাশয়ের আকিঞ্চনে এবং বঙ্গ দেশীয় লোকমণ্ডলীর ত্যাগাশুণে এই ছুঁতটনা ঝটিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিন্ন হইয়াছে। শিক্ষার্থী বালকগণের উৎসাহ বিধানার্থে ১ন ও ২য় শ্রেণীর কতকগুলি বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল, সেই সকল বৃত্তিদানে গভর্ণমেণ্টের দখল হইত; শুণবান ঘরিয় বালকদের ছয়মুঠবশতঃ সেগুলি উঠিয়া গেল। তবে বিভাগাগর মহাশয়ের বহু আকিঞ্চনে কালেজের মূলোৎপাটন হৃদিত রহিল।

সংস্কৃত ও হিন্দু কালেজের স্থান সম্বলান হইয়াও উপরে দুটী ঘর পড়িয়া

* ইহার বিস্তারিত বিবরণ জীশিক্ষা বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে।

থাকিত। পূর্বে তাহা হিন্দু কালেজেরই ছিল। সংকট কালেজে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করার ঐ হুটী ঘরের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। বিভাগাগর মহাশয় কর্তৃগক ইং সাহেবকে উক্ত অভাব জানাইয়া ঘর হুটী প্রার্থনা করিলেন। তত্ক্ষণে প্রভু তাঁহাকে হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ সাটক্রিক্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ ঘর চাহিয়া লইতে বলিলেন। সাটক্রিকের সহিত পূর্বে হইতে বর লইয়া একটু মনোমালিন্য ঘটয়াছিল। বিভাগাগর মহাশয় তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “আপনি হিন্দু কালেজে সাটক্রিকের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে ডাকাইলে আমি তথায় গিয়া সাক্ষাৎ করিতে ও আপনার সমক্ষে আমার প্রয়োজন জানাইতে পারি। কিন্তু আমি একাকী এই জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।” ইং সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কাৰ্য্যকালে সাহেব অন্য প্রকার করিলেন। তিনি নিজে সাটক্রিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিভাগাগর মহাশয়কে ডাকান নাই। বিভাগাগর মহাশয় সেখানে সাক্ষাৎ না করিয়া সাহেবের বাটাতে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। সাহেব বিভাগাগর মহাশয়কে সাটক্রিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বারবার অনুরোধ করিলেও, তিনি পুনঃ পুনঃ অসম্মত হওয়ার একটু অধ্যুৎপাত হইল। সাহেব তাঁহাকে পাঠাইতে জেদ ধরিলেন, তিনিও বাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। রেশারেশি আরও বদ্ধমূল হইল। ইং সাহেব বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে পরিচালিত হইয়া সম্ভ্রমসহযোগে অভিমত্যাধের প্রয়োজন করিতে লাগিলেন।

তর চার্লস উডের ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক নির্দেশ অনুসারে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়।* লর্ড ডালহাউসি এই তত্ত্বাহুতানের সর্বপ্রকার আয়োজন করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তারতম্বলদ লর্ড ক্যানিংএর রাজত্বের প্রারম্ভে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত প্রস্তাবে কলেবর পরিগ্রহ করে। যে সকল মহোদয়কে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মোট সংখ্যা ৩৯ জন মাত্র ছিল। ঐ সমস্তগণের মধ্যে ছয় জন মাত্র দেশীয় সভ্য ছিলেন, এবং তন্মধ্যে দুই জন মুসলমান। বিভাগাগর মহাশয়, ৬প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৮রমাপ্রসাদ রায় ও ৮রামগোপাল বোষ, এই চারি মহোদয় হিন্দু সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বিষয়বিভাগের 'প্রথম বাৎসরিক সভার (কন্ভোকেশনে) সভাপতি পদবর
ডেনারেল বাহাদুরের এক পার্শ্বে লর্ড বিসপ ও অল্প পার্শ্বে বিভাগসময় মহাশয়
উপবিষ্ট ছিলেন। * উহার গঠন কার্যে তাঁহার পরামর্শও সাধরে গৃহীত
হইয়াছিল। ঐ বৎসরের ২৮শে নবেম্বর তারিখে বিষয়বিভাগের সদস্যগণের যে
সভা হইয়াছিল, তাহাতে একটা পরীক্ষকসমিতি (Board of Examiners)
সংগঠিত হয়। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষার প্রশ্ননির্ধারণ এবং
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার উপযুক্ততা নির্ধারণ করিবার ভার, বিভাগসময় মহাশয়ের
উপর অর্পিত হইয়াছিল।† এনট্রেন্স ও বি, এ, পরীক্ষার সমগ্র কার্যভার
ইহাদের উপর অর্পিত হওয়ার ইহাদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত, সেই
অল্প প্রত্যেককে বৎসরে ছয়শত টাকা পারিশ্রমিক বদিয়া দেওয়া হইত। অনার্স
(Honours) পরীক্ষার্থী থাকিলে, সে বৎসর অতিরিক্ত আর একশত টাকা
পরীক্ষকদিগকে দেওয়া হইত। এইরূপে কিছুকাল কাটিলে পর, পরীক্ষক
সমিতির পুনর্গঠনের সময়ে বহুচেষ্টা করিয়াও বিভাগসময় মহাশয়কে ঐ সকল
কার্যে লিপ্ত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ইহার পর কেবল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের
এম, এ, পরীক্ষার তিনি পরীক্ষক হইতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইহার পরেও
সময়ে সময়ে বিভাগসময় মহাশয়কে বি, এ, ও এম, এর সংস্কৃত পরীক্ষক হইবার
অল্প অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি আর ঐ সকল কার্যভার গ্রহণ করিতে
সম্মত হন নাই। বিষয়বিভাগের গঠিত হইলে পর, ইহার কোন এক অবিবেশনে
শিক্ষাবিষয়ক নানা প্রকার আলোচনার মধ্যে সংস্কৃত বিভাগের উন্নতিয়া দিবার

* কোরবর সিংহী-অবসর প্রাপ্ত এজিয়ার বাবু কেব্রমোহন বহু বৎসরের নিকট
এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

† Resolved :—That the following gentlemen be requested to form a
Board and that as a body, such Board should be responsible as well for
the questions set, as for the valuation of the answers, and that each
member should be ready, if called upon, to assist so far as he is able as
well in the other subjects of the examination as in those to which he has
been specially appointed—* * * Sanskrit, Bengali, Hindi, and Gorya—
Pundit Isser Chandra Bidyasagar, Principal, Sanskrit College. Minutes
of the Provisional Committee, 28th Nov. 1857 and confirmed by the
Senate, 12th Dec. 1857.

প্রত্যয় হয়। বহুসংখ্যক ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই প্রকৃতির খোদকত্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একমাত্র বিভাগায়ন মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বহুবিধ যুক্তি ও তর্ক সহযোগে প্রতিপক্ষ-গণকে একেবারে নীরব করিয়া দেন। তাঁহারই বিশিষ্টরূপ অধ্যবসায় ও আকিকর্নের কলস্বরূপ সংহত কালেজ অতাপি বিভ্রান্ত থাকিয়া তাঁহার পৌরব বুদ্ধি ও আমাদের শিক্ষা বিভাগের সহায়তা করিতেছে।

সিভিলিয়ানী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া যে সকল সাহেব কর্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল সেন্ট্রাল কমিটি নামে এক কমিটি স্থাপন করেন। সিভিলিয়ান সাহেবদিগের পরীক্ষা গ্রহণই এই কমিটির কার্য ছিল। বিভাগায়ন মহাশয় ঐ কমিটির একজন প্রধান সভ্য ছিলেন এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।

বিলাতী কর্তৃপক্ষের আদেশ মত যখন বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিভাগায়ন স্থাপন হইতে লাগিল, তখন ঐ সকল বিভাগায়নে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য বহুসংখ্যক পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পণ্ডিতের বেতন অল্প বলিয়া সহজে লোক পাওয়া বাইত না, একজন দক্ষিণ বাঙ্গালার তদানীন্তন ইনস্পেক্টর প্রাচী সাহেব বিভাগায়ন মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি পণ্ডিত চাহিয়া পাঠান। তৎকালে বিভাগায়ন মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ উক্ত পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বটে, কিন্তু বেতনের অন্ততানিবেদন জাহায়ের কেহই ঐ সকল কর্ম গ্রহণে সম্মত নহে। অন্তর্দ্বন্দ্ব পকাশ টাকা বেতন হইলে, কেহ কেহ বাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ ছাত্রের সংখ্যাও বড় অল্প, বিশেষতঃ বৎসরের শেষে তির্যক্ৰমণ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র পাওয়া যাইবে না। *

হেটলিট হাদিডে সাহেবের সহিত বিভাগায়ন মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। ইংরাজ ও বাঙ্গালীতে একরূপ আত্মীয়তা অন্নই হয়। বিশেষতঃ প্রভু ও ভৃত্যে একরূপ সৌহার্দ্য অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।

* No 1167 From the Principal, Sanskrit College, to Hodgson Prat, Secy., Inspector of Schools, South Bengal, dated 15th March 1887. In reply to his letter No. 174, dated 10th February 1887.

হুইটা ঘটনা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। একবার বিভাগসাগর মহাশয় ছোটলাট তবনে উপস্থিত হইয়া দেখেন, কলিকাতার অল্প কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সংবাদ পাঠাইয়া বঙ্গেশ্বরের দর্শন মানসে বহুক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, বিভাগসাগর মহাশয় আসিয়াছেন শুনিয়া ছোটলাট হালিডে তৎক্ষণাৎ উপরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। এই ঘটনার মর্ম্মাহুত হইয়া উপরোক্ত মহোদয়গণের কেহ কেহ ঐরূপ উপেক্ষা সম্বন্ধে হালিডে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ছোটলাট তত্বতরে বলিয়াছিলেন যে, “আপনারা নিজের নিজের বৈয়কিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলাপ করিতে আসিয়া থাকেন, আর বিভাগসাগর মহাশয় রাজকার্য্যে আমাকে সুপরামর্শ দিবার জন্ত আসিয়া থাকেন, সুতরাং উদ্দেশ্যের প্রভেদে অধিকারেরও প্রভেদ হইয়া থাকে। আপনারা আসেন আপনাদের জন্ত, আর তিনি আসেন আমার জন্ত। এমন স্থলে যদি তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গে উপরে আসিতে বলিয়া থাকি, তাহাতে কি কোন দোষ হইরাছে ?” *

অপর ঘটনা এই :—হালিডে সাহেবের অনুরোধমত তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে নানাবিধের কথোপকথনের জন্ত ছোটলাট তবনে যাইতেন। কিন্তু সেই দরিত্রের চিরপ্রিয় বিভাগসাগরী চামর গায়ে দিয়া, আর তালতলার চটি পায়ে দিয়া যাইতেন। ছোটলাট বহু অহুন্নয় বিনয় করিয়া অনুরোধ করায়, বিভাগসাগর মহাশয় কয়েকবার পেটুলন, চোগা, চাপকান ও পাগুড়ী পরিশোধিত হইয়া ঐতি গোপনে সহর অতিক্রম করিয়া আলিপুরে বেলেভেড়িয়ারে দর্শন দিয়াছিলেন। এই কার্য্যটা তাঁর নিকট একটা অপকর্ম্ম বলিয়া মনে হইত। এই সভ্যতাসম্বন্ধ বৈশিষ্ট্যের সুসজ্জিত হইয়া তিনি মনে করিতেন, যেন সত্ত্ব সাজিয়াছেন। তাঁহার অভ্যস্ত ক্রেশ ও অসুবিধা হইত। হুই তিনবার এইরূপ অস্বীতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক পরিকল্পনা সুসজ্জিত হইয়া ছোটলাট-তবনে বাতায়ানত করার পর, বোধ হয় চতুর্থ দিবসে, তিনি সাহেবকে বলিলেন, “এই আপনার সহিত আমার শেষ দেখা।” সাহেব চমকিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, “কেন পণ্ডিত, কি হইরাছে যে আর দেখা হইবে না ?”

* এ ঘটনায় অল্প নানা হায়ে শুনিতেও একদা এসবকর উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আদর্য্য তাঁহারই নিকট শুনিয়াছিল।

দ্বাধীনচেতা বিভাগাগর মহাশয় হাসিতে হাসিতে ছোটগাটের মুখের উপর বলিলেন, “কয়েকটী মত যম্বলগাণারক পোষাক পরিয়া, সঙ্ সাজিয়া, আপনায় সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ কার্য আমার দ্বারা হইবে না।” সাহেব অগত্যা নত মুখে কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, “পণ্ডিত, যে পোষাকে আসিলে, আপনায় স্তম্ভ ও স্তম্ভিহা হয়, তাহাই করিবেন, এ বিষয়ে আমার পছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই।” * এই ঘটনার পর, আর কখনও চটি জুতা, খান ধুতি, আর তাঁহার প্রবর্তিত বিভাগাগরী চাদর পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল শেষ দশায় অত্যধিক অসুস্থতা নিবন্ধন চিকিৎসকের অনুরোধে সেকেন্দ্রে ফ্যাসানের ক্রানেলের অঙ্গরাখা ব্যবহার করিতেন।

হাণ্ডিতে সাহেব অনেক বার অনেক বিষয়ে বিভাগাগর মহাশয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াও, সর্বদা তাঁহাকে ইহা সাহেবের সহিত সত্বা স্থাপন করিতে, তাহা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করিতেন। বিভাগাগর মহাশয়ও সে পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য ইহা সাহেবের ভ্রমের বশবর্তী হইয়া চলা ক্রমে ক্রমে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। পরিশেষে একবার তিনি বিভাগাগর পরিদর্শন কার্যের বিবরণ প্রদান করিলে পর, ডাইরেক্টর ইহা সাহেব সেই রিপোর্ট বৈশিষ্ট্য করিয়া সাজাইয়া দিতে বলেন। এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, বিবরণটা দেখিতে শুনিতে বেশ আকর্ষণকর বিশিষ্ট হয়; উপরিউক্ত কর্মচারীরা দেখিয়া বুঝিবেন যে বৈশিষ্ট্য কাজ কর্তৃক হইতেছে। উন্নতমনা ও স্তায়পরায়ণ বিভাগাগর এইরূপ অনুরোধে অপমানিত বোধ করিলেন, তিনি বাহা নিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার কোন স্থানের একটা বর্ণও পরিবর্তন করিতে সম্মত হইলেন না। অধিক পীড়াপীড়ি করার শেষে কর্মভাগের অভিপ্রায় জানাটলেন। তাঁহার কর্ম পরিত্যাগকাহিনী নিয়ে বখাও বর্ণিত হইল। পাঠক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সামান্য নীচতা স্বীকারের পরিবর্তে পাঁচশত টাকা বেতনের চাকরিটা কত সহজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই কর্ম-পরিত্যাগ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য কতদূর পর্যন্ত অনুরোধ হইয়াছিল।

* অন্ততঃ শুনা থাকিলেও, আমরা এ ঘটনাটিও তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়া আনিয়াছিলাম।

বিভাগসগর মহাশয় ছোটগাট জ্বালিডে সাহেবকে এই সংক্ষেপে প্রথম যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং বাহাতে প্রমুখিত বহি প্রজ্ঞলিত হয়, তাহা এই :—

১ম পত্র।

মহাশয়,

বিগত শনিবার বর্ধন আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তখন দক্ষিণ বাক্সালা বিভাগের ইন্স্পেক্টর নিয়োগ সম্বন্ধে আমি দুই এক কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করায়, আপনি আমাকে ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার নিকট অর্পণ করিতে বলিয়া ছিলেন। তদনুসারে আমি সেই অনুমতিপ্রাপ্তির সুযোগ গ্রহণ পূর্বক জানাইতেছি যে, যদি আমাকে উপরোক্ত ইন্স্পেক্টরের পদে বদলী করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার স্থানে সংস্থিত কালেজ কাহাকে নিযুক্ত করিলে কালেজের কল্যাণ হইবে, সে বিষয় আমার সহিত পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করিলে ভাল হয়, কারণ উক্ত বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্য হইতে কাহাকে নিযুক্ত করিলে, সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হইবে, তাহা বহুদিনের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমিই ভাল বলিতে পারিব। গতকর্মেন্ট প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুল কালেজ সম্বলিত জেলাসমূহের বিভাগীয় ইন্স্পেক্টরের পদে আমাকে স্থাপন করা যদি বিবেচনা সঙ্গত না হয়, অন্ততঃ জয়ালী, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার মডেল স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে পারেন। সরকারী স্কুল কালেজের তার বিভাগীয় ইন্স্পেক্টরের উপর মিলেই চলিতে পারে, বাক্সালা শিক্ষা বিভাগ বিষয়ে আমি আপনাকে এত বেশী বিরক্ত করিয়াছি যে, আর ইহার পুনরুদ্রেক দ্বারা আপনার বহুমূল্য সময় ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করি না।

(বাক্সর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

হুঃখের বিষয় এতিলিপিতে তারিখ দেওয়া ছিল না। কিন্তু উক্ত পত্রের উত্তরে ছোটগাট জ্বালিডে সাহেব যে উত্তর দেন, সাহেবের সে পত্রের তারিখ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিভাগসগর মহাশয়ের উক্ত পত্র লিখিত হইয়াছিল।

একান্তরে হাণ্ডিডে সাহেব বিভাগাগর মহাশয়কে যে পত্র • লিখিয়াছিলেন,
তাহা এই :—

২য় পত্র ।

দার্জিলিং,

২৭ শে মে, ১৮৫৭ ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে ।

কলিকাতা ।

পণ্ডিত মহাশয়,

আপনি হরত জানিতে পারিয়াছেন যে, আপনার পত্র পাইবার পূর্বেই আমি মিষ্টার লজকে উক্ত শূদ্ধ পদে নিরীচন করিয়াছি । ইহার পূর্বে উক্ত পদ লেক্টেনেন্ট লিঙ্কে দেওয়া হইয়াছিল, তিনি ইংলণ্ডে আছেন এবং উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই ।

আমি আশা করি, শীঘ্রই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কারণ আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি, এবং এই প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে (যাহার উন্নতিকল্পে আমরা উভয়েই আগ্রহীণ) আলাপ করা যাইবে ।

(স্বাক্ষর) ফ্রেড্, জে, হাণ্ডিডে ।

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর গর্ডন ইয়ং সাহেবকে বিভাগাগর মহাশয় যে
১ম পত্র লেখেন তাহা এই :—

৩য় পত্র ।

সংস্কৃত কলেজ,

২০ শে আগষ্ট, ১৮৫৭ ।

মাননীয় ডব্লিউ, গর্ডন, ইয়ং,

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয় সমীপে ।

মহাশয়,

আপনি প্রায় তিন মাসের অল্প সময় ভ্রাম্য করিয়া বাইতেছেন, এরূপ
স্থলে ইহাকেই সঙ্গমর বোধে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, অতি অল্প

দিনের মধ্যে আমি কৰ্ম পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইরাছি, আমার এক্ষণ স্বরূপ কৰ্মত্যাগ করিবার উদ্দেশ্য সাধারণের জানিবার উপযোগী নহে, তাহা অস্ত্রের জানিবার অতুপযোগী বলিয়াই, সে সকল কারণ উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

সংস্কৃত কালেজের শিক্ষা বিষয়ক নূতন পদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইরা উঠে নাই, তাহা সুসম্পন্ন করিতে আরও দুই তিন মাস লাগিবে। আগামী ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমি আমার এই বর্তমান কৰ্ম করিব। ডিসেম্বরে আমি আমার কৰ্মত্যাগ-পত্র যথারীতি প্রেরণ করিব।

আপনাকে এত পূৰ্ব্ব হইতে আমার অতিপ্রার জ্ঞাপন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমার অবসর গ্রহণে, শিক্ষা বিভাগে যে পদ শূন্য হইবে, তাহার পূরণার্থে সুবিবেচনার জন্ত যথেষ্ট সময় পাঠবেন।

(স্বাক্ষর) জৈবরজেন্দ্র শর্মা।

৪র্থ পত্র।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ,

৩১শে আগষ্ট, ১৮৫৭।

মাননীয় এফ্., জে, হালিডে,

মহাশয় সমীপে।

মহাশয়,

কিছুদিন গত হইল, একবার বাঙ্গালা শিক্ষানামের বর্তমান পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনি আমাকে এক মস্তব্য-পত্র প্রেরিত করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, এবং আমিও নিতান্ত অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক সে সময়ে তাহাতে সন্মত হইরাছিলাম। কিন্তু পরে চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি যে, আমারই সহযোগী কৰ্মচারিগণের ও অন্যান্য সকলের কার্যকলাপের সমালোচনা-সম্বলিত মস্তব্য পত্র প্রদান অতীব কঠিন কার্য্য, আমি উক্ত কমাগ্রার্থনাপূরঃসর মস্তব্য-পত্র প্রদান প্রতিক্রিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

এহলে আমি আপনার অনুমতি গ্রহণ পূৰ্ব্বক জানাইতেছি যে, আমি আগামী

জাহুরারী মাসে কর্ন হইতে অবসর গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছি। এবং আমার সে অভিপ্রায় এক “আধা সরকারী” পত্রে মিটার ইংকে জানাইয়াছি এক তাহার এক খণ্ড প্রতিলিপি আপনার পাঠের জন্য এতৎসহ প্রেরণ করিলাম ।

সসন্মান প্রছাবনত,
(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ।

পত্রোত্তরে ছোট লাট মাননীয় হালিডে সাহেব যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই :—

৫ম পত্র ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে ।

৩১শে আগষ্ট ।

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,

আমি আপনার এই সন্মত শুনিয়া সত্যসত্যই অত্যন্ত হুঃখিত হইলাম । আগামী বৃহস্পতিবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মূল কারণ কি, আপনি আসিয়া আমাকে বলিবেন ।

আপনার,
ফ্রেড্, জে, হালিডে ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই কলিকাতার নিকটবর্তী বারাকপুর নগরে প্রথমে সিপাহিগণের বিদ্রোহ দেখা দেয়, অতি অল্প চেষ্টার সে উদ্যোগ নিবারিত হইয়াছিল, এবং গভর্ণমেন্টও তদ্বিবারণে সফলকাম হইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন । কিন্তু বার্ড, এপ্রেল, মে ও জুন মাসে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিদ্রোহের অনল প্রজলিত হইয়া উঠে । কলিকাতা রাজধানী, হুতরাং বেখানে বাহা ঘটয়াছিল, তাহার কলাকলজনিত ভয়ে কলিকাতাবাসী ইংরাজ ও বাঙ্গালী খ্রীপুরুষ আপাষর সাধারণ সকলেই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল । নগর রক্ষার জন্য বিবাহাতি গোরা পাহারার প্রয়োজন হইয়াছিল । সন্ধ্যার পূর্বে সহরের লোক

দ্বার বন্ধ করিষ্ঠ, আর প্রভাতে দুর্বোদয়ের অনেক পরে দ্বার খুলিষ্ঠ। সে সময়ে ছাত্রেরা বিভাগসাগরে আসিতে সাহস করিষ্ঠ না। সংকট কালেজে গোয়ালিগকে স্থান দিবার জন্য বিভাগসাগর মহাশয় অনেক দিনের জন্য কালেজের কার্য বন্ধ রাখেন, এরূপ তড়াতাড়ি কালেজ বন্ধ করিষ্ঠে হইয়াছিল যে, কর্তৃপক্ষকে জানাইবার অবসর পান নাই। কালেজ বন্ধ করিয়া ডাইরেটর ইং সাহেবের নিকট অন্ততঃ কার্যারম্ভের জন্য রিপোর্ট করেন, সাহেব বিভাগসাগরকে কালেজ বন্ধ করার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিদ্রোহের সময়ে সহসা সরকারী কার্যে প্রয়োজন হওয়ার তিনি কালেজের বাটী ছাড়িয়া দিয়া একবিন্দুও অন্তর করেন নাই, এই ভাবে ইং সাহেবের পত্রের উত্তর দেন; কর্তৃপক্ষ-পরায়ণ সাহেব এ কথা মনে মনে বিরক্ত হইলেন, কিন্তু এ ব্যাপার কর্তৃপক্ষের গোচর করিষ্ঠে সাহস করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে, কর্তৃপক্ষের নিকট এ ঘটনায় তিনি পরাজিত হইবেন। কর্ম পরিচালনা করিয়া চলিয়া যাইবার পক্ষে এ ঘটনাটোও একটা প্রবল কারণে পরিণত হইয়াছিল।

ইহার পর ছোট লাট জালিডে সাহেব অনেক মিষ্ট কথা তুট করিয়া আর এক বৎসর কাল বিভাগসাগর মহাশয়কে শাস্তভাবে কর্মে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট, ছোট লাট পত্রের দ্বারা তাঁহাকে বেলেজিডিরারে যে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান, সেই খানেই সেবারকার উদ্ভোগের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, তিনি বহুভাবে অনেক বুঝাইয়া সে যাত্রা বিভাগসাগর মহাশয়কে নিরস্ত করিয়াছিলেন। বিভাগসাগর মহাশয় কেবল তাঁহারই আত্মীয়তার অনুরোধে বাধ্য হইয়া সেবার সে সফর হইতে বিরত হন। কিন্তু বখনই ইং সাহেবের আত্মীয়তার ভাব প্রকাশ পাইত, তখনই কর্মভাগের সফর নুতন করিয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত। শেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সেই যে কর্ম ভাগ করিলেন, আর বহু চেষ্টাতেও সে কর্ম গ্রহণ করিষ্ঠে সম্মত হইলেন না। ছোট লাট সেই সময় একবার বুঝাইবার মানসে বলিয়াছিলেন, আপনি এত বড় সমাজসংস্কার কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ সুযোগ ব্যাপারে অর্থাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। বিভাগসাগর মহাশয় তৎক্ষণে লিখাছেন, মহাশয় যদি বা আপনার অনুরোধে একটু চিন্তা করিতাম, বখন

বিপদের ভর দেখাইতেছেন, তখন আর ও “ছাই ভর” গ্রহণ করিব না। ঐ যে ছাড়িয়া দিয়াছি, উহাই আমার শেষ কার্য। এমন কি শেষ হুজুরি পত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কম্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে পর, পাছে বাগিকা-বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের জের থাকে, এই জন্তই এক মাস বিলম্ব করিয়া ঐ কার্যের শেষ মিটাইয়া একেবারে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সে সুখ ঘটে নাই। কম্ব পরিত্যাগের পর বহুদিন পর্যন্ত বাগিকাবিভাগের প্রতিষ্ঠা বিষয়ক ব্যাপারে তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল।

৬ষ্ঠ পত্র ।

মাননীয় ডব্লিউ, গর্ডন, ইয়ং

শিক্ষাবিভাগের ডায়েরীর মহাশয় সমীপে।

মহাশয়,

যে গুরুতর কর্তব্যভার এক্ষণে আমার উপরে অর্পিত আছে, তাহার সম্পাদনের জন্ত অবিরাম মানসিক পরিশ্রম নিবন্ধন, আমার স্বাস্থ্য একবারে এত অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে যে, আমি বাধ্য হইয়া আমার এই কম্ব পরিত্যাগ-পত্র মাননীয় লেক্টোনেট গভর্ণর বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করিতেছি।

২। আমি বেশ অনুভব করিতেছি যে, এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যের সম্পাদনে বেরূপ গভীর মনোযোগের প্রয়োজন, আমার দ্বারা এক্ষণে আর তাহা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমার এক্ষণে বিশ্রামের প্রয়োজন? সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে এবং আমার নিজের শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক শান্তি রক্ষা করিতে হইলে, বর্তমান কার্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ ত্রিণ আমি সে সুখ লাভের উপায়ান্তর দেখি না।

৩। আমি স্থির করিয়াছি, আমার স্বাস্থ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন পুস্তক রচনা ও সংকলন দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহ্য সাধনে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত থাকিব; ব্রহ্মসম্মিতির জনকদ্বারপের সুশিক্ষণাত এবং তাহাদের মধ্যে আনন্দের সহিত যদিও আমার সাক্ষাৎ সাক্ষর চলিয়া বাইতেছে, তথাপি

আমি জীবনের অবশিষ্ট সমগ্র সময়, সেই সুপবিত্র অনুষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠার নিয়োগ করিব এবং সেই ব্রত জীবনের শেষ দিনে, আমার চিত্তভরে উদ্‌ঘোষিত হইবে।

৪। আমার এরূপ গুরুতর কার্যে অগ্রসর হইবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কারণ বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশার লোপ ও শিক্ষা প্রণালীর বর্তমান পদ্ধতি সৰ্ব্বক্ষে আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাবই প্রধান কারণ। বিভাগীয় কর্মচারীগণের কর্তব্য কার্যের অসম্পাদনের পক্ষে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ও উপরিস্তন কর্মচারীর কার্যকলাপের সহিত ব্যক্তিগত সহানুভূতি এই দুইটি নিত্য আবশ্যক।

৫। উপরোক্ত কারণবলের প্রথমটির সৰ্ব্বক্ষে আমার বক্তব্য এই যে, অবসর সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্প কারিক ও মানসিক শ্রমে আমি অনেক অধিক কার্য করিতে পারিব; কিন্তু এরূপ গুরুতর কার্যে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করা অন্তায়। বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত আমি পরিবার ও পরিজনবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারি নাই, এবং আরও অধিক দিন এইরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যের সংশ্রবে থাকিলে, আমার শরীর একবারে সেরূপ কার্যের অসুপযোগী হইয়া পড়িবে, এই চিন্তা আমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

৬। দ্বিতীয় কারণ সৰ্ব্বক্ষে আমি কেবল এই বলিতে চাই যে, গভর্ণমেন্টের উপর, আমার বুদ্ধি বিবেচনা ও মতামত চাপাইয়া দিবার, আমার কোন অধিকার নাই, তথাপি আমি বাহাদিগের অধীনে কর্ম করি, তাঁহাদিগের নিকট একথা গোপন করিতে পারি না যে, যে কাজ আমি করিতেছি, তাহাতে আর আমার হৃদয়ের অনুরাগ নাই। এই অনুরাগের অভাবে আমার কার্য-কুশলতারও অভাব ঘটিবে। আমি এতদপেক্ষা অধিক বলিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এটুকুও না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ এরূপ ভারপ্রাপ্ত ধর্মবুদ্ধির অধীন ব্যক্তির পক্ষে, সে অনুরাগ থাকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

৭। অবসর গ্রহণ কালে আমার মনের অক্ষুণ্ণ ভূমি এই যে, আমি আমার কুশলশক্তি সামর্থ্যের সাহায্যে যতদূর সম্ভব আগ্রহসহকারে কর্ম করিয়াছি, এবং

এইরূপ মনে করি যে, গভর্ণমেন্ট অবিচলিত ভাবে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, আমার যে সকল আশার সহ করিয়াছেন এবং আমার প্রস্তাবিত প্রত্যেক বিষয়ে যেকূপ মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্বীকার করিলে, আমার পক্ষে বোঝাবি হইবে না। সম্মান নিবেদন ইতি। সংকৃত কার্লেজ, ৫ই আগস্ট ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

(স্বাক্ষর) জেমস চার্লস শর্মা।

৭ম পত্র।

প্রিয় মহাশয়,

আপনি কি ৫ই আগস্টের পত্রেব কোন স্থান পরিবর্তন করিতে চাহেন? যদি তাই হয়, তবে যত শীঘ্র সম্ভব আপনি এক দিন এখানে আসিবেন এবং আপনার বেকূপ ইচ্ছা হয়, চাই কোন অংশ পরিবর্তন করিবেন, অথবা ঐ আবেদন পত্রের পরিবর্তে আর একখানি সংশোধিত নূতন পত্র পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু যাহাই করুন, একটু শীঘ্র করিবেন। আমি শনিবারে এখানে থাকিব, আবার মঙ্গলবার আসিব। আপনার গত শনিবারের কথায় আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আপনি ছুটির আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে সম্মত নহেন, তাই তাহা পাঠাই নাই।

৯ই সেপ্টেম্বর।

আপনার,
ডব্লিউ গর্ডন, ইয়ং।

এই সকল পত্রের সাল তারিখ মাস এ সকলের ঠিক নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন পত্রের সাল তারিখ কিছুই নাই, কেবল বার আছে; কোন গানিতে তারিখ আছে সাল নাই। এরূপ স্থলে কেবল পত্রের তারিখ অবলম্বন করিয়া পরে পরে বিভক্ত করা গেল। এতদ্বিধ আরও একটা বিশেষ কথা এই যে, ঐ সকল পত্র ভিন্ন আরও অনেক কথা মুখে মুখে হইয়াছে। ছোট লাট হাঙ্গিডে সাহেবের অধিকাংশ কথাই যে বিভাগাগর মহাশয়ের সাক্ষাতে হইয়াছে, তাহা ইহার পরবর্তী স্মরণ পত্রে অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এরূপ স্থলে,

যাহা বিভাগাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি, আমরা কেবল তাহারই উল্লেখ করিব।

৮ম পত্র।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮।

মাননীয় এক্, জে, হ্যালিডে,

বঙ্গদেশীয় লেক্টোনেট গভর্ণর মহাশয় সমীপেবু।

মহাশয়,

আমি পূর্ণ মানোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমার প্রেরিত কৰ্ম্মপরিত্যাগ পত্রে যে সকল অংশ আপনাদের নিকট আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে স্থানগুলি ঐ পত্র হইতে উঠাইয়া দেওয়া আমার বিবেচনার কোন মতেই যুক্তিযুক্ত বা ভায়াসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ এই যে, আমার শরীর অসুস্থ বটে, কিন্তু আমি ধৰ্ম্মপ্রমাণ বলিতে পারি না যে শারীরিক অসুস্থতাই আমার কৰ্ম্মত্যাগের একমাত্র কারণ। যদি তাহাই সত্য হইত তাহা হইলে আমার স্বাস্থ্যের জ্ঞাত দীর্ঘকালব্যাপী বিদায় লইলেই পারিতাম। আমি ত আপনাকে বহুবার জানাইয়াছি যে, বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে কৰ্ম্ম করা আমার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর ও ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ বহু অর্থব্যয় করিয়া যে প্রণালীতে বাদ্ৰালা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সে পদ্ধতির প্রতি আমার কোন প্রকার সহানুভূতি নাই। আপনি বেশ অবগত আছেন যে, আমি সৰ্ব্বদাই আমার কর্তব্যের পথে বাধা পাইয়াছি। এতদ্বিধ কৰ্ম্মক্ষেত্রে আমার আর অধিক অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা দেখি না এবং একাধিক বার আমাকে অতিক্রম করিয়া অন্তেরা অগ্রসর হইয়াছে। এক্ষণে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্বীকার করিবেন যে আমার অসুস্থতা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু তথাপি আমি অসুস্থতা নিবন্ধন কৰ্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য না হইলে, আরও কিছুদিন কৰ্ম্ম করিতাম, আমার এই বর্তমান শারীরিক অসুস্থতা আমাকে এই সকল গুরুতর কর্তব্যাকর্মে সম্পূর্ণ অসুপযোগী করিয়া ফেলিয়াছে। যখন শারীরিক অসুস্থতা তির অত্যন্ত কারণ আমার

কৰ্মভাৰ্য্যাপনৰ সময় চূড় কৰিবৰ পক্ষে সহায়তা কৰি আছে, তখন অল্প কাৰণগুলি প্রত্যাহ্বান কৰিলে, আমাৰ পক্ষে নিতান্ত নিবৃত্তিতাৰ কাৰ্য্য হইবে। কেবল এই কাৰণে ঐ সকল কাৰণেৰ অল্পম্বেষ দ্বাৰা কৰ্মভাৰ্য্যাপন পত্ৰ পৰিবৰ্ত্তিত কৰা আমাৰ পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। অধিকন্তু আমাৰ কৰ্মভাৰ্য্যাপন পত্ৰ আমাৰ হাত হইতে চলিয়া যাওয়ার পৰ, অনেকেই উক্ত পত্ৰগত বিষয় সকল অবগত হইয়াছে, আৰু এখন যদি আমি কোন প্রকাৰ পৰিবৰ্ত্তন কৰি, তাহাও লোকে জানিবে, এক্ষণ হলে আমি কেবল আমাৰ বন্ধুদিগেৰ নিকট নহে, জনসাধাৰণেৰ নিকটও অকাৰণ নিন্দাৰ পাত্ৰ হইয়া পড়িব। * * * আমাৰ পদভাৰ্য্যাপন পত্ৰেৰ ঐ অংশ উঠাইয়া না দিলে, যে, আপনাৰ পক্ষে অনুবিধাজনক হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আমাৰ পক্ষে অধিকতৰ আক্ষেপেৰ বিষয় আৰু কিছুই নাই। যখন আমি ভাবিতেছি যে, অজ্ঞাতসাবে আমি আপনাৰ এক্ষণ ক্লেশ ও অনুবিধাৰ কাৰণ হইলাম, তখন আমাৰ হৃৎখেৰ সীমা থাকিতেছে না। কোন উপায়ে আমাৰ পদভাৰ্য্যাপন পত্ৰে ঐক্লপ পৰিবৰ্ত্তন কৰিতে পারিলে তাহা আমাৰ পক্ষে পৰম তৃপ্তিকৰ হইত, কিন্তু আমি যে বিসদৃশ অবস্থায় পড়িরাছি, এবং বাহা আপনাকে বহুবিবৃত্ত ভাবে লিখিয়া জানাইলাম, তাহাতে আমাৰ পক্ষে যে ঐক্লপ পৰিবৰ্ত্তন কৰা একপ্রকাৰ অসম্ভব, আশা কৰি আপনি তাহা অনুভব কৰিতে পারিরাছেন।

সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ নিজেৰ এই ব্যাপাৰে আমি যে আপনাকে এত ক্লেশ দিলাম, ইহাৰ জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা কৰিয়া এবং আপনাৰ প্রতি আমাৰ ভক্তি ও সম্মান জানাইয়া এক্ষণে আমি বিদায় গ্রহণ কৰিতেছি।

(বাৰ্দ্ধক্য) জৈষ্মনচন্দ্ৰ শৰ্মা।

৯ম পত্ৰ।

১৫ই সেপ্টেম্বৰ ১৮৮৮।

পণ্ডিত জৈষ্মনচন্দ্ৰ শৰ্মা মহাশয়ে।

প্রিয় মহাশয়,

আপনাৰ অন্তৰ্ভাৰ্য্য তাৰিখেৰ পত্ৰ প্রাপ্ত হইরাছি। আপনাৰ পদভাৰ্য্যাপন পত্ৰেৰ যে অংশ রাখিবৰ প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনি উল্লেখ কৰিরাছেন, সে অংশ

উঠাইয়া না দেওয়ার আবার কোন প্রকার অনুবিধা হইবে, আপনার ঐক্লম মনে করার ভ্রম হইরাছে; ঐ অংশ থাকি না থাকার আবার কিছুই আসে যায় না। পত্রের ঐ অংশ উঠাইয়া দিতে বলার কারণ এট যে, হরত শিক্ষা বিভাগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আপনার ঐক্লম অসন্তোষ প্রকাশের গূঢ় কারণ পরিকার করিয়া উল্লেখ করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইবে, অথচ আপনি বলিয়াছেন যে, ঐ সকল কথাই প্রকৃত তাৎপর্য্য সরকারি কাগজপত্রে তাকিয়া বলিতে আপনি কোন ক্রমেই সম্মত নহেন, এবং আপনার শারীরিক অনুহতা একমাত্র কারণ না হইলেও, কর্ম-ভাগের নানা কারণের মধ্যে প্রধানতম একটা, ঐক্লম হলে যে সকল কথা পরিকার করিয়া বলিবার অনুবিধা হইবে না, তাহার উল্লেখ না করিয়া কেবল অনুহতার কথা বলিয়া কর্ম-ভাগ করিলেই ভাল হইত।

আপনি আমাকে স্বীকার করিতে বলিয়াছেন যে, আপনার অনুযোগ করিবার উপযুক্ত কারণ রহিয়াছে, আপনার যে ঐক্লম মনে করিবার উপযুক্ত কারণ আছে, আমি তাহা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আপনি যেগুলিকে কর্ম-ভাগের উপযুক্ত কারণ বলিয়া আপনার পদভাগ-পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই :—(১) বাঙ্গালা শিক্ষা দানের বর্তমান পদ্ধতি আপনার অনুমোদিত নহে, উহাতে কেবল বৃথা অর্থ ব্যয় হইতেছে মাত্র। (২) আপনি আপনার কার্যে সর্বদাই বাধা প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৩) উন্নতি পথে অগ্রসর হইবার আপনার ক্ষমতা দাবি উপেক্ষিত হইরাছে।

এই সকল কথাই উত্তরে কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, শেষটায় সম্বন্ধে আপনার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়টায় সম্বন্ধে এই বলি যে, আপনি কোন দিন কোন ঘটনার আমার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন নাই, বরং তাহার বিপরীতই সর্বদা ঘটিয়াছে, প্রথমটায় সম্বন্ধে এই বলি যে, এটা কেবল মতের বিভিন্নতা মাত্র, বিশেষতঃ আপনি যে বাঙ্গালা শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত, তাহাতে ঐ প্রশ্ন তত প্রয়োজ্য নহে।

একান্ত বিশ্বাসভাজন,

ফ্রেড, ডে, হামিল্টে।

১০ম পত্রে ।

সোমবার, ২০শে সেপ্টেম্বর ।

মাননীয় ডব্লিউ, গর্ডন, ইয়ং,

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয় সমীপে ।

প্রিয় মহাশয়,

বহু চিন্তার পর, আমি দেখিতেছি, আমার পদ-ত্যাগ-পত্রে কোন প্রকার পরিবর্তন করা হ্রাসতঃ আমার পক্ষে সম্ভব নহে । পত্রের উত্তর দানে বিলম্ব হওয়ার জন্ত ক্ষমা করিবেন ।

আপনার,

(স্বাক্ষর) জৈবরচয় শর্মা ।

১১শ পত্রে ।

মাননীয় এফ, জে, হ্যালিডে,

বাক্সলার লেপ্টেনেন্ট গভর্নর মহোদয় সমীপে ।

প্রিয় মহাশয়,

আমার পদত্যাগ পত্রের উল্লিখিত অংশ রাখিয়া দিলে, কোন প্রকারে আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে না, এ সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম । আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে সেদিনকার আমাদের কথাবার্তার ভাবে আমার সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, পদত্যাগ-পত্রের ঐ অংশ থাকায় আপনার অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা এবং আমার ঐরূপ ধারণা না থাকিলে, আমার ১৩ই তারিখের পত্রে আমি উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিতাম না ।* এক্ষণে আমার মন একটা গুরুতর ভার হইতে মুক্তি লাভ করিল ।

একটা বিষয় সম্বন্ধে আমি কয়েকটা কথা বলিতে চাই । শেষপত্রে আমি আমার বক্তব্য সবিত্তারে বিবৃত করি নাই, ইহাই আমার দুঃখ । আমার পত্রে আমি এক সুহৃদের জন্তও এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করি নাই, যে, আপনার দ্বারা আমি আমার কর্তব্যসম্পাদনে বাধা পাইয়াছি, বরং অল্প দিকে আমি ইহা বিলক্ষণ অনুভব করি যে, আপনার নিকট সর্বদা সর্বপ্রকারে উৎসাহই পাইয়াছি, এবং আমার বোধ হয়, আমার কর্তব্য-পত্রের শেষ

ভাগে আমি আমার কনরের ঐক্য ভাব প্রকাশ করিয়াছি। কাজকর্মে বাধা পাওয়ার কথা উল্লেখ করিবার তাৎপর্য এই ছিল যে, আমি কাজ কর্ণে সর্বদা বাধা পাইয়া নিরন্তর আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধা হইয়াছি। আপনি সর্বদাই অনুগ্রহ করিয়া মনোযোগ সহকারে আমার সকল কথাই শুনিয়াছেন এবং অধিকাংশ স্থলেই আপনি মধ্যস্থ হইয়া আমার সেই সকল অসুবিধা দূর করিয়াছেন। আপনাকে এইরূপে বিরক্ত করিতে আমি সর্বদাই অসুবিধা বোধ করিয়াছি, কিন্তু অপরিহার্য কারণে বাধা হইয়াই আমাকে ঐক্য করিতে হইয়াছে। আমার নিজের আচরণ সত্বে যখন এক্ষণ সুরক্ষিত প্রায় উঠিয়াছে, তখন সে সত্বে আমার দুএক কথা না বলিলে নয়, তাই পুনরায় আপনাকে বিরক্ত করিলাম। নিবেদন ইতি ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ।

সসন্মান শ্রদ্ধাবনত,
(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অন্ততম সেক্রেটারীর নিকট হইতে শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের ১৫৬৬ নম্বরের যে পত্র প্রাপ্ত হন, তাহার কিয়দংশ :—

১২শ পত্র।

উপরিস্তন কংগ্রেসীয়ের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া আপনার বিগত ১৮ই আগষ্ট তারিখের ২০২৭ নম্বর পত্রের (অন্তান্ত পত্রসহ) প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি এবং তাহার প্রত্যুত্তরে জানাইতেছি যে, লেক্টেনেন্ট গবর্নর আপনার অনুরোধের উপর নির্ভর করিয়া সংরক্ত কালেক্টর অধ্যক্ষ ও অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার পদভাগ-পত্র গ্রহণ করিতেছেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, পণ্ডিত মহাশয় এক্ষণ নিশ্চয়ভাবে কণ্ঠ হইতে অবসর গ্রহণ করা উচিত বোধ করিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি তাহার অসুস্থতার উপরূক্ত কারণ বর্ণাইতে পারিতেছেন না। তথাপি আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে

জানাইবেন যে, দেশীয় লোকদের শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী ও উৎসাহপূর্ণ কার্যের জন্য তিনি গভর্ণমেন্টের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন ।

সার্বাংশের অবিকল প্রতিলিপি,

(স্বাক্ষর) ডব্লিউ. গর্ডন ইয়ং ।

ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন্স ।

অবিকল প্রতিলিপি

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা, ,

সংস্কৃত কালেক্টর অধক্ষ ।

১৩শ পত্র ।

মাননীয় ডব্লিউ. গর্ডন ইয়ং,

সমীপে ।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ২৪৬১ নম্বর পত্রে আমাব পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম । * * * নানা স্থানের বালিকাবিদ্যালয় সমূহের পণ্ডিত ও অজ্ঞাত লোকদের বেতন প্রকৃতি দিতে অসমর্থ হইয়া আমি অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছি : আমার ভয় হয়, কর্তৃক্সাগ করিয়া চলিয়া গেলে, এই অশান্তি আরও অনেক অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । আমার শারীরিক অবস্থা কাজকর্মের সম্পূর্ণ অসুপযোগী হইলেও, যদি আপনাদের আগন্তি না থাকে, আমি এই অপ্রীতিকর বালিকাবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠাব্যাপারে গভর্ণমেন্টের শেব মীমাংসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে চাই। • ইতি এই অক্টোবর, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ ।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ।

১৪শ পত্র ।

বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ।

প্রিয় মহাশয়,

কালেক্ট, নব্বাল স্কুল, পাঠশালা প্রভৃতির সম্বন্ধে যে হুকুম বাহির হইয়াছে একে বে সকল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, একপে আরু তাহার কোন প্রকার

পরিবর্তন করা সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে সুপ্রিয় গভর্নমেন্ট কবে তাঁহাদের শেষ মতামত প্রকাশ করিবেন, তাহার হিম্মত নাই; এক্ষণ স্থলে নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব করা আমার মতে জ্ঞায়সঙ্গত হইবে না। আপনার এই তারিখের পত্র আরও দুই এক সপ্তাহ পূর্বে পাইলে, আপনার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইত। 'আমার মতে এক্ষণে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, এই বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের ব্যয়সম্বন্ধীয় ব্যাপার শীঘ্রই বিবেচিত হইবে। বিবেচনার সময়ে সাহায্যে তাঁর বিচার হয়, এবং আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সে বিষয়ে উপরিতন গভর্নমেন্ট বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, এবং যত শীঘ্র সম্ভব, আপনাকে এই বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক আশান্তিকর প্রস্তাব সম্বন্ধে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে।

আপনার,

ডব্লিউ. গার্ডন ইয়ং।

নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক ও উপরোধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বিভাগাগর মহাশয় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কর্ম ত্যাগ করিয়া, স্বাধীনভাবে জীবনের পথে চলিবার স্মরণ পাটয়া কৃতার্থ হইলেন। তৎপূর্ববর্ত কঠোর ইয়ং সাহেবকে তিনি নিজে কাজ কর্ম শিখাইয়াছিলেন, ছোট লাট হালিডে সার্হেবের আত্মীয়তা ও বন্ধুতার অনুরোধে যোগ আনা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইয়ং সাহেবের সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চলিবার অল্প প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গভীর আক্ষেপের বিষয় এই যে, ডাইরেটর ইয়ং সাহেবের অনাত্মীয়তা ও প্রতিবন্ধকতা স্বাধীনপ্রকৃতি বিভাগাগর মহাশয়ের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তাঁহার শেষ পত্রের আদ্যোপান্ত মনোবোগ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, উহার শেষাংশ প্রথমংশের সম্পূর্ণ বিপরীত। একখানি ক্ষুদ্র পত্রে এক্ষণ উক্তি-বৈপরীত্য, বিভাগাগর মহাশয়ের প্রতি ইয়ং সাহেবের আন্তরিক অনাত্মীয়তার পরিচায়ক। বিভাগাগর মহাশয় কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া কলহের প্রধান কারণ বালিকাবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার ব্যয়বিষয়ক প্রশ্নের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, সাহেব বলিলেন, না, তাহা

হইবে না। এক্ষণে স্থলে সরকারী কাগজে মাননীয় ছোট লাট হাণ্ডিডে সাহেবের মন্তব্য কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। এক্ষণে স্থলে তিনি যে বহু সাধ্য সাধনারও আর সে পরিত্যক্ত মহারত পাঁচ শত টাকার চাকুরিটার প্রতি একটা বারও কিরিয়া চাহেন নাই, ইহাই তাহার পক্ষে পরম প্রাণার বিষয়। এই প্রভূত আয়ের ও বহু সম্মানের কৰ্ম পরিত্যাগ করা উপলক্ষে তাহার এক বহু স্কল-ইন্স্পেক্টর তাহাকে বলিয়াছিলেন, “বিভাগাগর! তুমি কাজ ভাল করিলে না।” তিনি তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনচিত্ততার বশবর্তী হইয়া বলিয়াছিলেন, “আমি টাকা অপেক্ষা—পদমর্যাদা অপেক্ষা, সস্তম্ভই বহু মূল্যবান মনে করি। যে কাজে সস্তম্ভের অপচয় হয়, আমি সে কাজ করিতে চাই না।” এখানে এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিভাগাগর মহাশয়ের কৰ্মত্যাগে তাহার পিতা মাতা ও পরিবারস্থ অজ্ঞাত আত্মীয়গণ সকলেই সমধিক চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু বিভাগাগর মহাশয়ের জীবনের পরবর্তী ঘটনা সকল, আত্মীয় স্বজনগণের কল্লনার বিপবীত ফল প্রসব করিয়া, তাহার জীবনকে শতগুণে উজ্জ্বল কবিয়াছে এবং তাহার অদ্বুত পরার্থপরতার গুণে স্বদেশের অশেষ কল্যাণকর ফল লাভ করার দাব মুক্ত হইয়াছে। তিনি বড় আশা করিয়া তাঁহার পদত্যাগ পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

“আমি জীবনের অবশিষ্ট সমগ্র সময় সেই সুপবিত্র অনুষ্ঠানের * সুপ্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করিব এবং সেই ত্রুত জীবনের শেষ দিনে, আমার চিত্তভ্রমে উদ্‌যাপিত হইবে।

তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা যে সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছে, তাঁহাতে রাজস্ব বজ্ঞের অনুষ্ঠানে তিনি যে বিজয়ী পাণ্ডবগণের দ্বায় সৰ্বদা ভগবানের শুভদৃষ্টি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? তিনি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, সকল প্রতিবন্ধীকে উপেক্ষা করিয়া, জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সুতীত্ৰ তাড়িতালোক সদৃশ সৰ্বজনবিমোহিনী প্রতিভার পরাক্রমে মানবমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া স্বকাৰ্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সৰ্ব কৰ্মে অতী হইয়া মানবকুলের মুকুটরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। কালকায়ের

* এদেশীয় সরকারীমণ্ডলীর জ্ঞানোন্নতি ও সাধারণ শিক্ষা বিভাগ।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রসাধুরী আরও অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিবে। বৃগবৃন্দার ধর্ম্মা মানবগণ অবনতমস্তকে সে গুণরাশির সমক্ষে প্রণত হইবে।

পরপদ-সেবার মনুষ্যের শক্তিসামর্থ্য সূচকরূপে প্রকৃতিত হয় না, এ কথা সাক্ষ্য বোধ হয় অনেকেই দিবেন। একবার আশ্বিনের কোন একের ও সম্মানিত মহোদয় * বিবরকর্ম পরিত্যাগ করিয়া সুদেশের সেবা-ব্রতঃ আত্মোৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইলে পর, তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা বিভাসাগর মহাশয়ের নিকট বিবিধ প্রকারে আপনাদের দুঃখ কষ্ট জানাইয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন; কিন্তু বিভাসাগর মহাশয় মুহুমুদ হস্ত রেখায় ওষ্ঠাধর অলঙ্কৃত করিয়া বলিলেন, “সে পাগলার চাকরি ছাড়ার দুঃখকাহিনী বলিবার বুকি আর ব্যয়গা পেলে না? এক পাগলের পাগলামীর কথা আর এক পাগলের কাছে বলিতে আসিয়াছে! কাজ ছেড়ে বেশ করেছে, পরের পা চেটে চেটে এ জাতটা উৎসর্গ সিন্নাছে। লোক তাঁবেদারি করা যত ছাড়বে ততই বাঁচবে।” বিভাসাগর মহাশয়ের জ্ঞান প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ ও দৃঢ়প্রকৃতি পুরুষের পক্ষে এইরূপ উত্তর-দানই স্বাভাবিক।

বিশালবলশালী সিংহ শিকারবদ্ধ হইলে, তাহার যে হৃদশা হয়, গুণবান পুরুষ পরপদসেবী হইলে, তদপেক্ষা অধিকতর হীনতা প্রাপ্ত হয়। আকাশবিহারী বিহঙ্গমকে গৃহে ক্ষুদ্র শিকারে আবদ্ধ কর, তাহার স্ব স্ব শক্তি অপসৃত হইবে। সে তোমার বুলি বলিবে, তোমার শিখান কথাই কহিবে, তাহার স্বভাব, তাহার মুক্তভাব, তাহার আত্মতৃপ্ত ভাব, যেমন থাকে না, দাপন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ পরপদসেবকও পরের বুলি বলে, পরের কথা কয়, ক্রমে পরের প্রদত্ত সুখে সুখানুভব করিতে শিখে। বিভাসাগর মহাশয় এইরূপ ধাতুর লোক ছিলেন না। যদিও এই কষ্ট-পরিত্যাগ করাতে তাঁহার মত ব্যয়শীল ও মর্যাদাশালী লোকের পক্ষে দিন চলা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সহসা কিছু করিলেন না। তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদিগের অনেকে তাঁহার কষ্ট ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন সুপ্রিমকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি মাননীয় জার জেমস্ কলভিন মহোদয়, বিভাসাগর মহাশয়কে আইনের পরীক্ষা দিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আইনের পরীক্ষা দিয়া, সুপ্রিমকোর্টে ওকালতি করিতে পরামর্শ দেওয়াতে, প্রথমতঃ তিনি অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন,

“এখন আবার নুতন করিয়া পরীক্ষা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তাতে ওকালতি কার্যে আমার তাদৃশ অনুরাগ নাই।” সাহেব মহোদয় তথাপি অনেক অনুরোধ করার তিনি সম্মত হইলেন, এবং ঐ কার্যের কলাকল মৰ্শনার্থ করেক দিন তাঁহার বন্ধু ষারকানাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সেখানে ক্ষুদ্রমাত্রাব্যবহারী লোকদের আচার ব্যবহার যাহা কিছু দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আন্তরিক আগ্রহের বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইল। তিনি কলভিন সাহেবের বাটীতে গিয়া তাঁহার অনিচ্চার কারণ জ্ঞাপন করিয়া ওকালতি ব্যবসায়ের সমস্ত ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কি উপায় করিবেন, কিছুই হির করিতে না পারিয়া কিছুদিনের অন্ত একটু বেশী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে স্ত্রীর সিসিলি বিডন বাকালার শাসনকর্তা। বিডন সাহেবও হালিডের স্ত্রীর বিভাগাগর মহাশয়কে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, সৰ্ব্বদা তাঁহার সংবাদ লইতেন। বিডন সাহেব পুনরায় বিভাগাগর মহাশয়কে রাজসরকারে প্রবেশ করাইবার অন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। নানা কারণে, বিশেষতঃ বিভাগাগর মহাশয়ের আগ্রহের অভাবে সে চেষ্টার কোন ফল হয় নাই। প্রয়োজনমত বখান্ধানে সেই সকলের উল্লেখ করা যাইবে।

— — —

ষষ্ঠ অধ্যায় ।



বাল্যশিক্ষাসাহিত্যে বিভাগসংগত ।

জাতীয় জীবনের প্রধান লক্ষণ দুটি,—ধর্ম ও ভাষা ; যে জাতি এক ধর্মীকোত্তর নহে—যাহার ধর্মালোচনার সমাজ-দেহের আপাদমস্তক উচ্ছৃঙ্খলিত না হয়, যাহার ধর্মালোচনের তরঙ্গে তরঙ্গে সমাজদেহে সজীবতা পরিস্ফুট হইয়া না উঠে, সে জাতি মৃত—তাহার ধর্ম মৃতধর্ম ; সে জাতির দ্বারা জাতীয় জীবন গঠনের সহায়তা হইতে পারে না । সেইরূপ, জননীর কোড়ে শুভ্রপান করিতে করিতে মানুষ যে ভাষায় সর্বপ্রথম ‘মা’ বলিয়া ডাকিতে শিখে, যাহার সরল ও সুমিষ্ট শব্দ সকল উচ্চারণ করিতে করিতে জিহ্বার প্রথম জড়তা কাটিয়া যায়, ক্ষুদ্র জীবনের শোক ও দুঃখপ্রকাশ করিয়া শিশু যে ভাষায় কাঁদিয়া থাকে, আনন্দে দিশাহারা হইয়া বালকবালিকা যে ভাষায় আপনার জয় ও পরের পরাজয়ের পরিচয় দিয়া থাকে, বালাকালের জীড়াকৌতুক ও আমোদপ্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে লোকে যে ভাষা শিখা করিয়া থাকে, মানুষ যে ভাষায় হাসিয়া আটখানা হয়, কাঁদিতে, কাঁদিতে যে ভাষায় মানুষ হৃদয়বার খুলিয়া দেয়, আপনার দুঃখকাহিনী বর্ণনকরিয়া অন্তরের তীব্রজ্বালা জ্বড়াইয়া থাকে, তাহাই তাহার মাতৃভাষা । মা ও মাতৃভাষা একই বস্তু, যে জাতি প্রবৈজ্ঞান্যবশতঃ মাতৃপূজা শিখে নাই, সে মাতৃভাষার আদরও জানে না । যে জাতির মাতৃভাষা এক নয়, যাহাদের মা বলিয়া ডাকিতে হইলে, শব্দ ও স্বর ভিন্ন হইয়া যায়, তাহাদের জাতীয় জীবনের অভিনয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে এখনও বহুবিলম্ব আছে ।

এক একটা শিশু বিভাক্ত-প্রকৃত রাবচিত্র ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় । সামান্য

কুতীরে, সামাজ্য লোকদের মধ্যে তাহার সমাগম হয় বটে, কিন্তু তৎকালীন লোক তাহার লক্ষণসকল দেখিয়া তাহার ভাবী কার্যকলাপের অন্ধপাত করিয়া থাকেন ; কিন্তু সর্ববিধ সুলক্ষণ বিস্তারিত থাকিতেও অনেক সময়ে ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে, এইবৈশিষ্ট্যবশতঃ যেমন স্বরায় শুভদিন সমুপস্থিত হয় না, বিলম্ব হইয়া পড়ে, বাক্সালা ভাবার দক্ষভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে । প্রবল শক্তিশালিনী দেবতা বা সংস্কৃতির আওতায়, ইহাকে ইহার শৈশবকাল কাটাইতে হইয়াছে । বাক্সালী-জীবনের প্রথম অবস্থায়, বাক্সালার সামাজিক ইতিহাসের শৈশবকালে, স্মৃতিশাস্ত্র-সংস্কারক ৮য়ঘননন্দন ভট্টাচার্য্য ও গীতগোবিন্দ রচয়িতা ৮য়ঘন গোস্বামী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির মুখোচ্ছল করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেই দেবতা বা সংস্কৃতির আলোচনার জীবনানতিপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীও সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছর্কোধ্য সংস্কৃতেই লিখিত হইয়াছে । তাঁহাদের স্নেহমমতা আকিকন ও উত্তম সকলই দেবসেবার নিয়োজিত হইয়াছে । অপেক্ষাকৃত দুর্বল অনধিকারিগণের সেবার্থে, তাহাদের তৃপ্তিবিধানের জন্য প্রচলিত বাক্সালা ভাবার পুষ্টিসাধনে কিছুমাত্র মনোযোগী হন নাই । সুতরাং বাক্সালা সাহিত্য বঙ্গসমাজের শৈশবকালের নীতিকুশল ও স্ননিপুণ লেখকগণের সেবা হইতে বঞ্চিত * । বাক্সালা ভাবার উন্নতিকল্পে বাক্সালার আপামর সাধারণ লোক-মণ্ডলীর পাঠোপযোগী গ্রন্থ রচনাতে বাঁহারা সর্বপ্রথমে আগ্রহের হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বরগীর নামাবলীর পুরোভাগে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও তৎপরে চৈতন্য, ভগবতপ্রণেতা বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চণ্ডী কাল্য প্রণেতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা হইতে অতি স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, বৈষ্ণবধর্মের অভ্যাসের বহুপূর্বে, বাক্সালা ভাবা, ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতার প্রথম অভ্যাসকালের ভাবার জায় সুখে সুখেই থাকিত ; গ্রন্থ রচনা করিয়া মানবের উক্তিসকল

* “বাঁহারা তৎকালে বিদ্যালয় করিতেন এবং বাঁহাদের প্রত্যাধি রচনা করিবার সাধারণ ভিত্তি, তাঁহারা সেই ভিত্তি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনে প্ররূপ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ দেখ করিতেন ; সুতরাং কৃতবিদ্যাদিগের কর্তৃক বাক্সালা অপ্রাকৃত ও উপেক্ষিত হওয়াতে বহুকাল পর্যন্ত ইহার বিলক্ষণ দুঃখই ছিল ।” পণ্ডিত রাধাপতি ভট্টাচার্য্য এইরূপ বাক্সালা ভাবা ও বাক্সালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব । ১৪ পৃষ্ঠা ।

দ্বারী করিবার কোন চেষ্টাই ছিল না। সুতরাং বিভাগপতি ও চণ্ডীদাস বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের পথপ্রদর্শক ও গুরুমহাশয় বলিয়া একাল পর্যন্ত পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এবিষয়ে সম্প্রতি মতবৈধে ঘটিয়াছে, বিভাগপতি বহুকাল হইতে বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের অগ্রণীয়ে পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিলেও “ব্রহ্মার ডায়লেক্ট” নামক গ্রন্থে গ্রিয়ার্সন সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিভাগপতি বাঙ্গালী কবি ছিলেন না। তাঁহার কবিতা সকল মৈথিলী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর, ঐ সকল কবিতা বাঙ্গালীদের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে বাঙ্গালা আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে, এবং ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিভাগপতি বাঙ্গালার আদি গ্রন্থকার ও পথ-প্রদর্শক বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের বালাসুন্দর ও যৌবনমগ্না বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালাভাষাবিষয়ক বক্তৃতায় প্রথমেই লিখিয়াছেন, “খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন পর্যটক হাউএন্থসঙ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়া বাঙ্গালা বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতক অংশের একই ভাষা দেখিয়া গিয়াছেন। কেবল আগাম ও উড়িয়ার ভাষা উক্ত ভাষা হইতে কিছু পৃথক ছিল। ইহা মগধী-প্রাকৃত ভাষাংগণ একপ্রকার পুরাতন হিন্দী ভাষা ছিল। হিন্দী ও বাঙ্গালা উত্তর ভাষাই ঐ এক ভাষা হইতে সমুৎপন্ন, তাই ইহার প্রাচীন কবিগণের ভাষা অত্যধিক হিন্দী মিশ্রিত। বিভাগপতি মৈথিলী-হিন্দী কবি। তাঁহার ভাষা না প্রাকৃত-হিন্দী না বাঙ্গালা। পরবর্তী বৈক্য কবিগণের দ্বারা বিভাগপতিরচিত কবিতা সকল বাঙ্গালা আকার ধারণ করিয়াছে।” গ্রিয়ার্সন সাহেবের উক্তি ও বিজ্ঞবর রাজনারায়ণ বাবুর উক্তি ফলে প্রায় এক প্রকারই দাঁড়াইতেছে। প্রভেদ এই যে, গ্রিয়ার্সন সাহেব বিভাগপতিক বাঙ্গালী কবি বলিতেছেন না, আর রাজনারায়ণ বাবু বলিতেছেন, বিভাগপতির অভ্যাসের পূর্বে বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র বাঙ্গালা ভাষা ছিল না, মৈথিলী ভাষাই তখন বাঙ্গালীর ভাষা ছিল। উক্তি দুটি বিভিন্নতর হইলেও, ফল হইল এক। এরূপ মতবিরোধের দ্বলে দলবল সহ বিভাগপতিকে সিংহাসনচ্যুত করা আমাদের মতে নিষ্ঠুরতার

পরিচায়ক । আমরা এরূপ কঠোর ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি, তবে বিজ্ঞাপতির সময়ে বাঙ্গালীর স্বস্তর বাঙ্গালা ভাষার সৃচনা হইরাছিল । বৈষ্ণব কবিগণের রচনা বর্তমান বাঙ্গালা হইতে ভিন্ন হইলেও এবং বহুল পরিমাণে বিন্দী মিশ্রিত হইলেও উহা বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে । বিজ্ঞাপতি মৈথিল কবি, তাহা গ্রিয়ার্সন সাঁহেব এবং রাজনারায়ণ বাবু উভয়েই স্বীকার করিতেছেন । তিনি বেহার অঞ্চলের লোক, * তাহাতে মৈথিল কবি ; বাঙ্গালার তাঁহার কোন রচনার প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা আছে তাহা তাঁহার মৈথিলী ভাষায় রচিত কবিতার বাঙ্গালা সংস্করণ মাত্র । এরূপ হলে যদি তাঁহাকে বাঙ্গালী কবিগণের অগ্রণী এবং বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের পথ-প্রদর্শক বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে কি বিশেষ কিছু দোষ হয় ? আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসই বাঙ্গালার সর্বপ্রথম গ্রন্থকার । যাহা হউক বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস ইহারা শ্রীগোবিন্দের আবির্ভাবের কিছুপূর্বে অভ্যাক্ত হইরাছিলেন, সে সময়ে তাঁহারা যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই কৃষ্ণলীলাবিসয়ক । মহাপ্রভু তাঁহাদের রচিত গীতাবলী শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন ।†

চারিশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল । লোক সকল নির্জীব জড়প্রায়, আহার বিহার প্রভৃতি দৈনিক উত্তর কার্যেই জীবনের মহামূল্য সময় কাটাতেছিল । সে সময়ে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না হইলে, সমাজ-দেহের 'প্রাণবায়ু অন্নকাল' মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইত । মানবের বুদ্ধি বিবেচনার অতীত হুস্ত পথে বিধাতা তাঁহার বৃহৎসংসারের হুস্ত হুস্ত পরিচালিত করতেন । ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে), বাঙ্গালার ভূতপূর্বে রাজধানী ও ধর্ম্মক্ষেত্র নবদ্বীপে নবদ্বীপচন্দ্রের জন্ম হয় । তাঁহার বিজ্ঞাবুদ্ধির প্রভাব বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল । তাঁহার অলোকসামান্য স্মৃতিশক্তি ও গৌরবান্বিত স্মৃতিশক্তি লাবণ্যে ঢল ঢল করিত । তিনিই তাঁহাকে দেখিলেই তালবাসিতে, তাঁহার সঙ্গে থাকিতে স্বভায়ে লোকের ইচ্ছা হইত । এতাদৃশ গুণবান ও রূপবান পুরুষ, স্মৃতিবান

* পণ্ডিত ভাটরত্ন কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিবরণ গ্রন্থাবলি, ২১ পৃষ্ঠা ।

† পদকল্পিত ১৫ পৃষ্ঠা, বৈষ্ণবদাস সংলিখিত ।

বাঙ্গালী জীবনে গবজীবন সঞ্চার করিতে আয়বলি দিলেন। জননী শচীদেবীর অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া, প্রিয়তমা সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রসার শ্রীতির চুস্কেত বন্ধন বীরবলে ছিন্ন করিয়া লোকসেবার আত্মোৎসর্গ করিলেন, ধর্মের প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া তাহাতে আপনি ডুবিলেন, দেশের বহুসংখ্যক লোককে ডুবাইলেন। এই আন্দোলনেই তই সম্প্রদায় লেখকের অভ্যাস হইল। একদল, বৈষ্ণব ধর্মের মধুর ভাব প্রচারে, কাব্য রচনা করিতে বঙ্গপরিচর হইলেন। বৈষ্ণব সাহিত্য সেই আন্দোলনের একাংশ। বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচারে যখন চারিদিক বিপর্যস্ত লইয়া পড়িল, যখন জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই উচ্চধর্ম লাভের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল, যখন বৈষ্ণবগণ, “চণ্ডালোহপি বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরাযণঃ,” “মুচি হরে মুচি হর, যদি কৃষ্ণ ভজ্যে, মুচি হরে মুচি হর যদি কৃষ্ণ ভ্যজ্যে” প্রভৃতি উচ্চভাবের ধর্মকথা সকল প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন আর একদল শাক্ত লেখক আবির্ভূত হইয়া স্বপক্ষ সমর্থনার্থে বহুগ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। এই শাক্ত ও বৈষ্ণব সংঘর্ষে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রকৃত প্রস্তাবে গঠিত হইয়া উঠে। এই সময়ের বাঙ্গালা ভাষা এই উভয় দিক হইতে বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। একদিকে চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত, জীব গোবিন্দীয় করচা ও ভক্তমাল প্রভৃতি বহুসংখ্যক সুদৃঢ় বৈষ্ণবগ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। অপর দিকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়া সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদেরই হৃদয়ভাষ্য হইয়াছেন। তাঁহার কাব্য-গ্রন্থের মধুপানে প্রমত্ত হইয়া সুপ্রবীণ রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন, “অনেকের মতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাঙ্গালার প্রধান কবি। স্বকপাল রচনাশক্তি বিষয়ে মোটা ধূতি ও দোণ্ডা পরিধানকারী দাম্ভ্যের পরিচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ, শোভন ধূতি ও উড়ানি পরিধানকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অসভ্য সভাসদ ভারতচন্দ্র এবং কোটপেন্টলন পরিধানকারী মটিকেল মধুসূদনকে জিতিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই *।”

মুকুন্দরামের কোমল কবিতাকলাপ এতই সরল যে, আপামর সাধারণ সকল লোকেই বুঝিতে পারে। ইহাই তাঁহার প্রধান গুণ, তাঁহার রচনা

* উক্ত রাজনারায়ণ বহু কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা, ১৪ পৃষ্ঠা।

পরিণাটী এবং কবিতা মিষ্ট তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্ত মুকুন্দরামের কাব্য "গজদন্ত কনকে জড়িত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই "গজদন্ত কনকে জড়িত" মুকুন্দরামের নিখুঁত উক্তি। মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে ঐ উক্তি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই কোন সুপ্রবীণ সমালোচক মহাশয় উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে বঙ্গের অমর কবি শ্রীকৃষ্ণবাস ও শ্রীকান্ধীরাম রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিয়া আমাদিগকে চিরঞ্জে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহাদের ঋণ পরিশোধপ্রয়াস বাল্মীকীর পক্ষে মূঢ়তা, এই দুই মহাত্মা তাঁহাদের অগ্রণী। বঙ্গের গৃহে গৃহে দ্রাবী পুরুষ ও বালক বালিকা যে বানায়ণ ও মহাভারতের অমূল্য উপদেশাবলীর আবৃত্তি করিয়া থাকে, তাহার জন্ত আমরা বিশেষভাবে ইহাদিগকেই ভক্তি সহকারে স্মরণ করিয়া থাকি। এদেশের নিয়ন্ত্রণীক লোক যে অজ্ঞান দেশের তদবস্থাপন্ন লোকদের অপেক্ষা নম্র ও ধর্ম্মশীল, কৃষ্ণিবাসের অক্ষয়কীর্ত্তি ও কান্ধীরাম দাসের ভারত-রত্নগুণিই তাহার প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য জাতি সমূহের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, ভারতে বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ সমূহের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সমাপ্ত সিদ্ধ হয় নাই, বাল্মীকীদেশে তাহা এই দুই মহাকাব্যগ্রন্থ দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বহুবিধ বিভিন্নতা ও বিচিত্রতার মধ্যে, ভারতে জাতীয়তার শেষ বেধা, সমাজ-দেহের ভিত্তিমূলে যে দেবীতে পাওয়া যায়, রামায়ণ ও মহাভারত তাহা নীরবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে কৃষ্ণিবাস ও কান্ধীরাম, ভারতেব বাল্মীকি ও ব্যাস।^{১০} ইহার পর বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় পক্ষ হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থ রচিত ও প্রচলিত হইয়াছিল, যাহার উল্লেখ মাত্রও এখানে সম্ভবপর নহে। ইহাদের পরবর্ত্তী কালে যাহারা বাল্মীকী তাহার পরিচর্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদ কতকগুলি শ্রামা-বিধবক সংগীত রচনা করিয়া বঙ্গের অমর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

* স্মৃতি তাঁহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত নাম রক্ষার জন্ত বাল্মীকী নামের আকারের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সবশ্রুত আর কি হইতে পারে? সাধু সন্তানের চিরস্মরণীয় বিধাতা ইহাদের সমস্তদানে প্রভুত্ব করুন।

সাব্বিকভাবে পূর্ণ সরল গীতগুলি সুমিষ্ট মধুর প্রসাদীস্বরে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই গাইতে পারে এবং সে গানে সাব্বিক শ্রীতি ও তৃপ্তি উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। কবিরঞ্জন বিভাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রায়গুণাকর কৃত অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিভাসুন্দরই সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রায়গুণাকর, ভ্রমরবেশে নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া, যে মধুচক্র রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহা চিরদিনই সরস থাকিয়া বাঙ্গালী পাঠকমণ্ডলীকে মধু বিতরণ করিবে। বিভাসুন্দরে ভারতচন্দ্র শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়া অস্তায় করিয়াছেন। এতাবৎকাল যে সকল গ্রন্থকাব ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের উন্নয়ন করা গেল, এ সকলই সে কালের ব্যাপার। গ্রন্থকার বহুকষ্টে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বহুবন্ধে তাহা রক্ষা করিতেন। আজকাল লোকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি ও নানাবিধ ধনরত্ন যেরূপ সম্ভরণে রক্ষা করে, সেকালে হস্তলিখিত পুঁজিগুলি তদপেক্ষা অধিকতর সাবধানতা সহকারে রক্ষা কবিতো হইত। বাহ্যর প্রয়োজন হইত, সে ব্যক্তি বহুক্লেণ স্বীকার করিয়া, বহু সময় ক্ষয় করিয়া, বহুসাধ্যসাধনার পর তবে একখানি গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে সুরোগ পাইতেন। সুতরাং গ্রন্থপ্রচার ও পাঠ এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছিল; গ্রন্থকারগণ এবং তাঁহাদের গ্রন্থ থাকিলে কি হইবে? গ্রন্থের প্রচার ও পাঠের সুরোগ ছিল না। এরূপ স্থল ঘাঁহারা পুস্তক রচনা করিতেন, তাঁহারা যে অথোপার্জননের আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়া এ কার্যে অগ্রসর হইতেন না, তাহা বেশ স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। সে কালের গ্রন্থকাবগণ আত্মতৃপ্তিসাধনোদ্দেশে নিজ নিজ কৃতি ও প্রকৃতির অনুরূপ পদ্য এক এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেন। গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্তি 'বাঁহা'র প্রবল ছিল, তিনিই কেবল নিজের তৃপ্তিলাভ ও বন্ধুগণের তৃপ্তিবিধানের জন্য গ্রন্থ রচনা করিতেন। কিন্তু তদ্বারা লোক-শিক্ষার বিশেষ সঙ্গরতা হইত না। তবে সেকালের এই দুর্ভাগ্যবিহীনদেশে গ্রন্থকারগণের ও বাঙ্গালাসাহিত্যের কল্যাণাকাঙ্ক্ষাগণের অভীষ্টসিদ্ধির এক উপায় ছিল। গ্রন্থকারগণ স্বকচরিত, রামায়ণ ও মহাভারত এবং অন্ত নানা প্রকার দেবদেবীর জিন্মাকলাপ অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিতেন। এক শ্রেণীর গায়কগণ চামর ও মন্দিরা সহযোগে সাধারণ লোকের নিকট ঐ সকল গ্রন্থগত বিষয় গান করিয়া বেড়াইত। এতদ্বির বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচারের পক্ষে কথক

ঠাকুরেরা, কবিগুরা ও বাজাওয়ালগণ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপই বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশব ও বাণ্যলীলা সম্পন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে কোন শুভমুহুর্তে, কোন মহাশয় দ্বারা, কি উপায়ে এই লোকশিক্ষার পথ সুপারিত হইয়াছে, কি কি অনুষ্ঠান অবলম্বনে আধুনিক কালের বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সহসা কি এক দৈব শক্তি লাভ করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্য ইহার কিশোরকাল অতীত হইবার পূর্বেই এত শক্তি সামর্থ্য, এত বিচিত্রতা, এত বিকৃতি লাভ করিয়া প্রবলবেগে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাই আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর হইল, বঙ্গদেশে ইংরাজরাজত্বের সূত্রপাত হইয়াছে। কোন নূতন স্থানে পদার্পণ করিতে না করিতে, সে স্থানের অভাব সকল দূর করিতে এবং সে স্থান সর্বতোভাবে মানবের বাসোপযোগী করিতে, যত প্রকার সড়পায় ব্যবলম্বন করা আবশ্যিক, ইংরাজ-জাতি সে বিষয় চিন্তাভ্যস্ত ও আগ্রহশীল। অনুসন্ধান কবিলে যেমন সকল জাতীর দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজেরও দোষ খুঁজিলে পাওয়া যাইবে; কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্ত যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, তাহা ইংরাজ-জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। রাজকণ্ড প্রাপ্ত অপরাধী ইংরাজগণ অষ্ট্রেলিয়াতে নির্বাসিত হইত। রুসিয়া সাইবিরিয়াতে অপরাধীকে নির্বাসিত করে, ভারতবর্ষবাসী আন্দামানে নির্বাসিত হয়; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার নির্বাসিত ইংরাজগণ ও তাহাদের বংশধরেরা যেমন সভ্য জগতের সুশৃঙ্খলিত পক্ষে সহায়তা করিয়াছে, এমন আর কোথাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যে জাতিই অপরাধিগণও একরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করিতে পারে, শত্রুদোষ, সশ্রমেও সে ইংরাজ জাতি বরদীর্ণ ও সম্মানের পাত্র। এতাদৃশ পূজার যোগ্য ইংরাজ-জাতির সেই বিচিত্র জাতীয় উন্নতির একটা প্রবল তরঙ্গ আটলানটিক ও ভারত মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া বঙ্গের জলের জ্ঞান উন্মুল তরঙ্গ তুলিয়া নানা পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে। সেই তরঙ্গের বাতপ্রতিঘাতে যে ধবল কেন্দ্রপুঞ্জ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাই সমগ্রভারতকে ধবলাকার করিয়া রাখিয়াছে। এই ইংরাজসময়মে যে সকল মহাকাব্যচর্চানের শুভ সূচনা হইয়াছিল, মুদ্রাব্যয় তাহাদের প্রধানতম একটা। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স নামক একজন ইংরাজ সর্বপ্রথম বহুরূপে ভোগ করিয়া মুদ্রাব্যয়ের উপযোগী এক প্রহ বাঙ্গালা অক্ষর

প্রস্তুত করেন।* ঐ অক্ষরের সাহায্যে হালহেড্ নামক জনৈক ইংরাজ কর্তৃক রচিত সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। এই দুই জন চিরকৃতজ্ঞতাভাজন বিদেশীয় মহাত্মার নিকট বাঙ্গালাভাষা ও ইহার গুণাকাজী মহাশয়গণ চিরঞ্জে আবদ্ধ। উইলিস্ ও হালহেড্ বর্তমান স্বরিতগতিসম্পন্ন বাঙ্গালাসাহিত্যের অতিপ্রাপিতামহ, স্মৃতগাং আগাদের পুজনীয়। যাহারা কোন অনুষ্ঠানের কেবল মাত্র সুফল সম্ভোগ করেন, তাহারা সে অনুষ্ঠানের সূচনাকর্তাদের অধাবসায় ও আকিঞ্চন, ত্যাগস্বীকার ও কষ্টসহিষ্ণুতার এক রেখুমাত্রও মনে ধারণা করিতে পারেন না। ঐ দুই বিদেশীয় মহাত্মা ইংরাজ বলিয়াই বোধ হয় ঐক্লপ অসাধ্যসাধনে সাহসী হইয়াছিলেন এবং প্রায় ছয় বৎসর কাল এদেশীয় নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া, ঐ সকল ভাষার অক্ষর সংগ্রহ করিয়া পরস্পর মিলাইয়া তবে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইংরাজ প্রেমপ্রণোদিত হইয়া নগণ্য ও উপেক্ষিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ আমরা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক অসংখ্য সংবাদপত্র এবং রাশি রাশি গ্রন্থের প্রচার দেখিতে পাইতেছি। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস মহাদায়ের সংগৃহীত ও অনুমোদিত আইন সকল এইচ্. পি. ফোর্টার নামক জনৈক ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহাতেই বাঙ্গালা মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থের প্রথম আভাস প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ফোর্টার সাহেবই বাঙ্গালা ভাষার সর্ব প্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন *

* স্কোটিশ্ গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুরের অনুমোদিত আইন সমূহের বাঙ্গালা অনুবাদের নমুনা পাঠকবর্গের প্রীতিবর্দ্ধনার্থে এখানে প্রদত্ত হইল। ইহাই মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থসমূহের আদি পুস্তক :—“১ ধারা ইন্ডেহার নামার ১ প্রথম দফা। সুবেজাং বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মোতালক করসম্পর্কীয় সমস্ত জুমির ১০ দশ সনী বন্দোবস্তের নিমিত্ত যে সকল আইন ইন্ডেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ১৫ নবেম্বর এবং ইন্ডেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফিবরেঅরীতে নির্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে জুম্মাধিকারিদ্বিগের জানান হইতেছে যে, যে সকল অধিকারী ঐ সকল আইনের মতে আপনাদ্বিগের

* পণ্ডিত রামগতি দ্বারের দ্বীপ্ত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব,

ভূমির বন্দোবস্ত স্বল্প কিম্বা আপনাদিগের পক্ষের লোকদিগের দ্বারা সরকারে করিবেক তাহারদিগের ভূমির যে মোকদরী জমার ধাৰ্য্য ঐ বন্দোবস্তের কালে হইবেক তাহা বিলম্বের কৰ্ম্মকৰ্ত্তা সাহেব দিগের মঞ্জুর হইলে দশ সনের পরেও অস্থির ও ফেরকার না হইয়া চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি ।”

“৮ ধারা। ইশুতহারনামার ৭ সপ্তম দফা। * * ১ প্রথম এই বে। হাকিমের উচিত যে ছোট বড় সকল লোকেব বিশেষতঃ হুজুর ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতএব ঐ শ্রীযুত সকল মফঃসলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চানী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্তে যে কালে যে আইন করা উচিত জানেন সে কালে তাহাই নির্দিষ্ট করেন কিন্তু এমত সকল আইন নির্দিষ্ট হইবাতে কোন প্রকারে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূমিকারীদিগের শিরে যে মোকদরী জমার ধাৰ্য্য বাহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহাবদিগের কিছু আপত্তা ও ওজর হইবেক না।”

আব এক স্থানে লিখিত আছে :—“যে যে কালে অংশ ক্রমে ভূমি বিক্রয়াদি হয় অথবা অংশীদিগের সহিত অংশ করা যায় সেট ২ কাপে সকল অংশের মোকদরী জমার ধাৰ্য্য যে অনুসারে হইয়া চিবকান অটল ক্রমে থাকিবেক তাহার কথা।” * হুজাই বাঙ্গালা গণ্ড বচনাব প্রথম পঞ্চ-প্রদর্শক ; সুতরাং ভাল হটক আব মন্দ হটক, পড়িতে পড়িতে হস্ত সংবরণ করিতে পারা যাক আর নাই যাক, এট পুস্তকেই বাঙ্গালা গণ্ড রচনার সূচনা হইয়াছে । আমরা যে পুস্তক হটতে উপস্থিত করেক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিলাম, উক্ত পুস্তক ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে । * * *

খৃষ্টাব্দ প্রচার শ্রীরামপুরের পাদরী মহাশয়গণের মুখা উদ্দেশ্য হইলেও সেই প্রচার কার্যের সৌকর্য্যার্থে তাহারাই সৰ্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । বহুল পরিমাণে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করণের উৎসাহদাতা এবং বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ও গ্রন্থ রচনার পঞ্চপ্রদর্শকরূপে ইহারা আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন । “বেঙ্গল চৈতন্য-সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পঞ্চ রচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী

* ইংরেজী ১৮২৩ সালের আশ্বিন মাসের কলকাতা দৃষ্ট বাঙ্গালী অগ্রহায়ণ ।

পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালা গল্প রচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।” * কৃতিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত যে মূলত মূল্যে বিক্রীত হইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও ঐ খৃষ্টীয় পাদরী মহোদয়গণের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফল মাত্র। “আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, ঐ সময়ে পূর্বোক্তবিধিত হালহেড্, উইল্‌কিন্স্, ফর্টার, কেরি, মার্সমান, কোল্‌ব্রুক্ এবং ভ্রায় উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরেজ মহোদয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি এতদেশীয় ভাষাসকলের অনুশীলনে ও উন্নতি বিধানে সাতিশর বহুবান হইয়াছিলেন।” †

খৃষ্টীয় মিনারী মহোদয়গণের কার্য্যারম্ভ হইবাব অব্যবহিত পরে এবং মহাত্মা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচর্য্যার নিম্নুক্ত হইবার পূর্বে, ইংরাজ মিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবাব অল্প কলিকাতায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোর্ট উইলিয়ম কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত কালেজে সাহেব ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার অল্প কয়েকখানি বাঙ্গালা গল্পগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আইনের গল্প রচনা, যেমন তেমন হইলে চলিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল পাঠ্যপুস্তকেব বাঙ্গালা রচনা এক অদ্যুত জিনিষ। স্থানে স্থানে হস্ত সংবরণ কবা অসম্ভব। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন কৃত “কৃষ্ণচন্দ্র চরিত” প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসু কৃত “প্রতাপাদিত্য চরিত” মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে “রাজাবলী” ও ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে “প্রবোধচন্দ্রিকা” উৎকল নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞানদ্বার কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।‡ আমরা রাজীবলোচন কৃত সে কালের পাঠ্য পুস্তক “কৃষ্ণচন্দ্র চরিত” হইতে একটু প্রীতিপ্রদ উপহার প্রদান করিতেছি :—

“ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকার উপস্থিত হইলেন। পরে এক দিবস রাজা মানসিংহের সহিত জাহানগীর সা বাদশাহের নিকট

* পণ্ডিত জগদ্বন্ধু কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

† পণ্ডিত জগদ্বন্ধু কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

‡ ঈশ্বরকৃষ্ণ রাজনারায়ণ বসু কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

গমন করিলেন। বাঁদসাহের নিকট সংবাদ বিস্তারিত রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন গমন এবং আগমন পর্য্যন্ত কিন্তু ভবানন্দ মজুমদারের বিস্তর ২ প্রশংসা বাঁদসাহের নিকট করণে বাঁদসা আজ্ঞা করিলেন তাহাকে আমার নিকটে আন। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত ক্রোধে হইয়া আহ্বান করিলেন। রায় মজুমদার বিস্তর ২ নমস্কার করিয়া করপুটে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বাঁদসা ভবানন্দ মজুমদারকে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেন উপযুক্ত মহুয়া বটে। পশ্চাৎ মানসিংহকে নানা প্রকার রাজ প্রসাদ সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করণের মূল ভবানন্দ মজুমদার যদি আজ্ঞা হয় তবে মজুমদারকে রাজ প্রসাদ কিছু দিউন। বাঁদসা হস্ত করিয়া কহিলেন উহার নিবেদন কি। তখন রাজা মানসিংহ করপুটে কহিলেন বাঙ্গালার মধ্যে বাগুয়ান নামে এক পরগণা আছে সেই পরগণা ইহার জমিদারি হউক। বাঁদসা হস্ত করিয়া কহিলেন জমিদারির লিপি করিয়া দেহ। আজ্ঞা পাইয়া রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণার জমিদারির লিপি বাঁদসাহের স্বাক্ষর করিয়া মজুমদারকে দিয়া সংভ্রান্ত করিলেন।”

আর একস্থানে এইরূপ আছে :—“রাজা পরমাত্মদে শত ২ সুবর্ণ এক ২ ব্রাহ্মণকে এবং উদাসীনকে ও অন্ধ অতুরে এবং পল্লকে প্রদান করিতে লাগিলেন। যাবদীয় নগরস্থ লোকদিগের সম্ভ্রান্তের সীমা নাই। কিঞ্চিংকাল পরে পাত্রে প্রীতি রাজা আজ্ঞা করিলেন যাবদীয় নগরের লোকের বাটীতে মস্ত ও দধি এবং সন্দেশ ভায়ে ভায়ে প্রদান কর।” রাজা রাজাজ্ঞানুসারে সকলের বাটীতে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রাজার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ অন্তঃপুরে বাইয়া পুত্র দর্শন করুন এবং ভৃত্যবর্গেরদিগেরও বাসনা রাজপুত্র দেখে। রাজা হস্ত করিয়া কহিলেন কর্তব্য বটে। রাজা অগ্রে পুরমধ্যে গমন করিয়া পুত্র দর্শন করিলেন পশ্চাৎ দাসীরদিগের প্রীতি আজ্ঞা করিলেন পাত্র প্রভৃতি যাবদীয় ভৃত্যেরা রাজপুত্র দর্শন করিতে আসিতেছে

সকলকে দেখণ্ড।” • বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা ইহার পরবর্তী গ্রন্থগুলির কোনখানিই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ সকল গ্রন্থ এক্ষণে নিভাস্ত হুত্ৰাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। আর কয়েক বৎসর পরে আমাদের দেশের কোথাও আর ঐ সকল গ্রন্থ পাওয়া যাইবে না; কিন্তু বিশ্বস্ত হৃদ্রে অবগত হইলাম, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগরের রাজকীয় সুবিশুদ্ধ পুস্তকালয়ে ঐ সকল পুস্তক অতি যত্নে সুরক্ষিত হইতেছে। এই জন্তই বর্তমান সময়ে ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা জানেন ৭ গুণে শ্রেষ্ঠজাতি। আমরা আমাদের মূল্যবান সামগ্রী যত্নে রক্ষা করিতে জানি না, তাহার, আপনাদের সম্পদ রক্ষা করে, আবার অল্প জ্ঞাতির সম্পদও রক্ষা করিতে নিশ্চেষ্ট নহে। যে “কৃষ্ণচন্দ্র চরিত” হইতে দুই একস্থল উদ্ধৃত করা গেল, সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, উক্ত গ্রন্থ ১৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজধানী লণ্ডননগরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এটী যে, এত পূর্বে ইংলণ্ডে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রণের ভারগ্রহণ করিবার এবং তাহার প্রফ দেখিবার লোকাভাব হয় নাই।

ইংরাজ এইরূপ উত্তমলীল ও কার্যাত্মক বলিয়াই বীৰবেশে দেশে দেশে বিচরণ করিতেছে, ও সর্বত্র সিন্ধিগাভ করিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে; আর আমরা এই গুণের অভাবেই মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছি। ইহার পর আর একখানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার শিরোনামা পৃষ্ঠায় (Title Page) এইরূপ লিখিত আছে :—

শ্রী

॥ তোতা ইতিহাস ॥

॥ বাঙ্গালা ভাষাতে ॥

॥ ঐচণ্ডীচরণ মুসলীতে রচিত ॥

লন্ডনরাজধানীতে চাপা হইল।

১৮২৫

এই পুস্তকের রচনা ও শব্দ বোঝানার নমুনাবরূপ নিম্নগীর্ণিত করে ক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইল :—“কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্তা স্বর্গের ভ্রমর বদন চক্রেয় ভ্রমর কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন । আমদ্ সুলতান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রেমের চিত্তে পুশবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ককিরের-দিগকে আহ্বান পূর্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাং বস্ত্রাদি দিলেন যখন সেই বালকের সপ্তমবৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদ্ সুলতান একজন বিজ্ঞান লোকের স্থানে পড়িবার জন্তে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন ।” * ইহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা রামমোহন রায়কৃত অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর গল্প রচনার পদ্ধতি প্রচলিত হইলেও উপরি উক্ত উৎকর্ষ গল্প গ্রন্থ সকল আদৃত ও বিভাগলয়ে পঠিত হইত ।)

অনেকেরই ধারণা যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রামমোহন রায় বাঙ্গালা গল্প রচনার পথ প্রদর্শক । এক্ষণে ধারণা লোকের মনে বহুমূল হইবার যথেষ্ট কারণ আছে এবং ইহার মূলে যে কিছু পরিমাণে সত্যও নিহিত আছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই । রামমোহন রায় বিষয়কর্ণ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃঃ) কলিকাতার অসিয়া অবস্থিতি করেন, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার বেদান্ত সূত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও বাঙ্গালা ভাষার অতীব শোচনীয় অবস্থা । উপরেই তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ প্রদত্ত হইরাছে । বিভাগলয়ের পাঠার্থে রচিত ঐ সকল পুস্তক ভিন্ন, কেবল গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারের উদ্দেশে তখনও কেহ বাঙ্গালা গল্পগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না । কিন্তু বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাঙ্গালা গল্প গ্রন্থ রচিত ও বস্ত্রে রক্ষিত হইত বলিয়া বোধ হয় । এই সম্বন্ধে সকল প্রকার সংশয়ের অপনোদন মানসে আমি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের লাইব্রেরিয়ান প্রভাসচন্দ্র ত্রিভূক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি অনুগ্রহ প্রকাশে আমার পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

শ্রীশ্রীহর্গা—

সহায় ।

নৈহাটী

১২শে জুন ১৮৯৪

বিহিত বিনয়ানুসর পুরঃসর নিবেদনমন্তঃ

মহাশয়, অনেকের ধারণা এই যে, মহাশয় ৮ রাজা রামমোহন রায়ই বাঙ্গালা গল্পের জন্মদাতা । তিনিই সর্ব প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বহুতর গল্প গ্রন্থ রচনা করেন, একথা সত্য হইলেও গল্প লেখার প্রণালী যে ইহার পূর্বে ছিল না, একথা বলা যায় না । গল্প লেখার রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী ৮ গৌরীশঙ্করও বহুতর গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন । রামমোহন জন্মদাতা হইলে গৌরীশঙ্কর বাঙ্গালা গল্প লিখিতে শিখিলেন কোথায় ? এই কথার উত্তর করিতে গেলেই গল্প রচনা প্রণালী যে রামমোহনের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, তাহা আর সন্দেহ থাকে না । গদ্য রচনার প্রাচীনত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গেলে বৈষ্ণব গ্রন্থের সহায়তা পাওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তর অনেক গ্রন্থ পাঠ করি, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীচৈতন্যের সময় পত্রাদি প্রায়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত ; আমি একখানিও বাঙ্গালা পত্র খুজিয়া পাই নাই । মহারাজ নন্দকুমারের কারাবাস কালে লিখিত পত্রই বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনতম গদ্য রচনা, অন্ততঃ ইহার পূর্ববর্তী কোনও গদ্য রচনা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই । নন্দকুমারের বাঙ্গালাও উর্দু বহুল এবং এখনকার দলীলের ভাষার স্তার । নন্দকুমারের বহু পূর্ব হইতেই দলীলাদি গদ্যে লিখিত হইত । বোধ হয় তাহা হইতে বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা করার নন্দকুমারের ভাবা ঐক্লপ হইয়াছিল ।

কিন্তু দলীল ও পত্রাদি গদ্যে লিখিত হইলেও যতদূর গদ্যে লিখিত পুস্তক প্রাপ্ত না হওয়া যায়, ততদূর বাঙ্গালা গদ্য যে প্রাচীন ইহা কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না ; এই জন্ত সংস্কৃত পুস্তক অনুসন্ধানের সময় আমি বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থেরও অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত হই । নিজ বাটীতে আমার পৈতৃক হস্তলিখিত পুস্তকাবলী অনুসন্ধান করিতে করিতে বৃত্তিকল্পন নামে একখানি বাঙ্গালা লিখিত বৃত্তি গ্রন্থ প্রাপ্ত হই । গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নহে,

উহাতে কয়েকটা মাত্র মঞ্জরী আছে, বখা তিথিমঞ্জরী, প্রারচিত্তমঞ্জরী, শুদ্ধিমঞ্জরী ইত্যাদি। বর্ষীয়ান খুল্লভাত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম উহা তাঁহার পিসামহাশয়ের হস্তলিখিত এবং তিনি যশোহর জিলা হইতে আনীত আদর্শ দেখিয়া গ্রন্থখানির প্রতিলিপি করেন। খুল্লভাত মহাশয়ের সংকার, খানাকুলের বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের বংশীরগণের রচনা। একথা কতক সত্য বলিয়াও বোধ হয়। কারণ বাঁড়ুয্যে ঠাকুর ও তাঁহার বংশীরেরা স্বতির ব্যবস্থা দেওয়া বাহাতে সম্ভব হয়, তজ্জন্ত বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর কোন সন্তান সংস্কৃত না জানিলেও ব্যবস্থা দিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়েই বাঙ্গালা স্মৃতিকল্পদ্রুম লেখা হয়।

খুল্লভাত মহাশয় যে সময়ের কথা উল্লিখ করিলেন, সে সময়ে খানাকুলের ভট্টাচার্য্যগণ অনেকেই আমাদের বাটীতে পড়েন, এক্ষণে তাঁহাদের মুখে অবগত হইয়া একজন সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ খুড়ামহাশয়ের পিসামহাশয় যে ঐ গ্রন্থ নকল করিয়া পাণ্ডিত্য খ্যাতিলাভ করিতে চেষ্টা পাঠবেন, তাহাও বিচিত্র নহে। ঐ সময়ে গোবিন্দচন্দ্র ও আমাদের বাটীতে অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং তিনি যে এই গ্রন্থের বিষয় অবগত হইবেন, এবং এক্রপ লিখিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? আর একখানি বাঙ্গালা গল্পে লিখিত স্মৃতি গ্রন্থ সেরপুর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে পাওয়া গিয়াছে, উহাও নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় নাই।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে আমাদের বাটীতে স্মৃতিকল্পদ্রুম গ্রন্থ নকল হইয়াছিল, তখন আদর্শ গ্রন্থ প্রাচীন, সুতরাং উহা যে ১০০ বৎসরেরও পূর্বে লিখিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। 'বর্ষ' তাহারও পূর্বে হওয়াই সম্ভব, কারণ নারায়ণ বাঁড়ুয্যে ঠাকুর ও তাঁহার পুত্র ইহারাই গ্রন্থকার। ইহার প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে প্রারম্ভ হইয়াছিল। . রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী এই শতাব্দীর ১৪।১৫ বৎসর অতীত হইয়া গেলে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং বাঙ্গালা স্মৃতিকল্পদ্রুম তাহা অপেক্ষা প্রাচীন।

একান্ত বশব্দ

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কিন্তু মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে দেখা যায় তিনি নিজেই বলিতেছেন :—“বোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম।” এই গ্রন্থ যে গল্পে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। রামমোহন রায়ের গল্প রচনার কাল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ (১৭৩৭ শক) হয় না। ১৭২০ খৃষ্টাব্দই (১৭১২ শক) তাঁহার গল্প রচনার প্রকৃত কাল স্থিরীকৃত হয়।

একশ্রেণী ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, সে সময়ের অনেক পূর্বে হইতে আমাদের দেশের নানা স্থানে লুপ্তায়িত রত্নের জ্ঞান হস্তলিখিত অসংখ্য গল্পগ্রন্থ সম্বন্ধে রক্ষিত হইলেও মহাত্মা রামমোহন রায় সে সকল গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হন নাই, কারণ সাত আট বৎসরকাল পাটনার ও তৎপরে কালীধামে অধ্যয়নার্থে অবস্থিতি করিয়া, বোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গৃহে আসিয়া প্রথম পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উক্ত গ্রন্থ রচনার সময়ে অল্পতর গল্প গ্রন্থের বিস্তারিত জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভীত ছিল। এ কথা বলিবার আরও বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, তিনি শাস্ত্র প্রচারার্থে যে সকল গল্পগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে ভাষা তাঁহার নিজের প্রীতিভা-প্রস্তুত বলিয়াই বোধ হয়। রামমোহন রায় স্বরচিত গল্পের প্রণালী বিষয়ে কাহারও নিকট শ্রী ছিলেন না। বেদান্ত গ্রন্থের অনুষ্ঠানপত্রে তিনি বাঙ্গালা গল্প পাঠের নিয়ম বিষয়ে যে উপদেশ দিতেছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঐরূপ গল্পপাঠ লোকের অনুরক্ত ছিল। আমরা তাঁহার অনুষ্ঠান পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে তাঁহার গল্প রচনার প্রণালী ও তৎপাঠের উপদেশ উভয়বিধ বিষয়ই জানা যাইবে। তিনি লিখিতেছেন :—“ও তৎসং।—প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যিক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলি শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অল্প ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়তঃ এ ভাষার গল্পতে অল্পাধিক কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত হই তিন বাক্যের অর্থ করিয়া গল্প হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যেক কালুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অন্তএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলোপের ভাষার জ্ঞান লুপ্ত না

পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন। এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। বাঁহাদের সংকূটে ব্যুৎপত্তি কিরিতো থাকিবেক আর বাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুতাবা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প ভ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন বাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে, তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অধিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন, তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন নামের সহিত কোন ক্রিয়ার অধর হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অধর ইহা, না জানিলে অর্থ স্থান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম বাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর বাঁহার সন্তার অবলম্বন করিয়া অগতের নির্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্ত হইলেন। এ উদাহরণে যতপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি, ততপি সকলের শেষে হইলেন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অধর হইতেছে।* এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক পদের অধর করিয়া দেখাইয়াছেন কিরূপে গদ্য রচনা পড়িতে হয়। ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এদেশে সে সময়ে গদ্যের প্রচলন তাদৃশ আদৃত হয় নাই এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া গদ্যরচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অন্তএব তাঁহারে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার ও শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার উপযোগী গদ্য রচনার প্রবর্তক বলিলে, বোধ হয় কাহারও প্রতি অজ্ঞার করা হইবে না। বাঁহা সাহিত্যে তাঁহার হস্তক্ষেপের বহু পূর্বে গদ্য রচিত হইয়াছিল। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে, অপরদিকে রামমোহনের প্রতি-দ্বন্দ্বী গৌরীশঙ্করও (গুড়গুড়ো ভট্টাচার্য্য) গদ্য রচনার মিতান্ত্র অপারগ ছিলেন না। তথাপি রামমোহন রায়ের রচনার মৌলিকতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং পার্থের পদ্ধতি প্রবর্তন ও উপদেশ দ্বারা তিনি গদ্যরচনাকারীদের মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাহা হটক, তিনি

* রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী, ১০ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারার্থে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আজ বাঙ্গালাসাহিত্যে যে ধর্মালোচনার প্রবল প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়, রামমোহন রায়ই ইহার পথপ্রদর্শক বা পিতৃপুরুষ। বাঙ্গালা ভাষার যিনি যে ভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্মালোচনা করুন না কেন, তাঁহার শ্রমের রাখা উচিত যে, ঐ মহাপুরুষের নিকট তিনি ঋণী। ভাষ্যের জ্ঞান তিনিও এ দেশবাসী মাঝেরই তর্পণের জল গণ্ডু ব্র আশ্রিত সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যাসের সময়ে আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙ্গালা সাহিত্য যেমন পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারকালেও ইংরাজ পাদ্রিগণ এবং সে সময়ের ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আত্মবান হিন্দুদিগের সহিত তাঁহার বাদ প্রতিবাদে, বাঙ্গালা সাহিত্য সেইরূপ জীবনের পথে আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। “রামমোহন রায় বচিতে যে কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও পৌত্তলিক মতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সঠিত বিচার। ঐ সকল বিচারে তিনি নিজের নানা শাস্ত্র বিষয়ক প্রগাঢ় বিজ্ঞা বুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাভীর্বা প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদগুণের এক শেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে সে সকল অধ্যয়ন করিলে চমৎকৃত ও তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে আশ্রিত হইতে হয়।” * কিন্তু যে সুমধুর ও সুশ্লীল ভাষা আজ বঙ্গবাসীর কর্ণকূহরে অমৃত সিক্তন করিতেছে, যে ভাষার প্রবলশক্তি ও বহুবিকৃতি দেখিয়া ঐ বাঙ্গালী মাঝেই আজ আনন্দিত, যাহার শ্রী সম্পাদনে অতুল প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তুলিকাগ্রে যে ভাষা অল্পমম সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে, যে ভাষার গাভীর্ব্যসম্বৃত গৌরব বন্ধনে পূর্ববঙ্গের সুপ্রবীণ লেখক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, আজ ঐহার সেবার, বঙ্গের বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত নিযুক্ত, সেই মাতৃভাষার গঠনকার্য্যে, তাহার পারিপাট্য সাধনে, তাহার অবশেষেই প্রাণসঞ্চারের জন্ত আনন্ডা কাহার নিকট ঋণী? নিজের শোণিত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া বহু চিন্তা ও বহু শ্রম স্বীকার করিয়া নিজের কল্পনির্বিশেষে কোন মহাত্মা ইহাকে লালন পালন

* পণ্ডিত রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,

করিয়াছেন ? সমগ্র বাক্সালীজাতি সম্বন্ধে বলিবেন, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগরই সেই ব্যক্তি ; তাঁহারই মমতাময় শান্তিজন্য লাভ করিয়া বাক্সালা সাহিত্য প্রাণ পাইয়াছে । তিনিই মহর্ষি কথের জ্ঞান কল্পা শকুন্তলাকে গালন করিয়াছেন— তিনিই মহর্ষি বাম্পীকি হইয়া বনবাসে সীতার অশ্রুজল মোচন করিয়া আশ্রয় দান করিয়াছেন, তাঁহার সুকোমল পিতৃকোড়ে সীতা ও শকুন্তল্য-পরিশোভিত বাক্সালা-ভাবা কিরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন নবীন কবি লিখিয়াছেন :—

একদিন এই মহামুনিবর, ভ্রমিতে গভীর বিজন বনে,
কি জানি সহসা, কেমন করিয়া মিলন হইল বাণীর সনে ।
পরম যতনে, আনি ঘরে তারে, স্বীয় তপোবলে সৃজন করি,
বিমল বসনে, সাজা'ল বাণীর, অহো ! কি মাধুরী হ'য়েছে মরি ।
মৃত প্রাণে তার, নবীন জীবন, করেছে প্রদান এ মহা ঋষি,
বালিকার স্নেহে মগন তাপস, বালিকা তাপসে রয়েছে মিশি ।
কত ভালবাসে, কত কথা কয়, চাহে কত কিছু বালিকা তার,
একে একে দিয়ে, নানা অলঙ্কার, সাজায়েছে ঋষি বাণীর কার ।
আখ্যানমঞ্জরী, ভুলি যতনে, পরাল গলায় চিকণ মালা ।
বালবিধবার, অশ্রুবিন্দু দিয়ে, মিল সাজাইয়ে বরণ ডালা ।
মহাপুরুষের জীবনচরিতে, মিল করে নব কঙ্কণ তার ।
মন্তকের মনি, করি সাজাইল, সীতাবনবাস-স্নেহোপহার ।
এইরূপে কত, বসন ভূষণে, সাজা'ল বাণীর নবীন দেহ ।
নব বেশ পরি, নব আশা তার, আগে এত শোভা দেখিনি কেহ ।*

বিভাগাগর মহাশয়ের রচিত প্রথম গল্পগ্রন্থ বাসুদেব চরিত । তাঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্যে থাকিলেও আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি যে, সেই অপ্রকাশিত বাসুদেব চরিতেই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ রচনার সূচনা হয় । আমরা তাঁহার অপ্রকাশিত প্রথম পুস্তক হইতে কোন-কোন স্থান উদ্ধৃত করিলাম :—“এক দিবস কৃষ্ণ বলরাম ও অস্ত্র অস্ত্র গোপবালকেরা

একত্র মিলিয়া খেলা করিতেছিলেন ইতি মধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনকনেরা নন্দমহিবীর নিকটে গিয়া কহিল ওগো কৃষ্ণ মাটা খাইরাছে আমরা বারণ করিলাম তনিল না। তখন পুত্রবৎসলা বশোদা অন্তবাস্তে আসিয়া কৃষ্ণের গণ্ড ধরিলেন এবং তর্জ্জন করিয়া কহিলেন রে চুষ্ট, তুই মাটা খাইরাছিস রহ আজ আমি তোকে মাটা খাওয়া ভাল করিয়া শিখাইতেছি।” * আর এক স্থানে :—
 “এই রূপে কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে দেবরাজের পূজা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-বাসীরা গোবর্দ্ধন পর্বতের অর্চনার বিধি সংস্থাপন করিলেন এবং স্তম্ভিমান দেব দর্শন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন দেখ ভাই আমরা এতাবৎকাল পর্যন্ত ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলাম কখন দর্শন পাই নাই কিন্তু অস্ত্র একবার মাত্র অর্চনা করিয়া গিরিদেবের দর্শন পাইগাম অতএব এতদিন আমরা এমন প্রত্যক্ষ দেবতার উপেক্ষা করিয়া নৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি আজ কৃষ্ণ হইতে আমাদের ভ্রম নিবারণ হইল। কৃষ্ণ দেখিতে বালক বটে কিন্তু বুদ্ধিতে আমাদের পিতামহ। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন করিয়া কৃষ্ণ গুণগান করিতে লাগিলেন এবং নৃত্যঙ্গীতাবগানে পুনরায় পর্বত প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন।”

“তাজিয়া ইন্দ্রের পূজা পর্বতে পূজিল।

শুনিয়া ইন্দ্রের মনে ক্রোধ উপজিল ॥” †

বিভাসাগর মহাশয়ের সর্বপ্রথম রচনা যে এইরূপ সুন্দর হইবে আমরা ইহাই আশা করিয়াছিলাম, তাহার কবিতা রচনারও অভ্যাস ছিল, শেষ দুইটা চরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তৎপরে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বেতালপকবিশ্লেষিত্তির বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন, ইহাই তাহার প্রকাশিত পুস্তক সকলের আদি গ্রন্থ। উক্তর কালে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন, সে সময়ের সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতমণ্ডলী উক্ত গ্রন্থের রচনার পারিপাট্য সম্পর্কনে তাহার পূর্নাতাস আশ হইয়াছিলেন।

উক্ত গ্রন্থ রচনার পর উহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যরূপে গৃহীত

* বিভাসাগর মহাশয়ের বাস্তবের চরিত্রের হস্তলিখিত পুঁখি, ৩৩ পৃষ্ঠা।

† বাস্তবের চরিত্র, হস্তলিখিত পুঁখি, ৩৩ পৃষ্ঠা।

হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে প্রথম মন্তব্য প্রকাশের ভান পরলোকগত ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়। তাঁহার নিকট উক্ত গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়ার তিনি আপত্তি করেন। বিভাগাগর মহাশয় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া শ্রীরামপুরের পাদ্রী সাহেব মহাশয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাদ্রী মার্সম্যান সাহেব সে সময়ে প্রচলিত সমস্ত গল্প গ্রন্থের মধ্যে উক্ত নবপ্রকাশিত বেতালপঞ্চাংশতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়া এক প্রশংসা পত্র দিলেন। বর্তমান বাক্যলা ভাবার পিতৃহানীর বিভাগাগর মহাশয়ের প্রথম গ্রন্থ এইরূপ দুই এক ধাক্কা খাইয়া শেষে পাদ্রী সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়। এই ঘটনাটী কেবল আমাদের কাছে এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, জগৎবিখ্যাত দেহপিয়রের রচিত মহানু্য রত্ন সকল বহুকাল সুপরিজ্ঞাত ও অনাদৃত ছিল, মিলটনের জীবদ্দশায় তাঁহার প্যারাডাটস্ লাটের মূল্য কেহ অনুভব করে নাই। জনসন ভদ্রজ্ঞানোচিত পরিচ্ছদেব অভাবে লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। গোল্ডস্মিথ্ চিরজীবন দাবিদা পীড়ায় নিপীড়িত ছিলেন। ইহাদেব রচিত গ্রন্থাবলীর আদর থাকিলেও সমাবরূপে সমাদৃত হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। তাহা না হইলে তাঁহাদেব আর্থিক অসচ্ছলতা অত অধিক হইত না। প্রমাণের জন্ত বিদেশেই বা কেন ছুটাছুটি করিতেছি। বাক্যালার অমর কবি শ্রীমধুসূদন জীবদ্দশায় অনাদৃত ও মৃত্যুকালে পবিতাক্ত। স্মৃতরাং বিভাগাগর মহাশয় যে প্রথম উদ্যমে চুপকাড় ন'ডাচাড়া খাইবেন, ইহা অল্প বিচিত্র কি? তবে শীঘ্র যে তাঁহার বিপদজ্ঞান কাটিয়া গিয়াছিল এবং সহজে যে তিনি তাঁহার গম্যপথ পরিকাব কবিত্তে পারিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, বেতালপঞ্চাংশতির রচনা একাল পর্যন্ত সমভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে। এখনও লোকের আদর করিয়া সে পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করে।

এখানে আবার আমরা আর একটী গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ৮মদশমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনী প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাক্ষরণ, এম, এ, মহাশয় উক্ত মহাশয়ের জীবনচরিত্তের ৪২ ও ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—“বিভাগাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চাংশতিতে

অনেক নূতন ভাব ও অনেক নূতন সূক্ষ্মর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমন্ট ও ক্লেচার লিখিত গ্রন্থগুলির দ্বারা ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।” এ বিষয় কথা। এ কথাটির কিছু মূল আছে কি না দেখা আবশ্যক। বিভাগাগর মহাশয়ের জীবনচরিত প্রণয়নে অগ্রসর হইয়া আমরা পূর্বে তাহা ভাবি নাই, কিন্তু এক্ষণে জ্ঞানের অমুরোধে আমরা ইহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এ বিষয় নইয়া কোন প্রকার বাগ্‌বিত্তা না করিয়া আমরা পূজনীয় গিরিশচন্দ্র বিহারী মহাশয়ের পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের সন্দেহ অপনয়ন করিলাম :—

“পরম শ্রদ্ধাম্পদ,

শ্রীযুক্ত চৈতন্যচন্দ্র বিভাগাগর মহাশয়

স্বাশ্রয়-প্রতিমেষু।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, প্রণীত মননমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চাশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম! তিনি লিখিয়াছেন “বিভাগাগর প্রণীত বেতালপঞ্চাশতিতে অনেক নূতন ভাব ও সূক্ষ্মর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমন্ট ও ক্লেচারের লিখিত গ্রন্থগুলির দ্বারা ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।” এই কথা নিতান্ত অলীক ও ভ্রান্ত, আমার বিবেচনায় এরূপ অলীক ও ভ্রান্ত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্রনাথ বাবুর নিতান্ত অজ্ঞার কার্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি বেতালপঞ্চাশতি রচনা করিয়া আমাকে ও মননমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। প্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে ছই একটি শব্দ পরিবর্তিত হইত। বেতালপঞ্চাশতি বিষয়ে আমার অথবা তর্কালঙ্কারের এতদতিরিক্ত কোন সংশয় বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন
তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি—

সোদরাভিমানিনঃ

শ্রীগিরিশচন্দ্র শৰ্ম্মণঃ।”

সত্য-মিথ্যা, জ্ঞান অজ্ঞান বিচার কবিবার পক্ষে এই পত্রখানি পাঠকের
পক্ষে যথেষ্ট, ইহার উপর আমাদের আর বলিবার কিছুই নাই।

একশত খণ্ড বেতালপঞ্চবিংশতি তিনশত টাকার মার্শেল সাহেব ক্রয়
করেন। এই তিনশত টাকার মুদ্রাক্ষরের ব্যয় সঙ্কলান হইল। অবশিষ্ট
পুস্তকগুলি বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। বেতালপঞ্চবিংশতির
প্রথম সংস্করণের ভাষা তাদৃশ প্রোঞ্জল হয় নাই। সংস্কৃতমূলক কঠিন
শব্দ সকল ঐ পুস্তকের অন্তর্ভরণ রূপে বিরাজিত ছিল, উদাহরণ স্থলে উল্লেখ
করা যাইতে পারে—“উত্তালন্তরঙ্গমালাসঙ্কল উৎকল্লফেননিচয়চুষিত ভয়ঙ্কর
তিমিকরনক্ৰচক্রভীষণ শ্রোতব্ধতীপতিপ্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য
তরু উদ্ভূত হইল।” এরূপ বহুসমাসসমন্বিত পদাবলী যে পাঠকের কটিকব
হইবে না, তাহা তিনি স্বরায় বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন। এই জ্ঞাত বেতালের
পরবর্তী সংস্করণ সকলে ক্রমে ক্রমে ঐরূপ স্থানগুলি পরিবর্তিত হইয়াছে।
বর্তমান সংস্করণের ভাষা প্রোঞ্জল ও লাগিত্যপূর্ণ। যে কোন স্থান পাঠ করিলে
পাঠকের তৃপ্তিলাভ হইবে, যথা :—“এই সময়ে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী রাজার
সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল; এবং তদীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া
কহিল, মহারাজ! আমার প্রতি যে আক্রা করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য
করিব।” আর একস্থানে :—“রমণীর বসন্তকাল উদ্ভাসিত হইলে রাজকুমারী,
উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া, পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা
সম্মত হইলেন, এবং রাজধানীর অনতিদূরে, যে যোজনবিস্তৃত অতি রমণীর
উপবন ছিল, উহাকে ক্রীলোকের বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক
লোক পাঠাইয়া দিলেন।” এইরূপ সুসুধুর পদবিস্তার, ভাষা ও ভাবের সমাবেশ
ইতিপূর্বে কোন প্রেমেই পরিলক্ষিত হয় নাই। রচনা বিষয়ে বেতাল সে সময়ের
সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। ভাষা বিষয়ে বেতালই বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব
প্রথম গ্রন্থ। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিভাগসাগর মহাশয় মার্সদান সাহেব কৃত ইতিহাস

অবলম্বনে বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া, ইংরাজ রাজত্বের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সে সময়ের শেষ পর্য্যন্তের জেনারেলের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত করিয়া একখানি ইতিহাস রচনা করেন। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মনোহর। আমরা বাল্যকালে বিভাগগরে এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম। এখনও তাহার স্মৃতিষ্ট “পদাবলীপূর্ণ স্থানসকল কণ্ঠস্থ আছে। বিভাগাগর মহাশয় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে চোব্বার্স বিওগ্রাফি নামক গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া “জীবন চরিত” প্রণয়ন করেন। জীবন চরিতে বিদেশীয় বীৰকাহিনী বিবৃত হইয়াছে, যে সকল মহাদ্বার আবির্ভাবে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জাতীয় গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে, যাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া স্বদেশের হিতসাধন কবিয়াছেন, এবং যাহাদের জন্মগ্রহণ ও সেবার পৃথিবীর সমগ্র মানবমণ্ডলী উপকৃত ও লাভবান হইয়াছেন, তাহাদের কীর্তি-কলাপ ও সুপবিত্র নামাবলী কেবল গ্রীসের, কেবল রোমের, কিম্বা কেবল ইংলণ্ডের সম্পত্তি নহে, সমগ্র পৃথিবীর ধনরত্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সেই সকল মহাদ্বার কীর্তিগাথাই উক্ত পুস্তকের বিষয়ীভূত হইয়াছে। পদমাধুর্য্য বিষয়ে বেতাল যেমন প্রসিকি লাভ করিয়াছে, ভাষার ওজস্বিতা বিষয়ে জীবনচরিত সেইরূপ উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ হইলে সুন্দর, সুমধুর ও সুশ্রাব্য হয়, বেতাল, বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ ও জীবন চরিত গ্রন্থই সে সময়ে তাহার আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। জীবনচরিত, আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী প্রভৃতি পুস্তক রচনার জন্ত বিভাগাগর মহাশয়কে বিদেশীয় চরিতের পক্ষপাতী বলিয়া কেহ কেহ কটাক্ষপাত কবিতো পাঠবন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বালকগণের পাঠোপযোগী সহজবোধ্য দেশীয় আখ্যায়িকা সে সময়ে সংগৃহীত হওয়া, সম্ভবপর ছিল না, তাহা হইলে, তিনি কখনই উপেক্ষা করিতেন না। আর উদারকদম বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট :—“অয়ং নিম্নঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্” এ বিচার ছিল না। “উদারচরিতানাম্ব বহুধেব কুটুম্বকম্।” দানে যেমন মুক্তহস্ত, সাধু চরিত্র সমাদরেও তিনি প্রকৃত হিন্দু ভাবে পরিচালিত হইয়া উদারতার উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হিন্দুর চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাহাতে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে চোব্বার্স কন্ডিমেন্টস অব্ নলেজ নামক

গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে বালকদিগের পাঠোপযোগী করিয়া শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ বা বোধোদয় রচনা করেন। এই পুস্তকে সহজ ও সরল ভাষায় পদার্থ বিভাগ, বস্তুবিচার, কাল বিভাগ ও সংখ্যাদি নির্দেশ করা হইয়াছে। বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সরল ভাবে বালক বালিকাদিগকে বুঝাইবার উপযোগী এক্ষণ বঙ্গালা গ্রন্থ অতি বিরল।

ইহার পর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিভাগাগর মহাশয় কার্লদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক নাটকের উপজ্ঞাস ভাগ অবলম্বনে এক অতি উপাদেয় সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন, ইহারই নাম “শকুন্তলা”। শকুন্তলার সমাগমে বঙ্গালা সাহিত্য এক অপূৰ্ণ নূতন শ্রী ধারণ করিল। বঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিশোরীর বাল্যলীলার যৌবনের নবোন্মেষ দেখা দিল। শকুন্তলার তাঁহার লিপিচাতুর্য, রচনামাধুর্য ও পদ্মললিতা দর্শনে পাঠক মাত্রেই মোহিত হইয়া গেলেন এবং চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বিভাগাগর মহাশয় এই বৎসরেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক” রচনা ও প্রচার করেন। উক্ত পুস্তক প্রচারে কিরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বিধবাবিবাহবিষয়ক অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। বিধবাবিবাহবিষয়ক আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকিয়া এবং কালেক্সের কাজকর্ম যথারীতি সম্পন্ন করিয়াও বিভাগাগর মহাশয় বহু গ্রন্থ রচনার নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন। যে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবাবিবাহের আন্দোলনে সমগ্রদেশ টলটলানমান, যে সময়ে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা বিভাগাগরকে লইয়া ব্যস্ত ও বিব্রত, তিনি সেই বৎসরে সেই গণ্ডগোলের মধ্যে, সেই সমাজ-তরঙ্গের ফেনপুঞ্জের মধ্যে, বিধবাবিবাহ প্রস্তাবরূপে, রোমের বাতাবিতাভিত্তি বিপদসঙ্কুল সমাজবন্ধে উপবেশনপূর্বক শিশুদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনার নিবিষ্টচিত্ত। দুইভাগ বর্ণপরিচয়, কথামালা ও চরিতাবলী এই বৎসরেই রচনা করিয়াছিলেন। বিভাগাগর মহাশয় যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাকে লইয়া চারিদিকে হলহুল পড়িয়া গিয়াছে, আর তিনি সংঘটতিতে, নিশ্চিন্ত মনে, বঙ্গীয় বালকগণের পাঠোপযোগী বর্ণপরিচয়রচনা শেষ করিয়া, কথামালা ও চরিতাবলী প্রণয়নে নিযুক্ত হইলেন। এই দ্বিবিচিত্রতা ও

শান্তভাব, তেজস্বী উদ্ধতপ্রকৃতি বিদ্যাসাগরে কি বিচিত্রতার সমাবেশ নহে ?

ডেভিড্ হেন্সলের ঝায় বেথুনের মৃত্যুতেও কলিকাতাবাসিগণ যারপর-নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহু লোকের উদ্যোগে বেথুনের স্মৃতি রক্ষার্থে বেথুন সোসাইটি নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার প্রতিষ্ঠা কার্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সভায় এতাবৎকাল বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে এবং এখানে বক্তৃতা করিয়া ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকেই লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের যে বক্তৃতার বিশ্ববিজয়িনী প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়, সেই “ধীশুশ্রুট, ইউরোপ ও এসিয়া” বিষয়ক বক্তৃতার রঙ্গভূমি বেথুন সোসাইটি। এই সভার সে কালের এক অধিবেশন দিবসে বিদ্যাসাগর মহাশয় “সংস্কৃত ভাষা সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব” পাঠ করেন। ইহা একখানি সমালোচনা গ্রন্থ। সংস্কৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত অণুত সমালোচনাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য, কিন্তু উক্ত পুস্তিকার বান্দীকি ও ব্যাসের অমূল্য গ্রন্থস্বরের সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। এই ছুই মহায়া ও তাঁহাদের রচিত মহাকাব্যের অনুল্লেকের কাবণ নির্দেশ করা সুকঠিন ব্যাপার। বোধ হয় প্রবন্ধের আয়তনের দীর্ঘতা ও প্রবন্ধ পাঠের সময়ের অল্পতাই ইহার একমাত্র কারণ; তাহা হইলেও, ইহাদের ও ইহাদের গ্রন্থের নামোল্লেখ না করা অজ্ঞায় হইয়াছে।

ইহার বচনপূর্ব হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সভাগণের পরিচয় হয়। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, বাবু রাজনারায়ণ বসু, মহর্ষি শ্বেবেচ্ছনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত আত্মীয়তা ও অনিষ্ঠতা রুদ্ধির এক বিশেষ কারণ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে প্রচারিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্যের সহায়তার তিনি ত্রুতী ছিলেন। নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা দ্বারা তত্ত্ববোধিনীর শোভা ও গৌরব রুদ্ধির পক্ষে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে উক্ত সংবাদ পত্রের উৎপত্তি, তিনি সে সভার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিলেন, এবং ব্রাহ্ম সমাজেরও কল্যাণ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহার বাঙ্গালা গদ্য মহাতারত রচনার সূচনা হয়। তত্ত্ববোধিনীতে মহাতারতের উপক্রমণিকা

ভাগ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইরাছিল। পরে ১৮৬০ ইষ্টাব্দে তাহী পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, উক্ত গ্রন্থের রচনাও অতি মনোরম। ভাষা ও ভাব সম্পূর্ণরূপে বিবরের অনুরূপ হইরাছে। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য বিভাঙ্গাগর মহাশয়ের গদ্য মহাভারত হইতে কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—“হে মহর্ষিগণ! ইহার পরেই অতি প্রমত্ত অনুশাসনপর্ক। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথাপুত্র ভীষ্মের নিকট ধর্মনির্ভর শ্রবণ করিয়া হতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পর্কে ধর্ম ও অর্থের অনুরূপ ব্যবহার প্রশংসা, অশেষবিধ দানের পৃথক পৃথক ফল নিদেশ, সদস্য পাত্র বিবেক, দানবিধি কখন, আচারবিধি নির্ণয়, সত্যস্বরূপ নিরূপণ, গো ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্তন, দেশকালানুসারে ধর্মরহস্য মীমাংসা ও ভীষ্মদেবের স্বর্গাবোহন কীর্তন আছে। ধর্মনির্ভরবৃত্ত বহুব্রাহ্মণস্বত্ব অনুরূপ নামক ত্রয়োদশ পর্ক নির্দিষ্ট হইল।” তৎপরে পর্কসংগ্রহের শেষভাগে আর একস্থানের রচনা এই :—“তৎপরে অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য স্বর্গপর্ক। মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মরাজ দয়ালু-সদয়তাপ্রবৃত্ত স্বসমভিবাধারী কুরুবকে পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকগত নিবারণে আরোহণ কবিত্তে সম্মত হইলেন না। ধর্ম, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া কুরুরূপ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন। যুধিষ্ঠিব তৎসমভিবাধারে স্বর্গারোহণ করিলেন। দেবদূত ছলক্রমে তাঁহাকে নরক দর্শন করাইল। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে অবস্থিত আজ্ঞানুবর্তী ব্রাহ্মণের কাতর শব্দ শ্রবণ করিলেন। ধর্ম ও ইন্দ্র-তাঁহার কোভ নিবারণ করিলেন। অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আকাশগন্ধার অবগাহন করিয়া মানব দেহ পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গে বৈধর্ম্যাক্রান্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিবাধারে পরমাদরে ও পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।” গভীর পরিতাপের বিষয় যে এরূপ সুসংলগ্ন পদবিভাঙ্গ-সম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ ভাষার লিখিত গদ্য মহাভারত গ্রন্থ তাঁহার লেখনীতে পূর্ণবয়স প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার বিচারশক্তি ও বহুজ্ঞানশ্রুত সমালোচনা সহ মহাভারত গ্রন্থ যে এক অতি উপাদেয় বস্তু হইত, বিভাঙ্গাগর মহাশয়ের রচিত মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগ কেবল তাহারই আভাস প্রদান করিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতিতে অধীনতার ভাব ছিল না। তিনি উগ্র প্রকৃতির লোকের আচরণেই সর্বদা আপনাকে পরিচিত করিতেন। এইরূপে পুস্তকাদি রচনা দ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আয়ের সূচনা হইলেও, তিনি সে সময়ে যে সকল বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষপতির অক্ষয় ভাণ্ডারও স্বয়ং শূন্য হইয়া যায়, সুতরাং অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সামান্য অর্থ কি হইতে পারে? সমুদ্রে শিশিরবিন্দুৎ তাঁহার পুস্তকের আয়, তাঁহার সে সময়ে ব্যয়-বারিধি-বক্ষে লুপ্তায়িত হইল। তথাপি তাঁহার সংসারের অভাব ছিল না। ছোটলাট জালিডে সাহেব যখন প্রবোধ দিবার মানসে বলিয়াছিলেন যে, বিধবাবিবাহরূপ সূর্য্যহং আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া এবং বিধবাবিবাহ কার্যে লিপ্ত থাকিয়া, এরূপ বহুবেতনের কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করা কি সুবিবেচনার কার্য্য হইতেছে? তখন বহুবর জালিডে সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে স্বাধীন প্রকৃতির পরিচায়ক প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “গগন বুঝিয়াছি, এক পোয়া চাউল হইলে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দিনপাত হইবে, তখন আব অর্থের লালসা পরিচালিত হইয়া আত্ম সম্মান বিনাশ করিব কেন?”

ইহার পৰ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় “সীতার বনবাস” রচনা করেন। সীতার বনবাসে তাঁহার বাঙ্গালা রচনার শোভা ও সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে প্রাক্টুটিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ প্রাথমিকতার পরিচায়ক প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ। ইহা প্রকৃত অনুবাদ নহে। অনুবাদের ছায়া পড়িলেও, ইহাকে এক প্রকার মূল গ্রন্থ বলা যাউতে পারে। এই গ্রন্থের বিষয়গত মৌলিকতা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার না হইলেও, ভাব ও ভাষা বিষয়ে তিনিই ঐরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের পথ-প্রদর্শক। ‘রামবনবাস’, ‘রামের বনগমন’, ‘রামের রাজ্যাভিষেক’ প্রভৃতি রামায়ণের ছায়াবলম্বনে যে বহু গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসই এই সকল গ্রন্থের পথ প্রদর্শক। সীতার বনবাস বহুকাল ধরিয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। একনিষ্ঠতা, সহিষ্ণুতা, এবং হৃৎকণ্ঠের নিপীড়নে নিম্বেষিত হইয়াও পতির প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রদর্শনই সীতার বনবাসের অমূল্য সম্পদ। শিলাসংঘর্ষে চন্দন যেমন তরল হইয়া মধুর গন্ধ বিস্তরণ

করে, দেহের স্নিগ্ধতা ও মনের প্রকৃতা সম্পাদন করে, বনবাসে দেবীপ্রকৃতি সতীর অপূর্ণ চরিত্রমধুরীও উজ্জ্বল শোভা ও সৌন্দর্যের মগ্নরমিষ্ট স্বভাব বিতরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। বিন্দু প্রমাণ মৃগনাভি যেমন বহুবৎসর ধরিয়া তাহার বাসস্থানকে সুগন্ধপূর্ণ করিয়া রাখে—যখনই তাহার আশ্রয় লইবে, যখনই তাহার আধাবের নিকটস্থ হইবে, তখনই তাহার স্বাভাবিক সৌরভে শরীর ও মন পুলকিত হইয়া উঠিবে, বাস্তবিক আশ্রম-বাসিনী সীতার জীবনভাবভূমিও অলৌকিক গুণাবলীর অনুশীলনে স্বতঃই জন্মে গভীর আনন্দের সঞ্চার হয়, সেই দেবীচরিত্রের অনুধ্যানে মন আপনা আপনি উচ্চতর লোকে অবস্থিতি করিতে অভ্যস্ত হয়। সেই অমূল্য রত্নভাণ্ডারের যে অংশই পাঠ কর না কেন, সেই বনদেবীর মধুর মৃতি জন্মে প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্তরে স্বর্গস্থ বিতরণ করিবে। সীতার বনবাসে বিভাগাগর মহাশয় বঙ্গীয় নারীসমাজের সমক্ষে নিকান সংসার ধর্মেব আদর্শ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গবঙ্গীগণ সীতাচরিত্রের অনুকরণে আত্মোন্নতি সাধন করিতে প্রয়াস পাইলেই, বিভাগাগর মহাশয়ের উক্ত অমূল্য গ্রন্থ রচনার উপযুক্ত পুঙ্খাব হইবে। সীতার বনবাস সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি জায়রাম মহাশয় লিখিয়াছেন “বিভাগাগররচিত সীতার বনবাসকে অনেক ‘কামার জোলাপ’ কহে। ঐ পুস্তকের প্রথমোংশ ভবভূতির প্রণীত উত্তরচরিত্রের প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমুদয় ভাগ কেবল নুতনরূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকারজনক ও কি অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। বোধ হয় উহাতে এমন একটা পত্রও নাই যাহা পাঠ করিতে পাঠকেরও জন্ম দ্রব না হয়। কল্পনাস্রব উদ্ভীপনে বিভাগাগরের যে কি অসুত শক্তি আছে, তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক আমরা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া তৎকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে বিভাগাগরের লেখনী মধুরী, উহা হইতে যাহা কিছু নির্গত হয়, তাহাই মধুরী হইয়া পড়ে। বলিতে কি সীতার বনবাস পাঠাবলানে বিভাগাগরকে, এইরূপ কার্যে ব্যবহারের নিমিত্ত তাহার স্বনামাঙ্কিত একটা স্বর্ণময়ী লেখনী সৌন্দর্য্যাকাশ সম্পাদক দ্বারা অপ্রকৃতভাবে উপহার দিবার জন্ত আমাদের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল; লেখনী নিৰ্ম্মাণ করাইবার জন্ত অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলাম,

কিন্তু নানা কারণে তৎকালে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ভাবিয়াছিলাম, অপর কোন সুযোগে উহা প্রদান করিব। কিন্তু বড়ই চুংখের বিষয় এ পর্য্যন্ত তেমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না।*

সীতার বনবাস রচনা করিয়া তিনি রামের রাজ্যাভিষেক রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে, উক্ত গ্রন্থের কয়েক কণ্ঠা যখন মুদ্রিত হইয়াছে, পুস্তক শেষ হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই, এমন সময় সহচর-সম্পাদক বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত “রামের রাজ্যাভিষেক” এক খণ্ড বিভাগসাগর মহাশয়কে উপহার দিতে যান। বিভাগসাগর মহাশয় দেখিলেন যে, শশী বাবু ঐ পুস্তক একখানি রচনা করিয়াছেন, এবং সে পুস্তকখানি দেখিয়া যখন বুঝিলেন যে, সেখানি মন্দ হয় নাই, অমনি নিজের সেই অর্দ্ধমুদ্রিত গ্রন্থ প্রচারের সমস্ত ভাগ করিলেন। সাহিত্য-সংসারে এরূপ উদারতা অতি অল্প লোকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আখ্যানমঞ্জরী, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাকরণ কোমুদীর অপরাংশ, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সটীক মেঘদূত এবং পীড়িতাবস্থার বর্ধমান অবস্থান কালে অগচ্ছিত্যাত সেক্সপিয়ার রচিত কমিডি অব্ এররস্ (Comedy of Errors) নামক গ্রন্থাবলম্বনে “ভ্রান্তি বিলাস” রচনা করেন। আমরা এই শেষোক্ত গ্রন্থ পাঠে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। ইহার উপভাস ভাগ এত অধিক হান্তবসোদ্দীপক যে, হান্ত সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া, কণকালের ক্ষুদ্র পাঠ লোক করিয়া পুস্তকহস্ত হান্তের শেষ তরঙ্গ সম্মুখগাঙ্গে বিশ্রাম লাভ করিয়া তবে পুনরায় পাঠারম্ভ করিতে হয়। অবিমিশ্র নিঃস্মরণ হান্ত সম্মুখগের উৎসবরূপ ‘ভ্রান্তি বিলাস’ বাঙ্গালী পাঠকের পরম আদরের বিনিস। ইহাতে উপভাসের নারক নায়িকা আছে, কিন্তু মলিনতা নাই, গোপাল ভাঁড়ের রহস্য আছে, কিন্তু ভাঁড়ামি নাই। এই পুস্তকে বিভাগসাগর মহাশয় তাঁহার লিপিচাক্ষুণ্যের প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার লেখনীর শুণে, তাঁহার রসিকতার পারিপাট্যে ইহা একখানি সুখপাঠ্য ও নিঃস্মরণ আনন্দদায়ক গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। উপভাস-পাঠকদিগের পক্ষে এ গ্রন্থ অতীব উপায়ের।

ইহার পর বঙ্গীর কুলকল্যাণের পরম সুন্দররূপে আর একবার জিনি

* বাঙ্গালী ভাষা ও বাঙ্গাল সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৯৮ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কুলীন কতারা যে পতি বর্তমানেও বৈধব্য-যজ্ঞণা ভোগ করিতে এবং সমাজের অন্ধতাজাত নিষ্ঠুরা-চরণের অধীন হইয়া চলিতে বাধ্য, ইহা সাময়িক লোকাচার মাত্র। শাস্ত্রের কোথাও এরূপ অসদ্ব্যুত্থানের অনুমোদন নাই। ভারতবর্ষীয় কোন শাস্ত্রকার এরূপ অকীর্তন ছই, দশ বা ততোধিক দারপরিগ্রহ-বিধির পক্ষপাতী হন নাই। ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এবং সম্ভব হইলে, রাজবিধির দ্বারা স্ত্রীজাতির প্রতি এরূপ পণ্ডবৎ নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ করিতে বহুপরিকর হইয়া উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ ও পুস্তিকা সকলের সুবিস্তৃত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এতদ্বিন্ন বিভাগিচ্ছার্থী বালকগণের শিক্ষাগোচর সুবিধার জন্য বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহাকে সর্বদাই নানা প্রকার কার্যে লিপ্ত থাকিতে হইত বলিয়া, তিনি গ্রন্থ রচনার জন্য অবসর অতি অল্পই পাইতেন।

বিভাগাগর মহাশয় সর্বসময়ে ৫২ খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ, উপক্রমণিকা ও তৎপরবর্তী ব্যাকরণগুলি তাঁহার নিজের পরিশ্রমের ফল। সংস্কৃত নানা গ্রন্থ হইতে সার সংকলন করিয়া ঝড়ুপাঠ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। যযুৎশ, কিরাতাঙ্কনীর, শিশুপাল বধ, মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন পাঠ মিলাটরা যতদূর সম্ভব মূল গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। সটীক অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রকাশের সময়ে ভারত-বর্ষের নানা দেশীয় হস্ত লিখিত গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া পরস্পর মিলাইয়া মূল পাঠ নির্ণয় পূর্বক, অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা সংস্কৃত বিভাগিগণের যে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে বিদ্যুমাত্র সন্দেহ নাই, আর সেই কল্যাণ সাধনের জন্য তাঁহাকে বহুক্ষেণ ও দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পাঁচখানি ইংরাজি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইংরাজিতে বিধবাবিবাহ তাঁহার নিজের রচনা, অপরগুলি সংগ্রহ মাত্র। অবশিষ্ট ৩০ খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ। তন্মধ্যে ১৪ খানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক। এই ১৪ খানির মধ্যে বর্ণপরিচয় প্রভৃতি কয়েকখানি তাঁহার নিজের রচনা; অবশিষ্ট সকলগুলিই হয় ইংরাজী, না হয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার দ্বারা

অনুবাদিত কিংবা ইংরাজী বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ভাবাবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১৬ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৩ খানি ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল, বিদ্যানুন্দর ও মানসিংহ। বহুপরিশ্রমে ও আকিঞ্চনে কৃকনগর রাজবাটী হইতে হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এই তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অবশিষ্ট ১৩ খানি গ্রন্থ সাধারণ পাঠ্য পুস্তক। ইহার মধ্যে শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি কয়েকখানি অল্প ভাষায় রচিত গ্রন্থের অনুবাদ, বা ভাবাবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি তাঁহার নিজের রচিত। সে সকল গ্রন্থে তাঁহার রচনার পারিপাট্য ও ভাবগাম্ভীর্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ তাঁহার মৌলিক রচনা শক্তির প্রচুর পরিচয় দিতেছে, তিনি ঐ সকল গ্রন্থ রচনা বিষয়ে কাহারও নিকট শ্রী নহেন। অনন্তবিশুদ্ধ পরোধিবন্ধ যেমন বিন্দু বিন্দু বারিপাতে উপকৃত হয় না, বিচিত্রকল্পী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেম-প্রণোদিত-হৃদয়-পরোধিও তদ্রূপ ঐ সকল গ্রন্থ রচনার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হয় নাই। সে হৃদয়ের স্নগভীর তলদেশে যে অমূল্য রত্নরাজি লুক্কায়িত ছিল, তৎসমুদায় উন্মোচন করিয়া তিনি অরচিত ঐ সকল গ্রন্থের শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঁহারি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শক্তি সামর্থ্যের প্রকৃত পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তাঁহার বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করুন। সামাজিক আয়েরগিরির সেরূপ অন্ধানিগরণ ভারতে অতি অল্পই হইয়াছে। যে গ্রন্থের প্রবল প্রভাবে অধ্যাপকমণ্ডলী পরাকৃত ও নতমস্তক, আপত্তিকারীদের জটিল প্রশ্ন মীমাंसিত ও কূটতর্ক নীরব, এবং যে গ্রন্থের কুরধারে সমাজনীতি-জ্ঞানের হৃর্দেয় আবরণ ছিন্নভিন্ন, সেই গ্রন্থেই তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক ঐতিহ্যের পরিচয়, সামাজিক অভিজ্ঞতা, ও লোকসমাজ রক্ষার সহপার বিষয়ক জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক, যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিতে চাও, তাঁহার হৃদয়ের অপরিমেয় গভীরতার যদি ভূষিতে চাও, তবে তাঁহার সেই বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ গ্রন্থ পাঠ কর।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী ধারণের পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্য, সাহিত্য নামের প্রকৃত বোধ্যতা লাভ করে নাই। আমরা কয়েকখানি পুরাতন গ্রন্থ হইতে কেন কোন হান উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছি। তাঁহার আবির্ভাবের

পূর্বে সাহিত্যের যে কি ছরবহা ছিল, এবং বেতালপঞ্চবিংশতি দ্বারা বাক্সালা সাহিত্যে যে সুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই । বেতাল সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি জ্ঞানরত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—“এক্ষণে যে সুশ্রাব্য সংস্কৃতশব্দমঞ্জিষ্ট বাক্সালা গদ্য রচনার বিস্তৃত রীতি প্রচলিত হইয়াছে, বিভাগাগরের^১ বেতালপঞ্চবিংশতিই তাহার মূল কারণ, বেতালপঞ্চবিংশতির পূর্বে ওরূপ প্রকৃতির বাক্সালা রচনা ছিল না । বিভাগাগরই উহার সৃষ্টিকর্তা ।” বিভাগাগর মহাশয়ের অমৃতবর্ষিণী লেখনীর স্মৃতি ধারাসিক্ত হইয়া সুধীরজনের বঙ্গভাষা এই বলিয়া গর্ভ করিয়াছেন :—

“কি কারণ তোষামোদ করিব সকলে ।

পিপাসা যাবেনা কভু গোপ্পদের জলে ॥

বিশেষতঃ বারি বিনে কিছু নাই ড়র ।

একাকী ঈশ্বর মম বিভাগ সাগর ॥

তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান ।

জ্বায় উঠিবে মম যশের তুফান ॥”

বাস্তবিকই সুধীরজন গ্রাণের কথা বলিয়াছেন । বর্তমান বাক্সালা ভাষা বিভাগাগর মহাশয়ের পরিচর্যাতে পরিতুষ্ট হইয়া শোভাগাবতী জননীর গৌরবশীত উক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষাসেবী বিভাগাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার ও প্রতিষ্ঠা সপ্রমাণ করিতেছে ।

ইহার পূর্বে যে বাক্সালা ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা^২ কেবল অল্পসংখ্যক বিসর্গ বজ্জিত সংস্কৃত মাত্র । তাহার প্রমাণ এষ্ট :—

“অনেক বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাক্সালা রচনা কালে কেবল অল্পসংখ্যক বিসর্গ শব্দ সংস্কৃত শব্দাবলীর বোজনা করিয়া থাকেন; তাহাদের সেই ‘উচ্ছলজীকরাত্মজনির্জরাত্তঃকণাকরবৎ’ বিভীষিকাময়ী ভাষার লংকম্প উপস্থিত হয় ।” + সত্যসত্যই যে ইহাতে কেবল লংকম্প উপস্থিত হয়, তাহা নহে,

^১ বাক্সালা ভাষা ও বাক্সালা সাহিত্যবিবরণ গ্রন্থাবলি, ১৯০ পৃষ্ঠা ।

^২ ঈশ্বর রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য “আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়”, ১৯ পৃষ্ঠা ।

এইরূপ ভরস্কর পাঠি বিলুপ্ত হইতে দূরে—সুদূরে থাকিতে পারিলেই রক্ষা, নতুবা ইহার চাপে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা। আর একটা প্রমাণ :—

“আজিও সংস্কৃত শাস্ত্রে পরম প্রবীণ মহামহোপাধ্যায় চতুর্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে একপাত বাঙ্গালা লিখিতে দিলে, তাঁহারা প্রায় ঐরূপ বাঙ্গালাই লিখিয়া বসিবে। অত্য়াপি তাঁহাদের অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, কঠিন, জটিল ও ছক্কোখা রচনাতেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়। আমাদের মনে আছে যে, এক সময় কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালার লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞাপ্রদর্শন পূর্বক কহিয়াছিলেন—

“এ কি হয়েছে! এ যে ‘বিজ্ঞানাগরী বাঙ্গালা’ হয়েছে! এ যে অনারসে বোঝা যায়!”* ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আক্ষেপ করিবারই কথা। কাব্য আচাৰ বিচাবে, শাস্ত্র ও ব্যবহারে তাঁহারা বহুকাল ধরিয়া লোকসমক্ষে ছক্কোখা হইয়া আছেন, এখন আর সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন না, সকল বিষয়ে সরল হওয়া সহসা সম্ভবপর নহে, এবং সমস্তও বোধ করেন না। বিজ্ঞানাগর মহাশয় এই শ্রেণীর লোক হইয়াও সহজ কথা কহিতে ও সরল ভাষায় লিখিতে গিয়া ‘অশ্রেণীচ্যুত’ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাস্তবিক বিজ্ঞানাগর মহাশয় বহু চিন্তা ও শ্রম স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বচনানৈপুণ্যের বিশেষত্ব এই যে, একদিকে ‘জিনি নীতার বনবাস, শকুন্তলা ও ব্রাহ্মবিলাস রচনা করিয়া ভাষার কোমলতা ও মধুরতাব সৃষ্টি করিয়াছেন; আর এক দিকে বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি শাস্ত্রসঙ্গত সমালোচনা গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়াছেন। আবার আর এক দিকে ১ম ও ২য় ভাগ বর্ণপরিচয়, কথামাল্য, প্রকৃতি রচনা করিয়া শিশুদিগের পাঠোপযোগী সরল গদ্য গ্রন্থ রচনার অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার লেখনী এক দিকে বর্ণপরিচয়ের সরলতা অর্জন করিয়াছে, অল্পদিকে বেতালের লালিত্য ও জীবনচরিতের গাভীঘোর পরিচয় দানে সফলতা লাভ করিয়াছে, শত শত সাধুবাদে সে লেখনীর প্রশংসা পরিসমাপ্ত হয় না। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার

* ইহুদ্য রাসমতি ভারতীয় প্রথম বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, ১০৮ পৃষ্ঠা।

প্রতিভার পরিচয় এই সারলা—কোমলতা—গাভীর্থ্যের বিচিত্র মিলনমধ্যে লুক্কায়িত
রহিয়াছে। এই অল্পই জ্ঞারর মহাশয় স্বনির্ভিত লেখনী উপহার দিবার
মানস করিয়াছিলেন। বর্ণপরিচয়ের রচনার আর একটু সামান্য ব্রকমের ইতিহাস
আছে। সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকার মহাশয় বিভাগাগর মহাশয়ের পরম
বন্ধু ছিলেন। বাহার অকৃত্রিম প্রীতিহুত্রে আবদ্ধ ইহা চিরদিন তাঁহার কার্য-
কলাপের সহিত অক্ষুণ্ণ যোগ রাখিয়া চলিয়াছেন, সরকার মহাশয় তাঁহাদের
মধ্যে এক জন। প্যারীবাবুর সদর বাটীর বৈঠকখানা ঘরে সর্বদাই বিভাগাগর
মহাশয় প্রকৃতির সমাগমে মজলিস্ হইত। একদিনকার ঐরূপ মজলিসে
বঙ্গদেশীয় বালক বালিকাগণের শিক্ষা লাভের সঙ্গপার সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠে।
সেদিনকার বৈঠকের কথাবার্তার স্থির হয় যে, প্যারীচরণ সরকার মহাশয়
ইংরাজী বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের প্রথম পাঠ্য কতকগুলি
ইংরাজী পুস্তক রচনা করিবেন; আর বিভাগাগর মহাশয় বাঙ্গালা বর্ণমালা
হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের উপযোগী কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা
করিবেন। এইরূপ স্থির হওয়ার পর উভয় বন্ধু ঐ উভয় ভাষায় শিশুপাঠ্য
গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বিভাগাগর মহাশয় একদিন বিভাগার
পরিদর্শনার্থে বাহির হইয়া পথে পাকিতে বসিয়া বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ
রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ রচিত হইবার বহু পূর্বে শিশুবোধ ও তৎপরে ৬মদশ
মোহন তর্কালঙ্কার রচিত শিশুশিক্ষাই একমাত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল।
এই শিশুপাঠ্য রচনাতে বর্ণযোজনা ও শব্দ নির্মাচনে তিনি যে আদর্শ প্রদর্শন
করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনার অনামধ্যাত বাক্য-সম্পাদক ও গ্রন্থাভিযুক্তপ্রণেতা
শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ভিন্ন অপর কেহই তাহার সমকক্ষতা
লাভ করিতে পারেন নাই। যদিও কয়েকখানি অতি সুন্দর ও সচিত্র
শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়া শিশুদের শিক্ষার বিবিধ সুবিধা সাধন
করিয়াছে, তথাপি বর্ণবিজ্ঞান ও শব্দসংস্থাপনে আমাদের বিবেচনার অকুপ্রাস
খিকিলে কোমলমতি বালকগণের শিক্ষার সুবিধা হয়, এবং ইহাই কতকটা
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলিয়া গৃহীত। বর্ত্তমান বর্ণমালা প্রচলিতারা বিভাগাগর
মহাশয়ের জ্ঞান সেমিকে বেশী দৃষ্টি রাখেন বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের বিবেচনার বিভাগাগর মহাশয়ের পদ্ধতির অনুকরণ করিয়া

রায় বাহাদুর মহাশয় শিশুদিগের পাঠ্য রচনার বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকার পুস্তকের ভূমিকার শেষ ভাগে লিখিয়াছেন, “পুস্তক ক্ষুদ্র কিন্তু বিষয় গুরুতর। আমি যত্ন ও পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই।” আমরা অকপটে বলিতে পারি, শিশুশিক্ষার উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি বিভাগাগর মহাশয়ের পর তিনিই প্রদর্শন কবিয়াছেন। আমরা প্রথম যখন উক্ত “বর্ণপাঠ” দেখিয়াছিলাম, আমাদের মনে শৈশবের পিতৃসহবাস, পিতার উপদেশ ও চাণক্যের শ্লোক সকলের আগন্তিক্য কণা স্রবণ হইয়াছিল। কালসহকারে তাঁহাব রচিত এই অপূর্ণ “বর্ণপাঠ” এর আদর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বালকগণের পক্ষে শিক্ষা লাভ মাহাতে সহজ ও প্রীতিকর হয়, বিভাগাগর মহাশয় তাঁহাব উপযোগিতা অর্জন করিয়া ও সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এ কাণ্ড্য হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান সুপণ্ডিত বহুদর্শী ব্যক্তিকেও কেহ কোন পরামর্শ দিল, তিনি তাঁহা সাদরে গ্রহণ করিতেন, এবং গুণানুরাগী বিভাগাগর মহাশয় তাঁহা প্রকাজ্ঞ ভাবে স্বীকার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না, বোধোদয়ের ভূমিকাই তাঁহার চিবস্ত্রী প্রমাণ।

বিভাগাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার আব এক কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহা তাঁহার পূর্বে অজ্ঞা কাঁহাবও দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। আমরা তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণের রচনা হঠাত যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎসমুদয়ে, , : । ১ বিরাম, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা চিহ্ন নাই, এ সকলের কিছুই সে কালে ব্যবহৃত হইত না। বিভাগাগর মহাশয়ই ঐ সকল চিহ্ন অপ্রণীত বেতাল-পক্ষবিংশতি ২য় ও ‘৩য়’ অঙ্কবলে ও বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয়ভাগে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ঐ সকল বিরাম চিহ্নের অভাবে পূর্বে পূর্বে রচনা পাঠ যে কত দুঃস্বপ্ন হইয়াছিল, তাঁহা পাঠ করিলেই সহজে অনুভূত হয়, এ বিষয়েও বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে উপকৃত ও কৃতী।

সাহিত্যচর্চার লোকের প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক ও লোক-শিক্ষার পথ সুগম ও সহজসাধ্য করিবার যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্রপ্রচার প্রধানতম একটা। ইহার দ্বারা অতি অল্প দিন মধ্যে এদেশে জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে সুগভীর উপস্থিত হইয়াছে। কেবল যে সাহিত্যচর্চার সহায়তা হয়, তাঁহা নহে,

সংবাদ পত্রে উপভাস, গল্প, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার লোকে সর্বদা পরবর্তী সংখ্যা দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া থাকে। যে সংবাদপত্র পাঠের জন্য, লোক যত অধিক ব্যস্ত হয়, জনসমাজের উপর সেই সংবাদপত্রের প্রভুত্বও তত অধিক। ইংলণ্ডে টাইম্‌স্, ডেলিনিউস্ প্রভৃতি সংবাদপত্রই রাজত্ব করে। রাজশক্তি-বিশিষ্ট হাউস্ অব্ কমন্সের পরেই এই সকল সংবাদ পত্রের স্থান। এ দেশেও সমাজতত্ত্ব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর সংবাদ পত্র সকল কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, পুরাতন তত্ত্ববোধিনী, প্রভাকর এবং স্বতিমাতে পরিণত বঙ্গদর্শন, তৎপরে বান্ধব বামাবোধিনী ও ভারত সংস্কারক তাহার অত্যুচ্ছল দৃষ্টান্ত স্থল। বর্তমান সময়ে যে সকল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র উপরোক্তরূপ শক্তি লাভ করিয়া বঙ্গের পরিচর্যা-ক্ষেত্রে নিযুক্ত, ত্রীরামপুরের স্থায়ী মিশনারী মাসমান প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত “সমাচার দর্পণ” তাহাদের পূর্বপুরুষ। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মাসমান সাহেব কর্তৃক ‘সমাচারদর্পণ’ প্রকাশিত হয়। সমাচারদর্পণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিল। সেকালের একখানি সংবাদপত্র ২৩ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া দেশের সেবা করিয়াছে, ইহাট সমাচার দর্পণের যথেষ্ট গৌরবের বিষয়। প্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়া গভর্ণর জেনারেল মারকুইস অব্ হেষ্টিংস ও তৎপরে লর্ড আমহার্ট’ রাজসরকার হইতে অর্থব্যয় করিয়া ইহার যথেষ্ট ত্রীভূক্তি সাধন করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহীন্দ্রা রামমোহন রায় পরিচালিত কোমুদী, তৎপরে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কোমুদীর প্রতি-দ্বন্দ্বিরূপে সতীন্দ্রসিংহের পক্ষ সমর্থনার্থ ৬ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত সমাচার চন্দ্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার পর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাস হইতে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় “সংবাদপ্রভাকর” প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। প্রভাকরের প্রত্যয় পূর্ববর্তী সংবাদ পত্রগুলি কিরূপগরিমাতে প্রস্ফাটন হইয়াছিল। চন্দ্রিকা রান ভাবে পশ্চিম গগনে চলিয়া পড়িতেছিল, তদদর্শনে কোমুদীও বিলুপ্ত। প্রভাকরই বহুকাল ধরিয়া বঙ্গ ভূমির আধার হইয়া কর বিস্তারে চারিদিক আলোকিত করিয়াছিল। কিন্তু এ সকল ত হইল, সে সময়ে গল্প রচনার বেঙ্গল হৃদয় ছিল, সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধ সকলও সেইরূপ

কদম্ব ও কণ্ঠার্থগুণ শব্দ সহযোগে রচিত হইত, সুতরাং তাহা পাঠকের পক্ষে তৃপ্তিবিধায়ক হইত না; কিন্তু পড়াংশ প্রায়ই কৃত হইত। ক্রমে অন্নানু ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বহু সংখ্যক সংবাদ-পত্র নানা প্রকার উদ্দেশ্য সাধন করিলেও, উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বজনপ্রিয় সংবাদ-পত্রও বিভাগসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। সে সংবাদ-পত্রের নাম “সৌমপ্রকাশ”। সারদাচরণ নামে সংস্কৃত কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ একটা ছাত্র বধির ছিলেন। তাঁহার রচনা-শক্তিও বিশেষ প্রশংসা ছিল। তাঁহার অল্প কোথাও কদম্বকাজের সুবিধা হইবে না বলিয়া, তাঁহাকেই সৌমপ্রকাশের সম্পাদকীয় ভার দেওয়া হইল। কিন্তু বিভাগসাগর মহাশয় নিজে ইহার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংগ্রহ, উৎসাহ ও সহায়তা লাভ করিয়া সৌমপ্রকাশ দ্বারায় শ্রীত্বকি লাভ করিল। বর্ধমান রাজবাটীতে মহাভারত অনুবাদ কার্যে সারদাচরণ নিযুক্ত হওয়ার, সৌমপ্রকাশ অল্পদিন পরেই প্রথিতনামা ৬ দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের উপযুক্তরূপ তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনে উন্নতি পথে আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু বিভাগসাগর মহাশয়ের সহানুভূতি ও উৎসাহ হইতে সৌমপ্রকাশ কখনও বঞ্চিত হয় নাই। ইহাব প্রথম শ্রী সম্পাদনে বিভাগসাগর মহাশয় লেখনী ধারণ করিয়া ইহাকে সর্বাবস্থাব্যবস্থায় কবিতা তুলিয়াছিলেন। বেতাল যেমন বর্তমান বাঙ্গালা গল্প গ্রন্থ রচনাব পথপ্রদর্শক, সৌমপ্রকাশ সেইরূপ সূর্য্যচিস্রকৃত উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত সংবাদ-পত্র প্রচারের পথপ্রদর্শক। সৌমপ্রকাশ প্রচার ও তত্ত্বাবধিনীত সহায়তা করা ভিন্ন বিভাগসাগর মহাশয় আরও কোন কোন সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে লিখিয়াছেন। তিনি যখনই যাহাতে লিখিতেন, সেই সংবাদ-পত্রই লোকের আদরের জিনিষ হইত।

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা রচনার শিক্ষানবিশী কালে, বিভাগসাগর মহাশয় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা বিশেষ ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার “বাহু বন্ধুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার” গ্রন্থের আভ্যোপাস্ত বিভাগসাগর মহাশয় দেখিয়া দিয়াছিলেন। “বিভাগসাগরের সহিত এই সংস্রবাবীন অক্ষয় বাবু আপনাকে উপরূক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।”^{*} বাঙ্গালা সাহিত্যে অক্ষয় বাবুর

* বিদ্যানিধি প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত, ৩১ পৃষ্ঠা।

হান অতি উচ্চ, তাঁহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । বিভাগাগর মহাশয়ের জ্ঞান তিনিও বাঙ্গালা ভাষার গঠন কার্যে এক জন প্রধান উদ্যোগী । দারিদ্র্য-নিপীড়িত ও রুগ্ন অক্ষয়কুমারের মাতৃভাষার পরিচর্যায় প্রীত হইয়া সুখীরজন লিখিয়াছিলেন :—

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার ।

পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয় কুমার ॥

তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায় ।

অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায় ॥

আমাদের বক্তব্য এই যে, অক্ষয় বাবু বিভাগাগর মহাশয়ের সমসাময়িক হইলেও বঙ্গসাহিত্যে তিনি বিভাগাগর মহাশয়ের কক্ষিতপরে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং সেই অগ্রসব হওয়ার পথে মহর্ষি ও বিভাগাগর মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন । অক্ষয় বাবু জীবনচরিতে লিখিত আছে :—“এস্থ সম্পাদক অক্ষয় বাবু স্বয়ং শ্রীমদ্বর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধগুলি রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বসিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন • • আনন্দ বাবুর (রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু) নিকট অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধগুলি প্রেরিত হইত, এবং বিভাগাগর মহাশয়ের (তথায়) যাত্রারাত ছিল । তিনি উঠাকে ঐ প্রবন্ধগুলি দেখিতে বলিলে, উনি উঁহার কথানুযায়ী দেখিয়া দিতেন । এই প্রকারে কিছু দিন যায়, পরে এক দিন আনন্দ বাবু পণ্ডিতবরকে বলেন, ‘অক্ষয় বাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান ।’ ইনি বলেন, ‘আচ্ছা বেশ, তাঁহাকে আসিতে বলিবেন’, তদনুযায়ী অক্ষয় বাবু উঠার পর একদিন আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, ‘মহাশয় আমার প্রবন্ধগুলি দেখিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করেন । অতঃপর করিয়া এইরূপ করিলে বড় ভাল হইবে ; চিরবাধিত ও বিশেষ উপকৃত হইব’ । বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত দত্তজার এই প্রথম আলাপ পরিচয় ।” • বিজ্ঞবর রাজনারায়ণ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্য

সমালোচন কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যে রূপ অভিজ্ঞতার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—

“এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা ভাষার জনসম্মুখ স্বরূপ বিজ্ঞানগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত জৈষরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট আগমন করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রণীত গ্রন্থ সকলের দ্বারা বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহারা লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন। অক্ষয় বাবু কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভাৱ দীপ্তি পাইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্বাবনী শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অমুবাদ মাত্র; কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবা-বিবাহ বিচার পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল রচনাশক্তি নাই, এমন কখনই বলিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ভাষার বক্তৃতা করিবার সময় ও তাহা সমাপনকালে অনেক ইংরাজীও বাংলা অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগরের রচিত বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুবরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত সীতার বনবাসে ভবভূতির উত্তর চরিত ও বাম্বীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে। উহা তাঁহার এক প্রকার স্বকপোল রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়। বিদ্যাসাগর বঙ্গ ভাষার অনেক পরিমাণে নিদ্রাণ ও পরিমার্জন কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা-বশে আবদ্ধ আছে।” *

৮প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকার রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, সি, আই, ই, মহাশয় লিখিয়াছেন :—“প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য লেখক। তাহার পর বে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটা স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষার পরিণত হইয়াছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধু জনের ব্যবহার্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষা, অর্থাৎ

* শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ২৬ পৃষ্ঠা।

সামু ভিন্ন অপর ব্যক্তিসের ব্যবহার্য ভাব। এহলে সামু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষার কথোপকথন করিতে শুনিরাছি, তাহা সংস্কৃতভাষাসারী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার কদাচ ‘খয়ের’ বলিতেন না, ‘খমির’ বলিতেন। কদাচ ‘চিনি’ বলিতেন না, ‘শর্করা’ বলিতেন। ‘বি’ বলিলে তাঁদের রসনা অশুভ্র হইত, ‘আত্মাই’ বলিতেন, কদাচিৎ দ্বুতে নামিতেন। “চুল” বলা হইবে না, “কেশ” বলিতে হইবে। “কলা” বলা হইবে না, “রস্মা” বলিতে হইবে। কলাহারে বলিয়া “দই” বলিবার সময় “দধি” বলিয়া চিৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিরাছি, এক জন অধ্যাপক একদিন “শিত্তমার” ভিন্ন “শুভক” শব্দ মুখে আনিবেন না, প্রোক্তাভ্যাসও কেহ “শিত্তমার” অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাক্যলা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এক্ষণ ভাষার কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেননা কেহই তাহা পড়িত না। কাজেই বাক্যলা সাহিত্যের কোন শ্রীক্ষি হইত না। এই সংস্কৃতভাষাগিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা জৈনচন্দ্র বিভাগসম্বন্ধ ও অক্ষরকুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদের ভাষা সংস্কৃতভাষাগিণী হইলেও তত দুর্য্যোগ নহে, বিশেষতঃ বিভাগসম্বন্ধ মহাশয়ের ভাষা অতি সুসম্পূর্ণ ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এক্ষণ সুসম্পূর্ণ বাক্যলা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।”*

প্রচ্যাপদ বন্ধন বাবু আমাদের নিকটেও ঠিক এক্ষণ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন;—“বিভাগসম্বন্ধ মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাক্যলা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপাধিকৃত সম্পত্তি লইয়া

* প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রত্যাশী, - বন্ধনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা।

নাড়া চাড়া করিতেছি ।” এ করটা কথার বিনয় এবং কৃতজ্ঞতা উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে ।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁহার রচিত ‘বঙ্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর’ স্বীকৃত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ;—“বিভাগাগর আর কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও, তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী, বিনিঃশ্রুত গ্রন্থাবলীর গুণে তিনি চিরকাল বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন । তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা না হইলেও স্নেহময়ী মাতার স্তায় উহার পুষ্টিকর্তা ও সৌন্দর্য্যবিধাতা, তাঁহার স্বল্পে গল্প সাহিত্যের উন্নতি পরিপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য সাধিত হয় । দশভুজা দুর্গার প্রতিমার খড়্গ বাণ ও দড়ির উপর সামান্য মাটির কাজ হইয়াছিল, তিনি ঐ মাটি বখান্ধানে বিস্তৃত করেন এবং সৃষ্টিকামরী সৃষ্টি নানা বর্ণে সুরঞ্জিত ও চিত্রিত বেশে সজ্জিত করিয়া দেবমণ্ডপ প্রীসম্পন্ন করিয়া তুলেন । * * * তাঁহার মহাভারত ও বেতালপঞ্চবিংশতিতে যেরূপ ওজস্বিতা ও শব্দপ্রয়োগবৈচিত্র্য দেখা যায়, তাঁহার সীতার বনবাসে ও শকুন্তলার সেইরূপ ললিত পদবিস্তারের সহিত অসামান্য মাধুর্য্যগুণের উৎকর্ষ লক্ষিত হয় । সীতার বনবাস ও শকুন্তলা গল্প রচনার তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শনস্থল ।”*

তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন বহুসংখ্যক পুস্তক রচনার সূচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবকাশের অভাবে শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই সকল অসম্পূর্ণ পুস্তকের রচনার ভার বন্ধুদিগকেও দিতেন । নীতিবোধ রচনা আরম্ভ করিয়া সমরভাষে শেষ করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবুকে বলিলেন, “তোমার ত সময় আছে, বলিয়া না থাকিয়া বই খানা লেখ না ।” বিভাগাগর মহাশয়ের আদেশ ও পরামর্শে রাজকৃষ্ণ বাবু নীতিবোধের অবশিষ্ট ভাগ রচনা করিয়া পুস্তকখানি প্রচার করেন । এইরূপে আরও কোন কোন গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিয়া নিজে শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; ঐ সকল গ্রন্থ হয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে, না হয় কোন বন্ধু তাঁহার অনুমতিক্রমে সে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন ।

বিভাগ্যগর মহাশয়ের বহু দিন হইতে ইচ্ছা ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের একখানি সর্বাঙ্গস্বত্ব ইতিহাস রচনা করেন। এই অমূল্য উপযোগী আরোজনও করিয়াছিলেন। শেষ দশার যখন নিত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন সেই সময়ে একদিন স্বকৃতনামা শ্রীবৃদ্ধ নীলাদর মুখোপাধ্যায় এম্. এ. মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পর, বিভাগ্যগর মহাশয় অতি আন্তরিকভাবে বলিয়াছিলেন, “বড় ইচ্ছা ছিল আর কিছু করিব, কিন্তু আমার শরীরের অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িয়াছে, আমার দ্বারা যে আর কিছু হইবে এমন বোধ হয় না। তুই ত কর্মকাণ্ড ছাড়িয়া দিয়া আসিলি, লেখা পড়া শিখিয়াছিস, আমি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, তুই আমার সেই কাজের ভার নে দেখি।” আমরা সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নীলাদর বাবুর প্রস্থানের পর, ভয়ে ভয়ে কথটা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। অমনি একটু হাসিয়া বলিলেন, “এক খানা বই লিখিবার সমস্ত আরোজন করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু শরীরের এমনই অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে কোন মতেই আর সে কাজে হাত দিতে পারিতেছি না।” ব্যাপারটা জানিবার জন্য কোতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল, আস্তে আস্তে বলিলাম, “আপনার কি লিখিবার সাধ এখনও মিটে নাই ? এমন কি বই লিখিবার ইচ্ছা আছে, যাহার জন্য এত পূর্ব হইতে আরোজন করিতেছেন ?” তখন আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, “ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, কেবল শরীর ভাল নয় বলিয়া আজ কাল করিয়া বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে।” প্রায় অশ্রুতিপন্ন বৃদ্ধের অসুস্থ শরীর লইয়া সমগ্র ভারতের পূর্ণাবয়বসম্পন্ন ইতিহাস লিখিবার আরোজন ও উদ্ভাস ভারতবর্ষে এক বিচিত্র ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়।

বিভাগ্যগর মহাশয় যখন নীলাদর বাবুকে উক্ত কার্যের ভারার্পণ করিবার অন্তিম প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তুই ত কর্মকাণ্ড ছাড়িয়া দিয়া আসিলি, লেখা পড়াও শিখিয়াছিস, তুই আমার সেই কাজের ভার নে দেখি।” তখন সত্য সত্যই আমাদের মনে হইয়াছিল, ঐ মহাশয় “তুই” সম্ভাষণে বিভাগ্যগর মহাশয় আমাদের একবার ডাকুন। তাঁহার সে মিষ্টময়ি দান্য অপেক্ষা মিষ্ট ছোট ছোট “তুই” “তোমার” ইত্যাদি উপহার যে পাইয়াছে, সে আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলে, বিভাগ্যগর মহাশয়ের

এতি অধিক সন্ধান দেখান, কিংবা গভীর কুতূহলতা প্রকাশ করা, হইল বলিয়া মনে করি না। ক্ষুদ্র শিশুর কণাতে প্রকাণ্ড মার্তণ্ডের পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হওয়ার ভায়, অথবা ক্ষুদ্র বালুকণাতে পৌর্ণমাসী যামিনীর দিসন্তপ্রসারিত আকাশের পরম সম্পদ পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণরূপে প্রতিকলিত হওয়ার ভায় তাঁহার সেই মধুমিষ্ট “তুই” সম্ভাবণের মধ্যে সমগ্র বিদ্যালোগর স্বদর প্রতিবিম্বিত হইত। তাঁহার সেই মমতার অনন্ত পারাবারে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ‘তুই’ ‘তোম’ জগি কোমলতার জীবন্ত বিদ্যু সদৃশ বোধ হইত। তিনি তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক স্মৃতি সম্ভাবণে নীলাশ্বর বাবুকে বখন আদর করিলেন, আমরা সেই অজ্ঞাতনামা পুরুষকে মনে মনে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলাম এবং তাঁহাকে নীলাশ্বর বাবু বলিয়াই আমাদের প্রত্যয় জগিল।

বিদ্যালোগর মহাশয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। গুণের আদর করিতে কখনও রূপগতা প্রকাশ করিতেন না। বহুকাল হইতে তিনি ৮ মন্তিলাল শীলের গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। ৮ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিবিধ গুণের উল্লেখ করিয়া কত সময়ে আমাদের নিকট তাঁহার পৌরুষ ও প্রতিষ্ঠাবিসরক আখ্যায়িকার বর্ণন করিতেন। তিনি এই তুই মহাদ্বার তুই খানি জীবনচরিত্ত শিখিবার মানল করিয়াছিলেন, কিন্তু আক্ষেপের বিবর যে, তাঁহার সে ইচ্ছাও পূর্ণ হয় নাই। তিনি যাহা করিতে পারেন নাই, সে জন্য আমরা যতই দুঃখ করি না কেন, তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই স্বয়ং কীর্তীরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার জ্ঞানের বিন্দুতি ও গুণের গভীরতার পরিচয় দিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি সহকারে নূতনতর স্তরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালোগর মহাশয়ের সাহিত্যবিষয়ক মহীরদী কীর্তি আরও উজ্জল আকার ধারণ করিবে।

বিদ্যালোগর মহাশয় বিদ্যালয়ে ‘বিদ্যালোগর’ উপাধি পাইয়া বিদ্যার পরিসমাপ্তি করেন নাই। তাঁহার বিদ্যালোভাষ্যক জীবনব্যাপী ব্যাপার ছিল। শেষ দশায় নিত্যন্ত অল্পই শরীরেও সর্বদা বিদ্যাচর্চার নিমুক্ত থাকিতেন। হাত পা শুটাইয়া বসিয়া থাকা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। কিছু না কিছু সর্বদাই করিতেন, আর সর্বদাই কিছু করিবার সুবিধাও তাঁহার ছিল। তিনি- নিজেই বাবুদারের জন্য একটি পুস্তকালয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন,

সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং হিন্দী পুস্তকে সে পুস্তকাসার পরিপূর্ণ, তাঁহার নিজের চেষ্টার বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, সে সকল পুস্তক ভিন্ন অসংখ্য সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ তাঁহার পুস্তকালয়ে বেঙ্গল সংগৃহীত ও বন্ধে রক্ষিত হইয়াছে, সেঙ্গল আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ইংরাজী গ্রন্থ সকলের সমাদরও বর্ধিত করিতেন। সুপরিচিত ও গণনীয় ইংরাজ গ্রন্থকারগণের রচিত সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পুস্তকাগারে পাওয়া যায়। কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী, কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাৎক্ষণ্যে তাহা আনাইতেন। কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকে যে তাঁহার সংগ্রহ বেঙ্গল ছিল, তিনি সেঙ্গল বিধান ছিলেন না। তাহা যদি হয়, তবে কোন গ্রন্থে কিরূপ বিষয়ের আলোচনা আছে এবং তাহার ভাষা কেমন ও কি কি তত্ত্ব তাহা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, তিনি প্রয়োজনমত কিরূপে বলিতে পারিতেন? যে কোন বিষয়ে যখনই কেহ কোন কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে তাৎক্ষণ্যে কোন সুগ্রন্থ লেখকের অভিমত উল্লেখ করিয়া তদীয় গ্রন্থ হইতে তাহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে দেখিয়াছি—কট্, সেক্সপিয়ার, মিল্টন, হক্‌সলি, টিগোল, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরাজ কবি, উপন্যাসকার, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থগত বিষয়ের উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি। কথা এই যে, সময়ের তিনি বেঙ্গল সম্বাবহার করিয়াছেন, আধুনিক কালে তাঁহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তিনি পুস্তকাগারের শোভাবর্দ্ধনার্থ কোন পুস্তক ক্রয় করেন নাই, বাহা ক্রয় করিয়াছেন, তাহার অবিকাশ পাঠ করিয়াছেন, পরে সে পুস্তক নিজের পছন্দমত বাধাইয়া তবে তুলিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পুস্তক সকল বহুবারে সমুদ্রল স্মরণকরে স্মরণরূপে বাধাইতেন।

একবার কোন একজন সন্ন্যাসলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহার পুস্তকাগার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকগুলি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “এরূপ বহুবারে এই পুস্তকগুলি বাধান কি ভাল?” তৎক্ষণে বিদ্যালয়সর মহাশয় বলিয়াছেন “কেন, দোষ কি?” প্রত্যুত্তরে বাবু বলিয়াছিলেন, “ঐ চাকার অনেকের উপকার হইতে পারিত।” বিদ্যালয়সর মহাশয় তখন আর কিছু না বলিয়া অল্প কথা পাড়িলেন, শেষে বলিয়া ভাষাচ্য বাধিতে

খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার এ জোড়াটা কোথায় কত টাকার খরচ করিয়াছেন? ভিনিষটা ত বেশ হইয়াছে!” বাবু একটু অসাবধান হইয়া শালের নানাবিধ গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন “এ জোড়াটা পাঁচশত টাকার খরচ ছিল।” বিদ্যাসাগর মহাশয় অমনি বলিলেন, “পাঁচ সিকার কবলেও ত শীত ভাঙ্গে, তবে এর টাকার শালজোড়াটা গারে দিবার প্রয়োজন কি? এ টাকারও ত অনেকের উপকার হইতে পারিত; আমি ত মোটা চাদর গারে দিয়া থাকি।” বাবুর সুবর্ণ মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল, ক্ষণকাল লজ্জার মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, “আমি বড় অজ্ঞান করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন।” রহস্যপ্রিয় বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিলেন, তাঁহার যেন কিছুই হয় নাই, কিন্তু বাবুটা যতক্ষণ রহিলেন, তাঁহার চিন্তের প্রসন্নতা আর ফিরিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সরল সহজ উক্তি তাঁহার মর্শ্বস্পর্শী হইয়াছিল।

পূর্বে তাঁহার লাইব্রেরী হইতে প্রয়োজনমত বহুবান্ধবদিগকে পুস্তক লইতে দিতেন। কোন এক বন্ধু আবশ্যক মত একখানি বহুমূল্য পুস্তক লইয়া যান। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পুস্তক খানি চাহিয়া পাঠাইলে, উক্ত বাবু বলিয়াছিলেন, “সে বই আমি ফেরত দিয়া আসিয়াছি।” তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরক্ত ও মর্শ্বাহত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কাহাকেও কখন বই লইয়া যাইতে দিবেন না। যে বই একপে হারাইল, সেখানি ঐক খানি হুতাপ্য সংকৃত গ্রন্থ, জ্ঞানানি ভিন্ন অল্প কোথাও পাওয়া যায় না। আবার তাহাও পুনর্মুদ্রিত না হইলে, আবার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সকলে গুনিয়া অবাক হইবেন যে, ঐ বহুমূল্য গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন পরিচিত পুস্তকবিক্রেতা (Hawker) তাঁহার নিকট বিক্রয় করিতে আনি। তিনি সেই বইখানি দেখিয়া অবাক হইয়া পেলেন। ক্ষণকাল বিস্ময়বিজড়িত নীরবভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরক্ষণে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এ বই কোথায় পেলে?” সে বলিল, “—বাবুর বাড়ী হইতে কিনিয়া আনিয়াছি।” নাম গুনিবার ক্রোধে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বলা বাহুল্য বিক্রেতা বাঁহার নাম করিল, তিনিই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “সে বই আমি ফেরত দিয়া আসিয়াছি।” বিদ্যাসাগর

মহাশয় আর বিক্রি না করিয়া, পুস্তকবিক্রেতা যে মূল্য চাহিল, তাহাকে তাহাই দিয়া পুস্তক খানি ক্রয় করিলেন । যিনি নিজের পুস্তক অন্ত্রকে পড়িতে দিয়া, পুনরায় সেই পুস্তকখানিই নিজে ক্রয় করিতে বাধ্য হন, মানুষের আচরণে স্কন্ধ হইবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে । এই ঘটনার পর আর কখনও কাহাকেও ঐক টুকরা কাগজও পুস্তকালয় হইতে লইয়া বাইতে দিভেন না ।

সাহিত্যবিষয়ক আরও দুই এক কথা অল্প বিষয় উপলক্ষে বলিবার প্রয়োজন হইবে ।

— — —

সপ্তম অধ্যায় ।

স্ত্রীশিক্ষায় বিদ্যাসাগর ।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন দেশীয় সম্রাট মহোদয়ের সাহায্যে ও ভারতবর্ষ প্রান্তঃসরগীর জে, ঐ, ডি, বেথুন মহোদয়ের উদ্যোগে, কলিকাতা মহানগরীতে বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হইলেও, ইহার অনেক পূর্বে কলিকাতার নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত ও বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিবরণ রিপোর্টে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরের পাঠশালার পরীক্ষা গ্রহণ কালে দরিদ্র পরিবারের প্রায় ৪০টা বালিকা পরীক্ষা দিয়া নানাবিধ পারিতোষিক পাঠিয়াছিল। বালিকাগণের পরীক্ষা গ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া হিন্দুপ্রধান রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর লিখিয়াছিলেন,—“মহিলা শিক্ষাসমিতি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাদিগকেও পরীক্ষা করা গেল, তাহাদের পড়া ও বানান অতিশয় সন্তোষজনক।” * ইহা হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে ঐ বৎসরের পূর্বে হইতে কলিকাতার বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। উক্ত বৎসরের সন্তোষজনক ফল দর্শনে উৎসাহিত হইয়া উক্ত সমিতির কর্তৃপক্ষ সভাবাজার, শ্রামবাজার, জানবাজার ও ইটলিতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর উক্ত সমিতির হস্তে বরচিত “স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক” প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা ও আবশ্যিকতা বুঝাইবার জন্য এবং উহা যে উচ্চশ্রেণীর উন্নতমানের রীতিনীতির সম্পূর্ণ অনুরোধিত ইহা সপ্রমাণ

* Raja Radhacaunt in his Report says, “Several native girls educated by the Female Society were also examined whose proficiency in reading and spelling gave great pleasure.” Biography of David Hare by Pyary Chand Mittra. Page 53.

করিবার ক্ষমতা তিনি উক্ত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। প্রান্তঃস্বরূপীরা স্ত্রীশিক্ষিতা আর্থ মহিলাগণের নামোন্মেষ দ্বারা তিনি স্ত্রীশিক্ষার গৌরব বর্দ্ধন করিয়া উক্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, এবং আর বলিয়াছিলেন যে “যদি এই স্ত্রীশিক্ষাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়, তবে ইহার দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।” * আমরা এই ‘স্ট্রীশিক্ষাবিধায়ক’ এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহা হইতে দুই একটা আধুনিক অত্যন্তব্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না :—“আর এটকণকার স্ট্রীমিগের মধ্যেও দেখ। ব্রহ্মসিদ্ধাবাসে বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণী রাণী ভবানী ছিলেন, তিনি বালক-কালে বিভাগিনী করিয়া আপন রাজ্যের তাবৎ বিষয় কর্মের হিসাব আপনি দেখিয়া স্তম্ভাভিত্ত বিবেচনা করিতেন। * * আর রাঢ়ীর শ্রেণী ব্রাহ্মণ-কন্তা হটী বিভাগিনীর নামে এক জন ছিলেন, তিনি বাল্যকালে স্ব ২ গৃহ-কার্যের অবকাশে অখ্যানাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন পণ্ডিত হইলেন যে, সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন, পরে তিনি কাশীতে বাস করিয়া সৌভদেবীর ও তদেবীর অনেক লোককে পড়াইতে ২ তাঁহার সুখ্যাতি দেবীপামান্য হইয়া সেখানকার সকলে তাঁহাকে অধ্যাপকের দ্বার নিমন্ত্রণাদি করিতেন এবং তিনিও সভার আসিয়া সকল পণ্ডিত লোকের সহিত বিচার করিতেন। এবং জেলা করিমপুরের কোটালীপাড়া গ্রামে শ্রামাসুন্দরী নাম এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া দ্বার দর্শনের শেষ পরীক্ষা পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার স্বামীও মহামহোপাধ্যায়। ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন এবং কলিকাতার রাজবাটীর + সকলেই প্রায় লেখা পড়া জানেন।” † এটকণ উৎসাহ পাইয়া তিনি চারি বৎসর এই মহিলা শিক্ষাসমিতির-কাৰ্য্য বেশ চলিয়াছিল।

* Raja Radhacant offered the Society the manuscript of a pamphlet in Bengali the “*Stri Siksha Vidhayaka*” on the subject of female education the object of which was to show that female education was customary among the higher classes of Hindus, that the names of many Hindu females celebrated for their attainments were known, and that female education “if encouraged will be productive of most beneficial effects.” Page 55, Biography of David Hare.

অনেকগুলি রালিকা বাৎসরিক, ষাণ্মাসিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষার রাজ্যে রাখাকান্ত দেবের বাটীতে উপস্থিত হইত। কিন্তু পরিশেষে এই শুভানুষ্ঠানের প্রথম অঙ্কুর অর্থাভাবের উত্তপ্তক্ষেত্রে পড়িয়া শুক হইয়া যায়। সকলের সমান আগ্রহ না থাকায় এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে না পারায়, ইহা স্থচনাতেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহার আয়োজিক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে, পরবর্তী ২৫ বৎসর কাল ইহা আশানতস্করণে জনসাধারণে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল। শাপগ্রস্তা অহল্যা যেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া পাষণ কলেবরে কালান্তিপাত করিতে করিতে সহসা শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে স্বমুক্তি পরিগ্রহ করিল ও নিজ কর্তব্য সাধন মানসে আপনার পথে চলিয়া গেল, তেমনি মানব-কুলের মুকুটরূপ দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন বেথুন-সমাগমে আশানতস্করণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। নূতন উৎসাহে নূতন করিয়া জীবিকা হইল। বেথুনের আগ্রহ ও আত্মজ্ঞান সীমা ছিল না, তিনি কার্যমনোবাক্যে বঙ্গীর অবলাকুলের কল্যাণ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে কাজে যেমন গুরু, সেকাজে তেমনি শিষ্যও কৃতিত্ব থাকে। বেথুন বড় দয়বায়ের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। বেতন পাইতেন অনেক টাকা। মান সম্মানে বড়লাটের প্রায় তুল্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ব্যবহারে সবল অমায়িক লোক—বাগবদন ছিলেন। তাঁহার নিকট হইলে, তাঁহার সহিত কথা কহিলে বোধ হইত না যে, বড়লাটের বড় দয়বায়ের ব্যবস্থা সচিবের নিকটে পাড়াইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছি, বোধ হইত যেন আপনাদের কোন প্রবীণ আত্মীয় কিংবা গুরুজনের সহিত আলাপ করিতেছি। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন মহাত্মা না হইলে কি এই নিগ্রহগ্রস্ত কৃককার জাতির প্রতি তাঁহার এমন গভীর প্রেমের সঞ্চার হইত? পরোপকারপরায়ণ বেথুন বঙ্গীর ললনাগণের সুশিক্ষা সাধনে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু আর এক জন কৃককার মহাপুরুষ পশ্চাৎ হইতে বেথুন-দ্বয়কে বঙ্গীর কুলকন্তাদের কল্যাণ সাধনে আকৃষ্ট করিয়া-ছিলেন; ইনিই অমরকোণ্ডিসম্পন্ন বিজ্ঞানাগর মহাশয়। এই সময়ে একবার হুগলী, ঢাকা, ককনগর ও হিন্দু কালোজের সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণের পরীক্ষার বিজ্ঞানাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হন, তিনি ‘জীব-শিক্ষার আবশ্যকতা’ রচনার বিষয় নির্দ্ধারিত করেন। পরীক্ষার ককনগর কালোজের নীলকমল ভাট্টা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া এক স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হন।



J. W. Betts

উক্ত প্রবন্ধ সে সময়ের সংবাদপত্রে ও শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছিল । পারিতোষিক বিতরণ সভার জীশিকার পরম বহু বেথুন উপস্থিত ছিলেন, এবং উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সভার সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । শিক্ষা বিভাগের সহপায় অবলম্বনের অল্প এবং বঙ্গদেশের নানা স্থানে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিভাগীয় স্থাপনের অল্প বিভাগাগর মহাশয় সর্বদাই বেথুন-ভবনে গমন করিতেন । এই ঘটনাস্থলে পরস্পরের মধ্যে গভীর আদরীয়তা অন্বিয়াছিল ।

বেথুন সে সময়কার শিক্ষা সমিতির সর্বাধ্যক্ষ বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন । বিভাগাগর মহাশয় তৎপূর্বে বিভাগালের পাঠ সমাপনপূর্বক বিষয় কর্ত্তে প্রস্তুত হইয়াছিলেন । বিভাগাগর মহাশয় মার্শেল, মেরেট প্রভৃতি শিক্ষাবিভাগীয় সম্ভ্রান্ত কর্মচারিগণের এতই ভ্রাতা ও সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন যে, শিক্ষা বিভাগের কোন কর্মই প্রায় তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হইত না । অতি অল্প দিনের মধ্যে বেথুন ও বিভাগাগরে সহোদবাবিক ভ্রাতৃত্বের পুত্রপাত হইবার ইহাও একটা কারণ । ক্ষুদ্রকার্য্য ভটিনী যেমন পরিতদেহ অতিক্রম করিয়া নিম্ন ভূমির দিকে অবতরণ করিতে করিতে বৃহদায়তনা হইয়া প্রবল আবেগে পাগরাভিমুখে ধাবমানা হয়, বেথুন-বিভাগাগর সৌহার্দ্যও সেইরূপ অরিতগতিসম্পন্ন প্রোতস্বিনীর জায় প্রবলতর ও গভীরতর আকার ধারণ করিল, সে কালে বেথুন ও বিভাগাগরের সখাই বঙ্গমহিলাগণের সোভাগ্য-কাশে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জায় প্রতীতমান হইয়াছিল, সেই বহুতার ফলস্বরূপ জীশিকার সুপ্রচার সংসাধিত হইয়াছে । এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা এই, যেন সেই মণিকাঞ্চন-যোগ প্রস্তুত অমৃতধারা চির-প্রবাহিত থাকিয়া বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে থাকে । বিভাগাগর মহাশয় যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার সিদ্ধিকামনার তিনি নিজের শরীর, মন, ধন, মান, সুখ ও সম্পদ সকলই উৎসর্গ করিতে সর্বদা মুক্ত হস্তে অপেক্ষা করিতেন । তাঁহার বহু বান্ধবেরা তাঁহার এতাদৃশ গুণাবলীর চিরগন্ধপাতী ছিলেন । গুণময় বিভাগাগর-বহুদুগুণী শত শত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের ঐশ্বর্য্য সাধনে অগ্রসর হইলেন । এই কার্য্যে সহায়তা করিতে গিয়া, সে সময় বাহারী সমাজকর্ত্তক নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন, ৮ মদনমোহন ভট্টাচার্য্য, ৮ শঙ্কুনাথ-পণ্ডিত, ৮ রামগোপাল

যেব প্রভৃতি বহুসম্মানস্পদ মহোদয়গণের নামাকলী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা একরূপ ভাবে এই কার্যে সফলতা করিয়াছিলেন যে, ইহাদের প্রত্যেককেই বেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কতাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া যে সংসাহনের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি সে সময়ে ইহাদিগকে নানা প্রকারে লালিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সে উপদ্রবকে উপদ্রব বলিয়া মনে করেন নাই। দৌরাত্ম্যের ভাগটা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপরেই কিছু অধিক হইয়াছিল। কারণ সকলের মধ্যে তিনিই আবার তাঁহার ভুবনমালা ও কুন্দমালা নামী কতাবকে সর্বপ্রায়ে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এজন্য লোকের বিষেষের পরিমাণটা তাঁহাকেই মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। এ কার্যের জন্য উপরোক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককেই নানা প্রকারে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল; এমন কি সে সময়ের সংবাদ পত্র সকলও ইহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে প্রবৃত্ত করেন নাই।

বেথুন, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যালয়গর মহাশয়কে তাহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে অহুরোধ করেন। তদনুসারে বিদ্যালয়গর মহাশয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও উন্নতি সাধন কল্পে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন।^{*} বেথুন, বিদ্যালয়গর সমভিষাহারে সর্বদাই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিতেন। ডেভিড্ হেরারের ন্যায় বেথুনও আসিবার সময়ে বালিকাদিগের জন্য নানা প্রকার খেলিবার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিতেন। বিদ্যালয়ের আসিয়া বালিকাদিগকে ঐ সকল খেলনা দিতেন এবং বালক সাজিয়া তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতেন। প্রমাণ :— “তিনি প্রায়ই স্বত্বর্ন গমনকালে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উভয় কক্ষে ধারণ করিয়া বীরাবাসে লইয়া যাইতেন। তাহাদের বালিকানুগত জুড়লিত অভ্যাচার সকল তিনি আত্মদর্শক সহ করিলেন। ভুবনমালা ও কুন্দমালা বেথুনের একদূর মেহতাজন হওয়াতে লেডী ড্যান্‌ফোর্ডসি প্রভৃতিও তাহাদিগকে বঞ্চিত ভালবাসিতেন।”^{১০} এই ভাবে বিদ্যালয়ের কার্য বেশ সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। বেথুনের পৃষ্ঠপোষকতার ও বিদ্যালয়গর মহাশয়ের বয়ে অল্প দিন মধ্যে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল। এক দিন বিদ্যালয়ের পৃথক

* বিদ্যালয়গর প্রণীত ৩য় সংস্করণে তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত, ২৩ পৃষ্ঠা।

আলয় ছিল না। বিভাগরের প্রধান উদ্যোগী দক্ষিণারজন মুখোপাধ্যায়ের বাগীতে বিভাগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হানাতাব নিবন্ধন কিছুদিন পরে, সেখান হইতে গোলদীঘির দক্ষিণপূর্ব কোণের বাগীতে হানাতারিত হইরাছিল। বেখুন বালিকা বিভাগরের বাগী নির্রাণের জন্ত প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। বালিকাদিগকে বিনা বেতনে ও তৎপরে অল্প বেতনে পড়ান হইত। শিক্ষকগণের বেতনের জন্ত অনেক অর্থ ব্যয় হইত, তাহাও অধিকাংশ বেখুন আহলাদ সহকারে নিজ হইতে ব্যয় করিতেন। বালিকাদিগকে বাড়ী হইতে গাড়ী করিয়া আনিতে হইত, সেজন্তও মাসে মাসে অনেক অর্থ ব্যয় হইত। সমগ্র ব্যয়ের অধিকাংশই বেখুন সাহেব নিজে গ্রহণ করিয়া এই বালিকা বিদ্যালয়ের হারিত পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে বেথুন গঙ্গার পরপারে প্রায় ৪১৬ জেশন দূরবর্তী জনাই গ্রামের বহুসংখ্যক সন্ন্যাস্ত লোকের অনুরোধে সেখানকার বিদ্যালয় পরিদর্শন মানসে গমন করিয়াছিলেন। পথে বহুক্ষণ ব্যস্তিতে ভিজিয়া ও বহুদূরব্যাপী কক্ষময় পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তিনি জনাই গ্রামে উপস্থিত হন। সন্ধ্যায় বেথুন উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই তাঁহার শেষ কার্য্য হইল। সহসা তাঁহার হারারোগ্য অবের সূচনা হইল, এবং তিনি সেই পীড়ায় লোকলীলা সংবরণ করিলেন। বেথুন-বিরাগে বিদ্যালয়ের বালকের দ্বারা সন্মান করিয়াছিলেন। ভারতের পরম বহু বঙ্গমহিলাগণের চিরস্মৃদ্ধি বেথুনের লোকান্তর গমনে বিদ্যালয়ের মহাশয় বহুকাল ধরিয়া অতি বিষন্নভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং তৎপরে বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অনেক চিন্তা ও অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শেষে মাত্র প্রকার মতশৈথন্যবদ্ধন তিনি বেথুন বিদ্যালয়ের পরিচালনাকার পরিত্যাগ করেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে বিদ্যালয়ের নাম ছিল হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়। বেথুন মিষের উইলের দ্বারা এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক টাকা সাহায্য গিয়াছিলেন। সেই অর্থে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ হয় এবং তাঁহার প্রতি সন্মান প্রদর্শনার্থে তাঁহারই নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে।

বেধুনের লোকান্তর গমনে বিদ্যালয় জইয়া বিদ্যালয়গর মহাশয় বখন বিপন্ন
হন, তখন প্রোক্তঃসকলীর গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংএর পরী সদাশরাস্ত্র লোকী

ক্যানিং বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে অগ্রসর হন, এবং ইহার স্থায়ী বিষয়ে অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। লেডী ক্যানিংএর চেষ্টায় রাজসরকার হইতে বিদ্যালয় রক্ষার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টা হইয়াছিল। সেই জন্য পরবর্তী অনেক ঘটনানুসারে উক্ত বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার চেষ্টা ফলবর্তী হয় নাই। বিদ্যাাগর মহাশয় অনেক সময়ে বেথুনের নামের দোহাই দিয়া এবং লেডী ক্যানিংএর সহকারিতার উল্লেখ করিয়া বিদ্যালয়ের জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সেকালে বেথুন-বিদ্যালয়ের যে গাড়ীতে বালিকারা পড়িতে আসিত, তাহার গায়ে “কল্যাণোৎপন্ন পালনীয় শিক্ষণীয়ভিত্তকঃ” এই শাস্ত্রবচন লিখিত থাকিত। এরূপ গিথিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই যে, লোকে বুঝিবে যে জ্ঞান শিক্ষা শাস্ত্রসম্মত ও সদাচারানুগত। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের লোক সহজে কিছু বুঝিতে চায় না, অনেক স্থলে বুঝিয়াও বুঝে না, ষোল আনা বুঝিলেও তবনুসারে কাজ করিতে পারে না। এই জ্ঞানিকার স্রোত এত মুহূর্ত্তক গতিতে প্রবাহিত হইয়া আমাদের কথার যথার্থ্য সন্ধান করিতেছে। সে কালের জ্ঞান শিক্ষা প্রচার তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাাগর মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাদের সহায়তার বৈরাগ্য সন্ধান লাভ করিয়াছিল, বর্তমান কালেও মাননীয় জ্ঞান শ্রীমুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানরত্ন মহাশয়, রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণের সহায়তা ও সংশ্রবে যে যথাবিধি পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এক শ্রেণীর লোক চিরদিনই সকল প্রকার সদনুষ্ঠানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ও তাহার দোষ প্রচার করিতে নিত্য ব্যস্ত। অস্ত্রে ভাল খাইলে, ভাল পরিলে, অন্তকে সুখে সজ্জলে থাকিতে দেখিলে, যাহাদের চক্ষু টাটার, সেরূপ উন্নতিকাতর লোকমণ্ডলী চিরদিনই কোন প্রকার সদনুষ্ঠানের সূচনা হইতে না হইতেই, তাহার সর্বনাশসাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে। ছাত্র যেমন মনুষ্যের চিরসঙ্গী হইয়া সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করে, কোন প্রকার শুভানুষ্ঠানের সূচনাতে বিরোধী দলের অনুদয়ও চিরসহচররূপে বিরাজিত থাকা তদনুরূপ অপরিহার্য্য। জ্ঞান শিক্ষা প্রচার ত একটা অতি কুহায়াপার, গোল আলু প্রচলন সময়ে গুলতাই ইলঙ ও আয়ারলঙে একটা ছোট খাট বৃক্ষ

হইরাছিল। কয়েকটা লোক সে বিরাট ব্যাপারে প্রাণ হারাইয়াছিল, অনেকে জখমও হইয়াছিল। যে গোল আলু ভারতে নির্ঝিন্দে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই প্রথম প্রচলনে যখন সুসভা ইংরাজমণ্ডলীর মধ্যে একটা বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, তখন আর ত্রীশিকার প্রচাৰ ও প্রচলনে কেন যে ভারতে কুরুক্ষেত্রের স্মরণ-প্রাঙ্গণ প্রকটিত হইবে না, ইহা আমাদের বোধাতীত। তবে একটা কথা এই যে, তাঁহারা গোল করেন তাঁহারাই আপনাদিগকে পৃথিবীর সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মনে কবেন তাঁহারাই যেন ভারতের সুপবিত্র নামের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছেন। এতাদৃশ সুসন্তানগণ যদি ত্রীশিকাব প্রচারে খজাহস্ত হন, তবে তাঁহারা তদ্বারা আপনাদেবই অপদার্থতার পরিচয় দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খনা ও লীলাবতীর নামে, সীতা ও সাবিত্রীর নামে, পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর নামে গৌরবান্বিত বক্ষে ও উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রশংসা করিয়া তাহাতে হাবুডুবু খাওয়া তাঁহাদের ভাল দেখায় না। যে দেশ গার্গী ও আত্রেয়ীর নামে গৌরবান্বিত, যে দেশের শাস্ত্রবিশেষের গঠন কাৰ্য্য রমণীর মুখনিঃসৃত পবিত্র উক্তি সকলের দ্বারা পরিপূষ্টি লাভ করিয়াছে, যে দেশে আধুনিক কালেও ত্রীলোক বিদ্যালঙ্কার উপাধি পাইয়া অধ্যাপক-মণ্ডলীর সত্য সমাদৃত, সে দেশে ত্রীশিকার বিরুদ্ধাচরণ দেশের অধঃপতনের পরিচয়স্থল।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে ত্রীশিকা শু এক প্রকার প্রচলিত হইয়াছে, তবে আর এ সকল কথার অবতারণা কেন? অবতারণার কারণ এই যে ত্রীশিকা বিস্তারের পরমবন্ধু বিদ্যালাগর মহাশয়ের স্মরণ ও প্রতিষ্ঠার প্রতি দেশের লোকের অবজ্ঞা জন্মাইবার জন্য ত্রীশিকার সংগ্রহে এখনও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিদ্যালাগর মহাশয়ের হিন্দুবুদ্ধির বিপর্যায় ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি ত্রীশিকার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, সত্য সত্যই কি ত্রীশিকা ধর্মবিরুদ্ধ সংস্কার, না সাময়িক দেশাচারবিরুদ্ধ সংস্কার? হিন্দু সমাজের অতিভাবক স্থানীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর “ত্রীশিকাবিধায়ক” রচনা করিয়া তাহাতে বলিয়াছেন :—

“অন্তএব তাহাদিগকে যেমন গৃহ কার্যাদি শিক্ষা করান তেমন বাণককালে যাবৎ বয়ঃস্থ না হয় তাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত হয়। • • আর

দ্বিতীয়তঃ কোন প্রতি ও প্রতিতে জীলোককে বিদ্যাভ্যাস করিতে নিষেধ বচন
 লিখেন নাই। * * নীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে জীলোককে পুত্রের জ্ঞান
 পালন ও শিক্ষা করাইবেক, ইহাতে জীলোককে পাঠ করান অবশ্য কর্তব্য
 হয়। * * * এখন সকলের উচিত হয় যে আপন আপন পরিজনদের
 প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী জীকে আনাইয়া বসিতে রাখিয়া
 তাঁহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান এবং তাঁহারা নিধন তাঁহাদিগকে অমুভবিতা দিয়া
 যাবৎ বয়ঃস্ফূর্ত না হয় তাবৎকাল পাঠশালার পাঠান।” * তাঁহার বেলার
 ‘সাত খুন মাপ’ ! যখন রাজা স্তর রাখাকান্ত দেব এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া
 শ্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, নিজে বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া
 সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন দোষ হয় নাই ; দোষ হইল, যখন শাস্ত্রের
 প্রকৃত মর্মজ্ঞ, পাণ্ডিত্যগ্রগণ্য বিদ্যাভ্যাস মহাশয় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য অমুভব
 করিয়া এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ! এখন সেই চিরনীরব ও পরলোকগত
 বিদ্যাভ্যাস মহাশয়ের পবিত্র নামে নিকার দাগ পাড়িতে অগ্রসর হওয়া কি ভাল
 দেখায় ? আমরা বুঝিতে পারি না ছরদুই কোনটী ? আমাদের জ্ঞান ক্ষুদ্র
 ব্যক্তিদের ঐরূপ অসঙ্গত সমালোচনা, না বিদ্যাভ্যাস মহাশয়ের জ্ঞান শাস্ত্রজ
 পণ্ডিতের শ্রীশিক্ষাপ্রচারে সহকারিতা ? অনেক বিদ্বান বঙ্গমহিলার কাব্য-কানন
 পরিভ্রমণ উপলক্ষে হিন্দুপ্রধান মাননীয় অজ্ঞ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
 মহাশয় বলিয়াছেন :—“এই রচনাগুলি দেখিয়া শ্রীশিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে,
 ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।” আর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু
 মহাশয় বলিয়াছেন :—“একটি খাটি মন, একটি গুরু স্বয়ং, একটি সন্তোষের
 মূর্তি দেখিলাম। * * * মনে হইয়াছে আমাদের মত ছল প্রান্তিকে নিকাম
 বিশ্বজনীন ধর্ম অমুপ্রাণিত করিতে পারে, এমন প্রান্তিক দেশে এখনও
 আছে।” † বর্তমান সময়ে শ্রীশিক্ষাবিরোধিদের অসার ও ভ্রান্ত মতের এতদপেক্ষা
 উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত প্রতিবাদ আর কি হইতে পারে ?

নারিকেলের অণু উত্তম বস্তু, কিন্তু কাংস্ত পাত্র হইলে তাহার উৎকৃষ্টতা

* রাজা রাখাকান্ত দেব প্রণীত শ্রীশিক্ষাবিধায়ক, ১৮৭২-৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা ৮।

† শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রণীত কাব্যমুদ্রামালার সমালোচন পুস্তিকা।

লোপ পায়—তাই বলিয়া কি ডাবের জল চিরনিষিদ্ধ, কেহ আর ডাবের জল পান করিবে না ? পাত্রদোষে ত্রীশিকার ফল মন্দ হইতে পারে, তাই বলিয়া জনসমাজের অর্ধাধিক লোককে নিরঙ্কর করিয়া রাখাই কি বুদ্ধিমানের কাজ ? সে হিসাবে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও বিভাগাগর মহাশয় নির্দোষ লোক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বিবেচনার তাহাবাই মনুষ্যোচিত কার্য করিয়া জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

বিভাগাগর মহাশয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ত্রীশিকার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। ত্রীশিকার উন্নতিকল্পে যাঁহারা বেথুন-বিভাগলয়েব সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহঁদের কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বেথুন কুলের সংবাদ পাইতেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিবৎসরাধিককাল পূর্বে, একদিন, তাঁহার প্রাচীন বন্ধু বোলপুর নিবাসী ৬প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় তদীয় পুত্র ত্রীশুক ৫২২স্বনাথ সিংহের বিলাত যাওয়ার সজ্জাবনা নিবন্ধন পুত্রবধূ শ্রীমতী সুনীলাবালা সিংহকে বেথুন কালেজে স্থায়ী ভাবে ভর্তি করিয়া দিবাবজ্ঞ তাঁহাকে পত্র লেখেন, তদনুসারে বিভাগাগর মহাশয় হেমেন্দ্র বাবুর পত্নী সুনীলাবালাকে উক্ত বিভাগলয়ে প্রেরিত করিয়া দিতে গিয়া, বালিকা ও শিক্ষয়িত্রীগণকে দেখিয়া আনন্দে অশ্রুমাচন করিয়াছিলেন। আসিবাব সময়ে সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। সত্যযুগের একটা স্মৃতি তখনও জীবিত থাকিয়া পুরাতন কীর্তি কীর্তিনীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছিল, সে সম্মুখে আসিয়া গলগরীরূপবাসে যখন প্রশংসা করিয়া দাঁড়াইল এবং সেই পুরাতন কথা সকল শ্রবণ করাইতে লাগিল, তখন মধুর প্রকৃতি বিভাগাগর হৃদয় উথলিয়া উঠিল, সাগরে তুফান দেখা দিবে, বানের জলের প্রায় চক্ক হইতে সবেগে জলধারা প্রবাহিত হইল। কুলের দাগানে বেথুনের প্রস্তরমূর্তি সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বহুক্ষণ অশ্রুপাত করিলেন। সেই পুরাতন লোককে নূতন বস্ত্র দিয়া আর সকলের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিয়া গৃহে আসিলেন। শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া, দাগান হইতে প্রায়শঃ অবতরণ কালে দেখিলেন যে, ৩৪৪টা শিক্ষক মাত্র তাঁহার স্নেহ প্রদর্শনে বঞ্চিত হন, তখন সঙ্গে পাগলি বেহারাদের অল্প একটা টাকা ছিল, তাহাই তাঁহাদের এক জনের হাতে দিয়া বলিলেন, “এক ব্যক্তির পৃথক কল কেন হবে, তোমরাও এই ব্যক্তিকি জলযোগ করিও, বাদ যাওয়া বিধেয় নহে।” গৃহে আসিলেন বটে,

কিন্তু তাঁহার সুনির্ণল নীলাকাশসদৃশ স্বচ্ছ হৃদয় বিবাদমেষে আবৃত হইল । তাঁহাকে অনেক সময়ে দেখিয়াছি, কিন্তু সে দিন সে সুখমণ্ডলে বেষ্টিত বিবাদের ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম * সেরূপ অতি অল্পই দেখিয়াছি । অতিমাত্র ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার অসুখ কি খুব বাড়িয়াছে ?” কোন জবাব নাই । কণকাল পরে অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা আমাকে সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে বলিলেন । আন্তে আন্তে বসিলাম । কণকাল পরে বলিলেন, “না আমার অসুখ বাড়ি নাই । যেমন তেমনি আছে ।” আমি বলিলাম, “তবে আপনাকে এত কাতর দেখিতেছি কেন ।” তিনি বলিলেন “বেথুনস্কুলে গিয়াছিলাম, সব দেখে শুনে বড়ই সুখ হইল ।” আমি হতভাগ্য, সাগরের তরঙ্গভঙ্গির তলদেশে কি অমূল্য রত্ন লুপ্তারিত আছে, তাহা না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাতে দুঃখ কি ?” সেই বীরপুরুষ বীরোচিত আগ্রহ সহকারে বলিলেন, “এতগুলি মেয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে, তারাই আমার সেট স্কুলে শিক্ষারিত্রীর কাৰ্য্য করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার স্বল্প প্রাণপাত করিয়াছিল, সে দেখিল না । নিজের পদমর্যাদা ভুলিয়া যে ব্যক্তি বালিকাদের সঙ্গে খেলা করিত ; আর নিজে ঘোড়া হইয়া, হামা দিয়া, বালিকাদিগকে পিঠে তুলিয়া ঘোড়ার চড়াইত ! বাহার পিঠের উপর বালিকারা বসিয়া খেলা করিত ! সে দেখিল না !” এই বলিতে বলিতে অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি নিজের পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।

পাঠককে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, বেথুন-স্মৃতিই বিদ্যাসাগর-হৃদয়ে শোক-প্রাবণ প্রবাহিত করিয়াছিল । স্বী-শিক্ষার সুপ্রচার সন্দর্শনে তাঁহার উদার হৃদয়ে আনন্দের যে বিকলী-লীলা বিকশিত হইতেছিল সুহৃৎশোকজনিত ঘন অন্ধকারে তাহা অচিরে লুপ্তারিত হইল । তিনি গভীর বিবাদভরা দীর্ঘনিদ্রাস জাগ্র করিয়া বলিলেন,—“কি লোকই আসিয়াছিল ।”

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল কলিকাতার বেথুন-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন কার্যে সহায়তা করিয়া নিশ্চিত ছিলেন, তাহা নহে । পূর্বে আমরা বলিয়াছি, ছোট গাট্ জালিডে সাহেবের বাচনিক আদেশে মেদিনীপুর, বর্ডমান,

* তিনি বেথুন-স্কুল হইতে আসিয়া যখন একাকী কালাতিপাত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম ।

চগনী ও নদীয়া জেলার নানাহানে বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সেই সকল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লইয়াই শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত স্থায়ী মনাক্ষরের সূচনা হইয়াছিল (১২০ পৃষ্ঠা ও কৰ্ম্ম পরিত্যাগ বিষয়ক ১৩শ ও ১৪শ পত্র, ১৩২১৪০ পৃষ্ঠা ।) বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ সকল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ছোট লম্বা কর্তৃক অনুব্রত হইয়াছিলেন । কিন্তু সে অনুব্রত সৰ্ব্বদে কোন সরকারি কাগজপত্র কিংবা লিখিত আদেশ ছিল না । কাজে কাজেই অনাস্থীয়তা স্থলে ইয়ং সাহেব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বহুপরিকর হইলেন, এবং সে চেষ্টার কৃতকার্যও হইয়াছিলেন । ঐ চারি জেলার নানাহানে প্রায় পঞ্চাশটা বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সমুদায় ব্যৱভার নিজহস্তে গ্রহণ করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না । প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দুইজন পণ্ডিত ও একটা করিয়া দাসী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল । ইহাদের বেতন ভিন্ন অল্প ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল । বালিকারা বিনা বেতনে পড়িত । তাহাদের পাঠ্য-পুস্তক, লিখিবার কাগজ, প্লেট, পেন্সিল সমস্তই দিতে হইত । এই বৃহৎ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল ।

বালিকাবিদ্যালয়বিষয়ক বিল মঞ্জুর না হওয়াতে, ছোটলাট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পরামৰ্শ দেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, “আমি কখনও কাহারও নামে নালিশ করি নাই, অতএব আপনায় নামে কি প্রকারে অভিযোগ করিব, ঐ টাকা আমি নিজে গুণ করিয়া পরিশোধ করিব।” বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কর্তৃপক্ষের এইরূপ আচরণে মৰ্ম্মাহত হইয়া কেবল গুণভার হৃদে লইয়াছিলেন তাহা নহে, পাঁচশত টাকার চাকুরিটা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ সকল বালিকাবিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিষয়েও তৎপরে বহুদিন পর্যন্ত আগ্রহসহকারে নিযুক্ত ছিলেন । এই কার্যে তাহার ইংরাজ বন্ধুদের কেহ কেহ মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতেন । স্তর সিসিল বিডনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে স্ত্রী সিসিল বিডন বিভাগাগর মহাশয়কে যে পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ :—প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, * * এই বৎসরের এপ্রিল, মে, জুন এই তিন মাসের বালিকাবিদ্যালয়ের কণ্ডের মাসিক টাকা হিসাবে, এতৎসহ ১৬৫ টাকার একখানি হুণ্ডি পাঠাইতেছি। *

দার্জিলিং ১৭ই আগষ্ট ১৮৬৬

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সন্নীপে।†

প্রিয় মহাশয়,

একণে আশ্চর্য সহকারে আমি বালিকাবিদ্যালয়ের অন্ত স্ত্রী সিসিল বিডনের ১৮৬৬ সালের প্রথম অর্ধেকের মাসিক টাকা হিসাবে ৩৩০ টাকার একখানি হুণ্ডি পাঠাইতেছি। চেক বইখানি কলিকাতায় ফেলিয়া আসায় এইরূপ বিলম্ব হইয়াছে।

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন

(স্বাক্ষর) এইচ. রাবান।

এই সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি বহুকাল জীবিত থাকিয়া বাত্মান দেশে শ্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রচুব সহায়তা করিয়াছে। এই সমুদায় বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে বিভাগাগর মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি বীরসিং গ্রামেও একটা বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের বেতন ও বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তকাদি হিসাবে মাসে মাসে অনূন ৩০ টাকার ব্যয় হইত। বিভাগাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।*

* My dear Pundit * * I enclose a cheque for Rs. 165 on account of my subscription to your Female School Fund for April, May & June 1863—Yours very truly, C. Beadon.

Darjeeling, August 17th, 1866.

Pundit Jawarchandra Sorma,

† My dear SirI have now the pleasure to enclose a cheque for Rs. 330 on account of Sir Cecil Beadon's subscription to the Female Schools for the first half of 1866. This would have been sent before, but the cheque book was accidentally left behind.....Believe me, Yours very truly, H. Raban.

এই সময়ে বিভাগসম্বন্ধে মহাশয় ভায় বার্টল ফ্রেরকে যে পত্ৰ লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে ত্ৰীশিকাবিবয়ক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—“আপনি নিশ্চয়ই জানিয়া সুখী হইবেন যে মফঃস্বলের যে সকল বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে আপনি অনুগ্রহ করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, সে সকল বিদ্যালয়ের কার্য বেশ চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্তী জেলা-সমূহ ত্ৰীশিকার আদর ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে এবং এক একটা করিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ও সময়ে সময়ে স্থাপিত হইতেছে।” *

তিনি কোন কার্যের ভায় লইয়া প্রতিকূল ঘটনা নিবন্ধন তাহা ছাড়িবার পাও ছিলেন না। ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, করিতে বসিয়া না করা, আশ্বাস দিয়া নিরাশ করা, বিভাগসম্বন্ধে মহাশয়ের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিকৃত ছিল। শত শত বাধা বিঘ্ন, অভাব ও অসুবিধায় পড়িয়াও যখন তিনি এইরূপে নিজ ব্যয়ে ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় ঐ সকল বিদ্যালয়েব প্রাণ রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পরহিতৈষণাব্রতধারিণী কুমারী কার্পেণ্টার ভারতের নানাহান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। বালিকা কার্পেণ্টার মহাশয়া রামমোহন রায়েকে দেখিয়া অবধি ভারতবর্ষকে জনবাসিতে আরম্ভ করেন। তাহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, “রামমোহন রায়েই তাহার মনে ভারতের হিতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীপ্ত করিয়া দেন।” † তিনি অগবিস্থ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বন্ধুতা ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া পরতবর্ষবাসী নরনারীমণ্ডলীকে আরও অধিকতর স্নেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টারের শুভপদার্পণে ভারতের নানাহানে

* The Hon. Sir Bartle Frere.

Calcutta 11th Oct., 68.

My dear Sir—* * You will, no doubt, be glad to hear that the unfurl Female Schools, to the support of which you so kindly contributed, are progressing satisfactorily. Female Education has begun to be gradually appreciated by the people of districts contiguous to Calcutta and schools are being opened from time to time * * I remain, with great respect and esteem, Yours sincerely

Jayarchandra Sarma.

অভ্যর্থনা ও সমারোহের বহুবিধ আয়োজন হইরাছিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী উপনগর সকলেও সেরূপ অনুষ্ঠানের ক্রটি হয় নাই। বরাহনগর ও উত্তরপাড়ার অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমারী কার্পেন্টার কলিকাতার পদার্পণ করিয়া বেথুন-স্কুল ও অবলাবাঈব বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তদনুসারে তদানীন্তন ডিরেক্টর এটকিনসন সাহেব বিভাগাগর মহাশয়কে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র এই :—

২৭শে নবেম্বর, ১৮৬৬

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, *

মিস্ কার্পেন্টারের নাম অবশ্যই আপনি শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে আলাপ ও সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে চাহেন। আপনি কি আগামী বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারটার সময় বেথুনস্কুলে আসিতে পারেন? আমি তাঁহাকে সেই সময়ে, বেথুনবিভাগের প্রথম দেখাইবার জন্ত, লইয়া যাইব। একটু গোপন ভাবেই যাওয়া হইবে, আমাদের সঙ্গে অপর কেউ থাকিবে না, সেই জন্ত আপনার সহিত আলাপ করাষ্টয়া দিবার বেশ সুবিধা হইবে। ইহার পর আর এক সময়ে বিভাগাগরের কমিটির সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্ভবতঃ তিনি প্রব সক্ষম। মিষ্টার সিটন কার যত দিন কলিকাতার ফিরিয়া না আসেন, ততদিন এরূপ প্রকাশ্য ভাবে সকলের সহিত আলাপ হুগিত রাখাই ভাল।

একান্ত আপনারই

উইলিউ, এস, এটকিনসন।

27 Nov., 1866.

* My dear Pandit Miss Carpenter whose name you are no doubt acquainted with, is anxious to make your acquaintance and to talk to you about her projects for furthering Female Education in India, could you come at the Bethune School to meet her on Thursday morning about 11 past 11 o'clock? I am going to take her there at that time for a first visit which is intended to be quite of a private character and it would be a good opportunity to introduce you to her. On another occasion I think she will probably be glad to meet the gentlemen of the Committee but it will be better to defer this till Mr. Seton Kerr has returned to Calcutta.

Yours very truly (Sd.) W. S. Atkinson.

মিস্ কার্পেন্টারের সহিত পরিচয় হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল। আলাপ পরিচয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এমন কি মিস্ কার্পেন্টার বেখানে যখন বাইতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে বাইতে অনুরোধ করিতেন। সকল স্থানে না হইলেও, কোন কোন স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্ কার্পেন্টারের সঙ্গী হইতেন। উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্ কার্পেন্টারের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন। উড়ো ও এটাকিনসন সাহেবও সেই সঙ্গে ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি বগিগাড়ীতে বাণী ষ্টেশন হইতে উত্তরপাড়া বাইতেছিলেন, উত্তরপাড়ার অতি নিকটে পথে এক স্থানে মোড় ফিরিবার সময়ে গাড়ীখানি উল্টাইয়া পড়ে, সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হন। গুরুতর আঘাতে আহত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া রাজপথের অনতিদূরে তিনি এক স্থানে পতিত হইলেন, ঘোড়াও গাড়ীসমেত অন্তত পতিত হইল। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া পথের লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, কিন্তু কেহই তাঁহার সহায়তার অগ্রসর হয় নাই। মিস্ কার্পেন্টারের গাড়ী আসিলে পর, তিনি সেই লোকারণ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সত্বরপদে নিকটে গেলেন এবং তিনি সেই পথের পার্শ্বে নিরুন্মীতে বিদ্যাসাগরকে জোড়ে তুলিয়া বসিলেন এবং ক্রমাৎ দিয়া মুখ সুঁচাইয়া দিয়া ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন,—“যখন আমার চেতনা হইল, আমার বোধ হইল যেন আমার মাতৃদেবী আসিয়া আমাকে জোড়ে জাকিয়া বসিয়াছেন, আর মেহন্তরে পুত্রের সেবা করিতেছেন। শরীরে সেই একবার বর্গভোগ করিয়াছিলাম। সে দায়ব যন্ত্রণার মধ্যেও আমি মিস্ কার্পেন্টারের সেট মেহপূর্ণ বাৎসল্য লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম।” বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখের তাবে ও অঙ্গভঙ্গিতে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গভীর তক্তির চিত্র প্রতিকলিত হইয়াছিল। এই শব্দট হইতে পতনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুস্থ শরীরে রোগ, সর্বল শরীরে দুর্বলতা এবং শান্ত চিত্তে অশান্তির সূত্রপাত করিল। তাঁহার দরুতে গুরুতর আঘাত লাগে।

জাহার দেহ অপটু হইল, জাহার স্বাস্থ্য নাশ হইল। মধ্যাহ্ন 'সূর্যের তীক্ষ্ণ তেজ ক্রমে কীণতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পড়িয়া যাওয়ারভে সে সময়ে চারিদিকে এক মহা হলহুল পড়িয়াছিল এবং সে সময়ের সুবিখ্যাত গায়ক বীরাজ এই ঘটনা অবলম্বনে এক গীত রচনা করিয়াছিলেন।

("বৈতে থাক বিদ্যাসাগর" গানের সুর)

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
 বাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে,
 করে তুলছে তোলাপাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি.
 মিস্ কার্পেন্টার সকল দুল বেড়িয়ে এসেছে।
 কি মাল্লাজ কি বোঝাই সবই দেখেছে,
 এখন এসে কলকাতাতে (এবার) বাঙ্গালীঘের নে পড়েছে।
 উত্তরপাড়ী দুল বেতে, বড়ই রগড় হলো পথে,
 এটুকিন্সন্ উড়ে! আর সাগর সঙ্কেতে।
 নাড়ো চাড়ো দিলে খোড়ো খোড়ো মাঝাতে,
 গাড়ো উটে পনের সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বৈতে।*

সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুতে এরূপ গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল যে, ঐ স্থানের বেদনার জাহাকে পুনঃ পুনঃ শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি সুযোগ্য চিকিৎসকগণ বহুত-স্কেটিক (লিবার এবেসেস্) ইত্যাদি বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। মিস্ কার্পেন্টার দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, এবং সর্বদা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংবাদ লইতেন। কলিকাতা ত্যাগের কিছু পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্রপানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এই :—

প্রিয় মহাশয়, -আপনি পুনরায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন ওনিরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম; এবং সেই জন্য আমার তর হইতেছে যে, আগামী বুধবার প্রাতঃকালে আমার কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।

আমি আসামী কল্যাণ অপরায় চারিটার সময়, জীশিকা বিষয়ে পরামর্শ করিবার



Mary Carpenter

অনেকগুলি দেশীয় বন্ধকে, আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকিলে, আশা করি, আগনিও আসিবেন ।

আপনার চিরবিধাসভাভান,

মেরি কার্পেন্টার ।*

বেথুনস্কুলে স্বভাবভাবে কতকগুলি মহিলাকে শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, মিস্ কার্পেন্টারের এইরূপ ইচ্ছা ছিল, এবং যাহাতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সে বিষয়েও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টা কার্যে পরিণত হইয়াও স্থায়ী হয় নাই । স্থায়ী হইলে, কল কিরূপ হইত বলা যায় না ।

স্যার উইলিয়ম গ্রে, মিষ্টার সিটনকার, মিষ্টার এটকিন্সন প্রভৃতি সাহেবগণ এবং বাকালীদেরও কেহ কেহ মিস্ কার্পেন্টারের উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছিলেন । কিন্তু বিদ্যালয়গর মহাশয় এষ্ট প্রস্তাবে বিরোধী হইয়াছিলেন । তাঁহার স্থায়ী সহানুভূতির অভাবেই, প্রধানতঃ উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে পারে নাট । শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করাব অল্প মিস্ কার্পেন্টারের প্রস্তাব-মত, বেথুন বিদ্যালয়েই একটা নব্বাঁগ স্কুল প্রতিষ্ঠা কবিবাব অল্প স্যার উইলিয়ম গ্রে বিশেষ ভাবে উত্তোষী হইয়াছিলেন এবং সেই কাৰ্য্যের ঐচ্ছানোচিত্তা অবধাবণের অল্প ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর একখানি দীর্ঘ পত্রে বিদ্যালয়গর মহাশয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান । সে পত্রে তিনি শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণের পক্ষসমর্থন ও তদভাবে বেথুন বিদ্যালয়ে বহু অর্থ ব্যয় যে বৃথা হইতেছে, তাহার অল্প আক্ষেপ প্রকাশ করেন । বিদ্যালয়গর মহাশয় যে যুক্তি প্রণালী অবলম্বনে তাঁহার প্রত্যেক কথাই প্রতিবাদ করিয়া নিজের মত প্রবল রাখেন এবং যে বৃহৎ পত্রখানির চাপে সে সময়ের সে

* Dear Sir - I am very sorry that you are again ill, and fear therefore that I shall not have the pleasure of seeing you before I leave on Wednesday morning

I asked several native friends to meet at my room to-morrow at 4 P. M. on Female Education and if you are well enough, I hope, you would come.

Believe me to remain,

Yours truly,

Mary Carpenter.

Government House,

Jan'y. 7, 1867.

প্রবল আরোহণ বিকল হইয়া গিয়াছিল, তাহার অনুবাদ নিয়ে দেওয়া গেল । সেই পত্র পাঠে দেখা যায় যে, তিনি কেমন সুন্দর উপায়ে সকল দিক বজায় রাখিয়া উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি স্বী-শিক্ষার আবশ্যকতা এত অধিক মাত্রায় অনুভব করিতেন বলিয়া, স্বী শিক্ষা প্রচারের সেই প্রথম অবস্থায় দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া অতিমাত্রায় অগ্রসর হওয়ার পাছে সমূলে সর্বনাশ সাধন হয়, এই আশঙ্কায় সর্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন । তাঁহার সুবিবেচনাপরিচালিত পথে স্বী-শিক্ষার শৈশবকাল কাটিয়াছিল বলিয়াই, আজ স্বী-শিক্ষার প্রোত কতকিৎ প্রবল গতিতে উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতেছে । তিনি যে যুক্তিমার্গ অবলম্বনে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই পত্র-খানি এট :—

কলিকাতা,

১লা অক্টোবর, ১৮৬৭ ।

মাননীয় স্যার উইলিয়ম গ্রে,

প্রিয় মহাশয়,

আপনার সহিত শেষ দেখা হওয়ার পর আমি বিশেষ সাবধানতা সহকারে অনুসন্ধান করিয়াছি, এবং বিশেষভাবে চিন্তাও করিয়াছি কিহু মিস্ কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত, হিন্দুসাধারণের গ্রহণোপযোগী একদল শিক্ষয়িত্রী, বেথুন স্কুলেই হউক, বা অন্যত্রই হউক, প্রস্তুত করার পক্ষে বিষম অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া আমার যে ধারণা আছে, সে ধারণার পরিবর্তন করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না । এই ক্ষুদ্রতর বিষয় সত্ত্বে আমি বড়ই চিন্তা করিতেছি, ততই আমার মূঢ়রূপে এই প্রস্তাব জন্মিতেছে যে, হিন্দুভাব ও হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থা এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধী ; ইহার দ্বারা কোন শুভ ফলের প্রত্যাশা নাই বলিয়াই, আমি গভর্ণমেন্টকে সাক্ষাৎ তাহা এই কার্যের ভার লইতে জ্ঞাতঃ কোন পরামর্শ দিতে পারি না । আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, কোন সম্ভাব্য হিন্দু তাঁহার বরংহা আত্মীয়স্বজনকে শিক্ষয়িত্রীর কার্যে রত হইতে দিবে না । তাঁহার বর্তমান সময়ের সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া ১০।১১ বৎসরের-বিবাহিতা বালিকাদিগকেও অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে দেন না ।

একমাত্র আত্মীয়-স্বজনশূন্য অসহায় বিধবাশিশুকে এরূপ কার্যে পাওয়া বাইতে পারে, কিন্তু এদেশীয় পুরনোরীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উপযুক্ত কি না, সে প্রশ্ন না তুলিয়া, আমি কেবল এই বলিতে চাই যে, তাহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিলেই লোকের মনে আপনা আপনি নানা প্রকার সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণ উপস্থিত হইবে, এবং তদ্বারা গবর্ণমেন্টের এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য সহজেই বিনষ্ট হইবে ।

এই বিষয়ের সফলতা সাধনের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সরকারি বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হইরাছে—এবিষয়ে (Grant-in-aid অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হওয়াই, লোকসাধারণের মনের ভাব বুঝিবার সুন্দর উপায় বলিয়াই বোধ হয় । যদি এদেশের লোক মিস কার্পেন্টারের প্রস্তাবিত শ্রীশিক্ষাপদ্ধতি পছন্দ করে, তাহা হইলে তাহারা অর্থসাহায্য চাহিয়া আবেদন করিলে, গভর্ণমেন্ট প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তখন তাহাদের কার্যের সহায়তা করিতে পারেন । যদিও আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এদেশের অধিকাংশ লোকেই এরূপ সাহায্যের প্রার্থী হইবে না, তথাপি যে সকল লোক ঠোঁট সফলতার অভিমাত্র আশা স্থাপন করিতেছেন, সত্য সত্যই যদি তাহাদের আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিয়া এ অনুষ্ঠানের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন ।

আমি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেছি, তাহারা এই অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী, তাহাদের কার্যে আমার বিশেষ আস্থা নাই । কিন্তু ভারত গভর্ণমেন্টের প্রচলিত নিয়ম বিদ্যমান থাকিতে তাহাদের আর অনুযোগ কবিবার কোন সুযোগ থাকিবে না ।

বলা বাহুল্য যে আমি স্বীকারিতর হুশিষ্কা লাভের অশ্রীশিক্ষার আনুকূল্যতা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি এবং যত্বপূর্ণ আমার স্বদেশীয়-দিগের সামাজিক সংস্কার এরূপ চরিত্রক্রমণীয় বাধারূপে না পাড়াইত, তাহা হইলে সকলের অগ্রে আমি এই কার্যের পোষকতা ও সহকারিতা করিতে অগ্রসর হইতাম । কিন্তু যখন দেখিতেছি যে কোন মতেই এ কার্যে কৃতকার্য হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং গভর্ণমেন্ট এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে আপনাবাই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অপদস্থ হইবেন, তখন আমি কোন মতেই এ কার্যে সহকারিতা করিতে সম্মত নহি ।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বেথুন স্কুলের উন্নতিকল্পে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই। এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলি, যে তাই বলিয়া বিদ্যালয়টী একেবারে উঠাইয়া দেওয়া আমার মতে কোন প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। ভারতে স্বাধীতির জ্ঞানোন্নতির চিত্তকল্পে, যে পরমোবাত্ত-পরায়ণ মহাত্মার নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে আমার বিবেচনায় ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেন্টের সাহায্য করা নিতান্ত কর্তব্য। তৎপরে ইহাও বাঞ্ছনীয় যে, এদেশের রাজধানীতে একটি সুপরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিয়া মফঃস্বলের নানাস্থানের বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের আদর্শরূপে কার্য্য করিতে পারে। হিন্দুসমাজের উপর বর্ত্তমান বিদ্যালয়টীর নৈতিক শক্তির প্রভাব অনেক। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই বিদ্যালয়টীই ইহার নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহে, স্বীকৃতির সুপ্রচার সাধন করিয়াছে। এইজন্য আমার বিবেচনায় বৎসর বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই বিদ্যালয়টী রক্ষা করাতে যে লাভ হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু বোধ হয় চেষ্টা করিলে ব্যয় সঙ্কোচ ও উন্নতি সাধন উভয়ই করা যাইতে পারে। সুবিবেচনা সহকারে চেষ্টা করিলে, বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি না করিয়া বোধ হয় অর্দ্ধেক ব্যয় কমান যাইতে পারে।

আমি স্বাহোজ্ঞতির আশায় দীর্ঘকালের জন্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বাইবার মানস করিতেছি। যদি আপনি বেথুন স্কুলের নূতনরূপ ধাবড়া করিতে চান, আর সে বিষয়ে আমার মতামত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কলিকাতার ঘিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে এবং এ বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে সানন্দে সন্মত আছি।*

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন

(স্বাক্ষর) জৈবরচন্দ্র শর্মা ।

* এই পত্রখানি অতি বৃহৎ, একজন আসল ইংরাজী পত্রখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্তৃ-পরিচয়্যে বিবরক ইংরাজী পত্রখানির সহিত পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

সুন্দরবন,

১৪ই অক্টোবর, ১৮৬৭

পণ্ডিত জেথরচন্দ্র শর্মা সমীপ

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১লা অক্টোবরের পত্র পাইয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম । পত্রখানি বহুবিধ জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ । আশা করি, আপনি কোন কারণেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া স্থগিত বাধিবেন না । আমার বিশ্বাস এই যে, স্থান পরিবর্তনে আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবেন ।

যদি আমি আর কার্যকর দিন পাবে কলিকাতায় গিয়া আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, বেথুন বিদ্যালয়ের নূতন সংস্কারকাৰ্য্য বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া পরম সুখী হইব, নতুবা আপনি অবসরোত্তর পত্রের দ্বারা আপনার অভিপ্রায় আমাকে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে লিখিয়া জানাইবেন ।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কোন সাহসবহুভার নিকট পৰিচয়-পত্রের প্রয়োজন হইলে আমি সেক্ষত্রে আপনার একটু প্রয়োজন সাধন করিয়া বিশেষ চেষ্টা অনুভব করিব । ১৪ই হইতে আমি বেলাভড়িয়ায় থাকিব ।

আপনাব একান্ত বিশ্বাসভাজন

(স্বাক্ষর) ডব্লিউ, এ. এ.

বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত এই বিষয় লম্বা দীর্ঘকালব্যাপী তর্কবিতর্কের পর শিক্ষারিত্রী প্রস্তুত করণের জন্য নর্থাল স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্য দান স্থির হইয়া যায় । প্রায় দুই বৎসর কাল ধরিয়া বিভাগের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া থাকে । এক দিবস প্রয়োজনোপলক্ষে ভূতপূর্ব অবলা বান্ধব-সম্পাদক বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তদানীন্তন ডেপুটি ইনস্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন সুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, প্রসঙ্গক্রমে উক্ত রায় বাহাদুর মহাশয় 'শ্রী-শিক্ষারিত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দুই বৎসর ধরিয়া মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া আছে', এই সংবাদ দিয়া বলিলেন, যদি সম্ভব হয়, এখনও চেষ্টা করিতে পারেন । দ্বারিক বাবু এই উপলক্ষে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিতে

অনুরোধ করিলেন, এবং নিজে ছাত্রী সংগ্রহের ভার লইলেন। তাঁহারই সংগৃহীত ৫৬৬টা ছাত্রী লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়। প্রায় দেড় বৎসরকাল এই বিদ্যালয়ের কার্য চলিয়াছিল। পরে সহসা সেই সময়ের বন্ধীর ছোট লাট ভ্রার জর্জ ক্যাথলিক বিদ্যালয় উঠাইয়া দেন। বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার কোন বিশিষ্ট কারণের উল্লেখ নাই।* খ্রী-শিক্ষার উন্নতিপথের এই অস্তরার দূর হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। এখনও সে অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই।

মন্তভেদ নিবন্ধন, বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুদের কাহারও কাহারও অত্যধিক উৎপীড়নে, শেষে বিরক্ত হইয়া বিদ্যালয়গর মহাশয় বেধুন স্কুলের সহিত সাক্ষাৎ সংশ্রব ত্যাগ করেন, কিন্তু খ্রী শিক্ষার সুপ্রচার সাধনকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান আয়োজন হইত, তাগাতে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ক্ষয়ের পূর্ণ যোগ ছিল। কোথাও ঐক্লপ কার্যের অনুষ্ঠান হইলে, তাহাতে সাহায্য করিতে কখন বিবত থাকিতেন না। পুরনারীগণের শিক্ষা দিবার জন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার যে সকল খ্রীশিক্ষা-বিদ্যালয়ী সন্মিলনী স্থাপিত হইয়া খ্রী-শিক্ষার সুপ্রচার সাধন করিতেছে, সে সকলের প্রতি তাঁহার বিশেষ রোহণী ছিল। উত্তরপাড়া হিতকারী, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ সন্মিলনী, ফরিদপুর সুস্বত্বতা বাখরগঞ্জ হিতসাধিনী, বিক্রমপুরসন্মিলনী, মধ্যবঙ্গালাসন্মিলনী প্রভৃতির কার্য-বিবরণ শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। আমরা কোন সন্মিলনীর পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তাঁহার নিকট পুস্তকাদি সাহায্য প্রার্থনার জন্ত অনুরোধ হইয়া গাইতাম। সে সময়ে প্রসঙ্গক্রমে এই সকল সন্মিলনীর বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ঐক্লপ কোন সন্মিলনীর দ্বারা বিশেষভাবে খ্রী শিক্ষার সহায়তা হইতে শুনিগে, গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেন। চলিত কথায় লোকে বলে “অন্ন বিদ্যা ভরফরী,” কিন্তু তিনি অন্ন অধিক সকল প্রকার বিদ্যায়ই উৎসাহলাভা ছিলেন। আজকাল মেয়েদের অন্ন লেখা পড়া শিবার বড় একটা আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু খ্রীজাতির উচ্চশিক্ষার লোকের বিক্রম ও বিষয়-বহি অত্যধিক মাত্রায় জলিয়া উঠে। কিন্তু সকলে শুনিয়া অবাক হইবেন যে, বেধুনবিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তা শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এম্ এ, মহোদয়।

* খ্রীশিক্ষার চিরস্থায়ী দায়কানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

—ମଧ୍ୟ—

ପାଠ୍ୟ ପଦ୍ଧତି—

ଏକ ଦିନ ଶେଷ—ଦାକ୍ତରୀ ଓ
ତୋଷାକ ମାଡ଼ି କିଛି ମଙ୍ଗଳ କାହା ନାମକରଣ
କାହିଁ, ବାମି ସାଥ ମରାଣେ ବାହୁଦିତ
ହୁଏ। ଦୁଇ ମୁହଁ ବାହାର ମିଳି
ନାହିଁ ହୁଏ। ମୁହଁ ମରାଣେ କର,
ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବାହାର ମାଡ଼ି ଓ
ମରାଣେ ପାଠ୍ୟପାଠ୍ୟ ହୁଏ, ଏହି
ବାହାର ବାହାର କାହିଁ ଓ ବାହାର
ପାଠ୍ୟ।

ଏହି ପାଠ୍ୟପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ
ପାଠ୍ୟ: (Shakespeare's Works)
ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ, ପାଠ୍ୟପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ
ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ
କିମ୍ବା ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ

—ପାଠ୍ୟପାଠ୍ୟ—

—ପାଠ୍ୟପାଠ୍ୟ—

যখন বর্তমান সময়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীর আনন্দের পরিচায়ক এক প্রহ সেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলী * উপহারসহ তাঁহাকে যে সুন্দর পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা সেই পত্রখানিকে সর্বাঙ্গবৎ অমর করিবার মানসে এখানে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম । এবং উক্ত পারিতোষিকের প্রথম গ্রন্থে যেটুকু লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও যথাবৎ তুলিয়া দিলাম ।

SRIMATI

KUMARI CHANDRAMUKHI BASU,

The first Bengali Lady,

Who has obtained the Degree of Master of Arts,

OF THE CALCUTTA UNIVERSITY.

From her sincere Well-wisher

ISVARACHANDRA SARMA

তৎপরে অল্প সময়ে প্রয়োজন বশতঃ আরও একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও এখানে প্রদত্ত হইল ।

প্রিয়ারি:

শরণম্ ।

সম্ভ্রমসম্ভাষণমাবেদনমিদিম্

তোমার পিতৃব্যের † প্রীতি যে ছই খানি পুস্তক পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া অতিশয় আনন্দান্বিত হইয়াছি । কিন্তু অনেক দিন অর্ধদি আমার শরীরের বেতন মন্দ অবস্থা চলিতেছে, তাহাতে এক্ষণে ঐ পুস্তক পাঠ করি, আমার সেৱণ ক্ষমতা নাই । কিঞ্চিৎ সুস্থ না হইলে, পুস্তক পাঠ করিতে ও তথিযবে

* Cassel's Illustrated Shakespeare—Edited and Annotated by Charles and Mary Cobden Clarke.

† পরমোৎকর্ষতঃ কৃত্তিমিত্ত্বং হ্যনন্তরং বহু, এম, এ ।

কিছু বলিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বাটীর মেরামত হইতেছে। এক্ষণে আমার পরিবারবর্গ অল্প এক বাটীতে আছেন। আমি অতি কষ্টে আপন বাটীতেই অবস্থিতি করিতেছি। আর দশ বার দিনে মেরামত শেষ হইবে। শেষ হইলে তোমাকে সংবাদ লিখিব। তখন তুমি ও বাধা উভয়ে আসিবে। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, দেখিলে যারপরনাই আনন্দিত হইব, ইহা বলা বাহুল্য। আমার পরিবারবর্গ ভাল আছেন। ইতি ২৪ শ্রাবণ ১২৯২ সাল।

শ্রীমদ্রাজকৃষ্ণঃ

(সাক্ষ্য) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্মাঃ।

পুনশ্চ—৫১৬ দিন অতিশয় অসুস্থ ছিলাম। এক্ষণে এই পত্র লিখিতে এত বিলম্ব হইল, মনে কিছু করিও না। শ্রী কৃষ্ণঃ—

স্বাশিক্ষার সংশ্রবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গললনাগণ, সেই মহাপুরুষের স্বর্গারোহণের পর, সকলে সমবেত হইয়া ১৬৭০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ঐ টাকা বেথুনবিদ্যালয়ের কমিটির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। হিন্দুগৃহের কোন বালিকা তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার অল্প প্রস্তুত হইতে অগ্রসর হইলে, পরবর্তী দুই বৎসরের অল্প তাহাকে উক্ত সঙ্কিত অর্থের আর হইতে একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই অনুষ্ঠান যে সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাসিনী রমণীগণের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে আব সন্দেহ কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীজাতির পরম সুহৃৎ; ভারত-সন্তানদের মধ্যে বর্তমান যুগের প্রারম্ভে যুগপ্রবর্তক মহাত্মা রামমোহনের সহায়তা লাভ করিয়া বঁহার নানা বিপদে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই ক্ষেত্রে, সেই পুণ্য কার্যে, মহাত্মা রামমোহনের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে অধিকতর সুখের অবস্থায় স্থাপিত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার নারীসেবার সুবহু কীর্তিসম্বলিত সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে, অবলা রমণীগণ বাহা করিয়াছেন, আক্ষেপের বিষয় যে শতপ্রকারে উপকৃত সুশিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণ তাহরূপ কিছুই এপার্থক্য করিলেন না। বঙ্গরমণীগণ

৪৩ ! তাঁহারা দেবমূলত গুণালঙ্কৃত বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের প্রতি বিন্দুপ্রমাণ কৃতজ্ঞতাও প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন * ।

In the presence of His Excellency the Viceroy and Governor General of India—Lord Elgin, and many other notable European and Indian gentlemen * Bethune College, —5th March 1894.—Report. * * * The Committee beg to announce that they have recently received the sum of Rs. 1,670 from the Secretary to the Ladies' Vidyasagar Memorial Committee in Calcutta, for the establishment of an annual-Scholarship tenable for two years to be awarded to a Hindu girl who after passing the Annual Examination in the Third Class of the School, desires to prepare herself for the University Entrance Examination. The late Pundit Iswar Chandra Vidyasagar was the co-adjutor and fellow-worker of Mr. Bethune, when the School was founded and since then continued so long as he lived, to take the keenest interest in its welfare. It is therefore a source of great gratification to the Committee to find that a body of Hindu Ladies in Calcutta should have interested themselves in this manner to perpetuate the memory of the late Pundit Vidyasagar who, during his lifetime, in addition to the philanthropic work to which he devoted his whole life, had done so much to promote Female Education in Bengal.

M. Ghose,

Secretary.

অষ্টম অধ্যায়

—:—

সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগর।

১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিন্‌ক মহোদয়ের আদেশে সমগ্র ভারতবর্ষাণী প্রচণ্ড অধিকাংশ নির্ধাপিত হয়। সেই দিন হইতেই বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষে বৈদ্যজীবনের ওকিবহ ভারবহনের সূচনা হয়। ভারত জলাটে যে সভা-বহি চিন্তন ধব ধব কবিতা জ্বলিতেছিল, যে চতুর্দশ শতাব্দী হিন্দুধর্মী স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ কবিতাছিল, যে জীবন্ত নবীভূত ভারতাকাশকে মলিন করিয়া রাখিয়াছিল, বাংলাহনের সহকারিতায় ও বেন্টিন্‌কের অঙ্গুলিসংস্পর্শে সেট বহি চিবনির্ধাপিত হইল—রামমোহনন আশ্রয় সাধনায় ও বেন্টিন্‌কর শত্রুদৃষ্টিপাত সেট ৬য় আকাশকান্ড হইতে চিরদিনেব জ্বল অপসারিত হইল। চিত্তানলে পতিপার্শ্ব আত্মসমর্পণ কবিতা হিন্দুধর্মী চরিতের স্বর্গীয় শোভা প্রতিপাত হইল—নারী চরিত অদ্বৈত সৎস্কাভ প্রকাশ পাইল, ৩৭৩৩৩৩ পুরুষগণ যে এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং চরিত্র অক্ষয় বাগিবাব প্রমোদী হইয়া আত্মগোপন ও নিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছেন, তাহাতে আব সন্দেহ কি? আবার এতদংশ নারীচরিতে গাহারা চরিত্রগুণ ৩ তরঙ্গ প্রকৃতির লোহারোপ করেন, তাঁহাদের ত্বক অবিবচক লোক পৃথিবীতে অধিক আছে বলিয়া বোধ হয় না। সহস্রর স্ত্রীজাতির বীরস্বয় বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে আবার গাহারা স্বেচ্ছায়, সঙ্কল্পচিত্তে ও মহাপ্রবল সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষার ত্বক অনল-প্রবেশ করিতেন এবং ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিতে করিতে ভস্মে পরিণত হইতে প্রস্তুত হইতেন, জিজ্ঞাসা করি, তাদৃশ নবীপ্রকৃতি সাধী মহিলাগণ পতিভক্তির গুণ পরিশোধার্থে করজান সাধু পুরুষ পতীর অঙ্গুপম করিয়াছেন। পরলোক পতি-পার্শ্ব স্থানান্তরের আকাঙ্ক্ষা পতীর পক্ষে যেমন বাহনীর

পাঠ্য কি পত্নীর পার্শ্বে স্থান পাউবার আকাঙ্ক্ষা তদ্রূপ স্বাভাবিক হওয়া উচিত নহে? অস্বাভাবিক বজাটস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিণী প্রয়োজন হইয়াছিল, প্রয়োজন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন যে, বনবাসিনী সীতার স্বামী ১৬ নিকটে বাখিয়া শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞ সমাপন কবিরাজিগণেন এতাদৃশ উচ্চ আদেশ সম্মুখে বিজ্ঞান থাকিতে জন্মভূমি সীতার গায় গুণিগণেরই স্বীকৃতিবাক্য বাবস্থা! আর দারিদ্র্যগ্রস্ত পতিব পক্ষে সর্বদাঃ শাসনশাস্ত ও সদাচার-নামানিত! এজন্য বিধি বৈধন্যে চিবপক্ষপাতী হওয়া কি মানবধর্মের অপূর্ণতার পরিচায়ক নহে? পুরুষশক্তি প্রধান জনসমাজের পক্ষে অসহায় বালিকার জ্ঞান বেদ, বিধি, ত্রুত, নিয়ম, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি বিবিধ অকৃত্যমান বহু কবির আপনারা যে সর্ববন্ধনমুক্ত হইয়া উচ্চ স্থান নোংরা জায় পথে ১০ বিচরণ করেন, ইহা কি জ্ঞানসম্পন্ন? গাভা হটক, পুনানন। বেণ্টিকব বচ ১০৪ ভারতে অবলাজাতির জীবন চিত্তানন নিরূপিত হইল ব'ট, কিন্তু ১২পরিবারে ভূদানলব সৃষ্টি হইল। একব বন্ধুচর্চা অনিয়া পুত্রায় সন্তানদের পান অধিকার করিল। অন্য অকাঙ্ক্ষার প্রাপ্ত হইল। দেবতার পরিবর্তে অন্য দয় কবিত্তে আবদ্ধ কবিল। বালিকা, বৈধবোণ ১০১ হইতে জীবনের ১০ দিন পর্যন্ত, বেণু বেণু কবিতা ১০০ হইতে গাভি। সন্তানকে কেদিন ব'টক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ব্যাপার ১০০ হইত, ১০০ চিবজীবনেও কবিতা ১০ গৃহে যখনই আত্মীয়স্বজনগণের দিকে দৃষ্টিপাত কব, দেখিব, ববীয়সী সমস্তিনীর সকল প্রকান সুখসম্প্রদায়ের পার্শ্বে অপাপবন্ধা বালিকা সন্ন্যাসিনীর ১০০ কালিদায়ের বিবাদের জীবন মাও ধারণ কবিতা বিচরণ করিতেছে! প্রপ্রবীণ পিতা নিজের অল্পবয়স্ক বিধবা কস্তার ১০০বাবুষ্ঠানের বিবদ বশির মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের বালিকা পত্নীকে পাঠের পরন ১০০ কালবাপন করিতেছেন। কোমলপ্রাণ কস্তা ও ভগিনীক ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিয়ার বাবস্থা কি এইরূপই হইবে? আর যে ব্রহ্মচর্য চারিদিক অন্ধকার করে, সকলের জন্ম-তার সৃষ্টি করে, বাহাকে দেখিবামাত্র অন্তরেব জালা পত সর্পশনের জায় বহুপায়ক হইয়া পড়ে, তাহা কি ব্রহ্মচর্য? ১০০ব্রহ্মচারী ব্রহ্মশক্তি বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিয়া অচিরকালে মারা যে ব্রহ্মচর্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং প্রবলের আত্মত্বের অনুরোধে দুর্বলের প্রতি যে

সর্বদাই ঐক্য বন্ধুচর্য্যের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে, তাঁহাকেই কি বন্ধুচর্য্য বল ? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করিতে না করিতে এত নানী বৈষম্য, এই আচার-বিভ্রাট দেখিয়া হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিয়া ছিলেন, তাহ বন্ধুচর্য্যের বাগ্মন্য দ্বারা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বাহির বাটাতে আসিয়াছিলেন ; জগৎযোগ করিতে বলিলে পর, দারুণ মনস্তাপের সহিত বলিয়াছিলেন “এ ভিটার আর জগৎস্পর্শ করিব না ।” তাহ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাজীবনের নানাপ্রকার দুঃখাবস্থা অবগত হইয়া, এই বিধবাজীবন বন্ধুচর্য্যের একটানা শ্রোতের মধ্যে একটু পরিবর্তন আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । পতিব স্মৃতি বন্ধ ধারণ করিয়া বন্ধুচর্য্যের হইয়া যাওয়া কালান্তিমিত কবিতা সক্ষম ও সম্মত, তাঁহারা তাহাই করুন ; তাহাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ দক্ষ । সেই সকল নারীমহিলাধারিণী দেবতারা আত্মনিগ্রহ ও পরসেবায় পরম সম্পদ সম্ভোগ করিয়া চিরদিনই মানব সমাজের সন্থা নিঃস্বার্থ প্রেমের ও পরমার্থপরায়ণতার আদর্শরূপে পূজা প্রাপ্ত হইবেন ; কিন্তু যাহাদের পতিদম্পত্যবিষয়ক কোন জ্ঞানই নাই, অথবা যাহার এই দুঃখ পথের পথিক হইতে অসমর্থ, লোকবন্দা ও সন্যাসশৃঙ্খলাব পক্ষপাতী নীতিকৃশ্ণ মহাত্মা সেসকল অবস্থায় জীবন যাপনের জগৎ ভিন্ন নিয়ম নির্দেশ করিয়া থাকেন । এই নিয়ম নির্দেশের জগৎ প্রভূত জ্ঞান, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও অপরিসর সঙ্গদয়তা থাকা আবশ্যক, যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল । তিনি বিবিধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, বিবিধ তত্ত্ব আলোচনা করিয়া এবং বহুলোকের বাগা বিদ্য অতিক্রম কবিবার উপযোগী শক্তি সামর্থ্য অর্জন করিয়া সমাজসংস্কারের আয়োজন করিলেন । এইবার তিনি তাঁহাব সেই বহু বাপারের আয়োজনে বন্ধুপত্রিকার হইলেন, যাহাতে তাঁহার মনুষ্যত্ব পূর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যে আয়োজনের ভাৱে সমগ্র দেশ টলমল করিয়াছে, তাঁহাব যে সমবসন্তায় ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ স্বার্থতা-স্বার্থ লইয়া দূরে—দূরে পলায়ন করিয়াছিল, এইবার তাঁহার সেই বিরাট বাপার, সেই মহাব্যক্তের আয়োজন, যাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সমগ্র ভারতবাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । ভারতের সুপরিচিত ক্ষেত্রে অনেক মহাব্যক্তের আয়োজন হইয়াছে, কবিরা কতকগুলি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভারতীয়

সম্রাটগণ বহুবার রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গের এই মৃতপ্রার অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অভ্যাদিত হইয়া সমগ্র ভারতবাসী যে মহা আন্দোলনপূর্ণ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা কোথাও মিলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়া আসিয়াছি, যাহা কিছু গুণ-গরিমাব উল্লেখ করিয়াছি, তাহা লোপ পাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান লুকাইতে কাহারও সামর্থ্য হইবে না। দরিদ্রের গৃহে, পর্ণকুটীরে ঈশ্বরচন্দ্র বাংলাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, লোকে তাহা ভুলিতে পারবে, দরিদ্র ঠাকুবদাস বহুক্ষেত্রে তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন, লোকে তাহা ভুলিতে পারে, বিদ্যালয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ববিদ্যায় বিশারদ হইয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পাইয়া সংস্কৃত কালেক্স হইতে বহির্গত হন, লোকে তাহাও ভুলিতে পারে, লোকে একথাও ভুলিতে পারে যে, তিনি নিজের স্বাধীন প্রকৃতির অধীন হইয়া পরাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে বণা কবিতেন বলিয়া ৫০০ টাকা বেতনের কৰ্ম্মটি অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিয়া ছিলেন, সে কৰ্ম্মত্যাগ হইতে বিবত কবিত ছোটলাটের জায় সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধও ফলপ্রসূ হয় নাই, বাঙ্গালাসাহিত্যের সজীবতা ও শ্রী সম্পাদনে তিনি যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও লোক ভুলিতে পারে, তিনি যে তুঃখিজনের তুঃখ মোচনে, আৰ্ত্ত ও বিপন্নজনের সহায়তায় সদা ব্যস্ত থাকিতেন, তাহার বিদ্যুত বিবরণও জনসমাজ ভুলিতে পারে, কিন্তু ভারতে হিন্দু বিধবাবিবাহ প্রচলন ভারতবাসী কোন দিন ভুলিতে পারিব না। হিন্দু সংসারের ইতর ভদ্র, স্বী পুরুষ, বালক ব্রহ্ম চিরদিন এই অনুষ্ঠানের অল্প ঠাহাকে চিনিবে, ঠাহাকে জানিবে, তাঁহার কার্যকলাপ শ্রনিবার অল্প উৎকর্ষে অপেক্ষা করিবে। এই বিধবাবিবাহবিষয়ক আন্দোলনে তিনি জনসমাজসমক্ষে প্রকৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার শরীরে কত শক্তি ছিল, তাঁহার মনের বল কত অপরিমিত ছিল, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি এবং এতাদৃশ জটিল সামাজিক প্রশ্ন বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও তাঁহার রণনৈপুণ্য কতদূর বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেছে, তাহা চিরদিনই ভাবী বংশের গবেষণার বিষয় ও চিরগৌরববশত হইয়া থাকিবে। এই যে এক কাৰ্য্য তিনি করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সমগ্র দেশবাসীর নিকট পরিচিত।

নিম্না ও প্রশংসা, তিরস্কার ও পুরস্কার, অনাদর ও সম্মান, ইহারা তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়াছে, এমন এক ভয়ঙ্কর আন্দোলনের ব্যাপার হইয়াছিল যে, আদালতে বিচারপতি ও উকিলগণ, দেবালয়ে তীর্থযাত্রী ও পুরোহিতগণ, বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতৃগণ, অস্ত্রপুয়ে পুরাস্কারা, মাঠে ক্রীড়কগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া আলোচনা করিয়াছে, আর 'বিদেশসংগর'এর হয় নিম্না না হয় প্রশংসা কবিয়াছে। সংবাদ-পত্রের ত কথাই ছিল না। তাঁহার যে এত প্রতিপত্তি, তাঁহার যশ ও খ্যাতির যে এত বহু বিস্তৃতি, তাঁহার পবিত্র নামে যে দেশের সমগ্র লোকে মুগ্ধ, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা ও বিধবাদের বিবাহ দেওয়া তাহার প্রধান কারণ। বিধবাবিবাহের পক্ষসমর্থন, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা, এবং বিধবাবিবাহ দেওয়া তাঁহার জীবনের মহাগ্রন্থ। সেই রক্ত পালন ও উদ্গমণ করিতে তিনি জীবনের বহু মূল্য সময় ক্ষয় করিয়াছেন, উপাঞ্জিত অর্থের প্রায় সমগ্র অংশ ব্যয় করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ভাবতবশী়র আত্মজ্ঞাতির সামাজিক ইতিহাসে বিধবা বিবাহের চিন্তা কি এই প্রথম উপস্থিত হইল? না, ধারাবাহিকরূপে প্রমাণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, পূর্বেও এই বিধবাবিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল? আমাদের দৃষ্ট বুদ্ধিতে এদেশীয় সামাজিক আচরণ ব্যবহারের যে অর্থবোধ হয়, তাহাতে শোষণকাটাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় এবং সেই সঙ্গতির পক্ষে বহুতর বিজ্ঞানের গবেষণার ফল সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বিধবাবিবাহ গ্রন্থই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন অপর কোন মহাত্মা কোন উপলক্ষে ইহার স্বপক্ষে কোন কথা বলিবারে 'কি না, তাহাই আমরা সর্বাগ্রে আলোচনা করিব। এদিকটিক সোসাইটীর পত্রিকাতে ভারতে হিন্দুজাতির অশ্রেণীকৃত-বিষয়ক প্রবন্ধ ডাক্তার রাজকমলাল মিত্র মহাশয় এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিরূপে অশ্রেণীকৃত সম্পন্ন হইত এবং তাহার মন্থ সকল কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা স্থলে তিনি দেখাইয়াছেন যে, সেকালে মৃত পতির অনুগমন কালেও অনেক স্থলে মৃত ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর কিম্বা তজ্জন অপর কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির চিত্তার অঙ্গপ্রস্থানের পূর্বে তাহার বিধবার বান্ধ হস্ত ধারণ পূর্বক চিত্তা হইতে নামাইয়া লইত এবং তাহাকে গৃহে আনিয়া বিবাহ করিত। ঐ বিধবাও

দ্বিতীয়বার বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার-ধর্ম্য পালন করিত। এইরূপে চিত্ত হইতে বিধবাকে তুলিয়া আনিবারও মন্ত্র ছিল, মন্ত্র থাকিলে অবশ্য ইহা প্রসঙ্গত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। লোকে যেহামত গাথা ইচ্ছা তাহাই করিত না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই সংশ্বে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—“এই মন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাক্য ‘দিধিষু’ আরণ্যক এই বাক্যের অভিধানসম্মত যে সংজ্ঞা অর্থ করিয়াছেন তাহাতে ‘দিধিষু’ অর্থে ‘যে ব্যক্তি বিধবাকে বিবাহ করে’ কিম্বা কোন এক দ্বার দ্বিতীয় বারের স্বামী ; * বৈদিক কালে বিধবার বিবাহ যে আর্ঘ্যজাতীয় বাতিনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত ছিল, ইহা বিভিন্নতব প্রমাণ ও বৃক্তি দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। অতি পুরাকাল হইতে সংস্কৃত ভাষায় বিধবাবিবাহকারী ‘দিধিষু’ পতাস্তুর গ্রহণকারিণী ‘পরপুরুষ’ দ্বিতীয় পতির ঔরসজাত পুত্রপৌত্র’ প্রভৃতি শব্দের বিদ্যমানতাট বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকা সম্ভব প্রমাণ কবিতোছে।”†

বিধবাবিবাহের চেষ্টা যে ভারতবর্ষে, কিংবা বঙ্গদেশে এই নূতন নহে, তাহার প্রমাণ আরও বহুবিধ উপায়ে সংগৃহীত হইতে পারে, এ সম্বন্ধে রাজা বজ্রেন্দ্রের বর্তমান বংশধর মহোদয়গণের কয়েকজন একত্র হইয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

* এই ব্যাখ্যায় শেষ ভাগ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সে সময়ে কেবল বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল না, স্বামী বর্তমানে কোন কারণে পরম্পর বিচ্ছিন্ন একপক্ষের বিবাহ হইত।

† The most important word in the mantra is *didhishu*. In the *Ara-nyaka*, he accepts it in its ordinary well-established dictionary meaning of a man “who marries a widow, or the second husband of a woman twice married,” * * * “That remarriage of widows in Vedic time was a national custom can be easily established by a variety of proofs and arguments. The very fact of the Sanscrit language having from ancient times such words as *didhishu* ‘a man that has married a widow’ *parapuruṣu* ‘a woman that has taken a second husband’ *panmarbhana* ‘son of a woman by her second husband’ are enough to establish it.”

On the funeral ceremonies of the ancient Hindus. *The Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1870.

মহাশয় !

রাজা রাজবল্লভ তদানীন্তন সমাজ মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্ত বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নানাদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাও আনাইয়া ছিলেন। বিক্রমপুরনিবাসী কয়েকজন দ্বার্ত তট্টাচার্য্য রাজবল্লভের এ কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের অধ্যাপকমণ্ডলীর 'অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র পাইবার জন্য রাজা রাজবল্লভ কয়েকজন অধ্যাপককে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সদনে প্রেরণ করেন। তাহাতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী অন্যান্য প্রদেশীয় পণ্ডিতবর্গের প্রদত্ত ব্যবস্থার শাস্ত্রীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মন্ত্রণাকাল ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ সে ব্যবস্থা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে সাহসী হন নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্তে, বহু যত্ন সত্ত্বেও রাজা রাজবল্লভের প্রাণপণ চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। সার্কোডোম, বিদ্যাবাগীশ ও সিদ্ধান্ত, রাজা রাজবল্লভের এই তিন সভাপণ্ডিতের প্রথম দুই জন সহকারিতা করেন এবং শেষোক্ত পণ্ডিতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হস্তগত করিয়াছিলেন। এই জন্য সার্কোডোম ও বিদ্যাবাগীশ ও তাঁহাদের বংশধরেরা আজ পর্য্যন্ত রাজনগরসমাজে গেরূপ সমাদৃত, সিদ্ধান্ত ও তাঁহার বংশধরগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।

তৎপরে এই বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রসঙ্গে দ্বিতীশবংশাবলি চরিতে লিখিত আছে :—বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশের ভূদ্রসমাজে অত্য়পি এই 'প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে বিক্রমপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ স্বীয় তরুণবয়স্কা তনয়ার বৈধবা যত্নে যৎপরোনাস্তি ব্যথিতহৃদয় হইয়া, বিধবাবিবাহ প্রচলিত' সন্নিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থা পূর্বে পশ্চিম প্রকৃতি নানা অঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া, নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্ত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ তৎকালে ঢাকার প্রভুত কমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, যখন অল্প অল্প অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট অসুস্থ ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অসুস্থোধ করিলে, অনায়াসেই নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতসংগেরও নিকট ঐরূপ ব্যবস্থা পাইব। তাঁহার প্রেরিত পণ্ডিতেরা রাজবাটীতে উপনীত হইলে,

কৃষ্ণচন্দ্র অতীত আমদের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাদের প্রভুর অতীষ্ট সাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। তখনস্থব সভাস্থ ও নবদ্বীপস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে গোপনে রাজবল্লভের প্রেরিত বাবদা দেখাইলেন তাঁহারা ইহা পাঠ করগানস্তর কহিলেন, ‘এ বাবদা সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সম্মত।’ ইহা শ্রবণমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র নিরতিশয় ঈর্ষাদগ্ধচিত্ত হইয়া বলিলেন, ‘এ বাবদা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেও ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া রাজবল্লভকে নিরাশ করিতে হইবেক। একজন বৈষ্ণবজাতীয়, এই যে চির অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত কবিতা বাইবে, ইহা কোন মতেই সহনীয় নহে। কিন্তু এক্ষণে রাজবল্লভের যেকণ প্রভাব তাহাতে আমি তাঁহাকে কোনমতেই বিবর্ত করিতে পারি না, অতএব তাঁহার সম্ভাব্যার্থ আমি আপনাদিগকে এই ব্যবহার স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত, বৎসরোন্নতি অনুরোধ করিব, এবং আপনারা অসম্মত হইলে, আপনাদিগের প্রতি তাড়নাও করিব। আপনারা এত কহিবেন যে মহারাজ বা তাহারও অনুরোধে আমরা এক্ষণ বাবদা দিয়া পাপগ্রস্ত হইতে পারিব না।’

অনন্তর পরদিবস রাজবল্লভের পণ্ডিতেরা রাজার সভাস্থ হইলে রাজা নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন, বাজা রাজবল্লভ যে বাবদা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত হইবেক। যদি শাস্ত্রসম্মত নাও হয়, তথাপি যখন তিনি আমাকে ইহাব জ্ঞাত অনুরোধ করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে এ ব্যবহার স্বাক্ষর করিতে হইবেক। পণ্ডিতেরা রাজার পূর্ব নির্দেশানু-সারে, নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন কবিতা, উক্ত বাবদাতে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণ নিবাস হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রের চাহুরী বুঝিতে না পারিয়া এই নহং অনুষ্ঠানসাধনে ক্ষান্ত হইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ কালে গুপ্তকার নানা প্রকারে আক্ষেপ করিয়া ফুটনোটে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আচরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—মহারাজ শ্রীচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের প্রেরিত বাবদা পাঠ করিয়া বহু আক্ষেপ করিয়া কহেন, “গার, আমি কেন ইতিপূর্বে এ বিষয় সাধনে যত্নশীল হই নাই।”*

আমাদের নীরবে অরণ্যে রোদন করাই ভাল। ভারতের দম্ভতাপা ঈর্ষা-

* ১০৪৯ কালিকৈরচন্দ্র রায় প্রণত কিতাবঃশাবলিচরিত : ৫৫, ৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা।

পরায়ণতার প্রদর্শিত অধিকৃষ্ট চিরনিষ্কিন্ত হইয়াছে। রাজার রাজার বিবাহ করিয়া ভারতের রাজশক্তি ক্ষীণ ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছে; যে সামাজিক জীবন একতাপ্ত্রে অধিকতর সজীব হইয়া উঠিবে, দ্বীপপরায়ণতার উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরস্পরের সংগ্রামে সেই একতাজাত-সমাজ-শক্তির করে পরস্পরের চিরবিচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে, মহারাজ রুক্ষচন্দ্রের বিক্রমচরণ 'ও অমৃতাপ উভয়ই তাহার অত্যাচ্ছন্ন দৃষ্টান্ত স্থল। রাজা রাজবল্লভের সামাজিক পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা মহারাজ রুক্ষচন্দ্রের সহকারিতায় যে শতশ্রেণে প্রবল হইত এবং এই অশেষ কলাপকর অনুষ্ঠান অনতিবিলম্বে সামাজিক পদ্ধতিতে পরিণত হইত, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? প্রবল শক্তিপূঞ্জব পরস্পর সহকারিতায় যে কি অমৃত ফল উৎপন্ন হয়, বর্তমান ইংলণ্ড ও তাহার অধীন কূড় ও বৃহৎ রাজশক্তিনিচয়ের মিলিত উত্তম তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল, আর তাহাদেব পরস্পর সংঘর্ষণে কি বিষময় ফল ফলিয়া থাকে, বর্তমান ভারতসমাজ তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

বিভাগাগর মহাশয় যে সময়ে এই প্রশ্ন লইয়া বিব্রত, তখন দেশে অধ্যাপক-মণ্ডলী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও সাধারণ গৃহী লোকেরা বিধবাবিবাহ প্রচলনেব বিশিষ্টরূপ আনুকূল্য সর্বদাই অনুভব করিত। যখনই কোথাও কাহারও বালিকা কন্যা বিধবা হইয়াছে, তখনই সেট মোহের পুতুল কুদ্দকার্য কোমলাঙ্গীরা ভাবী দাক্ষণ দাবদাহ অবগ করিয়া কোমল-জন্ম স্ত্রীপুরুষ অঙ্গ-বারি মোচন করিয়াছে এবং তাহার বিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছে। কিন্তু সংসাহস ও উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে কেহ একরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিত না। বিশেষতঃ আমাদের দেশীয় লোকমণ্ডলী অদৃষ্ট-বাদের অধীন হইয়া অলস ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কোন প্রকার কাজে দীর্ঘকালব্যাপী আগ্রহ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন কাজে, প্রথম দিনের আগ্রহ দ্বিতীয় দিবসে বৃদ্ধি পাইয়া তৃতীয় দিবসে নির্মলপিত হইয়। এই জন্তই আমরা স্থির ভাবে কোন কার্য করিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিভাগাগর মহাশয়ের এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার দশবৎসর পূর্বে এই কলিকাতার বহুবাচার নিবাসী জনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি করেকজন বিধবা লোক বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজনকে লইয়া বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান

৫টার দলবদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু কাথাকালে অধিকনূব অগ্রসর হইতে পারেন নাট ।*

বিভাগাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কবিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠাবিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের প্রয়াসী হন । তাঁহার প্রতিষ্ঠাতারক বলেন, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহেব শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা পাঠবার জন্ত নববীপস্থ পণ্ডিত-গণীয় সভা আহ্বান করেন এবং পণ্ডিতগণ বিধবাবিবাহেব শাস্ত্রীয়তা স্বীকার কবিরায় সহস্রা লিখিত ব্যবস্থাপত্র দিতে সাহস করেন নাট । কিন্তু পবিশেষে ব্রাহ্মণ বিশিষ্টরূপ আগ্রহে অনুকূল হইয়া ব্যবস্থা দিতে সম্মত হন । ব্যবস্থা-এ পাঠবার অতি অল্পই বিলম্ব ছিল, এমন সময় বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় বারানগত নিবাসী বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহোদয়দিগের কড়ক পরিচালিত হইয়া কৃষ্ণনগরের নব্য সম্প্রদায় সভাসমিতি কবিরায় বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার কার্যে বক্রপরিণত হইলেন এবং সেই আন্দোলন স্রোতে সমগ্র নববীপ সমাজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল । বীণনগর (উলা) নিবাসী ভামদাব বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সদনবলে একরূপ বিপক্ষতায়গণ আনন্দ কাবলন , সমাজ সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া উঠা কঠিন হইল । তাঁহার প্রতিপক্ষতায় কৃষ্ণনগরে বিধবাবিবাহ প্রচলনচেষ্টা ক্রমে মল্লোভূত হইয়া আসিতেছিল, তাবসর কলিকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর বিধবাবিবাহবিষয়ক আন্দোলন প্রথম উপস্থিত কবিলেন ।

তৎকালেখিনী পত্রিকার গৌরব রবি যখন মধ্যাহ্ন অন্তিক্রম কাবিতছিল, তখন বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী তৎকালেখিনী প্রকাশের দিন গণনা কবিতেন, সেই সময় বিধবার বিবাহময়ীমুষ্টি সন্দর্শনে বিভাগাগর মহাশয়ের জন্ম নিৰ্গত তরল মনস্রোতে সেই মধ্যাহ্নস্রোত প্রদীপ্ত রশ্মিজাল পরিপ্রতিষ্ঠিত তৎকালেখিনীর ক্রোধ প্রাবিত হইয়াছিল । যে সকল প্রবন্ধ সে সময়ে লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষিতমণ্ডলীমধ্যে প্রমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল ।

এই সময়ে কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া কৃষ্ণনগরের এক

* মহোদয় শত্ৰুচন্দ্র প্রণীত জীবন চরিত ১১২ পৃষ্ঠা ।

সভার পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা ও বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকলের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাব বক্তৃতায় রুক্ষণগরে নূতন করিয়া আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। এদিকে তবু বোধিনীতে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথমে শিক্ষিত মণ্ডলী মধ্যে তৎপরে ক্রমে আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব ও বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের সমরঘোষণা প্রচারিত হইল।

অদৃষ্টবাদী ভাবতবাসীর অবসাদ কুস্কর্ষণের নিদ্রার জ্বালা। যদি সময়ে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে অনেক ফলপ্রদ শুভানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক সময়েই অকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সে উত্তম ও আগ্রহের ক্ষীণ রেখা সমাজ-সংগ্রামের উত্তপ্ত ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে না হইতে অদৃশ্য হয়। সংস্কারপ্রার্থী বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের সমর-সজ্জা সেরূপ অকাল নিদ্রাভঙ্গে আবদ্ধ হয় নাই। বহুদিন ধবিয়া চিন্তা করিয়া, বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া, বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, তৎপরে তিনি সমরাজ্ঞানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাব সহজ জ্ঞান ও সহজ বুদ্ধিতে বালিকা বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত বোধ হইলেও, তিনি যত দিন শাস্ত্রের প্রমাণ পান নাই, ততদিন সাধননিরত হইয়া কেবল শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে, শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিতেই নিযুক্ত ছিলেন। এই শাস্ত্র-সমুদ্র মন্বন করিয়া, কোন সত্য নিরূপণ কবা কি ভয়ানক কঠিন কার্য, তাহা সহজে অনুমিত হইবার নহে। বহু পুৰাতন কীটদষ্ট অপরিচ্ছন্ন হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে শাস্ত্রার্থ উদ্ধার কবা, বোধ হয় বাবণের প্রহরিনীবিরেষ্ঠিত অশাককাননবাসিনী সীতাব উদ্ধারসাধন অপেক্ষার্ত গুরুতর ব্যাপার, কিরূপ ধীরপ্রকৃতি হইলে, কি পরিমাণ সহিষ্ণুতা থাকিলে, একজন দিবারাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এইরূপ মহাসাধন নিরত নিযুক্ত থাকিতে পারেন, আমরা তাহা ধারণাই করিতে পারি না।

তিনিরাহি, এই সময়ে তিনি বিপ্রহরের সময়ে কেবল একবার বজ্রবর রাজকুমার বাবুর গৃহে আহার করিতে বাটতেন। কালেকের কার্য শেষ করিয়া অপরাহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কালেকের পুস্তকাসার পুস্তকরাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন এবং গ্রন্থ-কীটের দ্বারা পৃথিবী পড়ে পড়ে

বিচরণ করিতেন। "সন্কার পব কালোজের নিকটস্থ তাঁহার পুরন বন্ধু শ্রাম বাবু বাটী হইতে যৎকিঞ্চিৎ জল খাবার আসিত, কোন দিন বা কখনো কালের জন্ত নিজে গিয়া শ্রাম বাবুর বাটীতে জলযোগ করিয়া আসিতেন। এইরূপে বহুদিন কাটিয়াছে। শাস্ত্রাণোচনার এইরূপে নিয়ত নিষ্কৃত থাকার সময় একদিন রাত্রি শেষে একটা বিষয়ে শাস্ত্রাণের সঙ্কতি নির্ণয় কবিতেন। "পারিয়া ক্ষুদ্রমনে বাসায় যাইতেছিলেন, পথে সহসা প্রজ্ঞা দেবীর রূপা হইল, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া কুঁকিতে পারিলেন, ঐ প্রোকেয় অর্থ কিরূপ হইবে। তৎক্ষণাৎ ভাঙিত প্রবাহের জায় সেই পবিশ্রান্ত শরীরে ও কষ্টে মনে নূতন শক্তির সঞ্চয় হইল। তিনি গৃহে না গিয়া সংস্কৃত কালজে আগার ফিরিয়া আসিয়া পবিত্রাক্ত প্রোকেব অর্থ লিখিতে আবৃত্ত করিলেন। এইরূপ শাস্ত্র ১৮ করিতে কবিতেন রজনী শেষ হইল। প্রভাত স্মরণে মুহম্মদ প্রবাহিত হইয়া মন উহার অঙ্গস্পর্শ কবিল, প্রাতঃসূর্য্যোব কোমল কিরণ বেগা সকল মনে গোপনপথে তাঁহার পাঠাগারে পবিত্র হইয়া গািল, তখন তিনি গালাখান কবিলেন। এতদূর্নী ঐকান্তিকতা ন পারিল—“মমের মামন কিংবা শরীর পাতন” এইরূপ প্রতিজ্ঞা সহকারে জীবন উৎসর্গ না কবিলে কি কষ্ট কখন কোন কার্যে সিক্তমনোবৎ হইতে পারে? বিজ্ঞানসাগর মহাশয় নিদ্বাঙ্গাবনের অবসাদ সন্দর্শনে মনোহত হইয়া তাঁহার কলাগাধে শরীর মনপ্রাণ উৎসর্গ কবিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন উৎসর্গের অমৃতময় ফল ধরায় ফলিল, তিনি শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ কবিতেন করিতে পলাশব সন্তোষ :—

নষ্টে মূতে প্রব্রজিতে ক্লাবে চ পতিতু পতো ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারাগাং পতিরন্তো বিধায়তে ॥

মূতে ভর্তারি যা নারী ব্রহ্মচার্য্যে ব্যবাস্থতা ।

সা মূতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

তিশ্রঃ কোটোহঙ্ককোটী চ যানি লোমানি মানবে ।

তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি ॥

এই স্লোক তিনটা দেখিতে পাইলেন। এই স্লোক দেখার সঙ্গে সঙ্গে—উহার

অর্থ সজ্জিত সঙ্গ সঙ্গ তাঁহার জন্মের ও মনে এক বিচিত্র উল্লাস প্রকাশ পাইল । আনন্দে দিশাহারা হইলেন, গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পাড়াইলেন, “পাইয়াছি পাইয়াছি” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার বন্ধদের কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন “কি পাইয়াছ ?” বিজ্ঞানাগর মহাশয় প্রশংসিত কলমসদৃশ মুখভঙ্গিমায়া উত্তর দিলেন, যাহার জ্ঞাত্য এতদিন এতৎ ক্লেষ ভোগ করিতেছিলাম, আজ তাহা পাইয়াছি—পাইয়াছি :—

নাশে মূর্তে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতে ।

পঞ্চস্বাপংস্ত নারীণাং পতিরন্তো বিধীয়তে ॥

আজ বিজ্ঞানাগর মহাশয় অব আনন্দ ধবে না ! আজ আনন্দে ভগ্নমগ্ন আজ তাঁহাব সে বিশেষ জন্ম-বাবিধি বাক্য আনন্দে তবস্ত উঠিয়াছে, সে গাইব পালায় আজ তিনি নিজে নাহোরাবা ! তিনি যে রামানুজেন্দ্রের সতীন্দ্র নিবারণ বিষয়ক প্রতিজ্ঞাব জায় অর্পণ আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বাপবিধবাব ভ্রম-মোচনের উপায় কবিবেন, আজ তাঁহার সেই লক্ষ্যনিঃসঙ্গের পূর্ণীকায় পতিজ্ঞাপানের আশা-ফরোব প্রথম অভ্যাস দেখা দিয়াছে শাস্ত্র-মিষ্ট মন্তনে যে সত্য বহু উদ্ধৃত হইল, অচিনকালনধো তাহার দিগন্তব্যাপী আলোকচ্ছটা সম্মুখনে নোংরা মুখ হটাবে, হটাবে প্রবল পরাক্রমে লোক নির্ম্মার হটাবে এবং ভাবতবাসী শাস্ত্রানুশ্রবের অন্তবস্তী হইয়া তাঁহার জন্মের গভীর ভূমি বিধান করিবে ।

যখন শাস্ত্র সংগ্রহ হইল, যখন শাস্ত্র নির্ণয় হইল, তখন বিজ্ঞানাগর মহাশয় সেই শাস্ত্রানুশ্রবের চিহ্নি কবিয়া তাহার উপর সহজ জ্ঞান ও সুসূক্ষ্মতা অবলম্বনে এক গ্রন্থ রচনা করিলেন । সেই প্রথম গ্রন্থ তত বৃহদায়তন হই নাট । অল্পের মধ্যে নিত্যমু প্রয়োজনীয় কথাগুলি দিয়া বিধবাবিধাহে অবলুকতা সপ্রমাণ করিলেন । পুস্তক রচনা করিলেন বাট, কিন্তু এখন প্রচার করেন নাই । পুস্তক রচনা করিয়া সর্বত্র পিতার নিকট গেলেন পিতাকে গিয়া বলিলেন, “দেখুন, আমি শাস্ত্রানুশ্রব হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবাবিধাহের পঞ্চসমর্থনের জন্ত এই পুস্তকখনি প্রণয়ন করিয়াছি । আপনি কনিয়া এবিষয়ে আপুনার মত ন দিল, আমি ইহা প্রকাশ করিবে পাবিন

ঠাকুরদাস পুত্রকে বলিলেন, “যদি আমি এ বিষয়ে মত না দিই, তবে তুমি কি করিবে ?” জৈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, “তাহা হইলে আমি আপনকার জীবদশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না। আপনার দেহত্যাগের পর আমার যেকোন ইচ্ছা হইবে সেইরূপ করিব।” পিতা পুত্রকে বলিলেন, “আচ্ছা কাল একবার নিষ্কলন বসিয়া মনোব্যাগ সহকারে সমস্ত শুনিব, পবে আমার যা যা বক্তব্য তাহা বলিব।” পরদিন বিভাগাগর মহাশয় পিতার নিকট বসিয়া গ্রন্থখানি আত্মপাস্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন :—“তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা গিথিয়াছ তাহা সমস্ত শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে ?” পুত্র অমনি বলিলেন, “হাঁ, তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।” উদারজনর ঠাকুরদাস বলিলেন, “তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা কবিতো পার, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।” পিতার আদেশ পাইয়া বিভাগাগর মহাশয় পুনরুপলব্ধি জন্মসময় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “না, তুমি শুধু শাস্ত্র টান কিছু বুঝিবে না, আমি বিধবাবিবাহ স্বস্ব স্ব এই বহুখানি গিথিয়াছি, কিন্তু তোমার মত না পোয় এ বই আমি ছাপাইতে পারি না। শাস্ত্র বিধবাবিবাহের বিধি আছে।” সবলভাবে সৌম্যমুখে উন্নতমনা সহৃদয় জননী শ্রবণী দেবী অননি বলিলেন, কিছুমাত্র আপত্তি নাই, লোকের চক্ষুঃশূল, মল্লকায় অনঙ্গলেন চিহ্ন, ঘরের ঝগড়া হইয়া, নিরন্তর চাক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে, যাহাদের দিন কাটাতেছে, তাহাদিগকে সংসারে সুখী কবিবাব উপায় কবিব, এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তবে এক কাজ করিবে, যেন একে একজাকো বলিও না।” পুত্র বলিলেন, “কেন না বলিব না ?” জননী বলিলেন, “তাহা হইলে উনি বাবা দোষে পারেন। কারণ তুমি বিধবাবিবাহের গোলায়াল ভুলিলে ঐর অনেক কতি হইবার সম্ভাবনা।” বিভাগাগর মহাশয় বলিলেন, “বাবা মত দিয়াছেন।” বক্রাকর্ণিনী দেবী ভগবতী এই সংবাদ শুনিবামাত্র আরও দণ্ডবৎ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “তবে বেশ হয়েছে—তবে আর ভয় কি ?”

এইরূপে বিভাগাগর মহাশয় যখন পিতা মাতার অনুমতি ও সহায়ত্ব লাভ করিয়া বীরবেশে কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তঁক সেই সময় কি তাতার কিংবদন্তী পূর্বের কলিকাতার পটলডাঙ্গা মির্জার আমায়র, দাস (কলিকাতা) নিজের বালিকাকে বিবাহ করিয়া বিবাহ মিয়ার জন্ত তঁদুঁচাচা মহাশয়গণের নিকট

ব্যবস্থা প্রার্থী হইলে পর ৬ কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, 'ভবশঙ্কর' বিজ্ঞানস্ব, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, মুক্তারাম বিজ্ঞাবাগীশ প্রভৃতি কতিপয় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মিলিত হইয়া বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করিয়া যে ব্যবস্থা পত্র প্রদান করেন, তাহাব অবিকল প্রতিলিপি ও অনুবাদ এখানে প্রদত্ত হইল।

ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীহর্গা।

পরম পূজনায শ্রীযুত ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয়গণ সমীপেষু।

প্রশ্ন। নবশাখজাতায় কোন ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দ্রুত বিধবাম্বর ব্রহ্মচর্যাগ্নি অনুষ্ঠানে অক্ষম দেখিয়া পুনর্বিব অত্র পারে সমাপণ কবিবার বাসনা কবিতোছেন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে ইরূপ বিধবাব পুনর্বিব বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারব কি না আব পুনর্বিবাহানন্তর ঐ বালিকা দ্বিতীয় ভর্ত্তাব শাস্ত্রানুগত লীয়া হইবেক কি না এ বিষয়ে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আশ্রয় হয়।

উত্তর। মন্বাদিশাস্ত্রেণ নাবীণা পতিনবগানন্তরং ব্রহ্মচর্য্যসহমরণ পুনর্ভবনানামুত্তরোক্তব্যাপকর্ষণে বিধবাম্বরতয়া বিহিতত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্য-সহমরণ-রূপাঙ্ককল্পনায়ঃসমর্থয়া অক্ষতযোক্তাঃ শূদ্রজাতীয়মুত্তরভর্তৃকবালয়াঃ পাত্রান্তরেণ সহ পুনর্বিবাহঃ পুনর্ভবনরূপবিধবাম্বরত্বেন শাস্ত্রসিদ্ধ এব যথাবিধি সংস্কারাণ্যচ তত্ত্বাৎস্মিতীয়ভর্তৃভাষ্যাদ্ স্মৃতবাং শাস্ত্রসিদ্ধং ভবতীতি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিদাস্ততম্।

অত্র প্রশংসাম্। যুতে ভর্ত্তবি ব্রহ্মচর্য্যং তদম্বারোহণং বেতি শুদ্ধিতবাদি ধৃতবিকুবচনম্। যঃ পত্ন্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়ংজ্জয়া। উৎপাদয়েৎ পুনর্ভুং স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥ ইতি সা চেন্দ্রকৃতযোনিঃ স্ত্রাৎ গত্তপ্রত্যা গতাপি বা। পৌনর্ভবেণ ভর্ত্ত। সা পুনঃ সংস্কারমর্হতীতি চ মনুবচনম্। সা স্ত্রী যত্নকৃতযোনিঃ সত্যজ্ঞাপ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেণ ভর্ত্ত। পুন-বিবাহাৎ সংস্কারমর্হতীতি কুলকলটব্যাবধানম্। নোবাহিকেবু মনুসু নিয়োগঃ

কীৰ্ত্তিতে কচিং । নৃ বিবাহবিধাবুদ্ধ্যং বিধবাবেদনং পুনৰ্বিত্তি বচনস্ত
নবরাহা সপিণ্ডাৰ্হা ত্রিরা সমাভিবুদ্ধ্যঃ । প্রজ্ঞেন্দিতিধিগম্বা সন্তানস্ত
পৰ্বক্ৰয়ে ইতি নিয়োগমুপক্রম্য লিখনান্নিয়োগাঙ্গবিবাহনিষেধপৰং ন সামান্ধতো
বিধবাবিবাহ-নিষেধকমন্তথাপুনৰ্ভবণপ্রতিপাদকবচনয়োৰ্ণিবিষয়ত্বাপত্তি-বিত্তি দস্তা-
শৈব কন্যায়াঃ পুনৰ্দানং পরস্ত চেত্বাহাহতবৃত্ততব্ধরাঙ্গদীৰবচনং দেববেণ
সুতোংপত্তিৰ্দত্তকন্যা । প্রদীৰ্যতে ইতি তক্তাদিত্যপুবাণীৰবচনঞ্চ সময়ধৰ্ম-
প্রতিপাদকস্তরা ন নিত্যবদনুষ্ঠাননিষেধকম্ । সত্যামপাত্ত বিপ্রতিপত্তৌ
প্রকৃত্তেৎকৃত্তযোন্যাঃ পুনৰ্বিবাহস্ত প্রকৃত্তত্বাৎ দেববেণ সুতোংপত্তিৰানগ্রহাশ্রম-
গ্রহঃ । দস্তকতারাঃ কন্যায়াঃ পুনৰ্দানং পরস্ত বৈ ॥ ইতি মদনপারিজাতবৃত্ত-
বচনেন সহ তন্ত্বেবেকবাক্যেৎকৃত্তযোন্যা বালায়াঃ পুনৰ্বিবাহং ন তে প্রতিষেদ্ধুঃ
ৎকৃত্তঃ প্রকৃত্তাৎ কৃত্তযোন্যা বিবাহনিষেধকস্তরা) ব্যতিবেকমুথেনাকৃত্তযোন্যাঃ
পুনৰ্বিবাহমেব স্তোত্তরত ইতি ।

| | |
|-----------------------|--------------------|
| জগন্নাথঃ পরণম্ । | রামচন্দ্রঃ পরণম্ । |
| ঈ কামিনাথ পরণম্ । | ঈশ্বরকাম পরণম্ । |
| ঈ বিবেকরাজ পরণম্ । | ঈহবিঃ পরণম্ । |
| ঈ ভবনকর পরণম্ । | ঈঠাকুরদাস পরণম্ । |
| ঈ রামঃ পরণম্ । | ঈ কামিনাথঃ পরণম্ । |
| ঈ বামঠমু দেবপৰণম্ । | ঈ মধুসূদন পরণম্ । |
| ঈ বিধাঃ । | ঈ শঙ্করঃ পরণম্ । |
| ঈ ঠাকুরদাস দেবপৰণম্ । | ঈ শঙ্করঃ পরণম্ । |
| ঈ রমণীয়া দেবপৰণম্ । | ঈ ভবনাথ পরণম্ । |

ব্যবস্থার অনুবাদ ।

প্রশ্ন ।—নবশাখজাতীয় কোনও ব্যক্তির এক কন্যা, বিবাহিষ্ঠা হইয়া
মৃত বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে । ঐ ব্যক্তি, আপন কন্যাকে
৫০০ বিধবামুদ্র ব্রহ্মচর্যাতির অনুষ্ঠানে অক্ষমা দেখিয়া পুনর্বার অন্য পাত্রে সমর্পণ
করিবার বাসনা করিতেছেন । এ স্থলে বিজ্ঞাত এই, ব্রহ্মচর্যাশ্রমানে অসমর্থ
হইলে, ঐক্লপ বিধবার পুনর্বার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না ; আর,

পুনর্বিবাহানন্তর, ঐ বালিকা দ্বিতীয় ভর্তার শাস্ত্রানুসৃত ভাৰ্য্য হইবেক কিনা ; এ বিষয়ে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আত্মা হয়

উত্তর ।—নহু প্রভৃতির শাস্ত্রে, স্ত্রীলোকের পতিবিরোধের পর, ব্রহ্মচৰ্য্য, সহমরণ, ও পুনর্বিবাহ, বিধবাদিগের ধৰ্ম্ম বলিয়া বিহিত আছে । সুতরাং, যে শূদ্রজাতীয় অক্ষতঃশ্রমি বিধবা ব্রহ্মচৰ্য্য ও সহমরণরূপ দুই প্রধান কৰ্ম অবলম্বন করিতে অক্ষম হইবেক, অন্য পাতকের সঙ্ঘিত ভাৰ্য্য পুনরায় বিবাহ অবশ্য শাস্ত্রসিদ্ধ, এবং যথাবিধানে বিবাহ সংস্কার হইলে, সেই স্ত্রী দ্বিতীয় পতির স্ত্রী বলিয়া পবিত্রগণিত ও স্মরণ্য শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে । ধৰ্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত-দিগের এই মত

এ বিষয়ে প্রমাণ—দুহিতে ভর্তার ব্রহ্মচৰ্য্যং তদন্বারোহগং বা ।

ভুক্তিত্বপ্রভৃতিত্ব বিজ্ঞানচন

পতিবিরোধ হইলে ব্রহ্মচৰ্য্য কিংবা সহমরণ

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া ।

উৎপাদয়েৎ পুনৰ্ভূত্বা স পৌনৰ্ভব উচ্যতে ।

স। চেষদক্ষতয়োনিঃ স্তাদ্ গতপ্রত্যাগতাপি বা ।

পৌনৰ্ভবেন তৰ্ত্ত্ব। সা পুনঃ সংস্কারমৰ্হতি ।

মন্তব্যচন

যে নারী, পতি কষ্টক পবিত্রত্যাগ, অথবা বিধবা হইয়া, স্বৈচ্ছাক্রমে পুনরু হয়, অথবা পুনরায় অন্য বাক্যিক বিবাহ করে, তাহার গার্ভ যে পুত্র জন্মে, তাহাকে পৌনৰ্ভব বলে । যদি সেই স্ত্রী অক্ষতঃশ্রমি, অথবা গত-প্রত্যাগত হয়, অথবা পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, তবে পুনরায় পতিগত হইলে, তাহার পুনরায় বিবাহ হইলে পুনঃ

স। স্ত্রী মন্ত্যক্ষতয়োনিঃ সত্যন্যমাত্রয়েৎ তদা তেন

পৌনৰ্ভবেন তৰ্ত্ত্ব। পুনর্বিবাহাখ্যং সংস্কারমৰ্হতি ।

কষ্টক তটের বাখ্যা ।

সেই স্ত্রী যদি অকৃতবোনি হইয়া, অল্প ব্যক্তিকে আশ্রয় কবে, তাহা হইলে, ঐ দ্বিতীয় পতির সন্তিত সেই স্ত্রীর পুনরায় বিবাহসংস্কার হইতে পারে ।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্ৰেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে কচিৎ ।

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥

মহুৰচন ।

বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্ৰের মধ্যে, কোন স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এবং বিবাহ বিধি স্থলে বিধবার বিবাহের উল্লেখ নাই ।

এই যে বচন আছে, তদ্বারা, নিয়োগের অল্প যে বিবাহ, তাহাই নিষেধ হইতেছে ; কারণ, নিয়োগ প্রকরণ আবশ্য করিয়া, এই বচন লিখিত হইয়াছে নতুবা, সামাজ্যতঃ বিধবাবিবাহের নিষেধক নহে । যদি বিধবাবিবাহের নিষেধক হয়, তাহা হইলে, যে দুই বচনে স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহের বিধি আছে, সে দুই বচনের স্থল থাকে না ।

দত্তাস্মাশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরম্ভুচ ।

উদ্ধাত্তবদুত বহুলাবলীঃ বচন ।

দত্তা কন্যার পুনরায় অল্প পায়ে দান ।

দেবরেন স্নতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে ।

উদ্ধাত্তবদুত আদিত্যপুত্রাবচন ।

দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, দত্তা কন্যার দান ।

এই দুই বচন সমরসম্মতবোধক, একবারেই বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক নহে । এমনি এই শ্রীমাংসায় আপত্তি থাকে, তথাপি মননপারিজাতদুত—

দেবরেন স্নতোৎপত্তির্বানপ্রস্তুতশ্রমগ্রহঃ ।

দত্তকতারাঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরম্ভুচ বৈ ।

দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, বাৎসর্যশ্রমগ্রহণ, বিবাহিতা কৃতবোনি কন্যার অল্প পায়ে পুনর্দান ।

এই বচনের সঠিত একবাক্যতা করিলে, ঐ দুই বচন 'অক্ষতযোনি কজ্জার পুনর্জিবাধ নিবারণ করিতে পারে না; বরং মদনপারিজাতবৃত্ত বচন, ক্ততযোনিব দিবাহ নিষেধ দ্বারা, অক্ষতযোনির পুনর্জিবাহের বোধকই হইতেছে।

উক্ত ব্যবস্থা পদ সংবৃত্ত কালেজেব অধ্যাপক মুক্তারাম বিজ্ঞানাগরশের নিজের রচিত ও সংস্কৃত লিখিত। কিছুদিন পরে তার রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে আহৃত এক সভায় বহুসংখ্যক অধ্যাপক সম্মুখে নবরূপাগত স্মৃতি ৬৩৩জন্য বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়ের সঠিত বিচারে আক্ষরকারীদিগের অন্ততম ৬৩৩জন্য বিজ্ঞানরত্ন বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনে কবী হইয়া রাজবাটীতে এক জোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কিন্তু কালেজের বেলায় ৬৩৩জন্য বিজ্ঞানরত্ন মহাশয় পুরস্কার প্রাপ্ত শালের জোড়া গায়ে দিয়া বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সহায়তা করিয়াছেন। মুক্তা-রাম বিজ্ঞানাগর মহাশয়ও বিজ্ঞানরত্ন প্রদর্শিত পক্ষে এক এক পা কবিতা অল্পসব হইতে অধিক বিলম্ব করেন নাট। বিজ্ঞানাগর মহাশয় তাঁহার বিধবাবিবাহ বিবয়ক গ্রন্থে বিজ্ঞাপনে গণ্য হইতে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :—“শ্রীযুক্ত বাবু প্রমোদচরণ দাস বিমলা লোক, শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। তিনি শ্রীযুক্ত ৬৩৩জন্য বিজ্ঞানরত্ন পর্যাট পুরস্কার ৬৩৩জন্য মহাশয়দিগকে ধর্মশাস্ত্রের নামাসক জানিয়া তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা প্রার্থনা কবিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাও, সেই প্রার্থনা অনুসারে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। যদি বিধবাবিবাহ বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাঁহাদের বোধ থাকে, অথচ * * * শাস্ত্রের বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথার্থ ৬৩৩জন্য কর্ম করা হয় নাট। আর যদি বিধবাবিবাহ বাস্তবিক শাস্ত্রসম্মত কর্ম বলিয়া বোধ থাকে, এবং সেই বোধ অনুসারেই অবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া, ইহা যের বিবেচনা পদশ্রম করাও যথার্থ ভ্রমের কর্ম হইতেছে না।

যাহা উক্ত অক্ষতযোনির বিষয় এট যে, বাঁজা দেব এটরূপ রাস্তি সেই মহা-পুরুষবাই এদেশে ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসাকর্তা এবং তাঁহাদের বাক্য ও ব্যবস্থার অন্য কবিতাট এ দেশের লোকদিগকে চলিতে হয়।

ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার অধ্যাপকগণের এইরূপ আচরণ দেখিয়া উত্তরকালে

বিভাসাগর মহাশয় গভীর ক্রোধের সহিত বলিতেন, “আমি অরণ্যে স্নান করিতেছি, আমার বিশ্বাস ছিল যে, এ দেশের লোক শাস্ত্রানুগত, কিন্তু শেষে দেখিলাম, এ দেশের লোক শাস্ত্র মানিয়া চলে না, লোকাচারই ইহাদের ধর্ম।” বিভাসাগর মুহাশয়ের শিষ্যের বলিয়াছিলেন, “বাবা, ধরিবার পূর্বে ভাবা ও বুঝা উচিত, যখন বুঝে ধরেছ, তখন ছেড় না, কথার ও কাজে যেন মিল থাকে।” যেমন বাপ তেমনি ছেলে, কোন কাজে হাত দিয়া ঠাকুরদাস কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না। ছেলেটাকেও ঠিক সেই ধরণেব মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমাদের দেশ এমন বাপের এমন ছেলের সংখ্যা বাড়িবে না কি ?

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ প্রচার করিবারাত্র ভারতবর্ষের সর্বত্র অম্বিকাও উপস্থিত হইল। সৈন্তসহ নেপোলিয়ানের বিচরণে সমগ্র ইউরোপ যেমন বিপদাশঙ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সমগ্র ভারতবর্ষও সেইরূপ বিভাসাগর মহাশয়ের এই সংস্কার-সংগ্রামে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। সর্বত্র বিভাসাগর ও বিধবাবিবাহের আলোচনা হইতে লাগিল। কতদিক্ হইতে প্রতিবাদ আসিতে লাগিল, কত লোক গ্রন্থ রচনা করিয়া বিভাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগের ভ্রম প্রমাণ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাঠিতে লাগিলেন, কিন্তু বিভাসাগর মহাশয়ের প্রতিভা প্রসূত প্রসঙ্গত শাস্ত্র বাখ্যার কুবধারে প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধিজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, ঐ সকল বিপক্ষপক্ষের কূট তর্কের মীমাংসা করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে দ্বিতীয়বার বৃহদাকারে বিধবাবিবাহ গ্রন্থ প্রচার করেন।

উল্লিখিত বিধবাবিবাহ গ্রন্থের নানা স্থানে যে বিচার-নৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার কোন কোন স্থান পাঠকের নৃপি বিধানের অজ্ঞ প্রথানে উদ্ধৃত করা যেন।

নষ্টে মৃত্যে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পর্তো ।

পঞ্চম্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্তো বিধীয়তে ॥

মৃত্যে তর্কসি য়া নারী ব্রহ্মচর্যো ব্যবস্থিতা ।

স্য মৃত্যু লভতে স্বর্ণং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

তিত্ৰঃ কোটোহর্দকোটি চ যানি লোমানি মানবে ।

তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি ॥

“স্বামী অনুদেশ হইলে, মরিলে, ক্রীষ হির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে, স্বামীদিগের পুনর্জন্মের বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী, স্বামীব মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারীদিগের জ্ঞায় স্বর্গলাভ করে। মনুস্মৃতিব্রীকে যে সাক্ষিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসমকাল স্বর্গে বাস করে।”

পরশরসংহিতা কলিকালে লোক যাত্রা নির্ভারের প্রধান অবলম্বন। হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রমার্গাবলম্বী গৃহীদিগের পক্ষে এই পরশর সংহিতাই প্রধান অবলম্বন। ভারতচূড়ামণি মহাশয় বাস পরশরসংহিতাকেই কলিযুগের সহজ ধর্ম পালনের প্রধান সঙ্গরূপে উল্লেখ কবিরাজেন। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের যে সকল সংহিতা আছে, তৎসমুদায়-পূর্ব পূর্ব যুগের জন্ত বচিষ্ঠ। কলিযুগের সহজসাধ্য ধর্মপথ-প্রদর্শক মহাশয় পরশর। উপরোক্ত শ্লোকের যে স্বাভাবিক সহজ ও সবল অর্থ সাধিত হইতে পারে, তাহার বিপর্যয় বুটাইবার জন্ত বিভাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক অনেকগুলি অধ্যাপক এমন কি, কোন কোন বিষয় লৈক ও প্রাণপণ চেষ্টা কবিরাজেন। বিভাসাগর মহাশয় এই সকল পণ্ডিতদিগকে যেরূপে পরাজিত করিয়াছেন, বেরূপ শ্লোকের পব শ্লোক ধবিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কি উচ্চৈঃ কোন শ্লোকের সৃষ্টি এবং ঐ সকল মহাশয়ের দ্বারা সে সকলের কিরূপ অজ্ঞাতার্থ সংসিদ্ধিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাহার বুটাই-বার পদ্ধতি এত সহজ ও সুন্দর যে, যে ব্যক্তি লেখা পড়া কিছুই জানে না, তাহাকেও উক্ত গ্রন্থাবলম্বন সমস্ত কথা বেশ বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পরশরসংহিতার বিবাহবিধি নিম্নোক্তের সময়ে উপরোক্ত যে শ্লোকের উল্লিখ রহিয়াছে, তাহার ভিত্তিতে সাধনের জন্ত এবং সাধারণ লোককে তাহার অর্থ প্রকার তাৎপর্য বুঝাইবার জন্ত তিনি বহু অধিক প্রয়াস পাঠিয়াছেন, তিনিই বিভাসাগর মহাশয়ের প্রতি তত অধিক মাহাত্ম্য কটকটি প্রয়োগ ও তাহার বিক্রম বিক্রম ও মনিন রহস্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু

এইরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচারস্থলে বেক্রপ ধীরতা ও শাস্ত্র ভাব অবলম্বন করা আবশ্যিক, বিভাগাগর মহাশয় তাহা হইতে বিন্দু মাত্র বিচলিত হন নাই। প্রমাণ স্থলে এক স্থান উদ্ধৃত করা গেল :—

“কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল মহাশয়ের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কি প্রণালীতে এইরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্টরূপে অবগত নহেন। কেহ কেহ ‘বিধবাবিবাহ’ শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ক্রোধে অধৈর্য হইয়াছেন এবং বিচার কালে দৈর্ঘ্য লোপ হইলে, তত্ত্বনির্ণয়কালে যে অল্পদৃষ্টি থাকে, অনেকের উত্তরেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, যথার্থ অর্থার্থ বিচারে পরাধ্ব্য হইয়া কেবল কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে অতিপ্রায়ে তরুণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার সফল হইয়াছে, বলিতে হইবেক। যেহেতু, এতদ্বন্দ্বীয় অধিকাংশ লোককেই শাস্ত্রজ্ঞ নহেন; সুতরাং শাস্ত্রীয় কথা উপলক্ষে চুই পক্ষে বিচার উপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষীয় সমান প্রয়োগের বলাবল বিবেচনা করিয়া তথ্যাত্থা নির্ণয়েও সমর্থ নহেন। তাঁহারা যে কোন প্রকার আপত্তি দেখিলেই সংশয়াক্রান্ত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ অনেকেই আমার লিখিত প্রস্তাব পাঠে করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; পরে কয়েকটি আপত্তি দর্শন করিয়াই ঐ বিষয়কে একবারেই নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অধিকন্তু বিবরী লোকেরা সংশ্লিষ্টজ্ঞ নহেন; সুতরাং সংশ্লিষ্ট বচনের অর্থ অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের বোধার্থে ভাষ্য অর্থ লিখিয়া দিতে হয়। সেট অর্থের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহারা তথ্যাত্থা নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই সুযোগ দেখিয়া অনেক মহাশয়ই স্বীয় অভিপ্রেত সাধনার্থে, অনেক স্থলেই স্বল্পবৃত্ত বচনের বিপরীত অর্থ লিখিয়াছেন, এবং সংশ্লিষ্টানভিষ্ট পাঠকবর্গও তাঁহাদের লিখিত অর্পকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবিষয়ে তাদৃশ পাঠকবর্গকে দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ, কোনও ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া চল ও কোমল অবলম্বনপূর্ব্বক, সুনিবাক্যের বিপরীত বাখ্যা লিখিয়া, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে অনান্যাসে ও

অক্ষুণ্ণচিত্রে প্রচার করিবেন, কেহ আপাততঃ একপ বোধ করিতে পারেন না।

অধিক আশঙ্ক্যের বিষয় এই যে, উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাসসরসিক ও কটুক্তিপ্রিয়। এদেশে উপহাস ও কটুক্তি যে ধর্মশাস্ত্র-বিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্বে আমি অবগত ছিলাম না। বাহা ইউক, সকলের এক প্রকার প্রগতি নহে; সুতরাং সকলেই এক প্রণালী অবলম্বন করেন নাট। প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য প্রগতিভেদের প্রধান কারণ। কিন্তু, একপ গুরুত্ব বিষয়ে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রণালী ভেদ অবলম্বন না করিয়া, যেকোন বিষয় তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাট প্রের্যকর ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এহ যে, ঐহার উত্তরে যে পরিমাণে পরিহাস বাক্য ও কটুক্তি আছে, ঐহার উত্তর সেই পরিমাণে অনেকের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। অনেকের এবং ঐহ উত্তরদান প্রণালী দর্শনে আমার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। কিন্তু একটি উত্তর পাঠ করিয়া, আমার সকল ক্ষোভ এককালে দূরীভূত হইয়াছে। উল্লিখিত উত্তরে লেখকের নাম নাট, এক বব ঐ উত্তর দিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। এহ বর বয়সে বুদ্ধ ও সর্বত্র সর্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও উত্তরপুস্তকে মধ্যে মধ্যে উপহাসসরসিকতা ও কটুক্তি প্রিয়ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্মশাস্ত্র বিচারে প্রস্তুত হইয়া, বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও কটুক্তি প্রয়োগ করা এ দেশে বিজ্ঞব লক্ষণ। অবিকল্পে লক্ষণ হইলে, ঐহাকে দেশতক লোক একবাক্যে চটয়া, সর্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া ব্যাখ্যা কবে, সেই মহানুভব বুদ্ধ মহাশয় কখনও ঐ প্রণালী অবলম্বন করিতেন না।

কিন্তু যিনি যে প্রণালীতে উত্তর প্রদান করুন না কেন, আমি উত্তরদাতা মহাশয়দিগের সকলের নিকটই আপনাকে বৎপরোনাস্তি উপরূত স্বীকার করিতেছি, এবং তাঁহাদের সকলকেই যুক্তকার্ত্তে সহস্র সাধুবাদ দিতেছি। তাঁহারা পরিভ্রম স্বীকার করিয়া উত্তরদানে প্রবৃত্ত না হইলে, ইহাই প্রতীয়মান হইত, এতদঞ্চলীয় পণ্ডিত ও প্রধান মহাশয়েরা প্রস্তাবিত বিষয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরদান দ্বারা অন্ততঃ ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এই প্রস্তাব একপ নহে যে, একবারেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া নিশ্চিন্ত

থাকা যাইতে পারে । তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর না দিয়া মিথিত থাকিলে, আমি কত কোভ পাইতাম, বলিতে পারি না । তাঁহারা আমার লিখিত প্রস্তাবকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে পারে, সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান সহকারে স্ব স্ব পুস্তকে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন । যখন নানা ব্যক্তিতে নানা প্রণালীতে যত্ন করেন, আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তখন বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা পক্ষে বাহ্য কিছু বলা যাইতে পারে, তাহার এক প্রকার শেষ হইয়াছে, বলিতে হইবেক । এক্ষণে, সেই কয়েকটি আপত্তির মীমাংসা হইলেই কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় কি না, সে বিষয়ের সকল সংশয় নিবাকৃত হইতে পারিবেক ।”

)

এক্সে পরাশর-সংহিতার শ্লোক তিনটির যত প্রকার বিভিন্ন পাঠ দেওয়া হইয়াছে এবং বিভাগাগর মহাশয় তাহার যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি । কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান-সমূহের দশ জন অধ্যাপক মিলিত হইয়া এই মীমাংসা প্রচার করেন যে, পরাশর-সংহিতার বিবাহ-বিষয়ক বচনের অভিপ্রায় এট যে, যদি বাগ্দত্তা কস্তার বরের অনুদ্দেশাদি হয়, তাহা হইলে তাহার পুনরায় অস্ত্র বরের সহিত বিবাহ হইতে পারে, নতুবা নিবাহিতা, বিধবা প্রভৃতি দ্বীর পুনর্কীর বিবাহ হইতে পারে, এক্ষণে অভিপ্রায় কদাচ নহে । বিভাগাগর মহাশয় এই আপত্তি খণ্ডন হইলে বলিয়াছেন :—“বিবাহিতার পক্ষ প্রকার বিপৎপার্শ্বে পুনর্বিবাহের বিধানই উক্ত শ্লোকের স্বাভাবিক সৰল অর্থ । কষ্টকল্পনা দ্বারা শব্দের অর্থান্তর করনা না করিয়া অভিপ্রায়ান্তর প্রতিপন্ন হইতে পারে না । ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য বিধবাবিবাহের বিষয়ে হইয়াও পরাশরের উপলব্ধি বচনকে বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা দ্বীর বিবাহ বিষয়ক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন । তথা :—

“পর্যবেক্ষণ ও পর্যাখ্যানের দ্বারা প্রসঙ্গক্রমে কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীবিধের পুনর্কীর বিবাহের বিধি দেখাষ্টয়াছেন, (১) পুনর্কীর বিবাহ না করিয়া

(১) পরিবেক্ষণমাত্ৰং নাঃ স্ত্রীবিধ ইয়াং পুনর্কীরস্তাপি এসম্বাৎ কচিদভ্যাসুজাঃ পর্যবেক্ষিতং নহে কুঃ ইত্যাদি ।

ব্রহ্মচর্যব্রতের অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইয়াছেন, (১) সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল দেখাইয়াছেন, (২) পরাশর বচন মাধবাচার্য্যের মতে বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ বিধায়ক না হইলে, তিনি বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে অধিক ফল, পরবচনের একরূপ আভাস দিতেন না; কারণ, পূৰ্ণ বচন দ্বাৰা বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধি প্রতিপন্ন না হইলে, বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কবিলে, অধিক ফল, পর বচনের এই আভাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?”

তৎপরে বাগ্‌দত্তার বিবাহবিধি না হইয়া বিবাহিতা, বিধবা প্রভৃতির সম্বন্ধে যে ঐ শাস্ত্রবচন প্রযুক্ত্য তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ স্থলে বিজ্ঞানসাগর মহাশয় দেখাইতেছেন :—“নাবদ সংতিতা দৃষ্ট কবিলে, ‘নষ্টে মৃত্যে প্রব্রজিতে,’ এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাগ্‌দত্তা বিষয়ে কোন ক্রমে সম্ভবিত্তে পারে না, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক। যথা :—স্বামী অনুন্মিত হইলে, নবিলে, স্ত্রী বস্ত্র পরিহৃত হইলে, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রবিহিত। স্বামীর অনুন্মিত হইলে, ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা কবিলে, স্ত্রীর যদি সম্ভব না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর ইত্যাদি। (৩) * * * এই বচনে স্বামীর অনুন্মিত হওয়া প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈশিষ্ট্য ঘটিলে, স্ত্রীদিগের পক্ষে পুনর্বিবাহ বিধি আছে, তাহা কোনও মতে বাগ্‌দত্তা বিষয়ে সম্ভবিত্তে পারে না। কারণ অনুন্মিত স্থলে, সম্ভব হইলে একপ্রকার কালনিয়ম, আর সম্ভব না হইলে, আব এক প্রকার কাল নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। বাগ্‌দত্তা বিষয়ে এই বিবাহবিধি হইলে, সম্ভব হওয়া না হওয়া, এ অর্থাৎ উল্লেখ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?”

(১) পুনর্বিবাহবিধি। ব্রহ্মচর্য ব্রত অনুষ্ঠানে দেখাইয়াছেন যে ‘মৃত্যে ভর্তার বা নারী’ ইত্যাদি।

(২) ব্রহ্মচর্য্যাদি অধিক ফলব্রতগমনে বর্ণনিত চিত্রঃ কোটোহরকোজী চ বানি লোমানি” ইত্যাদি। বিধবা বিবাহ গ্রন্থ ২২ পৃষ্ঠা।

(৩) “নষ্টে মৃত্যে” ইত্যাদির পর

স্বামী বসন্তোপলব্ধ ব্রাহ্মণী প্রোষিতা পতিতঃ।

এ প্রকৃত্য তু চারি পরতোহন্তঃ সমাক্রান্তঃ।

ইত্যাদি বিধবা বিবাহ গ্রন্থ, ২৬ পৃষ্ঠা।

“নারদ-সংহিতা ও পরাশর সংহিতা এক সময়ের শাস্ত্র নহে, একখানি সভ্যবৃক্ষের অপরিধানি কলিযুগের শাস্ত্র । একপাত্রে যে আপত্তি উত্থাপন হইতে পারে, বিজ্ঞানসাগর মহাশয় তাহার খণ্ডনার্থে বলিয়াছেন :—“এ বিষয়ে আমাব বক্তব্য এই যে, নারদ-সংহিতা সভ্যবৃক্ষের শাস্ত্র, স্বার্থ বটে । কিন্তু নারদ বচনে যে কয়েকটি শব্দ আছে, পরাশর বচনেও অবিকল সেই কয়েকটি শব্দ আছে ; সুতরাং নারদ-বচন দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক, পরাশর বচনদ্বারাও অবশ্য সেই অর্থই প্রতিপন্ন হইবেক । ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, যুগভেদে অর্থভেদ হয় । সভ্যবৃক্ষে যে শব্দের যে অর্থ ছিল, কলিযুগেও সেই অর্থই থাকিবেক, সন্দেহ নাই । সুতরাং, নারদ বচনে ও পরাশর-বচনে যখন শব্দার্থে ঝিকুবিবর্গও ব্যত্যয় নাই, তখন অর্থার্থেও কোন ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না । ফলতঃ ‘নষ্টে মৃত্যে প্রব্রজিতে’ এই বচন উভয় সংহিতাতেই একরূপ আছে, সুতরাং উভয় সংহিতাতেই নিঃসন্দেহ একরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইবেক, তদ্বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি করিতে উদ্যত হওয়া কেবল অপ্রতিপত্তি-লাভ-প্রয়াস মাত্র । অতএব ‘নষ্টে মৃত্যে প্রব্রজিতে’ এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাণেশ্বর কল্পা বিষয়ে ঘটিতে পারে না, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে ।”

আমাদের এক বন্ধু একবার কোন এক সভায় একটী প্রবন্ধপাঠকালে ক্ষুদ্র অঞ্চল স্বন্দর একটী গল্প কবিতাছেন । এক ব্যক্তি পথে বসিয়া বন্ধু করাস্বাত করিয়া রোমন করিতেছে দেখিয়া এক পণ্ডিত তাহাকে জিজ্ঞাসিল, ‘ভাই কীদিতেছ কেন ?’ সে বলিল, ‘আমার গরীব হোসেন মরিয়াছে ।’ আগন্তুক সেই এট কথা শুনি, অমনি নিজের কোন অন্তঃকরণে মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে বেন কাতর হইয়া কীদিতে কীদিতে গৃহভিত্তিতে চলিল । পথে আর একজননের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর, সে ব্যক্তি কাতরদ্বয়ে গরীব হোসেনের ‘মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া বহুতর বিলাপ করিতে লাগিল, সে ব্যক্তিও তখন কীদিতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে যখন অনেকগুলি লোক কীদিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কোন এক বুদ্ধিমান লোক গরীবহোসেনের মৃত্যুসংবাদ শুনিবামাত্র ‘হা হতান’ না করিয়া, ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ‘ভাই, বাছার শোকে তুমি এত কাতর হইয়াছ, সে ব্যক্তি তোমার কে হয় ?’ তখন শোকার্ত ব্যক্তি বলিল, ‘আমার কেহই নহে,’

তখন প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'সে ব্যক্তি কার কে হয় ?' উত্তরদাতা পুনরপি বলিল 'তাও জানি না' । তখন প্রশ্নকর্তা বলিল, 'তবে কীদিতেছ কেন ?' তখন সেও ব্যক্তি কায় থামাইয়া বলিল 'ভাই, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমার কীদিবার আগ জানা উচিত ছিল যে, যে মরিয়াছ সে কে ? এখন জানিয়া আসিতেছি ।' তখন ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শেষ সেই পথপ্রান্তে উপবিষ্ট শোকার্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তাহার অতি আদরের গরিবহোসেন তাহার পোষাবর্গভূক্ত একটা বলীবন্ধ । তদ্রূপ বর্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দু আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী বহুসংখ্যক লোক, ধর্মশাস্ত্র ও সনাত্যাবর বিপরীত পথে চলিয়াও, গর্ভভরে ধর্মশাস্ত্রের সীমাসক ও সাখ্যাকাব বলিয়া সম্মানিত ও স্বধর্মনিরত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন । এই শ্রেণীর লোকদিগের সমক্ষে নতমস্তক হওয়া এবং চহাদিগকে সম্মানন গ্ৰহণ করা কি তাঁহাদের পক্ষে গরিব হোসেনের বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়া নহে ?

শাস্ত্র ও অনাক । ব্যাকরণ শাস্ত্র, কাব্য শাস্ত্র, সাহিত্য শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, অখণ্ড শাস্ত্র, পুৰাণ শাস্ত্র, সাহিত্য শাস্ত্র, উপনিষদ শাস্ত্র, বেদ শাস্ত্র, দেবনাগরী অক্ষর সংস্কৃত ভাষার গহ্ব কিচু লিখিত হইয়াছে, সমস্তই শাস্ত্র । ইটুক, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহা গদ গদ হইবার পূর্বে কি একটাবার কোন শাস্ত্রের ব্যক্তিক জিজ্ঞাসা করিয়া জানা উচিত নহে, কোনটা প্রামাণ্য আর কোনটা অপ্রামাণ্য, কোনটা সঙ্গত আর কোনটা অসঙ্গত, কোনটা শাস্ত্র-সম্মত আর কোনটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ? অবশ্যই তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ও নিষ্ঠাবান সম্মানের পক্ষে এই সকল বিষয়ের বিশদ জ্ঞানলাভ এবং তদ্বারা লোক-সমাজ-পরিচালন চেষ্টা বিধিসঙ্গত আনুকূল্য ও আনুকূল্যবিবরিত হইয়া বাহ্যিক শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে ও তদ্বারা লোকরক্ষা ও সন্নীতিসাধনপনে প্রয়াসী হইন, অবনীমণ্ডলে উজ্জ্বল মানবের পথ প্রশ্নক বলিয়া পরিগৃহীত । বিভাগ্যাগর মহাশয়ও সেই শ্রেণীর মহাজ্ঞান । তিনি আত্মকীর্তিবিশ্বস্ত হইয়া, কেবল শুভসাধনার্থ মুক্তভাবে শাস্ত্রচর্চা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণের প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং এই জ্ঞান শাস্ত্রবিশেষকে শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, বিশেষ ও সাধারণ প্রকৃতি বিশেষণে অভিজিত করিত এবং তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদান করিতে সাহস কবিয়াছিলেন ।

যাহারা লোক রক্ষা অপেক্ষা, জনসমাজের হিতসাধন অপেক্ষা, শাস্ত্রের গুচয় ও কুটম্ব রক্ষার সমধিক আগ্রহীল, তাঁহাদের নিকট বিভাগাগর মহাশয় রূপ-পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিচ্ছেদ্য বা লোকগাত্য নির্বাহ করিতে যাহারা সক্ষমতা করেন, বিভাগাগর মহাশয় সেট সকল সন্দেহশূন্য ববণীয় মহাত্মা লোক, কারণ তিনি প্রকৃত শাস্ত্রার্থেব নিচ্ছেদ দ্বারা লোকসমাজপরিচালনের সহায়তা করিয়াছেন । * বিভাগাগর মহাশয় অপর এক স্থানে বলিতেছেন :—

“বৃহস্পতীর ও আদিত্যপুরাণ বচনের লেকপ তাৎপর্য্য বাখ্যাত হইল, অনুসারে ঐ সকল বচন কোন মতে কলিযুগে বিধবাবিবাহ নিষেধ বোধক হইতেছে না । যদি নিষেধবাদীরা ঐ বাখ্যাত স্মৃতি না হইত, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে বিবাদ করেন, অর্থাৎ বৃহস্পতীর ও আদিত্যপুরাণের ঐ সকল বচনকে বিধবাবিবাহেব নিষেধক বলিয়া আগ্রহ-প্রদর্শন করেন, তবে এক্ষণে এট কথ্য বিবেচ্য হইতোহু য়ে, পরামর্শ-সংহিতাতে বিধবাবিবাহ বিধি আছে, এবং বৃহস্পতীর ও আদিত্যপুরাণে বিধবাবিবাহের নিষেধ আছে, ইহার মধ্যে কোন শাস্ত্র বলবৎ হইবেক, অর্থাৎ পরামর্শের বিধি অনুসারে বিধবাবিবাহ কর্তব্য কথ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক, অথবা বৃহস্পতীর ও আদিত্যপুরাণের নিষেধ অনুসারে বিধবাবিবাহকে অকর্তব্য কর্ম বলিয়া স্থির করা যাইবেক । এবিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, এট অনু-সন্ধান করা আবশ্যক, শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ স্থলে তদীয় চলচল-বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভগবান বেদব্যাসের প্রণীত দর্শনসংহিতাতেও এবিষয়ের মীমাংসা আছে । যথা, যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তদ্বার বেদই প্রমাণ, আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই প্রমাণ । (১) বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতি ও পুরাণ অনুসারে না চলিয়া বেদ অনুসারে চলিতে হইবেক, আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, পুরাণ অনুসারে না চলিয়া

(১) অতিস্মৃতিপূরণানাং বিরোধো যত্র দৃষ্টঃ ।

তত্র শ্রেষ্ঠঃ প্রমাণঃ স্যাদিত্যেব স্মৃতিকরা ।

স্বতি অনুসারে চলিতে হইবেক। পুরাণকর্তা স্বয়ং ব্যবস্থা দিয়াছেন, স্বতি ও পুরাণে পরস্পর বিরোধ হইলে, পুরাণ অনুসারে না চলিয়া স্বতি অনুসারে চলিতে হইবেক, সুতরাং গৃহস্মারদীয় ও আদিভাপুরাণে যদিই বিধবাবিবাহের নিষেধ সিক্ত হয়, তথাপি তদনুসারে না চলিয়া পরাশর সংহিতাতে বিধবাবিবাহের যে বিধি আছে, তদনুসারে চলাই কর্তব্য স্থির হইতেছে।”

বিভাগ্যসাগর মহাশয় এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার ইচ্ছা করিয়া কোন কণা উপেক্ষা করিতে কিংবা কোন প্রশ্ন গোপন করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি পুনরপি বলিতেছেন :—অতএব কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কৰ্ম্ম, তাহা নিকির্বাদে সিক্ত হইল। এক্ষণে এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র অনুসারে কর্তব্য কৰ্ম্ম হইলেও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে না। এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে, ইহারই অনুসন্ধান করিতে হইবেক শিষ্টাচার কেমন স্থলে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বিত হওয়া উচিত। ভগবান্ বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথা :—কি লৌকিক, কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়ই শাস্ত্রবিহিত ধৰ্ম্ম অবলম্বনীয়, শাস্ত্রের বিধান না পাইলে, শিষ্টাচার প্রমাণ (১) বশিষ্ঠশাস্ত্রে বিধিব্যবস্থার স্থলেই শিষ্টাচারকে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করার ব্যবস্থা আছে। অতএব কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কৰ্ম্ম, এ বিষয়ে আর কোন সংশয় অথবা আপত্তি হইতে পারে না।

আদিপুরাণ, পরাশরভাষ্যযুক্ত ক্রতু, গৃহস্মারদীয় পুরাণ, আদিভাপুরাণ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে বিবাহিতার পুনর্বিবাহের নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। আর কলিযুগের বিশেষ ধৰ্ম্মশাস্ত্রে পরাশর-সংহিতার ‘নষ্টে যুতে’ প্রভৃতি বচনদ্বারা বিবাহিতার পত্নাস্বর প্রভৃতির বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আবার কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ ও নারদ যুগবিশেষ নির্দেশ না করিয়া সামান্ততঃ সকল যুগের পক্ষে পতি পতিত, অসুস্থ, কুলশীলহীন, বঞ্চেচ্ছাচারী, চিররোগী, সগোত্র, দাস ও অস্ত্র জাতীয় স্থির হইলে অথবা মরিলে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বিবাহ সংস্কারের অনুজ্ঞা দিতেছেন। এই সকল বিসম্বাদী কূট তর্কের সশর ছেদনে বিভাগ্যসাগর মহাশয়ের স্থির লক্ষ্য ও পরচালনা অতীব প্রীতিপ্রদ।

আমাদের একটু ভয় হইতেছে যে, বীহারী তাঁহার সেই সুবিকৃত সমালোচনাগ্রন্থ আন্তোপাস্ত্র মনোযোগসহকারে পাঠ করেন নাই, তাঁহার হয়ত^১ আমাদের এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় বিশেষ তৃপ্তি লাভের সুযোগ পাইবেন না, স্থানের অল্পতা ও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমরা যতদূর সম্ভব তাঁহার বহুদর্শন ও শাস্ত্র-জ্ঞানের অন্বেষণ দিতে চেষ্টা করিব। এই সমালোচনাপাঠে যদি কাহারও মনে বিভাগাগর মহাশয়ের রচিত বিধবাবিবাহগ্রন্থ পাঠের আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বিভাগাগর মহাশয় পুরোনির্দিষ্ট শাস্ত্র বিরোধের স্থলে বাহা বলিয়াছেন তাহা এই :—“একগে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন; প্রথমতঃ কাত্যায়ন প্রভৃতি সাংহিত্যকর্তা মুনিদেব বচনে, কয়েক স্থলে সামাজ্যতঃ সকল যুগের পক্ষে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্কীর বিবাহের অস্বীকৃতি ছিল। তৎপরে, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামাজ্যকারে কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্কীর বিবাহেব নিষেধ হইয়াছিল। তদনন্তর, পরাশরসাংহিত্যতে, অমূল্যে প্রভৃতি পাঁচটা স্থল ধরিয়া কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতাব পুনর্কীর বিবাহের বিশেষ বিধি হইয়াছে। সামাজ্য ও বিশেষ স্থলে, বিশেষ বিধি ও নিষেধই বলবান হয়, অর্থাৎ যে স্থলে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে সামাজ্য বিধি অথবা সামাজ্য নিষেধ থাকে। প্রথমতঃ কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিরা সামাজ্যতঃ কোন যুগের উল্লেখ না করিয়া, কয়েক স্থলে বিবাহিতার পুনর্কীর বিবাহের বিধি দিয়াছিলেন। ঐ বিধি সামাজ্যতঃ, সকলযুগের পক্ষেই খাটিতে পারিত। কিন্তু, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে কলিযুগের উল্লেখ করিয়া, নিষেধ হইয়াছিল, সুতরাং ঐ নিষেধ কলিযুগের পক্ষে বিশেষ নিষেধ। এত নিমিত্ত, কাত্যায়ন প্রভৃতির সামাজ্য বিধি, কলিযুগে না খাটিয়া, কলিযুগ ভিন্ন অন্য যুগে খাটিয়াছে এক-সকল স্থলেই বিবাহিতার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল। কিন্তু পরাশর, অমূল্যে প্রভৃতি পাঁচটা স্থল ধরিয়া কলিযুগে বিবাহিতাব পুনর্কীর বিবাহের বিধি দিয়াছেন; পরাশরের বিধি বিশেষ বিধি হইতেছে। এত নিমিত্ত, আদিপুরাণ প্রভৃতির সামাজ্য নিষেধ, অমূল্যে প্রভৃতি পাঁচ স্থল ভিন্ন অন্য অন্য স্থলে খাটিবেক; অর্থাৎ বানী পতিত, স্ত্রীব, অমূল্যে, কুলঙ্গীহীন, বংশজাতারী, চিররোগী, অপস্কাররোগগ্রস্ত, প্রভৃতি, মৃত, সংগার, দাস, অস্ত্রজাতীর ইত্যাদির মধ্যে অমূল্যে, মৃত, প্রভৃতি, স্ত্রীব, পতিত এই পাঁচস্থলে পরাশরের বিশেষ বিধি

শাটবেক, তদতিরিক্ত স্থলে, অর্থাৎ কুলশীলহীন, বথচ্ছাত্রী, চিররোগী, অপস্মারোগগ্রস্ত, সগোত্র, দাস, অস্ত্র জাতীয় ইত্যাদি স্থলে আদিপূরণ প্রকৃতির সামান্য নিষেধ শাটবেক।

সামান্য ও বিশেষ বিধির নিষেধ স্থলে সচরাচর এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন করিবেক। (১) এস্থলে বেদে সামান্যতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের স্পষ্ট বিধি আছে। কিন্তু অশৌচ মধ্যে সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চ মহায়জ্ঞ ও স্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম করিবেক না, অশৌচান্তে পুনরায় করিবেক। (২) এস্থলে, জাবালি অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দনের নিষেধ করিতেছেন। দেখ, বেদে সামান্যাকারে প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের বিধি থাকিলেও, জাবালির বিশেষ নিষেধ দ্বারা অশৌচকালে দশ দিবস সন্ধ্যাবন্দন রহিত হইতেছে; অর্থাৎ জাবালির দাম্ব্য নিষেধ অনুসারে অশৌচকালীন দশ দিবস ব্যতিরিক্ত স্থলে বেদোক্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনব সামান্য বিধি খাটিতেছে।”

বিভাগসাগর মহাশয় এইরূপ বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন, যে, তাঁহার প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ প্রথা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রসম্মত ও হিন্দু আচার-ন্যূনমিতি; পরাশরসংহিতার বচনত্রয়ের বিরুদ্ধে যত প্রকার আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল এবং আবও যত প্রকার আপত্তি হইতে পারে, তৎসমুদায়ের শাস্ত্রসম্মত মীমাংসা করিয়া তিনি পরাশর-বচনের তাৎপর্য প্রবল ও অকুণ্ঠ রাখিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে—যে, তাঁহার উক্ত পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য সম্যক সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিষয়ের শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন :—১। পরাশর-বচন বিবাহিতাবিষয়, বাগ্নন্দ্যবিষয় নহে। ২। পরাশর-বচন কনিষ্ঠ্যবিষয়, যুগান্তরবিষয় নহে। ৩। পরাশরের বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ নহে। ৪। পরাশরের বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ নহে। ৫। বিবাহ-বিধায়ক বচন পরাশরের, শাষ্ণবের নহে। ৬। বিবাহবিধায়ক বচন পরাশরের, ক্রত্বিম নহে। ৭। পরাশরের বচন বিবাহবিধায়ক, বিবাহনিষেধক নহে।

(১) অহবহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।

(২) সন্ধ্যাং পঞ্চমহাযজ্ঞান্নৈত্য়িকং স্মৃতিকর্ম চ। তদ্ব্যতীতং হাপরেস্তেবাং দশাহং পুনঃক্রিয়া।

৮। দীর্ঘভ্রমার নিয়মস্থাপন বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক নহে। ৯। ৩৬৭ পরাশর-সংহিতা বিধবাবিবাহের নিষেধিকা নহে। ১০। পরাশরসংহিতা কেবল কলিধর্ম-নির্ণায়ক, অস্ত্রাশ্র যুগের ধর্মনির্ণায়ক নহে। ১১। পরাশরসংহিতা আত্মোপাস্ত কলিধর্মনির্ণায়ক, কেবল প্রথম দুই অধ্যায় কলিধর্মনির্ণায়ক নহে। ১২। পরাশর কেবল কলিধর্মবক্তা, অস্ত্রযুগধর্ম লিখেন নাই। ১৩। পত্ন্যশর সংহিতায় চারি যুগের ধর্মোপদেশ প্রদান সমপ্রমাণ হয় না। ১৪। কোনো পরাশর: স্মৃত: এই পরাশর বাক্য প্রশংসাপর নহে। ১৫। মনুসংহিতাতে চারিযুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিরূপণ করা নাই। ১৬। পরাশরসংহিতাতে পতিভত্যা ত্যাগ নিষেধ ও পতিভত পতি প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ নাই। ১৭। স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থবাদের প্রমাণা আছে। ১৮। বাগ্‌দানের পর বারের অনুচ্ছেদামি হট্টাল কঙ্কার পুনর্যবনের নিষেধ নাই। ১৯। পরাশরের বিবাহবিধি নীচজাতিবিষয়ে নহে। ২০। পিতা বিধবা কঙ্কাকে পুনরায় দান করিতে পারেন। ২১। বিধবার বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া দান কবিত্তে হইবেক। ২২। প্রথম বিবাহের মর্যই দ্বিতীয়বার বিবাহের মন্ত। ২৩। বিবাহিতদ্বীবিবাহ বিবাহিতপুরুষবিবাহের ন্যায় অপ্রশস্ত হয়। ২৪। দেশচার শাস্ত্র অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ নহে।

তিনি উল্লিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত ভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ সোস আনা শাস্ত্রমত কেবল আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধিতে যে এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে তাহা নহে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়ও আমাদের এই ধারণার অনুরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রমাণ :—“এই পুস্তক পাঠ করিয়া হিন্দু সমাজে একবারে হলুদুল পড়িয়া গেল। প্রাচীন হিন্দুরা বিভাসাগরকে নরসিং পুষ্টিয়ান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং অনেক ধনবান লোক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সাহায্যে বিধবাবিবাহ-নিষেধক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া বিভাসাগরলিখিত পুস্তকের উত্তরস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কোন কোন পুস্তকে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ গালি বর্ণনেরও ক্রটি ছিল না। প্রায় সকল সংবাদ পত্র হইতেই বিভাসাগরের উপর অনবরত প্রস্তর গতি হইতে লাগিল। কিন্তু মহামনা বিভাসাগর অবিকৃতচিত্তে সে সবদার সহ্য করিয়া ঐ বৎসরেই বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিলেন। ঐ

পুস্তকে একুপ পুণ্ডিত্য ও একুপ গাভীৰ্য্য সহকারে প্রতিপক্ষদিগেব প্রদত্ত সৰ্ববিধ আপত্তির খণ্ডন করিলেন, একুপ নৈপুণ্যেব সহিত শাস্ত্রার্থের মীমাংসা কবিলেন ও চুবিগাহ শাস্ত্রীৰ বিচাব সকল একুপ সবল ও মধুর ভাষায় রচনা কৰিয়া জলবৎ সহজ কবিয়া দিগলন হে, তাহা পাঠ কৰিয়া সকলেৱট বিজ্ঞানসাগৰকে অদ্বিতীয় পুৰুষ বলিয়া বোধ হইত। * ফলতঃ এই পুস্তকে বিজ্ঞানসাগৰেব বিজ্ঞা, বুদ্ধি, কোশল, বহুদক্ষিতা, সংব্রাহিতা, মীমাংসকতা, বিনয়, গাভীৰ্য্য প্রভৃতি অশেষ গুণের পৰাকাষ্ঠা প্রদৰ্শিত হইয়াছে। আমাদেব একজন সুবিজ্ঞ আত্মীয় কতিয়ছিগলন, বিধবাবিবাহ পুস্তকৰ শীৰ্ষৰ পটুক্ৰিগুণি যথা.—‘পৰাশৰ বচন বিবাহিতাবিসম্বন্ধক বাগ্‌দস্তাবিসম্বন্ধক নাহ’, ইত্যাদি অক্ষরগুণি ইংৰাজিৰ ইটালিক অক্ষৰেব দ্বাৰা লক্ষ্য শব্দক অক্ষর মন্দিত হইলেন গাল হইত। কারণ জিজ্ঞাস্য লগায় তিনি হে’ল পদেব কারণ, ‘ইংৰাজি জিগ্মস্‌তিৰ প্রতিজ্ঞাগুণি ইটালিক অক্ষৰেব আচ্ছ’ ইত্যাদি অপি-প্রায় হে’ল জ্ঞাপিতিব প্রতিজ্ঞাগুণি বেকুপ লক্ষ্য। অক্ষর্য পটুক্ৰিগুণিগুণেব সপাণ কৰা হইয়াছে, বিধবাবিবাহ পুস্তকৰ শীৰ্ষৰ পটুক্ৰিগুণিও তৎপৰবস্তা বিচাববল দ্বাৰা সেটেকপ নিশ্চয়কৃত রূপ উপপাদিত হইয়াছে। অতঃপ উভয় পুস্তকবহ শীৰ্ষৰ পতিজ্ঞাগুণি একবিধ অক্ষর মন্দিত হইয়া উচিত

১৮৩৭ খ্রীঃ সন ১৮৩৭ খ্রীঃ মাসিনী পক্ষিক ১ চৈত্র গুৰু সপ্তমী তেলপ অমিত্য বাক্ত কবিগছিগলন, গগানিগল পদ্য হইত হে :— শ্রীযুক্ত ষ্টেশনচক্ষু বিজ্ঞানসাগৰ চতুৰ্থ্য হতিপুৰী বিধবাবিসম্বন্ধক পুনঃসংস্কার পাঠ-সম্বন্ধ বলিয়া হে পুস্তক প্রকাশ করন, তাহা প্রাপিত হইয়া অবধি ই প্রস্তাব লইয়া হিন্দুসমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইত হে। তদনায় চানক পণ্ডিত ও প্রধান বিম্বী লোকসাগর মাদ্য মানক উক্ত বিষয় অপ্রণিত বাগিবাব অভিপায়ে এক এক পুস্তক প্রচার কৰিয়া তাঁতৰ দী হত বিস্তর সম্পত্তি উপাণন কৰিগছিগলন। সেই সকল আপত্তি যে নিতান্ত অসিদ্ধমূলক হই। পদলন কবিগার নিমিত্ত বিজ্ঞানসাগৰ চতুৰ্থ্য সম্প্রতি

১৮৩৭ খ্রীঃ সন ১৮৩৭ খ্রীঃ মাসিনী পক্ষিক ১ চৈত্র গুৰু সপ্তমী তেলপ অমিত্য বাক্ত কবিগছিগলন, গগানিগল পদ্য হইত হে :— শ্রীযুক্ত ষ্টেশনচক্ষু বিজ্ঞানসাগৰ চতুৰ্থ্য হতিপুৰী বিধবাবিসম্বন্ধক পুনঃসংস্কার পাঠ-সম্বন্ধ বলিয়া হে পুস্তক প্রকাশ করন, তাহা প্রাপিত হইয়া অবধি ই প্রস্তাব লইয়া হিন্দুসমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইত হে। তদনায় চানক পণ্ডিত ও প্রধান বিম্বী লোকসাগর মাদ্য মানক উক্ত বিষয় অপ্রণিত বাগিবাব অভিপায়ে এক এক পুস্তক প্রচার কৰিয়া তাঁতৰ দী হত বিস্তর সম্পত্তি উপাণন কৰিগছিগলন। সেই সকল আপত্তি যে নিতান্ত অসিদ্ধমূলক হই। পদলন কবিগার নিমিত্ত বিজ্ঞানসাগৰ চতুৰ্থ্য সম্প্রতি

ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় এক পুস্তক প্রকটন করিয়া প্রতিবাদিগণের সমুদায় পুস্তকের একত্র উত্তর দিয়াছেন । * * তদ্বোধো উপক্রম ভাগ পাঠ করিল এতদধীন পণ্ডিতগণের বিচারপ্রণালী অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, তাঁহারা তত্ত্বনির্ধারণে সর্বিশেষ মনোযোগী না হইয়া অমূলক আপত্তি উপস্থিত করিতেই উদ্ভূত থাকেন । আর দেশাচার ও কুসংস্কার যে এতদধীন কল্পিত ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া উঠিয়াছে, ঐ পুস্তকের উপসংহাব ভাগ তাহা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে । তাহা অগ্রস্তুতি কবিল, পক্ষান্তরে কঠিন অনবদ্য দ্রব্য হইয়া যায় ।

বিধবা স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহ নিবারণ যুক্তি অনুসারে সর্বতোভাবেই কর্তব্য, তাহাব সন্দেহ নাই, ভাবতবয়সী সন্তানসমূহও সম্পূর্ণ বিদেশ বলিয়া প্রমাণিত হইল অতএব এক্ষণে উহা প্রচলিত কবিয়া তাহাদিগের অমূল্য বৈধবায়ুনা ও যৌবনতব পাতকলাশি নিবারণ কবিত্তে ক্ষমতা বিনষ্ট কবা উচিত নহে ।

হাঁহারা বিধবাবিশিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিস্তৃত বিধবা-বিবাহ গ্রন্থ পাঠ কবিলেন, তাহাব যে কেবল বিধবাবিবাহব আবশ্যকতা ও তাহার সমাজ অন্তর্ভব কবিয়া চূড়ান্ত অনুমতি কবিলেন তাহা নহে, সেট সজে সজে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ে নিষ্ঠাসংকারে সন্তোষাচনার পদ্ধতি সমর্থন করিয়া, কটুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ গ্রন্থ সমুদেব যেকপ শাস্ত্র ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা দর্শন কবিয়া, তাহাকে অসামান্য ধৈর্যশীল, ক্ষমতাশালী, ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত বোধ অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন ।”

যখন বিধবাবিবাহ সর্বসাধারণ শাস্ত্রসিদ্ধ ও সমাজসংস্কারবিধিয়া তিনি তাহাব অকুরাগী বক্তৃতাগুলোর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাতয়া মিলেন তখন, কার সাধা, অব সে আগ্রহ ও উৎসাহের স্রোতঃ বোধ জবে । বিধবাবিবাহ দিহাব অল্প চান্দিক অঘোষণার সাড়া পড়িল গেল । এই সময়ে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে লোকদের সমক্ষে আর এক গুরুতব প্রশ্ন উপস্থিত হইল । পর এই যে, বিধবার বিবাহান্তে তাহাব গভজাত সন্তানেরা পাছে বর্তমান দায়ভাগ অনুসারে পৈতৃক সম্পত্তিতে স্বত্বান না হয়, এই আশঙ্কায় নিরাকরণ অল্প সর্বাঙ্গে গভর্নমেন্টের নিকট হিন্দু দায়ভাগের সঙ্গতিরক্ষার অল্প আবেদন প্রেরণ করা

হইল। কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েকজন সম্মত লোক ভিন্ন অপর সকলেই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সেই আবেদন পত্রের অনুবাদ এবং সেই অসংখ্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্য হইতে সুপরিচিত মহোদয়গণের নামের তালিকা এতৎসহ প্রদান করা গেল :—

* বহুসম্মানান্বিত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা সমীপে
নিম্নস্বাক্ষরকারী বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণের
বিনীত নিবেদন এই যে—

১। পটেশ্বর সামাজিক প্রণয় দ্বারা হিন্দুসমাজমধ্যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

২। আবেদনকারীদের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই বিধবাবিবাহ নিষেধরূপে নিত্যস্থ নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক। সমাজনীতি রক্ষার পক্ষে প্রবল অনুরোধ এবং সমাজের পক্ষে অল্প নানা প্রকারে বিবিধ বিঘ্নের ফলোৎপাদক।

৩। অতি শৈশবকালে বিবাহের পরূতি প্রচলিত থাকায়, বালিকারা অনেক দূরান ছাউয়ে, কিংবা কণা কহিতে শিশুবার পূর্বেও বৈধবান্ধবা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এজন্য বিধবার জীবনভার অধিকতর ক্লেশদায়ক হইয়া পড়ে।

৪। আবেদনকারীদের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এই বিধবাবিবাহ নিষেধ-প্রথা হিন্দুশাস্ত্রের কিংবা হিন্দুব্যবস্থাদর্শনের অনুমোদিত নহে।

৫। আবেদনকারীরা এবং অপর বহুসংখ্যক হিন্দু, বিধবাবিবাহে ধর্ম-বুদ্ধির বিরোধ অনুভব করেন না, এবং সামাজিক আচার ব্যবহার কিংবা হিন্দুধর্মের জীবনব্যাপার অল্প যদি কোন প্রকার আপত্তি হয়, তাহা, তাঁহারা অবোধে উল্লেখ করিতে প্রস্তুত আছেন।

৬। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং মাননীয়া মহারাণীর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানালয়ে বর্তমানে হিন্দুসম্প্রদায়ের বৈধব্যবাহে ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়া থাকে তদনুসারে বিধবাবিবাহ অসিদ্ধ এবং ঐরূপ বিবাহজাত সন্তান সকল অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবার সম্ভাবনা ।

৭। যে সকল হিন্দু ঐরূপ বিধবাবিবাহে নিজ নিজ ধর্মবুদ্ধির সম্পূর্ণ অনু-
মোদন পাইয়া থাকেন, এবং যাহারা ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারজাত বাধা
উপেক্ষা করিয়া ঐরূপ বিধবাবিবাহ করিতে সম্মত, আইনের পূর্বোক্তরূপ
বাধ্যতা হাদেশের ঐরূপ বিবাহে বাধা জন্মাইতেছে ।

৮। আবেদনকারীদের বিবেচনায় এইরূপ বোধ হয় যে, শাস্ত্রের বিপরীত
অর্থ নিবন্ধন যে সামাজিক বাধা গুরুতর আকার ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান, ব্যব-
স্থাপক সভার সে বাধা দূর করিয়া দেওয়া কর্তব্য ।

৯। বিধবাবিবাহের আইনঘটিত বাধা দূর করা বহুসংখ্যক নিষ্ঠাবান ও
বিশ্বাসী হিন্দুর ইচ্ছা ও ভাবের সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং যাহারা একান্ত
শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন এবং তজ্জন্ত যাহাদের সংস্রবে আঘাত লাগিতে
পারে কিংবা যাহারা সামাজিক সৌকর্যার্থে বিধবাবিবাহের প্রতিবাদী,
বিধবাবিবাহ প্রচলনে এরূপ লোক মণ্ডলীর কোন প্রকার অশুভ সাধিত
হইবে না ।

১০। পৃথিবীর অন্ত কোথাও, অন্ত কোন জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ এই
রূপ আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ নহে এবং এই অনুষ্ঠান মানবের সাধারণ প্রকৃতি-
বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়াও বোধ হয় না ।

১১। এই সকল হেতু বিজ্ঞমানে আবেদনকারীদিগকে প্রাধান্য এষ্ট যে,
মাননীয় ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা এই বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করিয়া নিম্ন-
লিখিতরূপে এক ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচার করেন, যাহাতে হিন্দু বিধবাবিবাহের
সর্বপ্রকার বাধা বিদূরিত হয় এবং বিধবাবিবাহজাত সন্তানেরা বৈধ সন্তান বলিয়া
পরিগণিত হয় ।

বিধবাবিবাহের বৈধতাঙ্গিকের উপযোগী এক পাণ্ডুলিপিসহ এই আবেদন
পত্র ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয় । এইরূপ আরও কর্তব্যনি-
মিত আবেদন পত্র পৃথক পৃথক প্রেরিত হইয়াছিল । আমরা যে আবেদন পত্র সংগ্রহ

করিয়াছি, তাহাতে প্রায় এক সহস্র স্বাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে
স্থাপিত সন্মান মহোদয়গণের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল।* উক্ত আবেদন

* জয়পুর মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

তারানাথ ভববাচস্পতি

প্রসন্নকৃষ্ণানন্দকামিকারী

শ্রীনাথ দাস

বিমলাচরণ

হরিশচন্দ্র প্রকটকার

কেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাণ্ডুরবাগান)

কালীকৃষ্ণানন্দমিত্র

দক্ষিণাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কালীকৃষ্ণানন্দ (নিবাসী)

অক্ষয়কুমার দত্ত (প্রবাসী)

কেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (প্রবাসী)

নবীকুমার মুখোপাধ্যায় (প্রবাসী)

ইন্দিরাকান্ত

মোহনচন্দ্র মিত্র (প্রবাসী)

মুরলীধর দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

স্বরূপনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী)

প্রবীণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত (প্রবাসী)

মুরলীধর দত্ত

কেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মোহনচন্দ্র মিত্র

মুরলীধর দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

মুরলীধর দত্ত

কেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মোহনচন্দ্র মিত্র

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীনাথ দত্ত (হাটবালা)

নীলকমল মিত্র (প্রবাসী)

স্বরূপনাথ মিত্র (প্রবাসী)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবাসী)

ইন্দিরাকান্ত

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সংস্কৃতকলেজ)

মোহনচন্দ্র মিত্র (প্রবাসী)

মুরলীধর দত্ত (সংস্কৃতকলেজ)

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত (প্রবাসী)

মুরলীধর দত্ত (প্রবাসী)

মোহনচন্দ্র মিত্র

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

মুরলীধর দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

মুরলীধর দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত (প্রবাসী)

মুরলীধর দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

মুরলীধর দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

মুরলীধর দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

মুরলীধর দত্ত (প্রবাসী)

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

মুরলীধর দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

মুরলীধর দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত

পত্র উত্তরপাড়াব হুঁবিধাত জমিদার বাবু জয়রাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্বাত্মে স্বাক্ষর করিয়াছেন । প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারিচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, বাজা প্রতাপচন্দ্র ও বাজা চন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্মানিত মহোদয়, বহু সংখ্যক স্বাক্ষরপূর্ণ অপর একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন । এতদ্বিত্ত বঙ্ক-
নানাধিপতি মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর স্বতন্ত্র এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন । নবাবীপাধিপতি মহাবাজ শ্রীশচন্দ্র, ঢাকার জমিদার ও অজ্ঞাত ধনী ত্রিঙ্গুগণ, ময়মনসিংহের জমিদারদের অনেকে সমবেত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবেদন পত্র প্রেরণ করেন ।

মহারাজ মহাতাপ চাঁদের সহকারিতা উল্লেখ কবিতা বিভাগাগর মহাশয় প্রবর্তবীর ব্যবস্থাপক সভার অজ্ঞাত সভা মাননীয় জে পি গ্রান্ট সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাব মর্ম্ম এখানে প্রদত্ত হইল :—“প্রিয় মহাশয়—আপনি অবশ্যই জানিয়া সুখী হইবেন যে, বঙ্কনানাধিপতি মহাবাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছেন । * * * বঙ্কদেশের সর্ব-
প্রধান একব্যক্তি এত কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা বাস্তবিকই গভীর আনন্দের বিষয় * * * মহারাজ নেকরূপ মার্জিত কৃতিত্ব লোক, তাহাতে তাহাব দ্বারা একাঙ্গী যথেষ্ট সহায়তা হইবে । মহারাজ চকলচিদের লোক নহেন, এবং অপরের দ্বারা পরিচালিত হইবারও পাত্র নহেন । তিনি স্বাধীনভাবে নিজের জন্ত চিন্তা করিয়া থাকেন এবং কোন বিষয়ের কষ্টব্যাকর্ষণা নিজেই স্থির করিয়া থাকেন । এক্ষণে মহারাজ যখন বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা

প্রচিন্তন লাহা (মহারাজ)

প্রচিন্তন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জয়রাম সিংহ (মহারাজ)

প্রচিন্তন (মহারাজ)

প্রচিন্তন লাহা

জয়রাম সিংহ

প্রচিন্তন লাহা

প্রচিন্তন লাহা (মহারাজ)

প্রচিন্তন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জয়রাম সিংহ (মহারাজ)

প্রচিন্তন (মহারাজ)

প্রচিন্তন লাহা (মহারাজ)

জয়রাম সিংহ (মহারাজ)

প্রচিন্তন লাহা

বুঝিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এই অনুষ্ঠানের চিবস্বত্বই ও বিশেষ পক্ষ-পাতী হইবেন।”*

প্রায় ২৫ সহস্র লোক সমবেত হইয়া উপরোক্ত আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন করার, সমগ্র বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। পূর্বে বহুবার উল্লেখ করা গিয়াছে যে, দেশে “আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের মাতৃ বিভাগসাগর আর বিধবাবিবাহ। বিধবাবিবাহের চেষ্টা কতদূর অগ্রসব হইল, সে সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারা এমন লোক, এমন সংবাদ পত্র, এমন পুস্তক বা পুস্তিকা লোকের বহু আগ্রহের জিনিস হইয়া উঠিল। বিধবাবিবাহের আন্দোলনের তরঙ্গ-তুফানে ভাসিয়া বিখ্যাত গায়ক দাশু রায় “বিধবাবিবাহ” বিষয়ে এক পালা পাঁচালি প্রস্তুত করেন। নানা স্থানে বিধবাবিবাহের গানও সেকালে হইত। এতদ্বিধা বিধবা বিবাহ নাটকও বাচিৎ হইয়া কলিকাতায় সে কালের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। শান্তিপুত্রের তীতিয়া বহুমুখা বাস্তব পাড়ায় উপর বিধবাবিবাহের গান তুলিতে আরম্ভ করিল। বিভাগসাগর ও বিধবাবিবাহবিষয়ক গানবিশিষ্ট শান্তিপুত্রের কাপড় বিভাগসাগর মহাশয়ের কৌতুকলাপ বিশেষভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচাৰ কবিরাজ। কাপড়ের পাড়ে গান উঠা এই প্রথম। শান্তিপুত্রের তীতিয়া এই নূতন পদ্ম অবলম্বন বহু অর্থ উপার্জন কবিরাজ ছিল। বিভাগসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলন উপলক্ষ যে সকল সংগীত বাচিৎ হইয়াছিল, সেগুলি এত দূরব্যাপী হইয়াছিল যে বঙ্গদেশের সমস্ত সকল শ্রেণীর লোক ঐ সকল

* The Hindu & P. G. O. — My dear Sir, — You will no doubt, be glad to hear that his Highness the Maharaja of Burdwan has promised his assistance to the furtherance of the sacred cause of the marriage of Hindu Widows * * * It is really a matter for congratulation that the first man of Bengal is going to take up the cause * * He entertains such enlightened views that we have every reason to hope for substantial assistance from him. The Maharaja is not a hasty man, nor does he consent to be led by others, but always thinks for himself and forms his opinions of things after mature deliberation. Now that his Highness is convinced of the goodness of the cause, I have no doubt that he will be its staunch friend and champion.

(Sd.) Issari Chandra Sarm.

গান গাহিয়াছে। আমরা শৈশবকালে “উঠ গা তোল ওহে নৃশূন্য,” “ওরে বামশশী ছবি বনবাসী, কে আমারে ডাকবে মা বলে” প্রভৃতি গানের স্মার, বিজ্ঞানাগর ও বিধবাবিবাহ-বিষয়ক গানগুলিও পল্লীগ্রামে, গরুর গাড়ীর গাড়ওয়ান-দিগকে পর্যন্ত গাহিতে শুনিয়াছি। তাহাদিগেরই মুখে বালাকালে শুনিয়াছি :—

“বেচে থাকুক বিজ্ঞানাগর চিরজীবী হয়ে।

সদরে করেছে রিপোট বিধবাদের হবে বিয়ে।” ইত্যাদি

বিধবাবিবাহ বিধি-বন্ধ হইবার সময়ে আন্দোলনও যথেষ্ট হইয়াছিল। আইনের পাণ্ডুলিপির প্রথম উদ্যোগের সময়ে আইন প্রস্তাবক মাননীয় জে. পি. গান্ট মহোদয় যে যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক উক্ত উপস্থিত কনিষ্ঠাভিগণের ভাবাধাংশটুকু উদ্ধৃত করা গেল :—“বর্তমান আইন দ্বারা ভাবতবর্ষের হিন্দুগণের স্বাধীনভাবে সামাজিক জীবন যাপনের অন্তরায় দূর হইবে। অথচ তাঁহারা কেবল আইনের আবদ্ধকর্তা অনুভব করেন না, তাঁহারা পুঙ্কল ক্রুর আপন ইচ্ছামত কার্য করিতে পাবিবেন। নিবাহসম্বন্ধে শারীর্ষবিধি অনুসারে কোনটী স্মার কোনটী অস্মার কিংবা হিন্দুনিগেব পক্ষে এই মতবিরোধ স্থলে কোনটী গৃহপয়োগ্য সে বিষয়ে বর্তমান আইন কিছুই বলিতেছে না। ইচ্ছা দ্বারা কোন ব্যক্তির কার্যকলাপের বাধা উদ্ঘাটবে না, কেবল তাঁহারা একটু ভিন্ন প্রকারের রীতিনীতি ও উদার সামাজিক ভাবের অনুবর্তী, ইংল দ্বারা উদ্ঘাটবে সামাজিক জীবন যাপনের পথের বাধা ও তনৌতি নিবারণিত হইতেছে।”

মাননীয় গান্ট সাহেবের বক্তৃতার আর এক স্থানের কিংমণ্য এই :—

“তাঁহারা দক্ষিণ পার্শ্ব মাননীয় বন্ধ, স্তর জেমস কলভিন্সি প্রদর্শন না থাকায়

* The Bill now presented will wipe out that blot in the Municipal Law of India. At the same time it will leave all those^১ Hindus who do not agree in the opinion of the Petitioners precisely as they are now. It does not pretend to say what is the right interpretation of the directions for conduct in respect of marriage in the text-books, or which of the conflicting authorities ought to be followed by a Hindu. It will interfere with the tenets of no human being; but it will prevent the tenets of one set of men from inflicting misery and vice upon the families of their neighbours, who are of a different and more humane persuasion.

এই বিধবাবিবাহ আইন প্রার্থীদিগের ও স্বাক্ষরকারীদের প্রধানতম, সংকট কালেজের সুরোগ্য ও সুপরিচিত অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই আইনের ঐতিহ্যানোচিত্য বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করেন।*

মাননীয় গ্রান্ট ট্রাষ্টার বক্তৃত্যব অপর একস্থানে বলিতেছেন :—“প্রায় তিন চারি শত বৎসরব মধ্যে হিন্দু ‘ল’ এর সার সফলকর্তা সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ওড়ারচাঁদ নিজের বিধবা কন্যাবিবাহ দিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিধবাবিবাহের চেষ্টায় প্রায় সফলকাম হইয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন স্থানেব বহুসংখ্যক পণ্ডিতের ব্যবস্থাও আনাটয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে বিফলমানরূপে হইয়া পড়েন। কোটার রাজাও বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টার উদ্যোগী হইয়া শেষে স্তব্ধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। স্তার টমাস ট্রেঞ্জ হিন্দু দায়িত্ব বিষয়েব উদ্ভাষকগণ বলিয়াছেন পুনাব জ্ঞানেক উচ্চজাতীয় সম্রাট শেংকব বিধবা কন্যাব বিবাহে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং সেই ব্যবস্থা অনুসরণে বিধবাবিবাহও দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দুগণ এই দুঃস্থ সামাজিক প্রণালী পরিবর্তন জন্য চন্দানীন্দ্রন কাশ বক্তব্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন তিনি নাগপুরব মহাবাউ ব্রাহ্মণের প্রবাক্তব কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন তিনি অষ্টদশবছরক কমিশনেব কাগজপত্র মধ্যে দেখিয়াছেন মোক্ষদেব একজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ১০ বৎসর পূর্বে বিধবার বিবাহবিষয়ক এইকণ আইন প্রণয়ন করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন।†

* Alton, his honorable and learned friend to his right (Sir James Colville) had left Calcutta, Pandit Isvar Chandra Vidyasagar, the learned and competent Principal of the Sanskrit College, who was the chief mover in the agitation out of which the bill had arisen, and was one of the subscribers to the Petition which had been presented to the Council a few weeks ago, prying for the measure, called upon him and consulted him on the propriety of asking the Council for such a law as the Bill now brought in.

† Between three and four hundred years ago, in Bengal, Raghunandan, a very learned and celebrated Pandit, who had written a Digest of the

বিধবাবিবাহ-বিধি প্রণয়ন কালে ভূরতগভর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভায় যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার কোন কোন স্থান অতীব প্রীতিপ্রদ এবং কোন কোন স্থান পাঠ করিতে বিধবা-স্বীবনের দারুণ দুঃখের প্রতি মানবহৃদয়ের গভীর সহানুভূতির স্কার হয় । প্রমাণ :—“যে প্রবন্ধ হইতে তিনি কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহারই একস্থানে লিখিত আছে, বিধবার পক্ষে সমস্ত আমোদ আশ্লাদ নিষিদ্ধ, তাহার নৃত্যগীতাদি দেখিতে ও শুনিতে বাওয়া হইবে না, কিংবা কোন প্রকার পারিবারিক শুভানুষ্ঠানে তাহার বাওয়ার বিধি নাই, কোন প্রকার উৎসবানুষ্ঠানে বহুলোকসমাগমজনিত আনন্দকর দৃশ্য দেখিতে নিষেধ আছে ।”* আমরা স্মিতাসা করি, বালিকা বিধবা কি মানুষ নহে ? আর রূপ ব্যবস্থা কি কেহ কখনও মানিয়া চলে ? ইহাই কিশিষ্টাচার ?

Hindu Law, which formed, he believed, in Bengal a text-book to this day, made a resolute attempt of this kind. He had at one time firmly resolved that his own widowed daughter should re-marry ; but the attempt failed. Raja Rajbullah, of Dacca, about the middle of the last century, made a similar attempt which seems to have been almost successful. He obtained a *Vyavastha* or Law opinion of a large body of learned Pandits ; but finally his attempt also failed. About the same time, the chief of Kotah made a similar attempt, with no better success. Sir Thomas Strange, in his work on Hindu Law, alludes to an instance in which a large assembly of Pandits at Poona actually gave permission to the widow daughter of a Hindu of high caste to re-marry, and the permission was acted upon. Several similar attempts by Hindus to alter this inveterate custom had been made of late years. He had observed, amongst the papers of the Law Commission, a paper written by a learned Brahmin of Madras nearly twenty years ago, praying that a Law to the effect of the present Bill might be passed. He had already mentioned the essay of a Maratha Brahmin of Nagpur, published about the same time. In Calcutta, there was great agitation on the subject about ten years ago, which was repeated two years ago. It was in consequence of the failure of this last attempt that Ishwar Chandra had taken up the subject ; and the petition lately presented was the result.

* The paper from which he was quoting proceeded to say :— All amusements are strictly prohibited to her. She is not to be present where there is singing or dancing or at any family rejoicing ; she is not even to witness any festive procession.

ইহার পূরে আর এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে :—“যদি তিনি বুঝিতে পারেন যে এই দুই ব্রহ্মচর্যাবস্থানে অসমর্থী একটী বালিকাও ব্রহ্মচর্যের গুরুভাব হইতে রক্ষা পায়, তবে কেবল তাহারই জন্য এই আইন পাস করা উচিত হইবে। যদি তাঁহার এই বিশ্বাস হইত যে, (যদিও তিনি ইহার বিপরীত কলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন) এই আইন পাস হইয়া কোন কাজে লাগিবে না, আবাবলগ্না হইয়া পড়িয়া থাকিবে, তাহা হইলেও কেবল ইংবাক্স নামের গৌরব স্বার্থার্থে এই আইন পাস হওয়া উচিত।

বহুসংখ্যক লোকের যত্ন ও চেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই তারিখে ভারত গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইন পাস হইল। আমরা বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট গেজেট হইতে ঐ বিধবা-বিবাহ বিধি ইংবাক্সী ও বাঙ্গালা অনুবাদে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—“(হিন্দু বিধবাবি বিবাহ আইন সিদ্ধ করা গেল।)”

“১ ধারা। স্বীয় পূর্ণ বিবাহ হওয়া প্রযুক্ত, কিংবা বিবাহ হইল কালে যে মৃত, এমন অন্য ব্যক্তির মৃত্যু পূর্ণ বাগ্গদান হইয়াছিল, এই প্রযুক্ত হিন্দুদেব মধ্যে কোন বিবাহ অসিদ্ধ হইবেক না, ও সেইকপ বিবাহ হইলে যে সম্মানাদি জন্মে তাহার অবিধ সম্মান হইবেক না। কোন রীতি ও শাস্ত্র যে কোন অর্থ করা যায়, তাহা ইহার বিরুদ্ধ হইলেও, হইবেক না উচিত।”

“২ ধারা। যে হিন্দু স্বীয় পূর্ণ বিবাহ হয় নাট, তাহার বিবাহ কালে যে যে কথা করেন, কি যে যে ক্রিয়াদি সম্পাদন, কি যে যে নিয়ম করণ ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইবার জন্য পটু হইয়, সেট সকল কথা প্রভৃতি হিন্দু বিধবাবি বিবাহ কালে করা গেল, তাহ সম্পাদন হইলে, কি করা গেল, তাহার সেট ফল

* If he knew certainly that but one little girl would be saved from the horrors of Brahminism by the passing of this Act, he would pass it for her sake, if he believed, as firmly as he believed the contrary, that the Act would be wholly a dead letter he would pass it for the sake of the English name

এই স্থানে একটী নত পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া যেন।

হইবেক । আর ঐ কথা, কি ক্রিয়াদি, কি নিয়ম, বিধবার প্রতি লুপ্তে না বলিয়া কোন বিবাহ অসিদ্ধ করা যাইবেক না ইতি ।'

রাজা রাধাকান্ত দেবপ্রমুখ হিন্দুগণ এই বিধবাবিবাহ-বিধি মজুর হওয়ার বিবোধী হইয়া এক স্বতন্ত্র আবেদন পত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই আবেদন পত্র কলিকাতার সম্রাট লোকদের অস্ত্র কেহই বেশী ছিলেন না, তবে অস্ত্র নানা স্থানের অনুন ত্রিশ সহস্র লোক সে আবেদন পত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে সে আবেদন পত্রের যুক্তি সকল যে কেবল তত প্রবল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহা নহে ; উহাব কোন কোন স্থান নিতান্তই অসম্মতজনক হইয়াছিল এবং ব্যবস্থাপক সভার একটা স্থান (*Indicous*) নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল । গ্রাণ্ট মেসোদর বলিয়াছিলেন বিবেচিগণের ত্রিশসহস্র স্বাক্ষরের তুলনায় বিধবাবিবাহপক্ষীয় লোকদের অল্প-সংখ্যক স্বাক্ষরেবও মূল্য অনেক অধিক । কারণ একপ সংস্কারের পক্ষে সাঁইস কবিয়া অগ্রসর হওয়া কিরূপ কঠিন কাৰ্য্য, তাহা ভাবিলে, প্রত্যেকেই আমাব কথা'র তাৎপর্য্য চুদয়ঙ্গম কবিত্তে পারিবেন । অপর পক্ষে বহুমানাদিপতি মহারাজ মহাতাপটান বাহাদুর ও নবদ্বীপ সমাজের অধিপতি মহারাজ শ্রীশঙ্করের সহকারিতায় বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের পক্ষ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । বিধবাবিবাহ

* "Act XV of 1856, dated 26th July, 1856 I. No marriage contracted between Hindoos shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by the reason of the woman having been previously married or betrothed to another person, who was dead at the time of such marriage, any custom and any interpretation of Hindoo law to the contrary notwithstanding.

"VI. Whatever words spoken, ceremonies performed or engagements made on the marriage of a Hindoo female, who has not been previously married, are sufficient to constitute a valid marriage, shall have the same effect, if spoken, performed or made on the marriage of a Hindoo widow ; and no marriage shall be declared invalid on the ground that such words, ceremonies or engagements are inapplicable to the case of a widow."

বিধিবদ্ধ হওয়াতে বিধবাবিবাহের আন্দোলন দেশ মধ্যে আবণ্ড প্রবল হইয়া উঠিল। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মাননীয় জে, পি, গ্রান্ট মহোদয়ের সর্বশেষ আগ্রহ ও পরিশ্রমেই বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী দল সমবেত হইয়া তাঁহাকে রুতজ্ঞতাশ্রুতক এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। উক্ত অভিনন্দন পত্র ককনগবাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র, বাবু রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সমাজপতি মহাবাজ শ্রীশচন্দ্র স্বহস্তে উক্ত অভিনন্দন-পত্র গ্রান্ট সাহেবকে প্রদান করেন। এটাই আইন পাস হওয়ার পরে "সিঁদ্রি, ফিবেল্ড কপাল।" ইত্যাদি আর একটা সঙ্গীত বচিত, দেশে দেশে প্রচারিত ও গীত হইতে লাগিল।

বিধবাবিবাহের পথে দায়ঃগ ঘটিত যে বিষম অস্বাভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মূলোচ্ছেদ হইল। এক্ষণে বিজ্ঞানাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ দিবস উদ্ভোগ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে সময়ে তিনি এই কার্যে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় তাঁহার পূজনীয় অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছু সুপারামশ দিয়াছিলেন, সেই কথোপকথন নিম্ন যথার্থ উদ্ধৃত করা গেল :—

“প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান সময়ে কিছুদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর নিরন্তর দাস্ত থাকিতেন। সমস্ত বিজ্ঞানাগরের নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য করিতে যে সময় পাটতেন, তাহার মধ্যে সুবিধামতে এক দিন তর্কবাগীশ বিজ্ঞানাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, ‘ঈশ্বর! বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া প্রবল জনবদ, কতদূর কি’ হইয়াছে জানি না, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দেশের বিজ্ঞ ও বুদ্ধমণ্ডলকে স্বনামে আনিতে কতকালা হইয়াছে কি না?’ প্রত্যুত্তরে বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলেন :—‘আমনি বিজ্ঞ ও বুদ্ধমণ্ডলী বলিয়া গণ্য করিতোছেন, তাঁহাতে কলিকতার রাজ্যে রণাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি আপনার লক্ষ্য কি না? আমি উঁহাদের অনেক উপাসনা করিয়াছি। অনেককেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, সকলই ঈশ্বরবীরা ও ধর্ম্মকণ্ঠকে সংসৃত বলিয়া নিশ্চয় কবিরাজি। ঈশ্বর! দুঃখ করেই সত্যসুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। মহাশয়! আমি অনেক দূর অগ্রসর

ইয়াছি, এখন আমার আর প্রতিনিবৃত্ত করিবার কথা বলা নহে ।’ তৎ-
বাসীশ মহাশয় পুনরপি বলিলেন :—‘ঈশ্বর, বালাবধি তোমার প্রকৃতি ও অদম্য
মানসিক শক্তির প্রতি আমার লক্ষ্য রহিয়াছে, তোমার ভগ্নোদ্ধার ও প্রতিনিবৃত্ত
করা আমার সম্বন্ধ নহে । তুমি যে কার্য্যটাকে লোকের হিতকর বলিয়া জ্ঞান
করিতেছ এবং বাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিয়াছ, সে কার্য্যের মূল
বন্ধন সম্যকরূপে দূরতর হয় এবং তাহা অর্দ্ধসম্পন্ন হইয়াই বিলীন না হয়, ইহাট
আমাব উদ্দেশ্য । কেবল কলিকাতাব করেকটা বৃদ্ধ আমাব লক্ষ্য নহে । উত্তর
পশ্চিম প্রদেশ, বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যথায় হিন্দুধর্ম প্রচলিত, ততদূর
দৌড়িতে হইবে । ধর্ম্মবিলোপ ও লোকমর্যাদার অস্তিত্ব করা হইতেছে বলিয়া
দাচার্য্য মনে করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সম্যকরূপে বুঝাইতে হইবে । বিধবার
সংস্কার সন্তান দায়ভাক হইবে বলিয়া যে বিধি হইয়াছে, তাহার পথাপ্ত জ্ঞান
করিতে হইবে । যখন তুমি বাজপুরুষদেব সাধনা এ বিধি প্রচলিত করাইতে
সমর্থ হইয়াছ, তখন পূর্ব্বকথিত দেশবিভাগেব সমাজপতিদিগের সহায়তা লাভে
সতকাণ্ড হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে না ।’* বাজ্য বাধাকাম্ব দেব
বাহাদুরের পবন পূজনীয় তৎকালীন মহাশয়ও যে বিধবাবিবাহের শাস্ত্যবস্থা
স্বীকার ও বিধি প্রচলনে সম্মত ছিলেন, উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে
তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয় । কেবল বঙ্গদেশে না হইয়া সমগ্র ভাবভবর্ষে সাধাতে
এক সময়ে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়, তাই তিনি সে বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্যে
আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ।

বিজ্ঞানাগর মহাশয় দরিদ্র প্রাক্কণেব সন্তান । পিতা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া
কায়করূপে দিন পাত করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্রের
পিতামহ ও প্রপিতামহ উভয়েই সুপরিচিত অধ্যাপক ও সুবিদ্বান ছিলেন ।
সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্গদেশীয় সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসারী অধ্যাপক বংশে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন । সুবিবংশে, বেদবেত্তা পূজনীয় গুরুবংশে কিংবা তত্ত্বলা সাধু সঙ্কম
বংশে জন্মগ্রহণ করা যে পরম গৌরবের বিষয় ও বহু পুণ্যের কথা তাহাতে আর
সন্দেহ কি ? কিন্তু গভীর চিন্তের সতিত বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ

* ঈশ্বর চন্দ্র বামাকর ডেপুটিমাগিষ্ট বাহাদুর মহাশয় তৎকালীন মহাশয়ের জীবনচরিত, ৩১৬২ পৃষ্ঠা ।

পণ্ডিতমণ্ডলী আর সে তপঃপ্রভাব ধারণ করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ও আচার আচরণ বিভিন্নতার আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্বপুরুষাগত ধর্মতত্ত্ব জ্ঞাত বিপুল বিভব আর তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি করে না, নারানিত্যের সুদৃঢ় শৈল-শিখরে আর তাঁহারা বাস করেন না। সত্যবাদিতার সুতীক্ষ্ণ রশ্মিজাল আর তাঁহাদের মহিমময় মুখগুলের শোভা বর্ধন করে না। আজ তাঁহারা হীনপ্রভ, স্নানভাবে অতীতের স্মৃতিকথা বক্ষে ধারণ করিয়া ছাড়ার ন্যায় ভারতের নির্জন প্রান্তে লুপ্ত হইতেছেন। আর জনপিপাসু অসুস্বাদনপ্রিয় একনিষ্ঠ আত্মা পণ্ডিতগণ সেই সকল প্রাচ্য ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতেছেন। আমাদের আশ্রয় ও আড়ম্বরের অন্তরালে আমাদের সমাজ-দেহের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়িতেছে ; জাতীয় জীবন-বৃক্ষের মূল অধ্যাপকমণ্ডলী রসশূন্য ও মৃতপ্রায়, সর্বত্র না হটক, অধিকাংশ স্থলেই প্রায় সম্পন্ন লোকদের ঘোল আনা ভাবেদার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিভাগসংগ্রহ মহাশয় এরূপ বিসম্বল অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিপুল শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং পরানুগত্য পরিহার পূর্বক আত্মনির্ভর ও তদ্বারা লোকসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া অধ্যাপক মণ্ডলীর মুখোচ্ছল করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে জীবনের উচ্চতর আদর্শ প্রদর্শন করিয়া দেশের সমগ্র লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বে প্রবল উদ্ভম ও বিপুল আয়োজনসহ তিনি এই সময়ে বিধবাবিবাহব্যাপারে বিরত ছিলেন, এইবার তাহা বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হইতে চলিল। স্বরায় বিবাহাধী পায় পাখী মিলিল। পাখী খাটুরা গ্রামনিবাসী সুবিখ্যাত রামধন তর্ক-বাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিভাগর। পাখী বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী পলাসডাঙ্গা নিবাসী ব্রজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বধীরা বিধবা কন্যা কালীমতি দেবী। এই বিধবাবিবাহ বিবাহে ৬মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সম্ভাব ছিল। তাঁহার জীবনচরিতে লেখা আছে :—“পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিভাগর তর্কালঙ্কার পরিত্যক্ত অজপণ্ডিতের পদে মনোনীত হন। . . . তর্কালঙ্কারের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। তর্কালঙ্কার তাঁহার বিবাহের সম্পূর্ণ বোধ্যাযোগ করিয়া-ছিলেন। . . . তিনিই প্রথম পরিকল্পিত বিধবা বাগিকার সংযোজন-কর্তা। ঐ বিধবা বাগিকা যাতাব সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের হস্তমিলনে প্রায় সত্তর

গমনাগমন করিত, তাঁহারই বিশেষ প্রবন্ধে মাতা ও কন্যা কলিকাতার প্রেরিত হয়।”*

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ-বিধি প্রচারিত হয়, আর মাসজর অত্যন্ত হইতে সা হইতেই ঐ বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়! কিরূপ আগ্রহ ও অহুরাগের সহিত কার্য করিলে, জীবন উৎসর্গ করিয়া কিরূপে সদনুষ্ঠানসাধনে অগ্রণব হইলে, স্বাধার এরূপ দ্রুত কার্য সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা আমরা এক্ষণে সম্যকরূপে ধারণাই করিতে পারিব না। শত প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে, রাজা রাধাকান্তের দ্বার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষতাচরণ উপেক্ষা করিতে, কত শত লোকের তীব্র বিরূপ সম্মুখ করিতে, যে কিরূপ শূকঠিন সহিত্বতা ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রয়োজন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অনুধাবন করা সম্ভবপর নহে। কেবল বিভাগাগর মহাশয়ের তুল্য ব্যক্তিকে এরূপ কার্যের প্রকৃত গুরুত্ব ও ইহার অনুষ্ঠানকারীর উপযুক্ততা ও প্রকৃত মর্যাদা জদয়জয় করিতে সম্ভব। ক্ষুদ্র ব্যক্তির মহৎ কাণ্ডের মূলা বুঝিবার সামর্থ্য কোথায়? টাকা, টিকনি করিতে, খুঁত ধরিতে আমরা সর্ব্বাংশে মজবুত। উচ্চ উদার ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বজনীন ভাবপ্রণোদিত হইয়া জনসমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতে জদয়ে আগ্রহ জন্মিলে, অন্তরে যে ধর্ম্মভাব-প্রবৃত্ত কর্তব্য জ্ঞানের মহিম্মম্ব বিভাজীলীলা প্রতিভাত হয় এবং সেই আলোকোজ্জ্বল মানস-নেত্র-পথে বিভাগাতর যে অনুলি সঙ্কেত নিপতিত হয়, বাঁহারা তাহা দেখিতে এবং সেই পথে চলিতে বদ্ধশীল হন, কেবল তাঁহারাই বিভাগাগর মহাশয়ের কার্যকলাপের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝিতে সম্ভব। বিধবাবিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইলে পর, বিবাহের সম্যক আয়োজনে তাঁহার জদয়ে যে কি গভীর ভূগির সকার হইয়াছিল, তিনি তাঁহার কণামাত্রও বুঝিতে পারেন, তিনিই দত্ত। পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের ভাগ্য-চক্রের আবর্তনে যে আবর্জনারাশি শুশুকৃত হইয়াছিল এবং বাহার বিনাশ সাধনে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে মহামতি রামমোহন বঙ্গপরিকর হইয়াছিলেন এবং বাহা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইবার পূর্বেই তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন, সেই অনুষ্ঠানক্ষেত্রে ঐশ্বরচন্দ্র বিভাগাতর সেমানীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শকাব্দ: ১৭৭৮, সন ১২৬৩ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ কুম্ভাব্দারম্ভ
বন্ধারণে বিজয়ী বিভাগসাগরের ভেদীয়ব নিনাদিত হইয়াছিল। বাজালার
সামাজিক ইতিহাসে এই দিন, চিরদিন অক্ষর গ্রন্থের-কলকে অঙ্কিত
 থাকিবে। ভবিষ্যৎ বংশ মানস-পটে দেখিবে, দিব্যকান্তি-পরিশোধিত
 সমুদ্রল বিভাগসাগর-মূর্তির স্প্রশ্যারিত দক্ষিণ হস্তের তর্জনীম অগ্রভাগে
 “১২৬৩ সালের অগ্রহায়ণের ত্রয়োবিংশ দিবস” আলোক-রেখার
 লিখিত রহিয়াছে। কস্তা কালীমতি দেবী জননীসহ সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাবু
 রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। বর শ্রীশঙ্কর
 বিভাগর কলিকাতার আসিয়া সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে
 উঠিয়াছিলেন। ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার দিবস সন্ধ্যার প্রাকালে নানা স্থানের
 পণ্ডিতমণ্ডলী ও অন্যান্য সম্রাট মহাশয়গণ বিবাহবাটীতে সমবেত হইলেন,
 পুরাণনারা কস্তাকে সমরোৎসবগী বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া বরাগমনের
 প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুকিয়া ষ্ট্রীট ও তরিকটবর্তী রাজপথসমূহ
 লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে; যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, মনুষ্যমূর্তি ভিন্ন আর
 কিছুই দেখা যায় না। পরিচিত অপরিচিত ইত্যর ভদ্র গায়ে গায়ে মাথায়
 মাথায় ঠাড়াইয়াছে। বিভাগসাগর মহাশয় এইরূপ জনতা ও বাধাবিঘ্নের
 আশঙ্কা করিয়া পূর্বে হইতে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে
 সুকিয়া ষ্ট্রীটে এবং যে পথে বর আসিবে সে পথে, প্রত্যেক দুই হস্ত অন্তর
 পুলিশ পাহারা রাখা হয়। যখন বর ও বরবাত্রী বিবাহবাটীতে আসিলেন,
 তখন বর দেখিবার জন্য পথে এত জনতা হইল যে, বরের পাকী লইয়া
 অগ্রসর হওয়া সুকঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িল। নূতন ব্যাপারের পথপ্রদর্শক
 হইতে গিয়া বরের সদাচিন্তিত ও চমকিত চিত্তে এই জনতাভাণ্ডে যে আশঙ্কার
 উদয় হইতেছিল, রামগোপাল ঘোষ, রসচন্দ্র ঘোষ, শঙ্কুনাথ পণ্ডিত, দারকানাথ
 বিদ্য, প্রভৃতি বিভাগসাগর-বন্ধুমণ্ডলী বরের দক্ষিণে ও বামে পাকী ধরিয়া উৎসাহ
 ও আনন্দ বর্ধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। এইরূপ সমারোহ
 ও জনতার মধ্য দিয়া বর ও বরবাত্রী বিবাহ বাটীতে প্রবেশ করেন।
 বিবাহ সূতায় সংযত কালেকের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ অনন্যায়গণ তর্কপকানন,



ସିଦ୍ଧିଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି

ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও ভায়ানাথ তর্কবাচস্পতি ও অজ্ঞাত চৌলের অধ্যাপকদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।* বিবাহ সভা, বিবাহের নিয়ন্ত্রণ ও আয়োজন কিরূপ হইয়াছিল, পুরাতন ‘ভববোধিনী’ হইতে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল :—

বিধবা বিবাহ ।

আমরা পরমাফ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি, যে আমাদের চিরবাহিত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ গত ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবাসরে দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিভারায় ভট্টাচার্য্যের সহিত পলাসডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ভদ্রবংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ সুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কস্তার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। এই কস্তার বয়স ৪ বৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে ইহার সহিত নবমীপাখিগতি রাজার গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত কল্পীগণপতি ভট্টাচার্য্যের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রথমতঃ বিবাহ হইয়াছিল, ঐ বিবাহের ২ বৎসর পরে অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়সে ইহার বৈধবা হয়। এই কস্তা পতিকূলে বাস করিত, ইহার জননী স্বীয় গৃহিতার অসহ্য বৈধবাবৃত্তি সহ্য করিতে না পারিয়া আপন আত্মীয়বর্গের সন্মতি অনুসারে তাহার পুনঃ পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনার্থে অতীত যত্নশীলা হইলেন এবং সেই যত্নানুসারে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই কস্তার পিতা লোকান্তরিত হওয়াতে ইহার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও দেশ প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী উল্লিখিত পাত্র ইহাকে সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্মণবর্ণের বিবাহ উপলক্ষে এদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও কুশণ্ডিকাদি যে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, এ বিবাহে সে সমস্তই হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই। এই বিবাহে ন্যূনাত্মক আটশত নিয়ন্ত্রণ পর হস্তিত হয়, তত্তির অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগের নিয়ন্ত্রণের অল্প কতকগুলি পর পৃথকরূপে সংকলিত কবিতার মুদ্রিত হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা ঐ দুই প্রকার পত্রই পশ্চাতে অবিকল সংকলন করিলাম।

শ্রীলক্ষ্মীমণিমেঘাঃ বিনয়ঃ নিবেদনম্

২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কস্তার শুভ বিবাহ হইবেক, মহাশয়েরা অনুগ্রহে পূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিঁহুদিয়ার স্ক্বেন্ স্ট্রীটের ১২ নম্বাক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকাজ্য সম্পন্ন করিবেন, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি । তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দা: ১৭৭৮ ।

অন্ত্যে ভোমে নিশান্তে বিলসতি নিতরাং পল্লিনীপ্রাণকান্তে

স্বাহাকান্তে অগাংশে দিনকিরণদিনে শাস্তমার্গানুসারী ।

ভূয়োভাবী বিধানাৎ পরিণয়নবিধিভূত্বীনাহুজারাঃ

পূর্য্যোবর্ষাধিবিত্তিরিহ সদসি গতেশ্বংরূপাপারতর্যাং ॥

ইহার পরদিবস পানীহাটী গ্রামনিবাসী এসিদ্ধ কারয় কুণীনবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু হরকালী ঘোষের-ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সহিত কলিকাতানিবাসী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্রের দাদাশরীরী বিধবা কস্তার বিবাহ হয় । এই কস্তাকে ইহার পিতাই সম্পাদন করেন । ইহাও কারয়বর্ণের নির্দিষ্ট কুলোচারাধুসারে সম্পন্ন হয় ।

উল্লিখিত মহৎ ব্যাপার সম্পাদন উপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছিল । শুভ বিবাহের সভার আর কলিকাতা নিবাসী প্রধান প্রধান সমস্ত তত্ত্ব পরিবারেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল এবং অনেক ভদ্রসন্তান কারয়নোবাকো পরিশ্রম করিয়া উক্ত কৰ্ম সমাধা করিয়াছিলেন । উল্লিখিত পক্ষে এত লোকের সমারোহ হইয়াছিল যে, সকল লোক জুজ্বররূপে বসিতে স্থান প্রাপ্ত হইতেন নাই এবং কন্যাসম্মানের বাটীর নিকটস্থ রাজপথ শকটাদি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল । বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রাবসারী অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতও উক্ত বিবাহের সভার অধিষ্ঠিত হইয়া শুভকৰ্ম সম্পন্ন করাইয়াছিলেন । এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হওয়ার্তে যে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রকাণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । কোন কোন ব্যক্তি মহানন্দে পুলকিত হইয়া আজ্ঞাদসাগরে ডাসিতেছেন এবং কোন কোন লোক শোকে হৃদয়ান হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন ; কেহ বা এই ঘটনাকে বঙ্গদেশের চিরকলঙ্কবৎ কারণ-জানিয়া ইহার প্রয়োজক ও প্রযত্নকরিত্তিকে বনের সহিত সাদৃশ্য প্রদান করিতেছেন 'কেহ বা ইহাকে নিচর ভারতবর্ষের কলঙ্কবস্ত্র ও

হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্যের হেতু মনে করিয়া ইহার উদ্ভোগকর্তা ও উৎসাহদাতাদিগকে মানাপ্রকার অগ্রাঘ্য কটু কাটব্য করিতেছেন। যে সকল জ্ঞানসম্পন্ন দেশহিতৈষী কুড়িয়ান লোক এই পরমকল্যাণকর শুভ ঘটনা সম্পন্ন হইবার প্রতি বহুকাল হইতে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছিলেন, যাহারা এই শুভদিন উপস্থিত হইবার ঐক্য প্রতিদিন দিনগণনা করিতেছিলেন, যাহারা এই আশঙ্কময় সুখের দিন প্রাপ্ত হইবার জন্য চরৎলাগিনী আশালতার মূলে নিয়ত বস-বারি সেচন করিতেছিলেন, এবং যাহারা এই বিধবাবিবাহরূপ পুণ্যতরুকে ঘেঁষাশন করতুমিতে যোগ্য করিবার জন্য নানাপ্রকার মানসিক ও মৈহিক পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক বঙ্গেশ্বর অনেক বহু বাক্যের মানসক্ষেত্রে ইহার বীজ বপন করিয়াছিলেন, এই ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহাদিগেরই মনে আশঙ্কের উদয় হইয়াছে। এই চিরবাহিত ও দূরগমিত সুখময় শুভদিন উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারাও আত্মদোষে পুলকিত হইয়াছেন এবং এই কল্যাণকর পুণ্যতরু সত্বরে সকল হওয়াতে তাঁহারাও আপনাদিগের সকল শ্রম ও সকল ব্যয়কে সার্থক জ্ঞান করিয়া আনন্দস্রোতে প্রাবিত হইতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, অগম্যধর্মের অসম্পূর্ণ করণা প্রসাদে তমসাক্ষর ভারতবর্ষে জ্ঞান-সুখের উদয় হওয়াতে ক্রমে ক্রমে এখান হইতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতেছে, জ্ঞানজ্যোতিঃ-প্রভাবে ভারতবর্ষের অনেক সন্তান জননী অন্ধভূমিকে নানাপ্রকার অন্ধকণ্টকে বিদ্ধ দেখিয়া তাহা উত্তোলন করিবার জন্য ব্যাকুলিত চিত্ত হইয়াছেন এবং তাহাকে পুণ্যকর্মরূপ পরম শোভনীয় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবার কার্যমোহকো বন্ধনী হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন যে, পাণ্ডারে প্রসীদ্ধিত জরতরুমি অনেক সাধু ব্যক্তির বয় হেতু এতদিনে খট্ট সকল পাপের ভার হইতে পুনর্বার মুক্ত হইতেছে, ভবনবিখ্যাত হিন্দুজাতির বহুকালের গাড় কলঙ্ক ক্রমে অপনীত হইবার উপায় হইতেছে এবং অবনতমস্তক হিন্দুস্থান পুনর্বার উন্নতপ্রাণ হইয়া আপনায় মহত্ব প্রকাশ করিবার পথ প্রাপ্ত হইতেছে এবং যাহারা এই সমস্ত শুভ চিত্ত সন্ধান করিয়া হিন্দুস্থানের শ্রীমুখ্য ও হিন্দুজাতির দৌরব্যুত্থির জন্য আশঙ্কাজালে নিয়ত বশবত্তী করিতেছেন। কিন্তু যে সকল জ্ঞানহীন পাতিজ্যোতিমানী বেকপরবশ লোক আপনাদিগের নৃসংবল কুসংস্কার হেতু এই সকল শুভ ব্যাপারকে অকারণে নিম্নিত করণ মনে করিয়া, ইহা

সম্পন্ন হইবার প্রতি নানার্থকার ব্যাখ্যাত করিরাছে, তাহার দ্বারা ধর্ম্মার্থের কোন বিচার না করিয়া এই শুভ দিন উপস্থিত হইবার আশঙ্কার নিরস্ত শক্তি হইরাছে এবং তাহার এই শুভানুষ্ঠানকর্তা সাধুদিগের আশালভার সুলোভেন করিবার জন্য কার্যমনোবাক্যে চেষ্টা করিরাছে এবং তাহার জ্ঞানচক্ষুকে একবারে ক্রম করিয়া এবং বুদ্ধি, বৃত্তি ও বিচারের পথে এককালে কষ্টক প্রদান করিয়া দেশপ্রচলিত ব্যবহারপরম্পরাকেই সর্বসিদ্ধি জ্ঞান করিয়া, তাহা নিরাকৃত হইবার নাম প্রয়ণ করিলে শুদ্ধবুদ্ধি ও লোমাক্ষিত কলেবর হইরাছে, এই নিত্যবাহিত শুভ সংকল্প সিদ্ধ হওয়ার তাহারাই শোকসাগরে মগ্ন হইরাছে এবং এষ্ট সম্বাপহারক নীতলতল ধর্ম্মরক্ষ কলবান হওয়ার তাহারাই হতাশ ও হতাশেতন হইয়া অনর্থক হাহাকার করিতেছে। তাহার মনে করিতেছে যে, ক্রম কলি প্রবল হওয়ার ধর্ম্মের স্রোত এককালে ক্রম হইবার উপক্রম হইল, ধর্ম্মশাস্ত্র লোকসমাজে অমান্য হইয়া উঠিল এবং ভারতবর্ষে অধর্ম্মের অধিকার দিন দিন বিস্তৃত হইতে লাগিল, তাহার ভাবিতেছে যে, এত দিনের পব হিন্দু নাম বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, ভারতভূমি ক্রমে পাপভাব ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল এবং হিন্দুজাতির মান, দশ, শ্রী, সৌভাগ্য সকলই অস্থায়িত হইয়া গেল। তাহার এই সকল অমূলক আশঙ্কা করনা করিয়া আপনাদিগর ভাবী সৌভাগ্যের আশাতরসাকে এককালে ক্ষীণ করিয়াছে। কিন্তু এষ্ট বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়ার যে ভারতবর্ষের কি পঞ্চাঙ্গ সৌভাগ্য উপস্থিত হইরাছে এবং ভারতবর্ষবাসী হিন্দুজাতির কতদূর মৌরব বুদ্ধি হইবার পথ হইরাছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপ ক্রমে যদি ভারতবর্ষের সকল কুপ্রথা নিরাকৃত হয় এবং এখানে সুপ্রকৃতি সকল প্রচলিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ভারতভূমি পৃথিবীর মধ্যে পুনর্ব্বার সর্বাঙ্গগণ্য ধর্ম্মরক্ষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এক হিন্দুজাতি সমাকল্পে নিরুপদ ও নিম্পাপ হইয়া উঠে। বিধবাবিবাহ কার্য্যকর প্রচলিত হওয়ার তাহার মনে মনে বিশ্বাস হইরাছেন, এক এ দেশের অষ্টকে অকারণ নিন্দা করিতেছেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া যেখিলেই তাহা-দিগের সে বিবাহ দূর হইবেক, এক তাহার অদেশকে সৌভাগ্যশাসী যেখিতে পাইবেন। এদেশে পতিহীনা অনাথাদিগের পুনরুত্থানের প্রথা প্রচলিত না

যাকালে যে এখানে ক্রমহত্যা, ব্রীহত্যা, ব্যক্তিচার প্রভৃতি মানা প্রকার উৎকট উৎকট পালের পথ পরিষ্কৃত ছিল, তাহা নানা পণ্ডিত বারংবার নানা প্রকার বুদ্ধি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তাহার অতি সামান্য বুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে; অতএব সেই প্রথা প্রচলিত হইলে যে, ঐ সমস্ত পালের পথ অবশ্যই বন্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই এবং তদ্বারা দেশের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলেরই বা সম্ভাবনা কি? ইহাতে হিন্দুধর্মাত্মানী প্রতিপক্ষীয় মহাশয়েরা কি অল্প বে উৎসাহাশ্বিত না হইয়া বিব্রত হইবেন তাহা আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই, তবে তাঁহারা যদি কেবল অভিমান পরবশ হইয়া এক বর্ষা ধর্ম্মধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, বহুকাল প্রচলিত বংশ-পরম্পরাগত দেশব্যবহারের উচ্ছ্র ও অপ্রচলিত, আধুনিক প্রথার প্রচার দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, তাহা হইলে আর আমাদের কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহারা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে মনে অভিমান করেন, পণ্ডিত বলিয়া পরিচর দেন এবং ধর্ম্মপালক বলিয়া দস্ত করেন, এমন মঙ্গল বিষয়েও এ প্রকার আনন্দের স্থলে তাঁহাদিগের দুঃখিত হওয়া ও অনায়াসে প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হয় না। দীর্ঘ কালের পর শারীরিক কোন চিররোগের আরোগ্য হইলে তদন্ত আবেশ করা যেমন অসঙ্গত, সেটরূপ দেশপ্রচলিত কোন প্রাচীন কুপ্রথার উচ্ছ্র দেখিয়া খেদ করাও অজ্ঞার। তাহা হউক প্রতিপক্ষীয় মহাশয়দিগের চিন্তা বশন কিংবা স্থির হইবে, যেহেতু নির্দোষ হইবে, এবং অভিমান দূরে গমন করিবে, তখন তাঁহারা আপনা হইতেই দেখিতে পাইবেন যে, এখানে বিশ্বব্যবহারের প্রথা প্রচলিত হওয়াতে এ দেশের কিরূপ সৌভাগ্য হইয়াছে।

একশ্রেণে যে সকল অসামান্য লোকের প্রবর্তে এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের উৎসাহে এই চিরব্যক্তি স্থপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের অসাধারণ শক্তি ও অতুল্য গুণের বিষয় বর্ণন না করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না। এই মহাব্যাপার যে কতিপয় অসামান্য বী-সম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাশয়দিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্বপ্রাণপ্রিয় প্রিয়তম ইন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞানসম্মত মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন-

সঙ্গেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই
অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে।

এই মহাব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও যে পর্য্যন্ত যত্ন
স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা শত বর্ষেও বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিব
না। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা ও তুলনারহিত ধীশক্তিই
এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইবার প্রধান কারণ। তিনিই অসাধারণ বুদ্ধিবলে
হিন্দুদিগের সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সমন্বয় করিয়া তাহার শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং
বিধবাবিবাহ যে হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ নহে, তিনি স্বীয় বিচার কোশলে তাহা সকল
লোককে শিক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহারই প্রভাবে হিন্দুশাস্ত্রের এ কলঙ্ক দূর
হইল এবং তাঁহারই প্রসাদাৎ হিন্দু বিধবারা অসহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল।
তিনি এই শুভসংকল্প সিদ্ধকরণার্থে নিন্দাকে নিন্দা বোধ করেন নাই, অপমানকে
অপমান জ্ঞান করেন নাই, এবং কটুকাটব্য ও উপহাসাদির প্রতি ক্রোধও
করেন নাই। তিনি যখন বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচার করেন,
তখন প্রতিবাদিগণ তত্ত্বতরে তাঁহাকে কটু কহিতে অপেক্ষা রাখে নাই, নিন্দা
করিতেও ক্রটি করে নাই, এবং নানা শত্রু নানা মতে বৈরসাধন করিতেও
ক্ষান্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার ভূধরনিশ্চল স্বাভাব কিছুতেই বিচলিত
হয় নাই। বজ্র যেমন পর্ব্বতের উপর পতিত হইয়া আগনিই তেজোহীন হয়, শত্রু-
গুণের নিন্দাবাদ ও কটুবাণী সকলও সেইরূপ তাঁহার উপর পতিত হইয়া আপনা
হইতেই নিস্বেজ হইয়াছে। তিনি যদি জ্ঞানহীন অবোধ লোকের বৈরব্যবহারে
বিরক্ত হইয়া এই শুভানুষ্ঠান সিদ্ধ করিতে কোনরূপে ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা
হইলে ভারতবর্ষীয় বিধবাদিগের প্রজ্জলিত বৈধব্য-যন্ত্রণানল নির্বাপিত হইবার
আর কোন উপায় হইত না এবং চূড়ান্ত ভারতবর্ষ ভ্রূণহত্যা ও ব্যভিচারাদি পাপ-
ভায় হইতে কল্পি কালেও পরিত্রাণ পাইত না,—অনাধা বিধবাদিগের ছদয়স্থিত
শোকান্নি-নিঃসৃত নিঃশ্বাসনলে ভারতবর্ষ চিরদিনই দগ্ধ হইত।

হা অগদীশ ! এ সমস্ত কল্যাণকর ব্যাপারের মধ্যে আমরা কেবল তোমারই
মহিমা সন্নির্দন করিতেছি এবং তোমারই প্রসাদ প্রভাষ করিতেছি। তুমি যে
কোন স্থানে ও কোন কোণে জীবের কল্যাণ সাধন কর, কাহার সাধ্য তাহা

বৈধগম্য করিতে পারে? কাহার মনে ছিল যে তৎসামাজিক ভাবতবর্ষে হিন্দু বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়া পতিহীন অবলাদিগের অনিবার্য শোকান্নি নির্বাপন করিবে, কে মনে করিত যে হিন্দু বিধবা বনিতারা হৃৎশ্বেদ শাস্ত্রের শাসন ছেদ করিয়া আপনাদিগের হৃৎখরশিকি নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে? আহা! তাহাদিগের * অসহ স্বর্ণা স্বরণ হইলে এখনও আমাদের অশ্রুপাত হয়। তাহারা যে আবার এ শুভ দিন প্রাপ্ত হইবে, আমাদের আর ইহা মনে ছিল না। কেবল তোমার কৃপাই এ সকলের মূল। ভারতভূমি পূর্বাধি ধর্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং হিন্দু জাতি চিরদিনই ধর্মপুত্র বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের স্বাক্ষর দেশ-ব্যবহারে সে সকল সম্পত্তিই হরণ করিয়াছিল, আবার তুমিই তাহাদিগকে সে অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিবার পথ প্রস্তুত করিলে। অতএব আমরা তোমাকেই নমস্কার করি। যে বৈধব্যব্রতাকে এ দেশের স্ত্রীলোকে অনিবার্য মনে করিয়াছিল, যে রোগকে তাহারা অসাধ্য ও অনারোগ্য ভাবিয়াছিল, বাহা হইতে তাহারা কসিনকালে মুক্তি পাইবার আশা করিত না, এক্ষণে যে মহাত্মা ব্যক্তির প্রযত্নে সেই ব্রতের শেষ হইল, সেই রোগের ঔষধ স্থির হইল, এবং তাহা হইতে এ দেশীয় স্ত্রীলোকে মুক্তি পাইল, তাহার এই অসামান্য কীর্তি যেন নিত্যকাল পৃথিবীর মধ্যে তোমার মহিমাকে মহীয়ান করে, অবশেষে এই আমাদের প্রার্থনা।

পরমশ্রদ্ধাস্পদে—

সবিনয় নিবেদন মিদ—

আমি ৬এ পোষে এলাহাবাদে পঁছিয়া ৯এ পোষে কীটগঞ্জে লালা বংশী-ধরের দক্ষ শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মিশ্রের বাগানে বাসা করিয়াছি। আমার মস্তকের পীড়ার অল্পে অল্পে উপশম বোধ হইতেছে, কিন্তু উদরের দোষ কিছুতেই বাইতেছে না। অম্লরোগ (acidity) অতিশয় প্রবল, স্তূতরাং সূচাকরূপ আহাৰাদি করিতে পারি না। এখানেও অগ্নিমান্দ্য ও অম্লরোগ প্রবল থাকিবে ইহা আমি কখনও মনে করি নাই।

আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবাবিবাহের শুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষের সর্বসাধারণ লোকে এ বিষয়ের নিমিত্ত আপনাদি

নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল। আমি যেন এ সময়ে তথ্যের থাকিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ কয়িন্ কালেও যাইবেক না। মাঘ মাসে কয়েকটি বিধবা-বিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল শুনিয়াছিলাম, তাহার কি হইয়াছে লিখিয়া বাখিত করিবেন। প্রাট সাহেব অবিলম্বে বিলাত-যাত্রা করিবেন ও আপনি তাঁহার পক্ষে নিযুক্ত হইবেন এই শুভসংবাদ সমূলক কি না, অনুরূপপূর্বক লিখিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রামাচরণ বিশ্বাস ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়দিগকে আমার সমস্ত্রীত সাদর নমস্কার অবগত করিবেন। ইতি।

শ্রীঅক্ষরকুমার দত্ত।

বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া বিভাগাগর মহাশয়কে নানা প্রকারে বিপদ হইতে হইয়াছিল। গত প্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান বিপদ এই যে, বিধবাবিবাহের সূচনা হইতে কলিকাতার কেহ কেহ গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৃদ্ধ পিতা ঠাকুরদাস, বীরসিংহের বাটীতে বসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার অশেষ গুণের আধার প্রিয়তম পুত্র ঈশ্বর-চন্দ্রের প্রাণসংহারের জ্ঞাত লোক নিযুক্ত হইয়াছে। এই নিদারুণ হুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং শ্রীমন্ত নামে যে এক সর্দার বাড়ীতে ষারবান ও পাইকের কার্য করিত, তাহাকে কলিকাতার 'বিভাগাগর মহাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। বিভাগাগর মহাশয় যখন কোথাও যাইতেন, পথে সেই শ্রীমন্ত সর্বদা সঙ্গে থাকিত; বিধবাবিবাহের আন্দোলনরূপ বৃহৎ বস্তার যখন সমগ্রদেশ ভাসিয়াছে, সেই সময় এক দিন রাত্রি বিপ্রহরের সময় সংস্কৃত কালেজ হইতে বাসায় আসিবার সময়ে ঠনঠনিয়ার কালীতলায় দেখিলেন, কয়েক জন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইতেছে। মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের এক মহাপুরুষের অকালে গোপনে শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই ভীমকার শত্রুদিগের সমাগমে তিনি ভীত কিংবা চিন্তিত হইলেন না, কেবল একটিবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কইরে ছিঁরে, সঙ্গে আছিল কি?” শ্রীমন্ত পশ্চাৎ হইতে বলিল, “তুমি চল না, কে আসে যায়, সে আমি দেখিব, তুমি চলিয়া যাও চাকর সঙ্গে আছে।” শ্রীমন্ত যে উত্তর

করিল, তাহা শুনিয়া^১ আক্রমণকারীরা তৎক্ষণাৎ বুঝিল যে, বিভাগাগর সুরক্ষিত হইয়া চলিয়াছেন, আর একটি পাও অগ্রসর হইল না ; যে বতদূর আসিয়াছিল, সেইখান হইতে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইল । এই সময়ে রাত্রিতে শ্রীমন্তকে সন্দেহ না হইয়া তিনি কোথাও বাইতেন না । সিপাহীবিরোধের সময়েও শ্রীমন্ত কলিকাতার বিভাগাগর মহাশয়ের শরীর রক্ষার্থে নিবৃত্ত ছিল । ঐ সময়ে সংস্কৃত কালেজে ইংরেজ সৈন্তদিগকে থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছিল । এক দিন শ্রীমন্ত দিনের বেলায় প্রয়োজনবশতঃ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে, সে কালেজ-গৃহে প্রবেশ করিতে বাইতেছে, গোৱারা আসিয়া বাধা দিল, তাহারা পথ ছাড়িয়া দিবে না, ছিরেও জোর করিয়া গোৱার বাধা অগ্রাহ করিয়া সেই পথে প্রভুর নিকট বাইবে । শ্রীমন্তের যেমন শক্তি ছিল, তেমনি সর্দারগিরিও জামিত ভাল, সাহসও ছিল অসীম । শ্রীমন্ত একবার সাহেবদের বল পরীক্ষা করিবার জন্ত সেই বাধাপ্রাপ্ত পথে লাঠি হাতে অগ্রসর হইল, গোৱারা প্রথমে নিষেধ করিল, শেষে ধরিয়া সরাইয়া দিতে গেল । কিন্তু শ্রীমন্তকে সরাইতে পারিল না, শ্রীমন্ত সম্মুখ হইতে দুই হস্তে দুই দিকে সাহেব সরাইয়া পথ করিয়া চলিয়া যার দেখিয়া অপদস্থ হইয়া গোৱারা বন্দুক ধরিয়াছে, তখন শ্রীমন্ত লাঠি ধরিয়াছে ! লাঠি খেলিয়া বন্দুকের গুলি নিবারণ করিতে উত্তত হইয়াছে, এমন সময়ে গোৱা-সৈন্তের কর্তৃপক্ষ সাহেব সেইখানে আসিয়া পড়িলেন । তিনি গোৱাদিগকে ঐরূপ ব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়া সন্তোষিত চিন্তে একবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং গোৱাদিগকে বলিলেন, “কি করিতেছ ? ও যে পশুভৈরব লোক !” গোৱারা ‘জ্যেষ্ঠের মুখে হুন পড়ার মত’ ভয়ে জড়সড় হইয়া দশ হাত তাকাতে গিয়া দাঁড়াইল । বিভাগাগর মহাশয়^২ আসিয়া শ্রীমন্তকে যখন তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমন্ত গর্ভভরে বলিল, “দেশের লোক সবই শু এক একবার নাড়াচাড়া দিয়া দেখিয়াছি, সুবিধা পাইয়া একবার সাহেব পরক করিয়া দেখিছিম ।” প্রভু বলিলেন, “এখন যে গিছলিরে বেটা !” শ্রীমন্ত বলিল, “আজ্ঞে আমার হাতে যে লাঠি ছিল, কায় সাধ্য আমার গায়ে হাত দেয় ।” বিভাগাগর মহাশয় বলিলেন, “তোমার গায়ে কি হাত দিত ? বন্দুকের গুলি মারিয়া তোকে সাবাড় করিত ।” শ্রীমন্ত তাহার স্নেহাম স্তম্ভখানিকে টাঙ্গাইয়া দিয়া ব্রজিত করিয়া বলিল, “যদি বন্দুকের গুলিতে মরিব, তবে লাঠিগাছ

ধরি কেন ? ওদের বন্দুক ভাঙতে হয়, আমার লাঠি সমানে চলে ।” বিজ্ঞানাগর মহাশয় শ্রীমন্তের বীরত্বকাহিনী জানিতেন, তবুও একবার লাড়াচাকা দিয়া ছুটী কথা গুনিলেন ।

১২৬৩ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বহু মহাশয়ের পিতৃব্যপুত্র ৬জগীন্দ্রনারায়ণ বহু ও সহোদর শ্রীযুক্ত মদনমোহন বহু ক্রমায়ত্তে এক একটা বিধবা কস্তার পাণিগ্রহণ করেন । এই উভয় বিবাহও বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল ।

এতাদৃশ অলস অর্থব্যয়ে তিনি ক্রমে ক্রমে নিঃশ্ব হইয়া পড়িতে লাগিলেন । বাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ মুখ দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া এই বৃহৎ ব্যাপারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা গুরুপ্রতিপদের চাঁদের মত উদয় হইতে না হইতে অদৃষ্ট হইলেন । দরিদ্র ঈশ্বরচন্দ্রের সমক্ষে নিরাশা-অমাবস্তার ঘন অন্ধকার পূর্ণ-মাত্রায় জ্বীড়া করিতে লাগিল । কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটা বৃহদাকার নক্ষত্রের জ্বার তাঁহার কোন কোন ইংরাজ বহু তাঁহার বিষাদপীড়িত আশার আকাশে উদ্ভিত হইয়া উৎসাহের আলোক বিতরণ করিতেছিলেন । দৈবাৎ পূর্ব গগনে উদ্ভিত নক্ষত্রের জ্বার কোন কোন স্বদেশীয় বহুর কিছু কিছু সহায়তা পাইয়া উপস্থিত হইতেন ; এবং তাহাতেই অতি কষ্টে সে সময়ে বিধবাবিবাহ-কার্য চালাইতে সক্ষম হন, কিন্তু নিজের অভাব ও অসুবিধার কথা এক দিনের জন্তও ভাবেন নাই ; এইরূপ অর্থব্যয় ও তজ্জন্ত নানা প্রকার অসুবিধা ও অনটনের মধ্যে তিনি যেরূপ নিশ্চিন্তমনে দিন যাপন করিতেন, তাহা চিন্তা করিলে অবাক হইয়া বাইতে হয় । শতবিধ অসুবিধার মধ্যে যখন তিনি এই বৃহৎ কার্যে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার এই সমাজসংস্কার ব্যাপারে বাঁহারা বিশেষভাবে সহকারিতা করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ ৬রাজনারায়ণ বহু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজন । বিজ্ঞানাগর মহাশয় রাজনারায়ণ বাবুর সহায়তা লাভে, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাসূচক যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল ;—“আপনি অসাধারণ সাহস প্রদর্শন পূর্বক বিধবাবিবাহের মঙ্গলার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি * * * যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অবশি আপনাকে স্বরণ হইলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকি । বস্তুতঃ আপনি অতি মহাত্ম্য-কর্ম করিয়াছেন । এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া স্নান প্রকারে

আপনার মনের যেরূপ রূপ হইতেছে, আর কাহাকেও সেরূপ রূপ পাইতে হইতেছে না ।”

হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় বাবু ছর্গামোহন দাস মহাশয় বরিশালে অবস্থানকালে তাঁহার বালিকা বিমাতার বিবাহের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া জ্যেষ্ঠ মহোদয় বিখ্যাত উকিল ৮কালীমোহন দাস মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতার প্রথমদ্বারা বিফলমনোরথ হইয়া বিজ্ঞাসাগর মহাশয়কে যে গভীর আক্ষেপপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বিজ্ঞাসাগর মহাশয় নিজে বিবাদ ও বিপদের মধ্যে মগ্ন থাকিয়াও নিরাশার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, ছর্গামোহন বাবুকে যে সাহায্য ও গভীর অনুরাগপূর্ণ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, সেই সুন্দর পত্রখানি এই ;—

অশেষ শুভাশ্রয়

শ্রীযুক্ত বাবু ছর্গামোহন দাস মহাশয়

পরমকল্যাণভাজনেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

অন্নদাচরণকে যে দিন শেষ পত্র লিখি, ঐ দিনেই আপনাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া স্থির করিয়াছিলাম, পরদিন লিখিব, কিন্তু পরদিন অধিকবার ভেদ হওয়াতে কয়েক দিন একরূপ দুর্ভাগ ছিলাম এবং তৎপরে আর কয়েকদিন কোন বিশেষ কারণ বশতঃ একরূপ ব্যস্ত ছিলাম যে আপনাকে এত দিন পত্র লিখিয়া উঠিতে পারি নাই, ফ্রাট গ্রহণ করিবেন না ।

আপনি অভিপ্রেত বিষয়ের সিক্তির নিমিত্ত যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সফলিত বিষয়ে যেরূপ ব্যাখ্যাত ঘটিয়াছে তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কি পর্য্যন্ত হুঃখিত হইয়াছি বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে । এবিষয়ে আপনি যে কিরূপ ক্ষোভ ও মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এই ক্ষোভ ও মনস্তাপ সহসা আপনকার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবার নহে । কিন্তু সাংসারিক বিষয়ের এইরূপই নিয়ম । সজ্জিতপ্রায়সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে না । “শ্রেয়ানি বহুবিশানি” শুভ কার্যের নানা বিষ । আমি যে অবধি এই বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম

সর্বদা এই আশঙ্কা করিতাম, আপনকার অগ্রজের কর্ণগোচর হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবেক। অবশেষে তাহাই ঘটয়া উঠিল। বাহা হউক এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা কত উত্তোষ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠিবে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, বাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়ঙ্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাধাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এমন অবস্থায় চেষ্টা করিয়া যতদূর কৃতকার্য হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়। এ বিষয় সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে ধেরূপ প্রকা ও প্রশংসা করিতাম, এইরূপে ব্যাধাত ঘটতেও সেইরূপ করিব। কারণ কর্ম সম্পন্ন হউক না হউক, আপনকার সাহস, মানসিক মহত্ব প্রভৃতি প্রধান গুণের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং ইহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সকল বিষয়ে আপনকার সম্পূর্ণ হস্ত থাকিলে অবশ্যই অভিপ্রেত কর্ম সম্পন্ন হইত। আপনি ধেরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমার বোধ হয় আর কেহই সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ফলতঃ আপনি একজন প্রকৃত পুরুষ বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবী হউন, আপনি দীর্ঘজীবী হইলে অনেক লোক অনেক প্রকারে আপনকার নিকট অশেষবিধ উপকার লাভ করিতে পারিবেক।

আমি অনেকবার অনেক প্রামাণিক লোকের মুখে আপনকার গুণানুবাদ শুনিয়াছি এবং আপনি সদাশয় সরলহৃদয় অকুতোভয় উদারচরিত ও সর্বদা পরের হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি।

আমি অজ্ঞাপি শারীরিক সম্যক স্বচ্ছন্দ হইতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে আপনকার মঙ্গল সংবাদ পাইলে পরম পরিতোষ লাভ করিব, ইতি।

ভবদীয়ত

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণ:

যখন অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, তখন বিধবাবিবাহ হওয়া এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল এবং চারিদিকে লোক বিজ্ঞপ করিয়া বলিতে লাগিল দৈববোশে হুই একটা বিবাহ হইয়া গিয়াছে আর হইবে না। আর এই

বিধবাবিবাহের ব্যাপ্তিতে সমগ্র দেশ যখন আন্দোলিত, ঠিক সেই সময়ে সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা হয়। নানা প্রকার জনরবের মধ্যে বিধবাবিবাহবিরোধী দল এই শুভব প্রচার করিতে লাগিলেন যে, হিন্দুধর্মের মর্ম না বুঝিয়া বিধবা বিবাহে হস্তক্ষেপ করিয়া ইংরাজরাজ বিপদে পড়িয়াছেন। বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া ইংরাজেরা সিপাহীগণের কোপানলে পড়িয়াছেন। ফলতঃ সিপাহী যুদ্ধে যাহারা লিপ্ত ছিল, তাহাদের কেহই বিধবাবিবাহ ব্যাপারের কিছুমাত্র অবগত ছিল না। যাহা হউক এই রাজবিপ্লব উপলক্ষে বিভ্রাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ কার্য কিছু দিনের অগ্ৰ স্থগিত ছিল। আবার প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে যখন সমগ্র দেশ স্থির ও শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তখন বিধবাবিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, সিপাহী-যুদ্ধের গোলযোগে বিধবাবিবাহেও গোলযোগ বাধিয়াছে, কিন্তু যখন বিরোধী দল দেখিলেন, “মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী” তখন তাহারা হতাশ হইয়া বিরোধিতার রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া নীরব ভাব ধারণ করিলেন। বিধবাবিবাহ আবার একে একে আরম্ভ হইল। এই উপলক্ষে তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকাতে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা এইখানে উদ্ধৃত করা গেল।

“গত ২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার রজনীতে একটা বিধবা কস্তার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে। এই কস্তার পিতা বর্তমান, তিনি স্বয়ং কস্তাদান করিয়াছেন। বর সুশিক্ষিত ও সংস্কারাত্মক; বয়স্ক্রম আঠার বৎসর মাত্র। কস্তাটি অতি বালিকা, বয়স্ক্রম আট বৎসর মাত্র। এই বয়সের মধ্যে তিনি বিবাহসংস্কার লাভ ও বৈধব্যগ্রন্থা ভোগ করিয়াছেন। অতি শিশুকালেই অর্থাৎ দেড় বৎসর বয়সে বৈধব্য সংঘটন হইয়াছিল। এক্ষণে অল্প বয়সে বিবাহ হইলে ঐ বিবাহ প্রকৃত বিবাহসংস্কার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত কি না, ইহা সম্পূর্ণ সন্দেহমূল্য। যাহা হউক দেশাচারানুসারে ঐরূপ বিবাহ বিবাহসংস্কার বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ নাম মাত্র বিবাহের অব্যবহিত পরক্ষণেই বরের মৃত্যু হইলে কস্তাও বিধবা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাদৃশ বিধবা কস্তাকেও যাবজ্জীবন বৈধব্যগ্রন্থাভোগ করিতে হয়। যাবজ্জীবন বৈধব্যগ্রন্থা ভোগ কেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা বোধবিশিষ্ট

ব্যক্তি মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে চলিয়া অবলা জাতিকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করা বুদ্ধিভাবী জীবের বিধের কিনা এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদেশীয় লোকেরা চির প্রকৃত কুসংস্কারের নিত্যস্ত বশীভূত। পুরুষানুক্রমে যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহা নানা অনর্থের মূল ও নানা উৎপত্তির হেতু হইলেও, তাঁহারা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া তদনুসারেই চলিয়া থাকেন। এই প্রথা প্রবল ও প্রচলিত থাকাতো, কত প্রকারে কত অনিষ্ট ঘটতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তথাপি কেবল কুসংস্কার দোষে এতদেশীয় লোকদিগের জ্ঞান হয় না। কলতঃ কুসংস্কার মনুষ্যের অস্তি বিধম শত্রু। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে যে এক কালে অনেক অনর্থ নিবারণ হইয়া যায়, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু বিধবাবিবাহ বহুকাল প্রচলিত ছিল না। কতিপয় পূর্বপুরুষেরা ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলেন নাই। সুতরাং এক্ষণকার লোকদিগের চিন্তাক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে এই কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে যে, বিধবাবিবাহ অতি অসৎ কর্ম। বিধবাবিবাহ যে বর্ধাধ পাত্ৰানুগত কর্ম, সে বিষয়ে আর সংশয় করা যাইতে পারে না। কিন্তু এতদেশে শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচারের অধিক সম্মান। সুতরাং শাস্ত্রসম্মত হইলেও দেশাচারপরগৃহীত নয় বলিয়া এক্ষণ পর্য্যন্ত বিধবাবিবাহের তাদৃশ আদর হইতেছে না। কিন্তু যখন প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইহা কোন মতেই অসম্ভাবিত নহে যে, এই শ্রেয়স্কর ব্যবহার অনধিক কাল মধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিবেক।

অনেকে এই আপত্তি করিয়া থাকেন যদি এই ব্যবহার বর্ধাধ শ্রেয়স্কর হইবেক তাহা হইলে আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলেন নাই কেন? এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই ব্যবহার সত্য জেতা দ্বাপর ও কলি যুগের কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, নৃতি ও পুরাণে তাহার অসংশয়িত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে এই ব্যবহার রহিত হইয়া আসিয়াছে। রহিত হইবার এই এক প্রধান কারণ লক্ষিত হইতেছে যে, পূর্ব পূর্ব যুগ অপেক্ষা কলিযুগে সহমরণের ও অনুগমনের প্রথা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। অনেক অধবা প্রায় লক্ষল বিধবাই

দ্বারীয়া সহিত 'অগ্নিচিটার' কিংবা বিদেশস্থ স্বামীরা যত্ন সংবাদ শুনিয়া স্বতন্ত্র 'চিটার' আরোহণ করিয়া জীবনযাত্রা সমাপন করিতেন। সুতরাং এক্ষণকার জীবন পূর্বে বিধবার সংখ্যা এত অধিক ছিল না এবং সকলকে ব্রহ্ম কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ প্রভৃতির সহস্র বৈধব্যবহুগা-ভোগ এবং বৈধব্য নিবন্ধন পরিবার মধ্যে নানা অনর্থ সংঘটন অবলোকন করিতে হইত না। যদি বিধবার সংখ্যা, বৈধব্য যন্ত্রণাভোগ ও বৈধব্য নিবন্ধন অনর্থ সংঘটনের মাত্রা অল্প হইল, তাহা হইলে আর বিধবাবিবাহের তাদৃশী আবশ্যিকতা রহিল না। বোধ হয়, এই হেতুবশতই ক্রমে বিধবাবিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে রাজশাসনে সহমরণ ও অনুগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বিধবার সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন অনর্থ সংঘটনের পরিমাণও উত্তরোত্তর অসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব যে কারণের অসম্ভাবে বিধবাবিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল, যখন ঐ কারণ বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বিধবাবিবাহের প্রথা অবলম্বন ভিন্ন অনর্থ নিবারণের আর কোন উপায় হইতে পারে না। কি আশ্চর্যের বিষয়, গত ১২ই ও ২৮শে আষাঢ় হুগলি জিলার অন্তঃপাতী রামজীবনপুর নামক গ্রামে দুইটা বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে কলিকাতা নগরে ক্রমে ক্রমে পাঁচটা বিধবার উদ্ধার ব্যাপার নির্বাহ হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে রীতিমত বিধবাবিবাহের এই সূত্রপাত হইল।

অনেকে মনে করিতেন, যদিও কলিকাতায় কথঞ্চিৎ এবিষয়ের আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সহসা হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। কলিকাতার অধিকাংশ লোক সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কুসংস্কার বিমোচন হইয়াছে। এমত স্থলে এরূপ হিতকর ব্যাপার প্রচলিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞান অজ্ঞানতিনিরে আচ্ছন্ন আছেন, সুতরাং তাঁহারা চির-সন্ধিত কুসংস্কারের নিত্য বশীভূত। এমত স্থলে এরূপ ব্যাপার হিতকর বোধ হওয়াই অসম্ভব। এই কথা অতি বথার্থ বলিয়া আপাততঃ প্রতীক্ষমান হয় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্বক পর্যালোচনা করিয়া

দেখিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হয়। * এক্ষণে এতদ্ব্যতীত অনেকই সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সেই শিক্ষা সম্যক ফলোপধায়িনী হইয়া উঠে নাই। ঐ শিক্ষার এই ফল ফল লক্ষিত হইতেছে যে, অনেকেই স্বদেশীয় আচার ব্যবহার অথবা বোধে পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকিতে ইউরোপীয় লোকেরা প্রশংসনীয় হইয়াছেন, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অকিঞ্চিৎকর আচার ব্যবহারের অনুকরণে কোন বিশেষ ফল নাই। যদি এতদেশীয় সুশিক্ষিতেরা সহসা দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সঙ্গুণের অনুকরণ শিক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এত দিনে এতদেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত বলা যায় না। যৎকালে যুবকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের তৎকালীন ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করেন, ইহাদিগের দ্বারা অনেকাংশে দেশের উন্নয়ন বিমোচন হইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ সকল যুবক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয় কর্মে ও সংসার ধর্মে প্রবিষ্ট হইলেই, সে সকল ভাবের এককালে অভাব হইয়া উঠে।**

এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে ধাঁহার কায়মনোবাক্যে বিভাগাগর মহাশয়ের সহকারিতা করিয়াছিলেন, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজন। সুতরাং তাঁহার আশ্চর্য্যের এই সংস্রবে বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ এইস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—“১৮৫১ সালে আমি মেদিনীপুরে যাই। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহের আন্দোলন উঠে। ত্রিযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ‘বিধবাবিবাহ উচিত কি না,’ একটা ক্ষুদ্র চর্চা প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল; এই চর্চা বাহির হওয়াতে মহা আন্দোলিত সমুদ্রের ত্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও তরানক তরঙ্গ সকল উঠাইতে থাকে। ধাঁহার এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিভাগাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল, বিশেষতঃ ঐ পুস্তকের বাগ্‌দান অধ্যায় লইয়া বিশেষ

আন্দোলন হয় । *যেভাবে বিভাগাগর মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের শীর্ষাংশ করিয়াছেন, তাহা অতীব সন্তোষজনক । এই সময়ে বিভাগাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত কালেজে বসিয়া এই বিষয়ে বাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনঃপূত হইল না । কালেজ হইতে বহুবাজারের বাসায় যাইবার সময় অর্দ্ধপথ গিয়াছেন এমন সময় উহার সন্তোষজনক শীর্ষাংশের ভাব মনে উদ্ভিত হইল । কালেজে তৎক্ষণাৎ পুনরায় আসিয়া তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, লিখিতে লিখিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল । সমস্ত ইংরাজীওয়াল বাঙ্গালী, বিভাগাগর মহাশয়ের পক্ষে ছিলেন । পুনর্বিবাহিত বিধবার) গর্ভজাত সন্তান যাহাতে পিতার ধনের উত্তরাধিকারী হয় এমত বিধান জ্ঞাত তাঁহার গর্ভম্রমেণ্টে আবেদন করিয়াছিলেন । জ্ঞান জন পিটার গ্রান্ট, যিনি পরে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর হইয়াছিলেন, তিনি উক্ত আবেদন উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন যে ‘অপর পক্ষীয়েরা যেমন হিন্দু, ইহারাও তেমনই হিন্দু !’ * আর এই বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন যে, ‘যখন সতীদাহ নিবারণ করা হইয়াছে, তখন বিধবাবিবাহ হইতে দেওয়া উচিত, চিরকাল বৈধব্যযন্ত্রণা সহ করা অপেক্ষা একবারে পুড়িয়া মরা ভাল ।’ যেমন বিধবাবিবাহের আইন করা হইল, অমনি কার্যারম্ভ হইল । বিভাগাগর মহাশয়ের কার্যের গতিকই এইরূপ । * * যে দিন বিবাহ হয় সে দিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে বৃগ ডেন্টোনের জায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে । মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিশ্ব লোক বরের পাঙ্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন । দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ পানিহাটির মধুসূদন ঘোষ করেন । তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন, এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়ামহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লিখেন যে, তোমার ছায়া আমার কান্নহকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম । দুর্গানারায়ণ যখন বিধবাবিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার পাঙ্কির ভিত্তরে মুখ দিয়া বলিলেন, ‘দুর্গা তোর মনে এই ছিল, একেবারে

* They are as much Hindoos as the other party.

মজালি।’ মেদিনীপুরেও অন্ন আন্দোলন হয় নাই। মেদিনীপুরের তরানীত্বক গভর্ণমেন্ট উকিল হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে, ‘রাজনারায়ণ বাবু জানেন না যে তিনি বাক্সালা ঘরে বাস করেন।’ ইহার অর্থ এই যে, যখন তিনি বাক্সালা ঘরে বাস করেন, তখন আমরা তাহা অনার্যাসে পুড়াইয়া দিতে পারি। আমি ও সেকেন্ড মাস্টার উত্তরপাড়ানিবাসী বাবু বহুনাথ মুখোপাধ্যায় মিলি গরে সংস্কৃত কলেজের হেডমাস্টার হইয়াছিলেন, আমরা দুইজনে একদিন জঙ্গলে গিয়া দুই মোটা লাঠি কাটিয়া লইয়া আসি, যদি দাঙ্গা হয় সেই সময় আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করা যাইবে। বোড়ালের লোকে বলিয়াছিল যে ‘রাজনারায়ণবাবু গ্রামে আইলে আমরা ইট মারিব।’ তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম দাঙ্গা হইলে আমি খুনী হইব। আমি বাক্সালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি, এইরূপ ঘটনা হইলে আমি স্থির করিব যে, এক্ষণে তাঁহাদিগের বিধবা-বিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন, তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন তখন উহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এইরূপ প্রবল হইবে।”

ঐ সময় মহর্ষি দেবেজনাথ ঠাকুর পশ্চিমে ছিলেন, আমি তাঁহাকে বিধবাবিবাহের সংবাদ দেওয়াতে তিনি আমার লিখিয়াছেন যে, “এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল * উৎপন্ন হইবে, তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে, কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।”†

বিধবার বিবাহকালে বিভাগসাগর মহাশয় প্রায়ই কজাপক্ষ অবলম্বন করিয়া মহা সমারোহে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার সমারোহের ভাব সহজে সকলের বোধগম্য হইবে না। তিনি নিজে একখানি খান ধূতি পরিয়া একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়া নিতান্ত দীন ব্যক্তির ভায় অথবা একান্ত সংঘনী পুরুষের মত কালাতিপাত করিতেন, কিন্তু অস্ত্রের বেলা ঠিক ইহার বিপরীত আচরণ করিতেন। বিধবাবিবাহে কজাকে বহুশূন্য বজ্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া সম্প্রদানার্থে উপস্থিত করিতেন, সেজন্ত এবং বিবাহসংস্কেট অস্ত্রান্ত্র অঙ্গুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ আয়োজন অল্প অনেক টাকা খরচ করিতেন; বিধবা-

* সামাজিক উৎপীড়ন ও অশান্তি এই অর্থে “গরল” শব্দের ব্যবহার করিগেছেন।

† শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের খরচিত জীবনচরিত।

বিবাহবিষয়ে বাহারী সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এক এক করিয়া অল্প হইতে লাগিলেন, কাজে কাজেই ক্রমে সমগ্র ব্যয়ভার তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িল। তিনি যখন এই কার্যে লিপ্ত থাকিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বস্বান্ত হইলেন, তখন তাঁহার পরম বন্ধু খ্যাতনামা মধুসূদন মৃত্তিকর একদিন রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আচ্ছা বিভাসাগর, দেশে এত লোক থাকিতে তুমি কেন এ কার্যে একা অগ্রসর হলে?” বিভাসাগর মহাশয় এই রহস্যের যে সরল সত্ত্বের নিয়ন্ত্রণে নিয়াছিলেন তাহা অতীব আশ্চর্যজনক। তিনি বলিয়াছিলেন, “যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন কি আর একা ছিলাম। অনেক লোকে মিলে মিশে একাজে হাত দিয়াছিলাম, কিন্তু যারা মায়ের ব্যাটা, তারা চুপে চুপে ঘরে গেল, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে গেল, আর আমি বাপের ব্যাটা, কাজে কাজেই ধরা পড়িলাম!” * বিভাসাগর মহাশয় অতি দ্বারায় সর্বস্বান্ত হইয়া ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সত্য সত্যই “বাপের ব্যাটা” বলিয়াই তিনি যে কার্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কার্যের গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা বিস্মৃত হইয়া অপর দশজনের দ্বার পশ্চাৎপদ হইতে পারিলেন না। তাঁহার ধর্মবুদ্ধি যে কিরূপ প্রবল ছিল, জ্ঞানানুষ্ঠানে তিনি কিরূপ নিষ্ঠার সহিত নিযুক্ত থাকিতেন, এবং সর্বস্বান্ত হইয়াও সে অনুষ্ঠান সাধনে কিরূপ আগ্রহসহকারে প্রাণ মর্মে সমর্পণ করিতেন, নানা প্রকার বাধা ও বিপদের মধ্যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে লিপ্ত থাকাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

বাগ্দিবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার চর্চগাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাসাগর মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিধবা-বিবাহের ব্যয় সঙ্কলনার্থে ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তিনি কিছু টাকা লইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে চর্চগাঁচরণ বাবু অর্থাভাবে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া একখানি পত্র লেখেন;—“তুমি এতৎসহ প্রেরিত পত্র হইতে জানিতে

* বিভাসাগর মহাশয়ের সন্তানসমূহ প্রিয়পাত্র ভদ্রশঙ্কর উকিল বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহের নিকট এই উত্তরদান গুলিগাছি।

পারিবে যে, আমার স্বর্ণের ব্যাপার বিপদের আকার ধারণ করিয়াছে, আর বিলক চলিবে না।”*

বিত্তাসাগর মহাশয় স্বর্ণভারে ক্লিষ্ট বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, নিজের অবস্থা ও উৎসাহশীল বন্ধুগণের আচরণে ক্লিষ্ট মস্তাহত হইয়াছিলেন, ডাক্তার বাবুর পত্রের উত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই এ দ্বয়ের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে। পত্রখানি এই :—“আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা দেখিলাম, কিন্তু তোমার কাগজ খোলসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং সম্ভব তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয়নির্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে, অস্ত্রান্ত লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহ-পক্ষীয় ব্যক্তির যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্বারা অনাদ্যাসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরায়ুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আর ক্রমে খৰ্চ হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি; সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে, আমাকে এরূপ সম্বন্ধে পড়িতে হইত না। কেহ মাসিক, কেহ এককালীন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া, কেহ বা তাহা না করিয়াও, দিতেছেন না। অস্ত্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্য দান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধ মাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টাৰ্দ্ধ এ পর্যন্ত দাও নাই এবং কিছু দিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এইরূপে আমার অনেক খৰ্চতা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ব্যয় পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে স্বর্ণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বাহা হউক, আমি এই স্বর্ণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি।

* You will learn from the same that my debt-affair is about to come to a crisis which does not admit of further delay * *

অল্প উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্ব্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সম্ভেদ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না, একান্ত অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া কান্দ থাকিতাম। দেশহিতৈষী সংকল্পোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া স্নাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না।” * * *

ভবদীয়ত্ত

শ্রীজৈশ্বরচন্দ্র শর্মাণঃ।

বিধবাবিবাহের আয়োজনে ধাহারা আনন্দে দিশাহারা হইয়াছিলেন এবং লোকবল ও অর্থসাহায্যের আশা দিয়া বিভাগাগর মহাশয়কে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে অধিকতর প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন এরূপ এক জন ধনকুবেরের একখানি পত্রের কিয়দংশ এখানে প্রদত্ত হইতেছে :—“আপনি যে চাঁদার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এত দিন পাঠাইতাম, কেবল আমি ও আমার সহোদর গুলির মধ্যে পরস্পর মত বিরোধ নিবন্ধন পাঠান হয় নাই। তাহার বলনে, বিধবাবিবাহ কার্য্যের যেরূপ মৃদু মন্দ গতি, তাহাতে কোন প্রকার সুফলের প্রত্যাশা করা যায় না। যদিও আমি এরূপ কার্য্যে দীর্ঘকালের জন্য নিযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। এ বিষয়ে আমার বিবেচনানুসারে চলিতে এইরূপ বাধা পাওরাত্তে এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে তত ইচ্ছা না থাকায়, আমি গভীর দুঃখের সহিত বিধবাবিবাহ বিষয়ের সংশ্রব ত্যাগ করিতেছি। ভরসা করি আমার বক্তৃতাগুলি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।” *

* The contribution you speak of, would have been made ere this, were it not for a difference of opinion between myself and brothers who

বিজ্ঞানাগর মহাশয় উপরি উক্ত পত্রের প্রত্যুত্তরে যে বহু বিস্তৃত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার করেক পঙ্ক্তি এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—“এই বিধবাবিবাহ বিষয়ে আপনার সাহায্য করিবার অভিপ্রায় হইতে বিরত হওয়ার সংবাদ যথাসময়ে না পাইয়া আমি এই সাহায্য প্রাপ্তির উপর বশেষ আশা স্থাপন করিয়াছিলাম, এবং ঐরূপ অর্থ সাহায্যের সম্ভাবনা থাকিলে যেরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব, তাহাও করিয়াছিলাম, এবং সেই জন্য এক্ষণে তন্নানক বিপদে পড়িতে হইতেছে।” *

বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বিজ্ঞানাগর মহাশয় যে কতদূর বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। আরও নানা সূত্রে ও বিবিধ উপায়ে বিপদের গুরুত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে, কৃষ্ণনগরাস্থিগতি মহারাজ সতীশচন্দ্র লিখিতেছেন :—“আমার পরলোকগত পিতৃঠাকুর আপনার নিকট যে ১৮০০ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, আমার দেওয়ান কান্তিকেশ্বরচন্দ্র রায়ের মারফত সে টাকা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম। আশা করি, আপনি কুশলে আছেন।” †

“আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন,

সতীশচন্দ্র রায়।”

contend by urging that as no practical benefit has hitherto resulted as had been expected by the advocates of the cause of widow marriage, further contributions to that end are needless, and though my argument was in favour of a perseverance in it for a time when a better result might ensue, it has failed to be of any avail with them. Being thus restricted in the use of my own discretion in the matter and indisposed as I feel to act independently of them, I am really sorry that my further co-operation with you in this respect should cease, and I trust the reasons I have mentioned will plead for my excuse.

Yours Sincerely.

* * *

* As the intimation came too late, I naturally counted upon receiving your donation, and I made arrangements accordingly. I have, in consequence, been placed in a very difficult position.

† My dear Bidyasagor Mohashya, I have received through my dewan Kartic Chunder Roy the eighteen hundred rupees (Rs. 1800) which my late father deposited in your care in his life time and for which I am much obliged. Hoping you are quite well. I remain, Sincerely yours.

Satish Chander Roy.

বিভাগাগর মহাশয়ের পরম স্নেহে ৮ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় ও তাঁহার সহোদরেরা বিভাগাগর মহাশয়ের এই সকল কার্যে সর্বদাই সহকারিতা করিয়াছেন। সর্বাধিকারী মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর বর্তমান পেট্রুয়ট-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাজকুমার সর্বাধিকারী বাহাদুর মহাশয় যে সময়ে লন্ডোনের ক্যানিং কালোজে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে তিনি বিভাগাগর মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—“মহাশয়ের ১০ই এপ্রেলের আজ্ঞাপত্র আমি এইমাত্র পাইলাম। বিধবাবিবাহের জন্তে মহাশয় গণগ্রস্ত হইয়াছেন ওনিয়া বারপরনাই হুঃখিত হইলাম। আমার সংস্কার ছিল যে, অনেক সমৃদ্ধ লোক এ বিষয়ে সাহায্যদান করেন। আপনাকেই সমুদয় ভার বহন করিতে হয়, আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি একশত টাকার একখানি নোট পাঠাইতেছি, ইহাতে যদি অভাব মাত্রও উপকার দর্শে, আপনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। আমার বস্ত্রদ্রব্য সাধ্য আমি সাহায্য করিতে ক্রটি করিব না। কিন্তু মাসে মাসে আমাকে কত দিতে হইবে, তাহা আমার উপর রাখিবেন না। মহাশয় দাদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাকে যাহা দিতে আজ্ঞা করিবেন, তাহার অগ্রথা সম্ভবে না। মহাশয়ের আমাদের উপর অনেক দাওয়া, আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। আমাদের কাছে সম্ভূচিত হওয়া আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।” * *

অশীর্বাদাকাঙ্ক্ষণঃ

শ্রীরাজকুমার সর্বাধিকারী ।

ইহার পর দ্বিতীয় পত্রখানি রাজকুমার বাবু ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ এখানে দেওয়া গেল :—দাদার ১৮ই তারিখের পত্র পাইলাম। তাহাতে জানিলাম যে একশত টাকার নোটের প্রথমদিক্ আপনার হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার অপসার্য্য পাঠাইতেছি।

দাদা আমাকে লিখিয়াছেন যে, আমাকে মাসে মাসে ১৫ টাকা করিয়া বিধবাবিবাহের খনতাপ্তারে দিতে হইবেক। আপনার যদি কোন আপত্তি না হয়, তাহা হইলে আমি ১৫ টাকার হিসাবে আগামী ছয় মাসের টাকা অগ্রিম পাঠাইতে পারি। মাসে মাসে পাঠান অপেক্ষা এইরূপে পাঠানই আমার পক্ষে

সুবিধানক * * শেয়ার্ছ নোটসহ এই পত্র পাঠাইয়া ইহার পৌছান সংবাদ
পাইবার জন্য বাক্ত রহিলাম।” * *

আপনার মেহভাজন

রাজকুমার সর্বাধিকারী। *

বিভাগসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের সহায়তার বঞ্চিত হইয়া এতদূর
বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পরিশেষে পুনরায় রাজসরকারের কৰ্ম্ম গ্রহণের
চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি,
সেই সময় স্ত্রীর সিসিল বিডন বন্ধের রাজসিংহাসনে অধিকৃত ছিলেন। তিনি
বিভাগসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সৰ্ব্বপ্রকার সমুদ্বর্ত্তানে
বিডন সাহেবের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। এই সময়ে এক দিবস কথোপকথন
উপলক্ষে বিডন সাহেব জানিতে পারেন যে, বিভাগসাগর মহাশয় অর্থাভাবনিবন্ধন
নিতান্ত বিপদে পড়িয়াছেন। কথাশ্রমজ্ঞে বিডন সাহেব বিভাগসাগর মহাশয়কে
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন প্রকার উপযুক্ত কৰ্ম্ম কাজের সুবিধা হইলে, তিনি
তাঁহা গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন কি না? তৎক্ষণে বিভাগসাগর মহাশয়
বলিয়াছিলেন, নূতন করিয়া চাকুরী গ্রহণ করার চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হয়
নাই, তবে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। লেফটেনেন্ট গভর্নরকে এইরূপ
উত্তর দিয়া সে সময় নিষ্কৃতি লাভ করেন। তিনি সাংসারিক অসচ্ছলতা উত্তরোত্তর
এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, শেষে নিরুপায় হইয়া ছোট লাটের প্রস্তাব মত কৰ্ম্ম
গ্রহণের চিন্তায় বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইতে হইতে বাধ্য হন এবং সেই অভাবের

* My dear Sir—Dada's letter of the 18th September just reached me.
I am glad to hear that first half of the currency note of Rs. 100 has reached
you, I enclose the second half.

Dada tells me to send you Rs. 15 every month, as my contribution
to the widow marriage fund. If you have no objection, I will send my
subscription in advance for six months, this will be more convenient to
me than sending it every month * * As I shall remain very anxious
till I hear from you, kindly let me know of the safe delivery of this
letter enclosing the second half of the currency note.

I remain, yours affectionately,

Raj Kumar Sarbadhikary.

তাড়নার বিপরীত ইহঁরা তিনি ছোটলাট মাননীয় বিডন সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র এই :—

মাননীয় সিসিল বিডন সমীপে,

প্রিয় মহাশয়,

আমার অবস্থার পরিবর্তন-নিবন্ধন আমার জন্ত কিছু করিতে অপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি খুব বিপদে পড়িয়াছি এবং কোন প্রকার নূতন আয়ের পথ না হইলে, আমার ঐ সকল অন্ত্রবিধা দূর হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আপনি অনুগ্রহপরবশ হইয়া গত বৎসর এই সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি আর রাজসরকারে পুনরায় প্রবেশ করিতে প্রস্তুত আছি কি না? আমার বোধ হয়, আমি সে সময়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে সময়ে বাহা আমার পছন্দ অপছন্দ বিষয় ছিল, আপাততঃ তাহাই আমার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি এইরূপে বিরক্ত করার জন্ত কিছু মনে করিবেন না।

বিশ্বাস ভাজন

(স্বাক্ষর) জৈশ্বরচন্দ্র শর্মা ।

ইহার উত্তরে বিডন সাহেব যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :—

* Hon'ble Cecil Beadon—My dear Sir,—A change in circumstances compels me to trouble you with a request to do something for me if possible. I am in difficulties and I find it almost impossible for me to put over them without a fresh source of income. About this time in the last year you were pleased to ask me whether I was willing to re-enter the public service, I think I expressed my unwillingness at the time, but what was then a matter of choice, has now become a matter of necessity.

Trusting to be excused for the trouble.

I remain &c ;

Jayara Chandra Sarma.

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়—

আমি আপনার অনুরোধ মনে রাখিব, কিন্তু আপাততঃ আপনাকে নিযুক্ত করিবার উপযোগী কোন কৰ্ম কাজের সুবিধা দেখিতে পাইতেছি না । * * *

আপনার বিশ্বাসভাজন
সি, বিডন ।

প্রিয় মহাশয়,

প্রায় তিন বৎসর পূর্বে আমার অবস্থাবৈশিষ্ট্য-নিবন্ধন আমি পুনরায় কৰ্ম-গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলাম এবং সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম । আপনি আমার পত্রের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আমার ইচ্ছা আপনি মনে রাখিবেন । সেই সময় হইতে আমার সাংসারিক অসচ্ছলতা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আমি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাকে আমার জন্য কিছু করিতে বলিতে বাধ্য হইতেছি ।

বিগত মার্চ মাসে একদিন কথোপকথনের সময়ে আপনি বলিয়াছিলেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন । যদি আপনার সে ইচ্ছা এখনও থাকে এবং আমাকে ঐ কৰ্মে নিযুক্ত করার যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আমাকে তাহাই দিবেন, কিন্তু আমি অতি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, আমার অভাব ও বিপদের মাত্রা গুরুতর আকার ধারণ করিলেও, যদি আমি উক্ত কলেজের ইংরাজ অধ্যাপকগণের সমান বেতন না পাই, তাহা হইলে আমার আত্ম-সম্মান বোধের অনুরোধে আমি উহা গ্রহণ করিব না । ঐরূপ ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণরূপে নূতন নহে, তাহা প্রমাণ হুলে হাইকোর্টের দেশীয় জজের পদের স্থিতি ও ইংরাজ জজদের সমান বেতনপ্রাপ্তি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে । †

* My dear Pundit—I will bear your wishes in mind. But I do not, at present, see any way in which I could find you suitable employment in public service.

Yours truly,

C. Beadon.

† The Hon'ble Sir Cecil Beadon,—About three years ago, I communicated to you my willingness to re-enter the public service on account of

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, *

আমি কোন প্রকারে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার পক্ষ্য সাহায্য করিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম, কিন্তু ইহা অসম্ভব হইবার পক্ষে গুরুতর বাধা দেখিতেছি । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট প্রেসিডেন্সী কলেজে এত অধিক বেতনে সংযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপকের পদের, সৃষ্টি করিবেন না । আমি আপনার নামের উল্লেখ না করিয়া মিষ্টার এটকিন্সনের সহিত সাধারণ ভাবে পরামর্শ করিব । * *

আপনার একান্ত বিশ্বাস ভাজন

সি, বিডন ।

the difficulty I was in, and solicited you to do something for me if practicable, you were pleased to say in reply that you would bear my wishes in mind. Since that time my difficulty have gradually assumed a far more serious aspect and I am compelled though most unwillingly, to trouble you again with the request for doing something for me, if practicable.

In March last, you expressed, in the course of conversation, a wish for appointing a professor of Sanskrit in the Presidency College. If you still entertain that wish, and if you see no objection to my being selected for the appointment, kindly give it to me. But I must say candidly that notwithstanding the serious nature of the difficulties I am in, my vanity would not permit me to serve, if the salary, which European Professors of that Institution draw, is not allowed to me, the grant of such an indulgence would not be an altogether unprecedented one. The native Judge of the High Court can be pointed out as an instance. With every sentiment of respect and esteem,

Yours sincerely

Isvara Chandra Sarma.

* My dear Pundit,—I should be glad if I could in any way forward your wishes but I see great difficulty in the matter. I am sure the Govt. of India would not listen to a proposal for founding a Sanskrit Professorship in the Presidency College on so high a salary. But I shall consult Mr. Atkinson on the general question without mentioning your name. *

Yours truly

C. Beadon.

প্রিয় মহাশয়, *

প্রেসিডেন্সী কলেজের সংকুত অধ্যাপকের পদসম্বন্ধে যখন আমি আপনাকে লিখি, তখন আমার এই ধারণা ছিল যে, ঐরূপ অধ্যাপকের পদ মজুর হইয়া রহিয়াছে এবং সে পদে লোক নিযুক্ত করিবার তার সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর ক্ষমতা আছে। কিন্তু আপনার পত্র পাইয়া বুঝিলাম যে, এ বিষয়ে বিশেষ অনুবিধার সম্ভাবনা রহিয়াছে, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনাকে ঐরূপ অনুবিধা ভোগ করা আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি সানন্দে আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতেছি। এই বিষয়ের জন্য আপনি আর আপনাকে বিব্রত করিবেন না। * * *

একান্ত বিশ্বাস ভাজন

(স্বাক্ষর) দৈবরত্ন শর্মা ।

বিভন সাহেবের আত্মীয়তা হত্রে আবদ্ধ হইয়া বিভাসাগর মহাশয় কর্তৃক কলেজের চিন্তায় আবার বিভ্রত হন। বোধ হয় আশাও করিয়াছিলেন যে তাঁহার জন্য গভর্ণমেন্ট কিছু করিতে পাবেন। কিন্তু তাঁহার আত্মসম্মান বোধই পরের তাবেলারী করার চিরশত্রু হইয়াছিল, তাই অথাভাবে বিষম বিপদে পড়িয়াও ক্রম ভাবে সম্মানশূন্য অন্ন বেতনের পদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন না।

প্রবন্ধনা ও স্বাগপবতা প্রভৃতি যে গুলিকে তিনি আন্তরিক রূপা করিতেন, পুনঃ পুনঃ সেই সকলেই হাতে পড়িয়া তিনি পদে পদে বিপর্যস্ত হইলেও, কখনও বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে ভ্রমোৎসাহ হন নাই। কেবল যে ভ্রমোৎসাহ হন নাই তাহা নাহ, অত্যধিক মাত্রায় আগ্রহ সহকারে ইহার সিদ্ধি কামনার চিরদিন রত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিভাসরস্বের বিবাহেই

* When I wrote to you about the Sanskrit Professorship, I was under the impression that the creation of such an appointment had been settled and that the place was entirely in your gift. But as it appears from your favour of the 9th ultimo that there is likely to be a great difficulty in the matter, and as it is farthest from my wish to put you to any sort of inconvenience on my personal account, I most gladly withdraw my request. You need not trouble yourself any further on the subject.

তীহার চক্ষে বিধবাবিবাহের বৈধতা, শাস্ত্রীয়তা এবং সে কার্যে তীহার অনুরাগের পূর্ণতা প্রকাশ পাইরাছে ।

পূর্বে লোকে বলিত, পরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া পরের ছেলের জাতি মজাইয়া সমাজ সংস্কার করা সহজ কাজ, তাই বিভাগাগর মহাশয় “পরের মাথার কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া” নাম কিনিতেছেন । অসার লোকে যে মহাপুরুষকে অসার ভাবিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? চন্দনের চন্দনস্থ অল্পবৃক্ষে বর্তাইলেও বাশ কখনও চন্দনের স্তবাস প্রাপ্ত হয় না, কারণ চন্দনস্থ লাভের অধিকারী হইতে হইলে, নিজের যে গুণটুকু থাকি আবশ্যক, বাশে তাহা নাই ; যে বৃক্ষের সে গুণ আছে, সে আংশিক ভাবে চন্দনস্থ প্রাপ্ত হয় । বাশের নাই, বাশ পায় না । তদ্রূপ বিভাগাগর মহাশয়ের স্বদেশবাসিগণের অনেকেরই তীহার উচ্চনীতি বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না । তীহার কার্যকলাপের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার যোগ্যতা তাহাদের ছিল না, তাই সেই সব লোক তীহার নামে এইরূপ অকারণ নিন্দা রটনা করিত । পুত্র নারায়ণ চন্দ্র ১২৭৭ সাংগের ২৭ শ্রাবণ, একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে খানাকুল কলকাত্তনগরনিবাসী শঙ্কুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশবর্ষীয়া বিধবা কস্তার পাণিগ্রহণ করেন । এই বিবাহের প্রস্তাব বিভাগাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা ৬ গোপালচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বিভাগাগর সমীপে জ্ঞাপন করেন । তিনি পুত্রের এই সাধু সন্তানের প্রস্তাব শুনিয়া জামাতা গোপাল বাবুকে বলিয়াছিলেন :—“ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আমার আর কিছুই হইতে পারে না । তখন আমার মতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?” বিবাহের সময় নারায়ণ বাবু পিতাকে বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরমা চিরদিন বিধবাবিবাহের স্বপক্ষতা করিয়া আসিতেছেন, তিনি এবং মা আসিবেন না কি ?” তদন্তরে বিভাগাগর বলিয়াছিলেন, “পুত্রের উপর পিতার অপেক্ষা মাতার অধিক অধিকার, তোমার গর্ভধারিণী যদি তোমার এ বিবাহে অমত করেন, তাহা হইলে আমি ইহাতে থাকিতে পারিব না । বিভাগাগর মহাশয়ের এই উত্তর দানে নারায়ণ বাবু নীরব হইলেও, তীহার পিতামহী ও জনীনর উপস্থিতি বাসনা প্রবল ছিল । নারায়ণ বাবুর বিবাহের পর সংবাদ পাইয়া তদীয় জননী কলিকাতার আসিয়া পুত্রবধূকে জ্রোড়ে লইয়া বহু অশ্রুপাত করিয়া বলিয়াছিলেন, “এ স্ত্রী আমাকে বঞ্চিত করিয়া তোমার কি লাভ হইল ? বউ নিয়ে আমাকেই ঘর করিতে হইবে ?” বলা বাহুল্য তিনি

দীর্ঘ জীবনে বৃদ্ধ প্রতি কখনও স্নেহের অভাব প্রদর্শন করেন নাই। নারায়ণ বাবুর বিবাহে বিভাগসংগ্ৰহ মহাশয়ের হৃদয়ে যে কিরূপ সুখোদয় হইয়াছিল এক তিনি বিধবাবিবাহের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার কাছে ও কথার কিরূপ মিল ছিল, বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে তাঁহার কি গভীর ঐকান্তিকতা ছিল, নারায়ণ বাবুর বিবাহের পর বিভাগসংগ্ৰহ মহাশয় তাঁহার তৃতীয় সহোদর শঙ্কর বিভাগসংগ্ৰহ মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার জীবনের এতাদৃশ মহাত্মবিশয়ক উচ্চভাবের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, সেই পত্রখানি এই :—

শ্রীশ্রীশ্রী শরণ

স্বতঃসিদ্ধঃ সন্ত—

২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতি বার নারায়ণ ভবভূক্তারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্বমহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যিক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত * হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। এখন শুনিলাম সে বিবাহ দ্বির করিয়াছে এবং কত্কাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোন মতে উচিত কার্য হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমার উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমনতুলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভ্রম সমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধের হইতাম। নারায়ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্ব

* অনেক কুটুম্বের লোক পত্রোক্ত “স্বতঃ প্রবৃত্ত” শব্দে বিভাগসংগ্ৰহ মহাশয়ের সম্মতির অভাব অর্থ প্রতিপন্ন করিতে ব্যাকুল কিন্তু “আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না,” এই বীজোচিত বাক্যের সম্বন্ধ থাকে না। আমরা সমগ্র পত্রের ভাবে নারায়ণ বাবুর বিবাহে গভীর পিতৃস্নেহের পৌষবানুভূতিই পরিচয় পাই।

প্রধান সংকল্প, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন সংকল্প করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্ত সর্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাজয় নহি; সে বিবেচনার কুটুম্ব-বিচ্ছেদ, অতি দুঃখ কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহাৰ ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমি অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আহাৰ ব্যবহার করিতে যাহাদের সাহস বা প্রগতি না হইবেক, তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্ত নারায়ণ কিছুমাত্র দ্বন্দ্বিত হইবেক এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্ত বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায়, এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেই; অনাধীন উচ্চার অনুবর্তী বা অনুরোধের বশবর্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে।
 ত্তি ৩১ শ্রাবণ।

শ্রীভাষ্কাজিগণ:

শ্রীশিবরত্ন শৰ্ম্মণঃ।

এই পত্রখানিতে বিভাগাগর মহাশয়ের হৃদয় ও মনের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি বিধবাবিবাহ কিরূপ চক্ষে দেখিতেন এবং তাহার সিদ্ধিকল্পে কত দূর ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন এবং আরও কতটা করিতে পারিতেন, তাহার নিখুঁত ছবি ঐ পত্রের বর্ণে বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। আমরা উক্ত পত্র পাঠ করিতে করিতে তাহার আকাশসদৃশ উচ্চ ও প্রেত জগতের অপরিসেরভার আত্মহারা হইয়া অশ্রু মোচন করিয়াছি। তৃতীয় সহোদর শঙ্কুচক্রে বিভাগাগরই বিভাগাগর মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এক একথা বিভাগাগর মহাশয় ও বিভাগরত্ন মহাশয় উভয়েই সর্বদা সর্বসমক্ষে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিভাগরত্ন মহাশয় অমুরাগভরে দীর্ঘকালের জন্ত তাহার

নানাবিধ কার্যে সহকারিতা করিয়া আসিয়া এবং তাঁহার জীবন-বিবরণ নানা ঘটনা আশেপাশে অবগত থাকিয়াও, বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, ইহা অপেক্ষা গভীর আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! যদি তিনি চিনিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক অনুষ্ঠানে সহকারিতা করিয়া পরিশেষে কোন্ সাহসে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হইতে নারায়ণ বাবুকে বিরত করিবার জন্য তিনি বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন? যখন দীর্ঘকালের জন্য জ্যোতীর কার্যে সহকারিতা করিয়া, সহোদর বিজ্ঞানরত্ন মহাশয় তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তখন দেশের লোক যে নানা চন্দোবন্ধে তাঁহার নিন্দা রটনা করিবে এবং তাঁহার প্রকৃত মর্যাদা বুঝিতে অক্ষম হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি! আমরা বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়ের কণাই বা বলি কেন? প্রচণ্ড পবন-পীড়নে সুপ্রসারিত শান্ত সাগর-বক যেমন তরঙ্গ-তুফানে নিজ প্রকৃতির পরিচয় দেয়, সহোদর বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়ের লেখনী-সম্মত যে বিরোধিতার বায়ু সহসা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতেই সাগর প্রকৃত সৃষ্টি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সমক্ষে মনুষ্যত্বের এক অপূর্ণ চিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন, এজন্য বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়ের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। “আমি দেশাচারের নিত্য দাস নহি” বিজ্ঞানাগর মহাশয় যেমন বলিয়াছিলেন, ঠিক সেটভাবে সমাজ সমক্ষে এই কথাটা বলিবার সাহসের অভাবেই দেশ মৃতপ্রায় হইয়া পছুর ছায় কাগযাপন করিতেছে। বঙ্গদেশে মহামহোপাধ্যায় ভট্টনায়কের বংশধরেরাই এ বিষয়ে উচ্চ মনুষ্যত্বের উজ্জল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। “উচিত বা আবশ্যক” বিষয়ে “লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।” এ দেশের অনেক লোক এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারিলে, এ দেশের কল্যাণের পথ এত দিন সুপরিকৃত হইত।

বিধবাবিবাহ ব্যাপারেও লোকে তাঁহাকে প্রবক্তা করিয়াছে। তিনি বহুবিবাহের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কেহ কেহ প্রবক্তা পূর্বক তাঁহার সহায়তায় বিধবাবিবাহ উপলক্ষ করিয়া একাধিক দায় পরিগ্রহ করিয়াছে, এবং তিনি এইরূপ প্রবক্তার আচরণে সময়ে সময়ে নিরন্তর মর্দপীড়া ভোগ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে এজন্য এত ক্রোধ পাইয়াছেন যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। লোকের এরূপ আচরণে তিনি যে কিরূপ

ক্লেশ অনুভব করিতেন এবং তাহা নিবারণের জন্য যে কত চিন্তিত থাকিতেন, নিম্নলিখিত ছুটি বিববাবিবাহ ব্যাপার তাহার অভ্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তহল :—

বিভাগাগর মহাশয় বহুবিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং বিববাবিবাহের সংস্রবে কোন কোন লোক লোভ-পরতন্ত্র হইয়া বহুবিবাহের প্রস্তর দেওয়ালে তিনি সাতিশর ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং যাহাতে লোক ঐক্লপ করিতে না পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পত্রাংশ ও ট্যাম্প কাগজে লিখিত একখানি এক্সারনামাব কিয়ৎশ তাহার স্মৃতির প্রমাণ :—“পরদিন বহুনাথ আমাকে এক নির্জন গৃহে লইয়া গেলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভভাবে থাকিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিলেন, আমাকে ক্ষমা করিতে হইবেক, আমি অতি দুর্দম্ম করিয়াছি, এই বলিয়া আকুল ছদ্ম হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিকিং স্থিরচিত্ত হইয়া পুনর্বার কহিলেন, আমি অতি দুর্দম্ম করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করিবেন বলুন। আমি কিছু অনুশ্রাবন করিতে না পারিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া কহিলাম, তুমি কি করিয়াছ বল, শুনিলে বিবেচনা করিয়া সকল বলিতে পারি। অনন্তর তিনি কহিলেন, গত অগ্রহায়ণ মাসে * * আর একটা বিববার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। * * আমি সবিশেষ সমুদায় অবগত হইয়া এবং তাহার কাতরতা দর্শন ও অনুতাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম, তুমি অতি গহিত কৰ্ম্ম করিয়াছ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আক্ষেপের বিষয় এই, বাহ্য করিয়াছ, তাহার পরিহারের পথ নাই সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন পথ* দেখিতেছি না।” লোকে এই সকল সংস্কারের কার্যে অগ্রসর হইয়া দ্রুতগতি সিদ্ধ করিবে এবং তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবে, তিনি স্বপ্নেও তাবেন নাই। লোকে এক্লপ করিতে পারে দেখিয়া তিনি তৎপরবর্তী অনেক বিবাহে একখানি অঙ্গীকার পত্র লিখাইয়া লষ্টতেন। তাহার একখানির এক স্থান এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—“বিববাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত আইন-সম্মত কৰ্ম্ম জানিয়া আমি বেজাপুরীক শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিলাম, অন্ত্যবধি আমার পরম্পর দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম। অর্থাৎ তুমি আমার পত্নী হইলে আমি তোমার পতি হইলাম, আমি ধর্ম্মপ্রমাণ প্রতীক্ষা করিতেছি, আমি প্রকৃতরূপে পতিধর্ম্ম পালন করিব, অর্থাৎ তোমার

বাবজীবন সাধানুসারে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিব। তোমার প্রতি কখনও অবজ্ঞা বা অনাদর প্রদর্শন করিব না, আর ইহাও অস্বীকার করিতেছি, তোমার জীবদ্দশায় আমি আর বিবাহ করিব না। যদি দুর্ভাগ্যের অধীন বা অন্তর্দীপ্ত অসৎ পরামর্শের বশবর্তী হইয়া অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ তোমার জীবদ্দশায় ভার্যাস্তর পরিগ্রহ করি, তাহা হইলে তোমাকে আধিবেদনিক স্বরূপ এক সহস্র টাকা দিব। আর যদি আমি পুনরায় বিবাহ করিতে তুমি অসন্তুষ্ট বা অন্তর্বিধ অস্তায় আচরণ দর্শনে বিরক্ত হইয়া আমার সহবাসে থাকিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তুমি স্থানান্তরে থাকিতে পারিবে। তোমার গ্রামাচ্ছাদনাদির ব্যয় নির্বাহ নিমিত্ত আমি তোমাকে মাসিক নিয়মে প্রতি মাসের আরম্ভে ১০ টাকা করিয়া দিব। * * আমি অবর্তমানে তুমি ও তোমার পুত্র কস্তুরা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে আমার পৈতৃক ও স্বাক্ষরিত যাবতীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে তাহাতে কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। আর যদি আমি তোমাকে বা তোমার পুত্র কস্তাদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বিনিয়োগ পত্রাদির দ্বারা আমার বিষয়ের অন্য কোন ব্যবস্থা করি, তাহা বাস্তব ও নামজার হইবেক। এতদর্থ স্বৈচ্ছাপূর্বক, সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দমনে এই একরার-পত্র লিখিয়া দিলাম।” এই একরার-পত্র এক টাকার ষ্টাম্প কাগজে লিখিত এবং তাহাতে চারিজন সন্মান্য লোকের স্বাক্ষর আছে। তাহার মধ্যে বারানত নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ মিশ্র ও সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়র বিশেষভাবে পরিচিত। আমাদের দেশের সংস্কারকদলও বিবাহ বিষয়ে এত অধিক আগ্রহের হইতে পারেন নাই।

তিনি বহুবিবাহের প্রতি এতই বিরূপ ছিলেন যে তাঁহার বহুমুগ্ধা জীবনের বহন অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল, সেই সময়ে তিনি একবার ইহার প্রতিবিধান মানসে আমাকে ডাকাইয়া পাঠান। তদনুসারে তাঁহার চরণ দর্শনার্থে উপস্থিত হইলে পর আমাকে বলিলেন :—“তুমিহে ১৮৭২ সালের ৩ আইন নাকি সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইবে?” আমি বলিলাম “গভর্নমেন্ট ব্রাহ্ম সমাজের কর্তৃপক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন দ্বারা কিরূপ কার্য হইতেছে এবং কোন প্রকার পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে কি না?” তিনি বলিলেন :—“আমি সেই অন্তর্ই তোমাকে ডাকিয়াছি,

তুমি আমার নাম করিয়া শিবনাথ ও আনন্দমোহন বাবু প্রভৃতি সকলের নিকট বলিবে যে ঐ আইনের এক্ষণ পরিবর্তন হয় কি না, বাহাতে ব্রাহ্ম সমাজের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বিধবাবিবাহার্যাদিগেরও কার্যের সহায়তা হয়। ঐ আইনে বহুবিবাহ নিবারণিত হইয়াছে বলিয়া আমি উহার উপর খুব খুসি আছি কিন্তু উহার কিছুতুকমাকার ভাবটা যদি কাটিয়া যায়, তাহা হইলে আমি অনেক প্রবন্ধনার হাত হ'তে নিস্তার পাই।” *

বিভাগাগর মহাশয়ের সর্বপ্রধান কীৰ্ত্তি বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টা সমাক্ষুসিক হয় নাই এবং হইতেছে না কেন? এই গুরুতর প্রশ্ন কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই প্রশ্নের সহুত্তর দেওয়া অতীব কঠিন কার্য, তথাপি যতদূর সম্ভব আমরা এ বিষয়ের উত্তর দিতে প্রয়াস পাইব। এই প্রশ্নের সহুত্তর বিভাগাগর মহাশয় নিজেই দিয়া গিয়াছেন। তাহা এই :—“আমি আশা করিয়াছিলাম, কোন সামাজিক ক্রিয়াকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেই এদেশের লোক তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, কিন্তু আমার সে বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে। এদেশে শাস্ত্র এবং দেশাচার এক পথে না চলিয়া পরস্পর বিভিন্ন পথে চলিয়াছে।” শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলে কি হয়, বোল আনা শাস্ত্রে বিশ্বাস ও তদনুরূপ সমাজ-শাসন নাই বলিয়া কত প্রকার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য অবাধে সমাজ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। গুরুবিক্রয় শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য, ধর্মশাস্ত্র সকলের কোথাও ইহার অনুমোদন নাই, কিন্তু কেমন চুপে চুপে এই ভয়ানক দুর্নীতি সমাজবক্ষে প্রবেশলাভ করিয়াছে, এক্ষণে এমন হইয়াছে যে, ইহার আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করা আর সম্ভবপর নহে। যে সমাজে, শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়া পুত্রের পিতা, বিবাহসম্বন্ধ উপহিত হইলেই, কস্তার পিতার সর্বনাশ সাধনে সন্মত, যে সমাজে কস্তার বিবাহ না দিলে জাতি রক্ষা করা ভার, আবার একাধিক কস্তার বিবাহ দিতে তাঁহাকেই সর্বস্বান্ত হইয়া ধ্বংসলাভে অভিভূত হইতে হয়, যে সমাজে, কুটুম্বিতা অর্থে সর্বত্র আত্মসাৎ করা এবং আত্মীয়কে চিরবিপন্ন করা, সে সমাজ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রভৃতি মহোদয়গণের অমোক্ষের নিকট আমি সে সময়ে বিভাগাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্যন্ত সে আইনের সংশোধন চেষ্টা আর সফল হইল না।

বিধবাবিবাহ প্রচলনে কেন অগ্রসর হইবে? সুরাপান শাস্ত্রনিসিদ্ধ, সুরাপায়ী হীনচরিত্র অপেক্ষা বালিকা-বিধবাবিবাহকারী সজ্জন কি লক্ষ শুণে আদরের পাত্র নহে? কিন্তু সমাজ কি করে? কঠাগতপ্রাণ সমাজের স্থিতিশীলতা ও ঔদাসীন্য এইরূপে অসদনুষ্ঠান সকলকে প্রেরণ দিতে ও শাস্ত্রসম্মত পরিবর্তন সকলে বাধা দিতে যে উদ্ভূত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। বিধবাবিবাহ প্রচলনের পথে দেশাচারই প্রবল শত্রুরূপে দণ্ডায়মান। এ বিষয়ে একজন শ্রদ্ধের নুপ্রসিদ্ধ সংস্কারকের দুই একটা কথা উদ্ধৃত হইল। তিনি বলিয়াছেন :—

এদেশীয় একটা ভদ্রলোক একবার আমাকে একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ‘রামমোহন রায় যখন এদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন, তখন সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, বেদবেদান্তের অনুবাদ করিয়া এবং বহুল পরিমাণে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে একেশ্বরবাদ এদেশের প্রাচীন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। আপনারা কেন সে পথ পরিত্যাগ করিলেন? আপনারা কেন শাস্ত্রীয় বচনগুলি উদ্ধার করিয়া আপনারদের মত সকল স্থাপন করেন না?’ তখন তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলাম তাহা এই— ‘শাস্ত্রার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইতে যে সময় ও যে শ্রমের প্রয়োজন, তাহা ব্যয় করিতে বিশেষ উৎসাহ হয় না, কারণ যদি আনিতাম দেশের লোক শাস্ত্রীয় বচনের অপেক্ষাতে বসিয়া আছেন, শাস্ত্রীয় বচন প্রাপ্ত হইলেই তাঁহারা আপনারদের পুরাতন ভ্রম বর্জন করিয়া নবীন সত্য গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে না হয় ক্লেশ স্বীকার পূর্বক শাস্ত্র-সিদ্ধ মন্বন করিতাম ও ভূরি ভূরি ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের নিষ্ঠুর ধরিতাম; কিন্তু যখন দেখিতেছি যে বিচার কালে লোকে শাস্ত্রের দোহাই দিচ্, আর বাহাই কল্পক, ফলে কার্য কালে দেশাচারকেই মান্ত করিয়া চলে, তখন আর শাস্ত্রীয় বচন অনুসন্ধানের প্ররুতি থাকে না। ইহার দৃষ্টান্ত বিভাগাগর মহাশয়। বিধবার পুনর্বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবার অস্ত্র তিনি কি না ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন! তাঁহার প্রণীত বিধবা-বিবাহ-প্রতিপাদক গ্রন্থ তাঁহার অদ্বুত পরিশ্রম ও অদ্বুত শাস্ত্র-বিচার-শক্তি, এই উভয়েরই প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছে। এমন শাস্ত্রীয় মীমাংসা রামমোহন রায়ের পরে আর কেহ কখনও দেখে নাই। বিভাগাগর মহাশয় আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের বেক্ষণ প্রাচীন শাস্ত্র

অনুরাগ, তাহাতে তিনি শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রতিপাদন করিলেই লোকে তাঁহার প্রশংসিত পথে গমন করিবে । কিন্তু তাঁহার এই আশা পূর্ণ হয় নাই । তিনি তর্কবুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইরাছিলেন বটে, কিন্তু কাঙ্ক্ষাকালে অতি অল্পসংখ্যক লোকেই আগ্রহ সহিতে পারিয়াছিল । অতএব দেখিতেছি, কেবল শাস্ত্রীয় বচনে কুলাইতেছে না ; আরও এমন কিছু দিতে হইবে, বাহাতে লোকে লোকভর অতিক্রম করিতে পারে ।

এই কথোপকথনের পর অনেকবার এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি । একদিন বিভাগাগর মহাশয়ের প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারের নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি চক্ষে পড়িল,—‘ধৃত্যে দেশাচার ! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা ! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া একাধিপত্য করিতেছিস্ ।’ * * *

দেশাচারের প্রতি বিভাগাগর মহাশয়ের যে এই গভীর মর্ম্মভেদী আক্রোশ ইহার কারণ এই যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অনুভব করিলেন, দেশাচারই তাঁহার পথে পাবাগ প্রাচীরের দ্বার পথ আবরণ করিয়া দণ্ডারমান ।” * *

দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন সমাজ-মধ্যে কোন পরিবর্তন আনিতে হইলে সমাজের প্রবহমান স্রোতে নিজের চেষ্টাকে ছাড়িয়া দিলে, তাহা ভাসিয়া যায়, কারণ বাহাদের বহুকালের অভ্যাস-প্রসূত প্রকৃতিগত আলস্য ও অনুরাগতা সমাজ-দেহের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আগ্রহ ও উৎসাহের নূতন শোণিত স্রোতঃ প্রবাহিত করিতে না পারিলে, সে সমাজ ক্ষেত্রে নূতন চিন্তায় প্রবল প্লাবন প্রবাহিত করিতে না পারিলে, সে ক্ষেত্রে নূতন ফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না । সেরূপ নূতন বস্তুর বিশাল তরঙ্গ তুলিতে হইলে, কেবল শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যাতে তাহা সূক্ষ্ম হয় না । যেমন সূক্ষ্ম অথচ সুদৃঢ় তাল শলাকা বিদ্যাতের সুতীর আলোকের পরিচালকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, তরূপ ধর্ম্মকে মধ্যবিন্দু করিয়া, ধর্ম্মকে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজ-সংস্কারের সূচনা করিতে হয় । ধর্ম্মরূপ ভিত্তির উপর বাহার প্রতিষ্ঠা, সেই সংস্কারকার্য্যই বাস্তবিক সূক্ষ্ম হয় । বিভাগাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার

* বিভাগাগর মহাশয়ের বর্ণারোহণ সময়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের কিরদংশ । বহাভারত বিভাগাগর সংখ্যা ।

কার্য সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র ও শাস্ত্রগত ধর্ম-ব্যাখ্যাসম্মত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার সংস্কার ব্যাপার ধর্ম সংস্কার প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া বিশেষ ভাবে স্থানীয়ভাবে করিল না। এই সম্বন্ধে বোম্বাই হাইকোর্টের মাননীয় জজ মহোদেব গোবিন্দ রাণাদে মহোদয় মালাবারি মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ প্রমাণরূপে প্রদত্ত হইল:—“কাম্য সহকারক কর্মসমূহে আমার এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ও আমাদের যাহাতে সর্বভোভাবে মনোযোগী হওয়া নিতান্ত কর্তব্য, সেই জটিল সামাজিক প্রশ্ন, ধর্মোন্মোচনের সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণরূপে সুসীমাসিদ্ধ হইতে পারে না। সুবিধা কিম্বা লাভালাভের চিন্তা সমাজদেহে সংস্কারসাধনোপযোগী বল বিধান করিতে পারে না, বিশেষতঃ আমাদের এ সমাজ শাস্ত্রাদেশ ও দেশাচারের বোল আনা দাস হইয়া রহিয়াছে। * * প্রকৃত কথা এই যে রক্ষণশীল সমাজের জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহার দ্বারা কোন সংস্কারকার্য সাধিত হইতে পারে না এবং সেজন্য কার্যে ইহার সহানুভূতিও নাই। বাহিরের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন সাধন হয় না, কিন্তু জীবন্ত অনুরাগপূর্ণ নূতন ধর্মজীবনের স্রোতে এই সকল সংস্কার-কার্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।” *

এদেশে একটা চলিত কথা আছে “দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি

* Our deliberate conviction, however, has grown upon us with every effort, that it is only a religious revival that can furnish sufficient moral strength to work out the complex social problems which demand our attention. Mere consideration of expediency or economical calculations of gains or losses can never nerve a community to undertake and carry through social reforms, especially with a community like ours, so spell-bound by custom and authority. * * The truth is, the orthodox society has lost its power of life, it can initiate no reform, nor sympathise with it. Only a religious revival, a revival not of forms, but of sincere earnestness which constitute true religion, can effect the desired end.”—The Hon'ble Justice M. G. Ranade of Bombay High Court wrote in reply to Mr. Malabari's note.

নাহি লাজ,” কিন্তু মিলে মিশে কাজ করা আমাদের দেশে সম্ভবপর নহে । ধর্মশাস্ত্রবেত্তা মহাজনগণের কেহ কাহারও সহিত মতে মিলিতেন না বলিয়াই এক এক করিয়া বিংশতি খানি ধর্মশাস্ত্র রচিত ও প্রচলিত হইয়াছে * এতদ্বিত্ত আরও কয়েকখানি ধর্মশাস্ত্র বিদ্যমান আছে । এই সকল ধর্মশাস্ত্রের বিধি সাধারণতঃ লোকবাত্তা নির্বাহে সহায়তা করিলেও, পরস্পরের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়াছে । সমাজশৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে এইরূপ মতভেদ যে সাংঘাতিক অন্তরায়, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ভারতবর্ষে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, এবং নানক ও কবীরগন্থী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টিই সামাজিক জীবন ক্ষয়ের প্রধান কারণরূপে কার্য্য করিয়াছে । আমাদের ভাগ্যে “দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ” এ দৃষ্ট আর দেখিতে পাওয়া গেল না । ইহার পরিবর্তে এদেশে “নানান্ মুনির নানান্ মত” সর্বনাশ সাধন করিয়াছে । রাজা রাজবল্লভের বিধবাবিবাহচেষ্টার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্তরায় হইয়াছিলেন, দ্বার্ত্ত ভবশঙ্কর বিহারদত্ত ও সুক্করাম বিভাগাগীর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়া লোক মজাইয়া পরে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া বিপক্ষের সহকারিতা করিয়াছিলেন । আর বিভাগাগর মহাশয়ের প্রাণগত চেষ্টা কথঞ্চিৎ ফলবতী হইলেও বিপক্ষপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ বহুপরিমাণে অন্তরায় হইয়াছিল । এইটী তৃতীয় কারণ ।

চতুর্থ কারণ এই যে, তিনি যেক্ষণ আগ্রহ সহকারে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার লোকান্তরগমনের সময় এদেশে সেইরূপ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া এ কার্য্যে রত থাকিবার লোক ছিল না । তবে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকালে বলিয়াছিলেন যে, “উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, বম্বে মাদ্রাজ, প্রভৃতি স্থানে যথায় হিন্দুধর্ম প্রচলিত, তত দূর দৌড়িতে হইবে ।” তিনি বিধবাবিবাহ গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিধবাবিবাহের

* অথত্রিবিধুহারীতবাক্যব্যোপনোহজিরঃ ।

বমাণত্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নগ্রন্থতীঃ ১ । ৪

পরামর্য্যাসম্মতলিখিতা দক্ষপোত্তমো ।

শাতাতপো বশিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রপ্রবোজকাঃ ২ । ৪

শাস্ত্রীয়তা প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই চেষ্টাই ক্রিয়ৎপরিমাণে ফলবতী হইয়াছে। বিভাগাগর মহাশয় লোকান্তরিত হইলেও বঙ্গদেশের বাহিরে ভারতের অন্ত্র নানাস্থানে বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টার নিবৃত্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বাঙ্গালীর সোভাগ্য এই যে, বাঙ্গালার প্রায় সকল প্রকার হিতানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য এই যে, সূত্রপাত হইতে না হইতেই অনুষ্ঠানের সেই চারাগাছগুলি উঠাইয়া ভারতের অন্ত্রান্ত্র উর্বরক্ষেত্রে রোপিত হয়। উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব, বম্বে ও মাদ্রাজে, বিধবাবিবাহ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে, নিম্নলিখিত বিবরণ তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রদান করিবেক :—বরদার অধিপতি মহারাজ সারাজি রাও গাইকোয়ার্ড ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখেব পত্রে মালাবারি মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—“আমার বোধ হয় প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দ্বারা এবিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে এবং এইরূপ আলোচনার একটা সীমা থাকা আবশ্যিক। এই সকল সামাজিক দুর্নীতি অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের কাছে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছে, এবং কার্যতঃ এ সকলে অগ্রসর না হইলে, ইহার প্রতিকার হইবে না। সুশিক্ষিত যুবকগণ সর্ববিধ সুযোগ থাকিতেও কাজের সময় যদি এক্ষণ শুভানুষ্ঠানে অগ্রসর না হন, উপদেশ দেওয়া ছাডিয়া আপনাবা কিছু কতি স্বীকার করিয়া এই সকল সংস্কার, কার্যে পরিণত করিতে প্রয়াস না পান এবং এই সকল কার্যে সহায়তা না করিয়া যদি নির্লিপ্ত থাকিয়া চিন্তাবিষয়ে সমাজের গীর্ধহান অধিকার করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে সমাজের সেরূপ অবস্থা চিন্তা করিতে প্রাণে আনন্দের উদয় হয় না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সংসাহসের অনুগত হইয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে জীবনের সর্বপ্রকার দায়িত্বভার বহন করা অপেক্ষা সংসারে উচ্চ সম্পদ আর কি হইতে পারে।” *

* “I think there has already been too much writing and lecturing on the subject and that such activity however useful and necessary, must have a limit. Evils like these call loudly for action, and action alone can remedy them. It is not very pleasant to reflect that so many of our learned young men who have such ample opportunities of doing good to their country, do not, when occasion offers, show the truth of the old adage “example is better than precept” by boldly coming forward, may be, at some personal sacrifice, to respond to what they, from their

মহীশূরের হিন্দু অধিপতি নিজ রাজ্য মধ্যে এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পুরুষ চৌদ্দ বৎসরের নূন বয়সের বালিকাকে বিবাহ করিতে পারিবে না । বাল্যবিবাহ নিবারণ ও বিধবার সংখ্যা হ্রাস হওয়ার পক্ষে এই শুভ সংস্কার প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবেক । বরদারাজ ও মহীশূরের অধিপতি প্রভৃতি রাজস্ববর্গ যখন এই সকল সংস্কার কার্যের পৃষ্ঠপোষক হইরাছেন এবং ঐ অঞ্চলের বহুতর মধ্যবিত্ত পরিবার * স্বতঃপ্রসূত হইয়া এই সকল মঙ্গলকর পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তখন আশা করা যায় বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের আগন্তু চেষ্টা কালে ফলবতী হইবে । তাহার লোকান্তর গমনের কিছুদিন পূর্বে নলডাকার হিন্দু রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় বহু অর্থ ব্যয়ে বিধবা বিবাহের আয়োজন করেন এবং একে একে কয়েকটা বিধবার বিবাহও দিয়া ছিলেন । পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী নিজ সম্প্রদায় মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন । এক্ষণে এই সকল কার্যে অগ্রসর হওয়ার পথে যে সামাজিক অভ্যাস ও উৎপীড়ন শত্রুরূপে দণ্ডায়মান, সুশিক্ষাগুণে সেগুলি কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইলে বিধবাবিবাহ প্রচলন কথঞ্চিৎ সহজ হইয়া পড়িবে । সম্পন্ন ও সাহসী ব্যক্তির গৃহে যখনই এরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহা বিনা ওজর আপত্তিতে সম্পন্ন হইবে । তাহার প্রমাণ এই যে, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মালাবারি মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহাতে বলিয়াছেন :—“বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনে আমি কাহাবও অপেক্ষা নূন নহি । কিন্তু সামাজিক সর্ববিধ চর্চাতির প্রভাব পাওয়ার, আশঙ্কায় বিধবাবিবাহ দেওয়া অপেক্ষা আমি বিধবার ব্যক্তিগত অধিকারের অধিক পক্ষপাতী * * আমার কল্পা নাই । কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আমার গৃহে

otherwise secure position, would lend weight and like to be recognised as the aristocracy of intelligence. Nothing is rarer in this world than the courage which accepts all personal responsibilities and carries its burden unbending to the end.”—Maharaja Gaekwar of Baroda.

* I had invited to the wedding all the Gujrati Hindoos who had contracted widow remarriage since my own, and a number of them had come from Gujrat and Kattyawar to take part in the marriage festivities (on the occasion of his daughter's marriage).—Taken from the story of widow remarriage of Madhowdas Rughnathdas, Merchant of Bombay, Page 76.

আমার বিধবা কন্যা থাকিত, আমি নিশ্চয়ই তাহার বিবাহের একান্ত বিধিমত চেষ্টা করিতাম।” *

দেশাচার শাস্ত্র হইতে ভিন্ন পথে চলিয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সমাজসংস্কার কার্যে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছে, তাঁহার বিপুল আয়োজনেও ক্ষুণ্ণতুল্য হয় নাই, ধর্ম ও শাস্ত্র উভয়ই তাঁহার স্বপক্ষে ছিল বলিয়া শতাব্দিক বিধবাবিবাহ তিনি নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ ও কারত্ববংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবার। বিধবাবিবাহের যে হুঁশিয়ারি তালিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতেই প্রায় একশত বিধবার বিবাহ সংবাদ পাওয়া যায়। এতদ্বিধা আরও অনেকগুলি বিধবাবিবাহ হইয়াছিল, বাহাতে তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্রব ছিল না। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠান সকলের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজেও বহুসংখ্যক বিধবার বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। সেগুলির অধিকাংশই বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের তালিকাভুক্ত নহে। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের তালিকার হিন্দু পদ্ধতি অনুযায়ী অনুষ্ঠানগুলিরই উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। দেশাচারের স্তম্ভীত শরজালে তাঁহার সংস্কার কার্যের গতিরোধ করিয়াছিল এবং তিনি তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন; সেই অন্তই বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের শেষভাগে তাঁহার হৃদয়ের গভীর আক্ষেপোক্তির পরিচায়ক অশ্রুজল বিসর্জন করিয়াছেন। আমরা সাংগঠনের অশ্রুগণার পাঠকগণকে রান করাইয়া এই ক্ষেত্রে হইতে ক্রমে অত্যাগমন করি। সেই উত্তম অশ্রুপ্রবাহের কিয়ৎংশ এই :—

“ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অসুগত ভক্তনিগকে, হর্ভেস্ত দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিয়াছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে স্বপূজন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মন্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্মের মন্দির ভেদ করিয়াছিস, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস, জ্ঞান অন্তার বিচারের পথ বন্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র

* “I yield to none in advocating widow marriage, but I advocate it on the broad ground of individual liberty of choice and not on account of immorality, possible or contingent. * * I have no daughter, but if I had the misfortune to have a young widowed one in my house, I would have certainly tried my utmost to get her remarried.”—Rajendra Lal Mitra.

বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্র ও শাস্ত্র বলিয়া মাস্ত্র হইতেছে ; ধর্ম ও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম ও ধর্ম বলিয়া মাস্ত্র হইতেছে । সর্ব ধর্ম বহিষ্কৃত, বধেচ্ছাচারী ছুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিরা, কেবল লৌকিকরক্ষাণ্ডে, সর্বত্র সাধু বলিয়া গণ্যীয় আদরণীয় হইতেছে ; আর, দোষলক্ষণশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরা তোর অনুগত না হইরা, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধর্মিকের শেষ, সর্বদোষে দোষীয় শেষ বলিয়া গণ্যীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন । তোর অধিকারে, যাহারা জাতিভ্রংশকর, ধর্মলোপকর অধর্মের অনুষ্ঠানে সতত রত হইরা, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিকরক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার আদান প্রদানাদি করিলে ধর্মলোপ হয় না ; কিন্তু যদি কেহ সতত সংস্কারের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এককালে সকল ধর্মের লোপ হইয়া যায় !

‘হা ধর্ম ! তোমার মর্ম বুঝা ভার ! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান !

হা শাস্ত্র ! তোমার কি ছরবস্থা ঘটয়াছে ! তুমি যে সকল কর্মকে ধর্মলোপকর জাতিভ্রংশকর বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নির্দেশ করিতেছ, যাহারা সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইরা, কালাতিপাত করিতেছে, তাহারা ত সর্বত্র সাধু ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে ; আর, তুমি যে কর্মকে বিহিত ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, তাহার কথা উত্থাপন করিলেই এককালে নাস্তিকের শেষ, অধর্মিকের শেষ, অর্জুণীনের শেষ হইতে হইতেছে । এই পুণ্যভূমি যে বহুবিধ চর্নিবার পাপ প্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অশেষে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিক রক্ষায় একান্ত বদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না ।

হা ভারতবর্ষ ! তুমি কি হতভাগ্য ! তুমি তোমার পূর্বতন সম্ভানগণের আচারগুণে, পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে বেঙ্গ পুণ্য ভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিরা দেখিলে, সর্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক

হইয়া যায়। কতকালে তোমার ছরবছা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা, মোহনিত্যের অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ক্রণহত্যা পাপের শ্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর নিবিষ্ট চিত্তে, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও স্বার্থ মর্মে অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই, স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে পারিবে। কিন্তু, চর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের বেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের বেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া লৌকিকরক্ষা ত্রোতে বেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জন, দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সম্বলিত লৌকিক ত্রোতের উদ্‌যাপন করিয়া যথার্থ সংপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের ছরবছা দর্শনে, তাহাদের চিরশুষ্ক জন্মের কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ক্রণহত্যা পাপের প্রবল শ্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে দুগার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা, প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধবা-যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহার, দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভঞ্জে, জগাপ্রলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জা ভরে, তাহাদের ক্রণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধবায়ন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিরোগ হইলেই ক্রীড়াতির শরীর পাপাশময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিভাগ্য জ্ঞানিদলক, পদে পদে

তাহার উদাহরণ গ্রাস্ত হইতেছে । ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে, সংসার তরুর কি বিষবর ফলভোগ করিতেছে । হায় কি পরিতাপের বিষয় ! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, জ্ঞান অজ্ঞান বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সম্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্তব্য ও পরমধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে ।

হা অবলাগণ ! তোমরা কি পাশে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না ।

কলিকাতা । সংস্কৃত বিভাগালয়,

৪ঠা কার্তিক । সংবৎ ১৯১২ ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর ।

বিধবাবিবাহের আন্দোলন ও আইন পাশ লইয়া যে সময়ে সমগ্র দেশবাসী বিভ্রান্ত, কেহ বা স্বপক্ষতা, কেহ বা বিপক্ষতা করিতে বদ্ধপরিকর, ঠিক সেই সময়েই বঙ্গদেশীয় কুলীনগণের অনুষ্ঠিত বহুবিবাহ প্রথা রহিত করিবার জন্য বিভাগাগর মহাশয় বহুলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র গভর্নমেন্টের সদনে প্রেরণ করেন । বঙ্গদেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ মহাশয়গণের মধ্যে যে বহুবিবাহ প্রচলিত, হিন্দুশাস্ত্র সেক্ষপ নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানের অনুমোদন করেন না । শাস্ত্রে যে সকল বিশেষ অবস্থার পুরুষের ভাষ্যান্তর গ্রহণের নির্দেশ আছে, সে বিশেষ আবশ্যকতা অতি অল্প লোকের জীবনেই ঘটয়া থাকে, সেক্ষপ বহুবিবাহে বহুবিস্তৃত হিন্দুসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইত না, এবং তাহাতে বহুলোকের দুঃখ, দশ, বিশ, ত্রিশ বা ততোধিক বিবাহের প্রয়োজন হয় না । এক্ষপ কার্য যে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলী, অসুস্থি ও ধর্মবুদ্ধির নিতান্ত বিরোধী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । অসুস্থি ও ধর্মবুদ্ধির অনুমোদিত নিকার কার্য বহুবিবাহ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী মধ্যে কতদূর স্থান পাইয়াছে এবং তাহার দ্বারা এ দেশের কিরূপ সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, বিভাগাগর মহাশয় তাহার রচিত বহুবিবাহ-বিষয়ক বহুবিস্তৃত গ্রন্থে তাহা অতি পরিকল্পিতভাবে দেখাইয়াছেন । তিনি উক্ত গ্রন্থে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উৎপত্তি, উন্নতি ও অবনতির ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে মধ্যকালে বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণগণ আপন আপন পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণকে গৃহপালিত পত্ন অপেক্ষ

অধিক ধনের পাণ্ডী বলিয়া মনে করেন নাই। কোন কোন স্থলে ভ্রমশেফাও হীনভাবে স্ত্রীলোকদিগকে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে, এবং এখনও যে তাহাদের সে দুঃখের অবসান হইয়াছে এক্ষণ মনে হয় না।

সর্বশ্রেষ্ঠ সংহিতাকার মহাত্মা মনু দারাস্তর গ্রহণের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে এক্ষণ অসদাচরণের প্রশংসা পায় না। বিবাহবিধিহীন মনু বর্ণিতছেন :—

মদ্যপাসাধুরতা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ ।

ব্যাদিতা বাধিবেতব্যা হিংস্রার্থিনী চ সর্বদা ॥

স্ত্রী যদি সুরাপারিনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রুরস্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয়, তাহা হইলে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক।

বক্ষ্যাম্যেহধিবেদ্যাক্ষে দশমে তু মৃতপ্রজা ।

একাদশে স্ত্রীজননী সন্ত্যস্তপ্রিয়বাদিনী ॥

স্ত্রী বক্ষ্যা হইলে অষ্টমবর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কল্যামাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে ও অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক। এই হইল বিবাহবিষয়ক তৃতীয় বিধি। উপর্যুক্ত কারণগুলির কোন একটা উপস্থিত হইলে, স্ত্রী বর্তমান থাকিতেও স্বশ্রেণী ও স্ববর্ণের মধ্যে দারাস্তর গ্রহণের ব্যবস্থা এই দুই শ্লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে এক প্রশ্ন হইতে পারে যে, মনুর সময়ে বঙ্গদেশীয় কুলীনগণের অভ্যাস হয় নাই। সুতরাং তাহার সংহিতায় সে বিষয়ের বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই। তাহা হইতে পারে, কিন্তু সংসারযাত্রা নির্বাহের পক্ষে সাধারণতঃ যে সকল অভাব ঘটিতে পারে, এবং সেদুঃস্থলে যেদুঃস্থ ব্যবস্থা করিলে, জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, মহাত্মা মনু তাহার ধর্ম শাস্ত্রে সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে আর এক কথা এই যে, মনু-প্রণীত সনাতন ব্যবস্থার অনুগত হইয়া চলিতে চলিতে সমাজস্রোত বিপথগামী হইয়াছে, তাহা না হইলে বঙ্গালের কোলীন্য প্রথা ও দেবীষরের মেলবন্ধন কিরূপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও আচার ব্যবহারের উপর রাজত্ব করিতে পাইল?

মনুষ্যজাতি প্রভৃতির নির্দেশ অতিক্রম করিয়া যদি এই প্রথা প্রচলিত করিতে ব্যাঘাত না জন্মিয়া থাকে, তবে, অশেষ অকল্যাণ, অনাচার ও অত্যাচারের নিদানস্বরূপ বহুবিবাহ প্রথা কেন রহিত হইবে না? নারী-মুক্তি বিজ্ঞানগণ মহাশয়ের কোমল হৃদয় তাই স্ত্রীজাতির সুখসাধনে আমরণ নিযুক্ত ছিল। তিনি বহুবিবাহ রহিত হওরা বিবরক গ্রন্থের সূচনায় লিখিয়াছেন :—

“স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ও সামাজিক নিয়ম দোষে, পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন শ্রবণ পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচার ও অত্যাচারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া, জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঐদৃশী অবস্থা। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমুগ্ধকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটয়াছে, তাহা অন্যত্র কুদ্যাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি কতিপয় অতি গর্হিত প্রথার অনুবর্তী হইয়া হতভাগা স্ত্রীজাতিকে, অশেষ প্রকারে, যাতনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা, এক্ষণে, সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাত্তে স্ত্রীজাতির হরবহার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার শ্রবণতা প্রসূত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত রেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, সে সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলতঃ এতদ্ব্যতীত অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে বাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র হিতাহিত বোধ ও সদসম্মতিবেচনাশক্তি আছে, তাদৃশ ব্যক্তি যাদেরই এই প্রথার বিবম বিবেচী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা, এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়। অথুনা এদেশের বৈয়াক্ষণ অবস্থা ঘটয়াছে, তাহাতে রাজশাসন ব্যতিরেকে ঐদৃশ দেশব্যাপক দোষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই। একান্ত অনেকে উদ্ধাক্ষ হইয়া, অশেষদোষাশ্লক বহুবিবাহ প্রথার নিবারণের নিমিত্ত রাজস্বারে আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে, কোন কোন পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যথাশক্তি সেই সকল আপত্তির উত্তর প্রদানে প্রকৃত হইতেছি।”

বিভাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহবিষয়ক সুবিস্তৃত গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ভাবে বন্ধীর ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিবৃত্ত এবং কৌলীন্ত প্রথা নিবন্ধন যে সকল দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলেন, এবং সেই সকল অনাচারকে সদাচারে পরিণত করিতে সমাজকে কতদূর ধর্ম ও হীনবল হইতে হইয়াছে, তাহা দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ রচনাতেও তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, বহুদর্শন ও লোকহিতৈষণার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থান হইতে তিনি বহুবিবাহকারীদের যে সকল তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত গভীর বিবাদ ও অবসাদে ক্ষয়মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গললনাপণের ভাগ্যাকাশ সুপরিষ্কৃত হইল না! বহুবিবাহ নিবারণ চেষ্টার প্রথম উত্তম বিধবা-বিবাহের প্রথম আন্দোলনের চাপে মারা যায়। বিদেশীয় রাজা এতকালে এই দুইটা বৃহৎ সংস্কার কার্যে অগ্রসর হইতে সম্মত হন নাই। বিসদা-বিবাহের বাধা বিদূরিত করিয়া তাঁহার। সে সময়ে অবসর গ্রহণ করেন। বিভাসাগর মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া যে সকল আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর ও কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ও তৎপরে তদীয় পুত্র সতীশচন্দ্রের আবেদনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ মহাতাপচাঁদের স্মৃতিস্তম্ভ সমালোচনাপূর্ণ ও বহু-বিস্তৃত আবেদনপত্রের অত্যন্ত অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল:—“কুলীনেরা টাকার লোভে বিবাহ করে, বৈবাহিক জীবনের কোন কর্তব্যই সম্পন্ন করিবার সক্ষম তাহাদের নাই। দাম্পত্যজীবনের প্রত্যাশায় সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিয়া যে সকল স্ত্রীলোককে এই নামমাত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, তাহার। ক্ষমতার প্রীতি অর্পণের পাত্র না পাইয়া, হয় ক্রমে ক্রমে গৃহ ও সন্তানের হইয়া যায়, নতুবা হুশিয়ার অভাবে প্রযুক্তিকুলের প্রবল উত্তেজনার অধীন হইয়া পাশের পথে পদার্পণ করে। * * *

এই সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার যদিও সহজবোধ্য এবং শাস্ত্রসম্মত, তথাপি হিন্দু সমাজের বর্তমান বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে, আইনের সহায়তা ভিন্ন, জনসাধারণের এই চর্চা নিবারণে কিংবা অন্ত কোন সহায় কোন মতেই কল্যাণ হইবে না।” *

* The Coolins marry solely for money and with no intention to fulfil

বহুবিবাহ রহিত করিবার জন্য নবদ্বীপাধিপতি, মিনাজপুরের রাজা বাহাদুর ও কলিকাতা, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, বশোহর প্রভৃতি নানা স্থানের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক আবেদন করিয়াছিলেন। ঢাকার জমীদার বাবু রাজমোহন রায় বহুবিবাহ ও সাধারণভাবে বিবাহবিষয়ক নানাবিধ কুসংস্কার নিষ্করণের পক্ষে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে বহু-সংখ্যক অধ্যাপক ও চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই আবেদন-পত্রের এক স্থানে লিখিত আছে :—“রালিকারা পুরোঁল্লিখিতরূপ বৃদ্ধ, অসমর্থ উপায়হীন ও হীনচরিত্র লোকের সহিত বিবাহ-যত্নে আবদ্ধ হইয়া পরিশেষে আত্মদমন পিতৃগৃহে কারক্লেশে জীবনধারণ করে, নাম মাত্রে প্রকৃত স্বামিগণ ইহাদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না এবং ইহাদের কোন প্রকার সংবাদও লয় না। কিন্তু এইরূপ কিছন্নস্ত্রী যত্নে প্রকৃত অপরিজ্ঞাত স্বামীর যত্নাতে ঐ সকল স্ত্রীলোক আইন ও সমাজশাসন ভয়ে বৈধব্যজীবনের সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হয়।” *

any of the duties which marriage involves. The women who are thus nominally married without the hope of ever enjoying the happiness which marriage is calculated to confer particularly on them, either pine away for want of object on which to place the affections which spontaneously arise in the heart or are betrayed by the violence of their passions and their defective education into immorality. * * *

That the remedy though obvious and perfectly consistent with the Hindu law, cannot, in the present disorganised state of Hindu society, be applied by the force of public opinion, or any other power than that derived from the Legislature. 27th December, 1855.

* That female children married under the circumstances commonly continue after marriage to live with their parents, their nominal husbands generally taking no notice of them and having no communication with them; but that, in the event of the death of their husbands, they are subject to all the disabilities which law and custom impose upon Hindu widows. 22d July, 1856.

বিভাগাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত বহুবিবাহকারী কুলীনগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তদৃষ্টে দেখা যায় যে, মোট ৮৬ খানি গ্রামের * ১২৭ জন কুলীন সন্তান সে সময়ে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহার সর্ব সমেত ১২৮৮ জন বঙ্গ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া ইহাদের অবিকাংশকেই চিরহুঃখানলে দগ্ধ করিয়াছেন ! হুগলী জেলার অন্তর্গত বহুসংখ্যক সন্তান উদ্ভ্রমণ্ডলীর বাসস্থান সুপ্রসিদ্ধ জনাই গ্রামের ৬৪ জন কুলীন মহাশয় ১৬২টা বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে যিনি সংখ্যায় অধিক বিবাহ করিয়াছিলেন, সেজন্য দুই মহাদ্বার প্রত্যেকের গৃহিণীর সংখ্যা ১০। এতদ্বির সমগ্র হুগলী জেলার বহুবিবাহে বিপ্লবী স্ত্রীর সংখ্যার তুলনার দেখা যায় যে, প্রত্যেক মহাশয় গড়ে ১১টীর অধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। আর যিনি সর্বাধিক অধিক পরিমাণ কৌলীভ রক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়স যখন ৫৫ বৎসর, তখন তিনি কুড়িগুণা বিবাহ করিয়া অক্ষরকীর্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন ! জানি না তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কালের মধ্যে আর ৮০টা বিবাহ করিতে অবসর পাইয়াছিলেন কি না ! বিভাগাগর মহাশয়ের পুস্তকান্তর্গত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি বয়সে সর্ব কনিষ্ঠ সে যুবক অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একাদশে পদার্পণ করিয়াছিল, অপর জন বিশ বৎসরের সময়ে ষোড়শাদশের পত্রিচর্যায় পরম পরিতুষ্ট ! পাঠক মহাশয়, যদি ইহাতেই সন্তুষ্ট হন ভালই, নতুবা বিভাগাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিক্রমপুর অঞ্চলের বহুবিবাহের যে দুখানি তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে বিচিত্র বিবরণ বিবৃত আছে, তাহা পাঠ করিয়া অধিকতর বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। সে 'বিবরণ এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। আমরা সেই তালিকা হইতে কয়েকটা বিষয়কর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এই তালিকাভুক্ত ১৭৭ খানি গ্রাম ঢাকা, বরিশাল ও করিমপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বিকিষ্ট, ঐ সকল গ্রামের বহুবিবাহকারী মহাশয়দের মোট সংখ্যা ৬৫২। ইহার সর্বসমেত ৩৫৮৮টা বঙ্গবালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রীরা গড়ে প্রত্যেকের হিসাবে ৫৪ সাড়ে পাঁচটা পড়ে। ইহাদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক অধিক পরিমাণে কৌলীভমর্যাদা রক্ষা

* অবশ্য এই অনুসন্ধানে যে কোন গ্রাম কিংবা কোন লোক বাস পড়ে নাই এরূপ বলা বাইরে পারে না।

করিয়া বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে অক্ষরকীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী কলসকাটা গ্রাম নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । যে সময়ে উল্লিখিত তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১০৭টা মাত্র প্রাণীর স্বামিষে বৃত্ত হইয়াছিলেন ! বোধ হয় তৎপূর্ববর্তী কালে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই সুপবিত্র, বিবাহ-সাধন পথে দিন দিন অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন ।

একবার লক্ষ্মী অবস্থান কালে, মেট্রোপলিটন-প্রবাসী নবাব মৃত ওয়াজেদ আলী সাহের পরিত্যক্ত লক্ষ্মীএর রাজভবন ‘কেইশর বাগ্’ দেখিতে গিয়া-ছিলাম । বহুদূর ব্যাপী সুবিকৃত হস্ত্যাবলী মরকত বিনির্মিত শিল্প শোভার চতুর্দিক সুশোভিত করিয়া সমাগত দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করিতেছে, দেখিয়া স্পন্দরহিত ভাবে ক্ষণকাল দণ্ডারমান থাকিয়া, সহচর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এতগুলি সুগঠিত সুন্দর গৃহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহূত হইতে কেন ? সজের বন্ধু বলিলেন, গণনা করিয়া দেখুন, দেখিবেন ৩৬৫টা গৃহ এই রাজ ভবনের সুবিকৃতি বৃদ্ধি করিতেছে । কারণ জিজ্ঞাসা করায় বন্ধু বলিলেন, ঐগুলি নবাবের বেগম-নিকেতন ছিল । প্রত্যেক গৃহে এক একটা বেগম বাস করিত । এই কথা শুনিয়া সে সময়ে আমার নবীন জীবনে যে গভীর বিবাদের ভাব অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা আজিও বিস্মৃত হইতে পারি নাই । আর আজ এই অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে স্বদেশে, নিজ সমাজে, আত্মীয় স্বজনগণের অনুষ্ঠিত এই গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান ও পরিণাম চিন্তা করিয়া আমার এই স্বার্থপর হৃদয়েও গভীর ক্ষোভ ও মানির উদয় হইতেছে । আজ বুঝিতেছি যে নবাবের মার্কনা আছে, কারণ তিনি নবাব, নবাবী ব্যাপারই স্বতন্ত্র । ঐশ্বর্য ও সম্পদ তাঁহার সুবতোগের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল । বাহাদুরিকে পদে পদে পরমুখালেদী হইতে হইয়াছে, বাহাদুর বিবাহ করিয়া ধর্মবোধে কিংবা কর্ম বোধে কিংবা সুখলালসায় কোনদিন প্রমত্তনে বাহাদুরের আলরে পর্যর্পণ করিবেন না, তাঁহাদের এইরূপে সুকোমল বালিকা-হৃদয়ের সুখ-স্বপ্ন ভাঙিয়া বাহাদুরকে দারুণ মনস্তাপ ও ব্যর্থতার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার কি অধিকার আছে ? খ্রী বা খ্রীর আত্মীয়স্বজনের তিক্তাক্ষর অর্থ বাক্য প্রহরণ করিয়া পদপ্রক্ষালনে সম্মত হওয়া, অথবা তিক্তাক্ষিত অর্থ অল্প

হইলে, সমাগত স্বামীর, প্রতিপদের নবোদিত চন্দের স্তায় অদৃশ্য হওয়া বাহাদের পক্ষে সম্ভব, সেরূপ পাৰ্শ্বাঙ্কদর ব্যক্তিগণের সহিকৃত্যর জীবন্ত সৃষ্টি নারী-হৃদয়ে নিরাশার বজ্র নিক্ষেপ করিবার কি অধিকার আছে ? এই অমাহুবিবিক্তিরাচরণ স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াই অবলা-সুহৃৎ বিভাগাগর মহাশয় বঙ্গদেশব্যাপী আন্দোলন তরঙ্গে ভাসিয়া বজ্ররবে জিজ্ঞাসা "করিয়াছিলেন, এক দিনের অল্প পতি-সন্দর্শন লাভ যাহার সমগ্র জীবনে ষটিবে না, তাহার হৃৎ হৃদশা বৃদ্ধি করিবার তোমার কি অধিকার আছে ? যদি দৈবক্রমে একজন মাত্র লোক ১০৭টি বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে সে ভিন্ন কথা ছিল, কিন্তু যখন দেখিতেছি, ইহার পর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে অপর একজন ৫০টি বিবাহ করিয়াছেন, আর একজন ৩৫ বৎসর বয়সের সময়ে ৪০টি বিবাহ করিয়াছেন, আর এক ব্যক্তি ৩৫ বৎসর বয়সের সময়ে ৩৫টি বিবাহ করিয়াছেন, আর একজন ২৭ বৎসর বয়সের সময়ে ১৪টি বিবাহ করিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত হইলেও না হয় মনের ক্রেশ মনে লুকাইয়া রাখিয়া শত মুখে সমাজসুখেব স্তুতি বন্দনা করিতাম। কিন্তু হায় ! আরও যাহা আছে তাহা লিখিতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু দেশাচারের সূতীক শক্তিশেল বিভাগাগর মহাশয়ের হৃদয়ের কোন্ মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার অল্প এবং তাঁহার সেই "হা অবলাগণ ! তোমার কি পাশে ভারত-বর্ষে আসিয়া অন্নগ্রহণ কর বলিতে পারি না" এই মর্মান্তিক আক্ষেপোক্তির প্রকৃত পরিচয় দিবার অল্প, বলিতে হইতেছে যে একটা দ্বাদশবর্ষীয় বালক কুলমথাদার অনুরোধে ৬টা কন্ডার ভার গ্রহণ করিয়াছে ! তাহাই, ইহার উপর আর বলিবার 'কিছু আছে কি ? আর একটা দ্বাদশবর্ষীয় বালক পঞ্চ কন্ডার পাণিগ্রহণ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছে। আর একটা বার বৎসরের বাগক বড়ননার সেবা গুণস্বায় পরিতৃপ্ত ! দেশাচার কি লোক-লজ্জার মাখার পদাঘাত করিয়া এতদূর অগ্রসর হইতে পারে ? হউক, ইহার উপর যে আরও আছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। বিশ্বাস হয় না, বলিতেও বা'দ বা'দ করিতেছে, কিন্তু সেই তালিকার নাম ধামসহ অতি স্পষ্টাকরে লিখিত আছে যে, এক পঞ্চমবর্ষীয় বালক হাতে খড়ি দিতে না দিতে, বহুবচনে না হউক বিবচনে পদার্থ করিয়াছে। এত অল্প বয়সে উপনয়ন সংস্কার হয় কি না

বলিতে পারি না, তবে একাধিক স্থলে যখন হৃদ্যপোষ্য বালকের বহুভাষ্যার উল্লেখ আছে, তখন কোন না কোন প্রকারে উপনয়ন ও বিবাহ সংস্কার একত্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। আর একটা কথা এই যে “গরজ বড় বালাই।” বঙ্গীয় কুলীন সমাজ এই গরজের অধীন হইয়া এমন সকল ধর্মবিরুদ্ধ ও নীতি-বিসংহিতকার্য করিয়াছেন যে, তাহার চিন্তামাত্রের শরীরে রোমাঞ্চ হয়, ক্ষোভ ও অভিমানে হৃদয়স্তম্ভী ছিন্ন করিতে এবং জনসমাজের মুখাবলোকন ভাগ করিতে ইচ্ছা হয়। দেবনিবাস পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে একরূপ কল্মসার অতীত নিদারুণ নিশ্চয় ব্যবহার সকল অনুষ্ঠিত হইতে পারে, বিশেষতঃ সেই :—

“যত্র নার্যাস্ত পূজ্যস্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ” মহাত্মা মনুর নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর অনুগত ধর্মমণ্ডলীর বাসভূমি ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে নারী জীবনের একরূপ দুর্দশা স্বরণ করিলে, হৃদয় ও মন আপনা হইতেই অবশ হইয়া পড়ে। উঠিতে, বেড়াইতে, হাসি তামাসার, আমোদ প্রমোদে সময়ক্ষেপ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। হয় না বসিয়াই বৃষ্টি অশেষ গুণের আহার ঈশ্বরচন্দ্র অপ্রতি-হতরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে যে ঘটনাতীর উল্লেখ করিয়া হৃদয়ের আর্ন্তভাবে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার লেখনী-নিঃসৃত সেই বিবাদ-চিত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

“ভঙ্গকুলীনের চরিত্র বিষয়ে, এ স্থলে, একটা অপূর্ণ আখ্যান কীর্ণিত হইতেছে। কোন ব্যক্তি * মধ্যাহ্নকালে, বাটার মধ্যে আহার করিতে গেলেন; দেখিলেন, যেখানে আহারের স্থান হইয়াছে, তথায় ছটি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। একটির বয়ঃক্রম প্রায় ১০ বৎসর, দ্বিতীয়টির বয়ঃক্রম ১৮-১৯ বৎসর। তাহাদের আকার ও পরিচ্ছদ দুর্ব্যবহার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে, তাহাদের মুখে বিবাদ ও হতাশার সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ ব্যক্তি বীর জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা ইহারা কে, কি জন্তে এখানে বসিয়া আছেন?” জননী ব্রহ্মার দিকে ‘অনুলি নির্দেশ করিয়া

* আমরা বিব্যাগগর মহাশয়ের নিকট এই আখ্যানিকাতী শুনিয়াছিলাম। উল্লিখিত “কোন ব্যক্তি” তিনি নিজেই। বীরসিংহের বাটিতে তাহারই আহারের সময় ঐ ঘটনাজি ঘটয়াছিল।

কহিলেন, ইনি চট্টরাজের স্ত্রী, এবং অন্নবয়সকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন এটি তাঁহার কন্যা। ইহারা তোমার কাছে, আপনাদের হৃৎকের পরিচয় দিবেন বলিয়া বলিয়া আছেন।

“চট্টরাজ হুপুস্বিয়া ভদ্রকুলীন; ৫১৬টা বিবাহ করিয়াছেন। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট মাসিক বৃত্তি পান; এজন্য, তাঁহার বখেটে খাতিস্ন রাখেন। তাঁহার ভগিনী, ভাগিনের ও ভাগিনেয়ীরা তাঁহার বাটীতে থাকেন; তাঁহার কোন স্ত্রীকে কেহ কখনও তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই।

“সেই দুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছন্ন দেখিয়া ঐ ব্যক্তির অন্তঃকরণে অতিশয় হৃৎক উপস্থিত হইল। তিনি আহাৰ বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের উপাখ্যান শুনিতে বসিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, আমি চট্টরাজের ভাৰ্যা, এটি তাঁহার কন্যা, আমার গর্ভে জন্মিয়াছে। আমি পিতৃগণের থাকিতাম। কিছুদিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা, আমি তোমাদের দুজনকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিব না। আমি বলিলাম, বাছা বল কি, আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী; তুমি অন্ন না দিলে, আমরা কার কাছে যাইব। তুমি একজনকে অন্ন দিবে, আর একজন কোথায় ঘাইবেক; পৃথিবীতে অন্ন দিবার লোক আর কে আছে? এই কথা শুনিয়া, পুত্র কহিলেন, তুমি মা, তোমার অন্ন বস্ত্র, যেরূপে পারি দিবে, উহার ভার আমি লইতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি কি উহাকে * * * হইতে বল। পুত্র কহিলেন, আমি তাহা জানি না; তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া পুত্রের সহিত আমার বিষম মনান্তর ঘটয়া উঠিল, এবং অবশেষে, আমার কন্যাসহিত বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইল।

“কিছুদিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মান্ত ভগিনীর বাটীতে একটি পাচিকার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে ঐ পাচিকার কৰ্ম করিব মনে মনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ২৪ দিন পূর্বে, তাঁহার পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন নিতান্ত হতাশাস হইয়া, কি করি, কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অন্তিম গ্রামে আমার স্বামীর এক সঙ্গের আছে, তাহার গর্ভবাস্ত সন্তান চট্টের কারবার করিয়া, বিলম্ব সন্ততিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দয়া ও ধৰ্ম্ম আছে।

ভাবিলাম যদিও আমি বিমাতা, এ বৈমাত্রেয়ী ভগিনী ; কিন্তু তাঁহার শরণাপত্ত হইরা দুঃখ জানাইলে, অবশ্য দয়া করিতে পারেন। এই ভাবিয়া অবশেষে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সমস্ত कहিয়া কাদিতে কাদিতে তাঁহার হস্তে ধরিয়া বলিলাম, বাবা তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর গতি নাই।

“আমার কাতরতা দর্শনে, সপত্নী-পুত্র হইরাও, তিনি যথেষ্ট মেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলেন এবং कहিলেন, যতদিন তোমরা বাঁচিবে, তোমাদের ভরণপোষণ করিব। এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণে, আমি আশ্লাদে পদগদ হইলাম। আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা সেরূপ নহেন। ‘এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল’ এই বলিয়া তাঁহারা যারণরনাই অনাদর ও অপমানিত করিতে লাগিলেন। সপত্নী-পুত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন কিন্তু তাঁহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলেন না। একদিন আমি তাঁহার নিকট গিয়া সমুদায় বলিলাম। তিনি कहিলেন, মা, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু কোন উপায় দেখিতেছি না। আপনারা কোন স্থানে গিয়া থাকুন ; মাসে মাসে আমার নিকট লোক পাঠাইবেন, আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব।

“এইরূপে নিরাশ্বাস হইরা, কাতা লইরা তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ভাবিলাম, স্বামী বর্তমান আছেন, তাঁহার নিকটে যাই এবং দুঃখবস্তা জানাই, যদি তাঁহার দয়া হয়। এই স্থির করিয়া পাঁচ সাত দিন হইল এখানে আশ্রয়স্থিলাম। আজ তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে বা আর বস্ত্র দিতে পারিব না। অনেকে বলিল, তোমার জানাইলে, কোনও উপায় হইতে পারে, একজ্ঞ এখানে আসিয়া বসিয়া আছি ! ঐ ব্যক্তি’ওনিরা ক্রোধে ও দুঃখে অতিশয় অভিভূত হইলেন এবং অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকণ পরে, তিনি চট্টগ্রামের বাটীতে গিয়া, যথোচিত তৎসনা করিয়া বলিলেন, আপনায় আচরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইরাছি। আপনি কোন্ বিবেচনায়, তাঁহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন ? তাঁহাদিগকে বাটীতে

রাখিবেন কি না স্পষ্ট বলুন। ঐ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া, বৃত্তিজোপী চট্টরাজ ভয় পাইলেন এবং কহিলেন, তুমি বাটাতে যাও, আমি ঘরে বুদ্ধিরা পরে তোমার নিকট যাইতেছি।

“অপরাহ্নকালে, চট্টরাজ ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া কহিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিসাবে, মাসে মাসে কিছু দিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বাটাতে রাখিতে পারি। ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন এবং তিন মাসের দেয়, তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন, এইরূপে তিন তিন মাসের টাকা আগামী দিব : এতদ্বিল্প তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের ভার আমার উপর রহিল। আর কোন ওজর করিতে না পারিয়া নিরুপায় হইয়া, চট্টরাজ, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তিনি নিজে হঃশীল লোক নহেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীরা দুর্দান্ত দম্ভা ; তাঁহাদের ভয়ে ও তাঁহাদের পরামর্শে, তিনি স্ত্রী কন্যাকে পূর্নোক্ত নির্যাত অবাব দিয়াছিলেন। বৃত্তিদাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার অস্বীকার করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া, ভগিনীরাও অগত্যা সম্মত হইলেন। চট্টরাজ, কখনও, কোন স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরাও খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। সেই কারণে তিনি, কন্মিনকালেও আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভদ্রকুলীনদিগের ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা পরিবার স্থলে পরিগণিত ; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব থাকে না।

“যাহাউক, ঐ ব্যক্তি পূর্নোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন এবং বৎসকালে অস্বীকৃত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, বাটাতে গিয়া, তিনি সেট হতভাগা নারীর বিষয়ে, অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চট্টরাজ ও তাঁহার ভগিনীরা স্থির করিয়াছিলেন, বৃত্তিদাতার অস্বীকৃত নূতন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইরাছে ; আর তাহা কোন কারণে রহিত হইবার নহে ; তদনুসারে চট্টরাজ, ভগিনীদের উপদেশের অনুবর্তী হইয়া স্ত্রী ও কন্যাকে বাটা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন ; তাঁহারাও, পত্যস্তর বিহীন হইয়া স্থানান্তরে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

কল্যাণী স্ত্রী ৩০ বরঃহা, * * * * ! ! এবং জননীর সহিত, স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন ।”

এই সকল চিন্তা করিয়া মনে হয়, এতদূর দুর্দশা কেন হইল ? বিভাগাগর মহাশয় নিজেই তাহার কারণ দেখাইয়াছেন এবং তাহার সহস্ররও দিয়াছেন, আমরা সেটুকু এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

“কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, দশ পুরুষ গত হইলে দেবীবর, কুলীন-দিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া মেলবন্ধন দ্বারা নূতন প্রণালী সংস্থাপন করেন। এক্ষণে মেলবন্ধনের সময় হইতে দশ পুরুষ অতীত হইয়াছে ; এবং কুলীনদিগের মধ্যে, নানা বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছে। সুতরাং পুনরায় কোনও নূতন প্রণালী সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া বল্লালসেন, উহার নিবারণের অভিপ্রায়ে কৌলীন্যমর্যাদা স্থাপন করেন। তৎপরে কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, দেবীবর উহার নিবারণের আশায়, মেলবন্ধন করেন। এক্ষণে, কুলীনদিগের মধ্যে, যে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, অমূলক কুলাভিমান পরিতপগ ভিন্ন, উহার নিবারণের আর উপায় নাই। যদি তাঁহারা স্বেবোধ, ধর্মভীরু ও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমান বিসর্জন দিয়া কুলীননামের কলঙ্ক বিমোচন করুন। আর, যদি তাঁহারা কুলাভিমান পরিত্যাগ নিতান্ত অসম্মত বা একান্ত অবিধেয় বোধ করেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে, কোনও নূতন ব্যবস্থা অবগণন করা আবশ্যিক। এ অবস্থায়, বোধ হয় পুনরায় সর্বস্বার্থী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিত্রাণের আর পথ নাই। এই পথ অবগম্য করিলে, কোনও কুলীনের অকারণে একাদিক বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবেক না ; কোনও কুলীনকৃত্যকে যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকাল, অবিগাহিতা অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না ; এবং রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারণিত হইলে কোন ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিবেক না। এ বিষয়ে কুলীনদিগের ও কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের যত্ন ও মনোযোগ করা কর্তব্য। অনর্থকর—অর্থকর কুলাভিমানের রক্ষা বিষয়ে, অহু ও অযোয্যের জ্ঞান, সহায়তা করা অপেক্ষা, যে সকল দোষবশতঃ, কুলীনদিগের ধর্মসোপ ৩

বারগরনাই অনর্থ সংঘটন হইতেছে, সেই সমস্ত দোষের, সংশোধন পক্ষে বদ্বান হইলে কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের, বুদ্ধি, বিবেচনা ও ধর্ম অনুযায়ী কর্তব্য করা হইবেক । ”

এ সকল ত হইল কিন্তু আরও যে কিছু বাকি রহিল ! মানুষের দ্বারা এরূপ কার্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে, ইহা কিছুতেই প্রত্যয় হয় না । কিন্তু বঙ্গদেশীয় কুলীনব্রাহ্মণগৃহে নিম্ন লিখিত ঘটনা সকলও সংঘটিত হইয়াছে ।

সুস্ত ভাগ করিয়াছে কি না সন্দেহ, এরূপ চারিবৎসর বয়সের সুকুমার শিশুর কোমল কণ্ঠে দোহুলামান পদকের ভায়, বিবাহালঙ্কার শোভা পাইয়াছে ! এরূপ একটা শিশুর কণ্ঠে দুখানি রত্নালঙ্কার ! অপর এক শিশু ভাগ্যশুণে চারিবৎসরেই পঞ্চালঙ্কারে ভূষিত !! অনেক কথা পূর্বে গল্পের আকারে গুনিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণভাবে এত দিন এতদূর অধঃপতন চিন্তা করিতেও পারি নাই । একথা একাকী নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিলে কি, আপনাদের উদাসীনতার প্রতি ঘৃণা ও সমাজের স্বার্থপরতার প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয় না ? দেশাচারের শিরচ্ছেদ করিতে প্রযুক্তির উত্তেজনা হয় না ? পাঠক একটাবার মনে মনে চিন্তা কর, লাভ্যের বিজলীবিকাশে চারিদিক আলোকিত করিয়া পূর্ণযৌবনা সুন্দরী যখন ঘৃণা ও অভিমানের অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া পঞ্চমবর্ষীয় বালকের কোমল কণ্ঠে বরমালা প্রদান করিয়াছে, তখন কি তাহার সেই উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসে সমাজদেহ সজ্জা পিত ও পাপভারাক্রান্ত হয় নাই ? কে বলিতে পারে যে, চারি বৎসরের শিশুর পঞ্চম পক্ষের স্ত্রী পূর্ণ যৌবনা ছিল না ? এবং তাহার সজ্জা হৃদয়ের অভিসম্পাতজাত অশ্রুকণার তাহার জন্মভূমি সিক্ত হয় নাই ? দেশাচার-সেবক সজ্জার বঙ্গসজ্জান কি অবগত নহেন যে, নারীহৃদয়-স্থলভ সংসারসুখ সম্ভোগের বাসনার কুসুমগুলি যখন পূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত, তখন সেই সুখ-স্বতির মলয়-হিল্লোলে বিবাদ-বহিঃপ্রজ্জ্বলিত করিয়া পূর্ণযৌবনা বঙ্গললনা অশীতিপর বৃদ্ধের লোকলীলাস্বরূপ-শস্যায় বাসর-গৃহ রচনা করিয়াছে ! সুপ্রবীণ বৃদ্ধ কুলীন মহাশয় মৃত্যুর করাল গ্রাসে আত্মসমর্পণ করিতে করিতে অনেক কষ্টের আশা তরসার বরমালা গ্রহণ করিয়া ভাহাদিসকে কৃতার্থ করিয়াছেন ! রমণীহৃদয়-সজ্জত এই নিদারুণ মর্ষবেরনা বিভাগ্যাগর মহাশয়ের হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্চার করিয়াছিল, তাই তিনি এই

রমণী-কনক-সুন্দর মহিষুতার অন্তরালে লুকাইত তুযানল নির্দোষিত করিতে প্রয়াস পাইরাছিলেন ।

অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, যে সময়ে ঐ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল সে ত বহু পূর্বের কথা, তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল । একরূপ পুরাতন আচার আচরণের আলোচনা করিতে গেলে, জীবনের সুখ শান্তিলোপ পায়, গৃহশরিকন লইয়া সুখে বাস করা ভার হইয়া উঠে । বিভাগাগর মহাশয়ের সংগৃহীত তালিকা পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু বহুবিবাহের নূতন তালিকাও আছে । অতি অল্প দিন হইল—সন ১২৯৮ সালে সঙ্গীবনী পত্রিকার যে অসংখ্য বঙ্গ রমণীর দুঃখ-কাহিনী ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা সেই বিবরণের সার সংগ্রহ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া, ঘোষাঘর, বরিশাল, ফরিদপুর ঢাকা প্রভৃতি বঙ্গদেশের আর সমস্ত জেলার ২৭৬ খানি গ্রামের বহুবিবাহকারী মহাশয়গণের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপে জানা যায় যে, ঐ সকল গ্রামবাসী ১০১৩ জন কুলীন মহাশয় ৪৩২৩টি কুলীন-কস্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং গড়ে প্রত্যেকের হিসাবে ৪।০ সাড়ে চার পড়ে । পূর্বোক্তিত্তি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বাদ দিলেও ১০, ১২, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০টি বিবাহের ত অভাব নাই । ৬০, ৬৫, ৬৭ও আছে, এইরূপ বিবাহকারীর তালিকার উল্লেখ করিতে গেলে স্থান সঙ্কুলান হয় না । কেবল এইমাত্র বলিতে চাই যে, পূর্বেও যেমন, এখনও সেইরূপ অল্পবয়স্ক বালকদিগেরও বহুভার্যা গ্রহণকার্য্য নির্দিষ্টভাবে চলিয়া আসিতেছে । এবিষয়ে লোকের ক্রটি বিশেষ কিছু পরিবর্তিত হয় নাই । একজন ৩৪ বৎসর বয়সে ৩৫টি স্ত্রীর ভবনপোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন । ২৭ বৎসরে ১২টি, ২৫ বৎসরে ৭টি, ২২ বৎসরে ৮টি এবং ২০ বৎসরের হুবকের ৮টি বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে । একরূপে আর অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে কিরূপে বলিব ? ভাল, এ পর্য্যন্ত হইলেও কথঞ্চিৎ পরিবর্তন বলা যাইতে পারিত, কিন্তু এইখানেই শেষ হয় নাই । এতদপেক্ষা অল্পতর চিন্তার বিষয় আছে । বর্তমান সময়ের সামাজিকসম বিভাগাগর মহাশয়ের লোকাভ্যাস গমনে অবসর গ্রহণ না করিয়া, যদি করা করিয়া এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান এবং প্রতিবিধান প্রাপ্য পদ্ধতি করেন, বঙ্গ ললনাদেশ

দুঃখ দূর করিতে, তাহাদের যত্না ও বিবাদের অশ্রুজল মুছাইতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহারা বিধাতার আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্ত হইবেন! আজ বিভাসাগর মহাশয় লোকান্তরিত, এই তালিকা দৃষ্টে অশ্রু মোচন করিবার কি কেহ নাট? এখনও যে ১৪, ১৫, ১৬ বৎসরের বালকগণের বহুভাষ্যার উল্লেখ দেখিতে পাঠিতেছি। একটা ষোল বৎসরের বালক তিনটি বালিকার স্বামী হইরাছে, দুটা ১৫ বৎসরের বালকের একটার দুটা বিবাহ হইয়াছে, অপরটা ৩টার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। একটা চতুর্দশবর্ষীয় বালক দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছে। আর পূর্বে যে দুঃখপোষা শিশু বরের বিবাহের উল্লেখ করিয়া নিজেই চিহ্নিত ছিলাম, ১২২৮ সালের সঞ্জীবনীর তালিকায়ও সেইরূপ চারি বৎসরের এক শিশুর কণ্ঠে তিনটা স্ত্রী-বন্ধ লক্ষ্যমান! আমরা খরগোসের জার পত্রাবরণে মুখ লুকাইয়া মনে করি, আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ, আমাদের সমস্তই ঠিক চলিতেছে। কিন্তু হায়, এ দুঃখ-কাহিনী শুনিবার, শুনিয়া ভাবিবার এবং প্রয়োজনমত সহৃদয় অবলম্বন করিবার লোকের যে অভাব হইয়া পড়িয়াছে, স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ কি একটা বার এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? অমিতপরাক্রম রামমোহন ও দৈবচন্দ্রের পুনরভিনয় কি স্বরার সংঘটিত হইবে না? বিভাসাগর মহাশয়ের কাতর ক্রন্দন কি বাঙ্গালী হৃদয়ে দ্রব বহি চলিয়া দিবে না? তিনি যে মনননীয়ে প্রাবিত হইয়া বলিতেন “আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি” তাঁহার সেই মনস্তাপপূর্ণ আক্ষেপোক্তি কি তবে সত্য সত্যই, সত্য হইবে? আজ আত্মন, সকলে ঔণপণ করিয়া এই সকল দুর্নীতি নিবারণে অগ্রসর হই। বিভাসাগর মহাশয়ের পরলোক-বাসী পবিত্র আত্মা আমাদের উত্তম ও আগ্রহ দেখিয়া পুলকপূর্ণ দৃষ্টিপাতে আশীর্বাদ করিবেন। আক্ষেপ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের ১০।১২টা শিক্ষিত মহোদয় এই গর্হিত অনুরোধের প্রত্যাশাতা হইরাছেন। তাঁহাদের ৩ জন এম. এ. বি. বিল্., একজন বি. এল., অপর কয়েকজন বি. এ., উপাধিধারী। ইহারাই যদি একরূপ কার্যে অগ্রসর হন, তবে আর দাঁড়াইব কোথায়? তবে ক্রমের আবরণে মুখ আবৃত করিয়া বলি—মা বঙ্গজননী! তোমার ভাঙ্গে এখনও অনেক দুঃখ ভোগ বাকি আছে। তুমিই তোমার কোন বোধ্য সন্ধানকে ডাকিয়া তোমার শ্রির সাধনে নিযুক্ত কর, আমরা সহজে উঠিয়া দাঁড়াইবার পাত্র নহি। স্বরত তোমার ডাকে আমরা পুনরায় সম্মিলিত হইতে পরিব।

বঙ্গাল ইষ্ট সঙ্গনোদ্যেগে কৌলীভ প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেশের দুর্ভাগ্য দোষে সে আশা ফলবতী হয় নাই। যে সকল পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে, কৌলীভ মর্যাদা সুরক্ষিত ও কল্যাণকর হইত, তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই, বেরূপ ঘটনাছে তাহারই উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য। দেবীঘর মেল বন্ধন করিয়া বন্ধীর কুলীন ব্রাহ্মণগণের আরও যে কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। কৌলীভপ্রথা ঘটক দেবীঘর ঠাকুরের হাতে আরও অধ্যোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কুলীনগণের মধ্যে সর্বদারী বিবাহ প্রথা রহিত হওয়াতেই এই বিবিধ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। বিভাগাগর মহাশয় এই কৌলীভসঙ্গীর্ণতা দূর করিবার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, আর সেই আন্দোলন বিবিধ আকারে বিশ বৎসর ধরিতা চলিয়াছিল। রাজদ্বারে দ্বিতীয়বার আবেদন প্রেরণ সময়েও প্রায় ২১০০০ লোক স্বাক্ষর করিয়া কৌলীভ প্রথা রহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই প্রার্থনাপত্রে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ সতীশচন্দ্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহোদয় স্বাক্ষর * করিয়াছিলেন এবং ২১০০০ সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত এই দ্বিতীয় আবেদন পত্র ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৯ মাঠ তারিখে তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর

* মহারাজ সতীশচন্দ্র রাধ বাহাদুর, নদীয়া।

সত্যপদ্রণ ঘোষাল, কুঁকৈলাস।

প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কান্দী।

জয়কৃষ্ণ সুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।

পূর্ণচন্দ্র দাস, নেওড়াপুলি।

সারদাপ্রসাদ দাস, চকদীঘি।

যজ্ঞেশ্বর সিংহ, কাঁতাড়া।

রাজকুমার দাস চৌধুরী, দারীপুর।

বিনোদরায়ণ দাস, কাঁতাড়া।

উদয়চন্দ্র চৌধুরী, রাধানগর।

দাস জিলাদ চৌধুরী, ঢাকা।

বিনয়কৃষ্ণ সুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।

শত বাথ পতিজ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামমোহন ঘোষ।

হীবালাল শীল।

জামাচরণ মলিক।

রাজেন্দ্র মলিক, রাজা।

রাজেন্দ্র দত্ত।

নরসিংহ দত্ত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

কালিদাস দত্ত।

রাজেন্দ্র দত্ত।

গোবিন্দচন্দ্র সেন।

হরিশোহন সেন।

স্বাধীন ঘোষাল।

শ্রম সিসিলি বিডন মহোদয়ের হস্তে অর্পণ করিবার জন্ত যে মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, তাহার সভাপণ যে কয়েকটা কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেগুলির মর্ম্ম এই :—
 “এই অতি ঘৃণিত ও অনিষ্টকর বহুবিবাহ প্রথা রহিত করণোদ্দেশ্যে প্রায় নয় বৎসর পূর্বে ২৫০০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র সে সময়ের মাননীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইয়াছিল। এই জঘন্য প্রথার অনিষ্টকারিতা বিষয়ে নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি পূর্বে যে আবেদন পত্র প্রেরিত হয়, তাহাতে অতি বিস্তৃত ভাবে সে সকল কথার আলোচনা হইয়াছে এবং আমরা অনেকেই সে আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। সুধৃষ্টি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অননুমোদিত এই সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনপক্ষে যে আপনি যত্নবান হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষতঃ এইরূপ সংস্কারকার্য্যের শুরুর অনুষঙ্গ করিয়া যখন এত লোক প্রার্থনা জানাইতেছে, তখন, ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার যুক্তিযুক্ততা আরও প্রবলরূপে প্রমাণিত হইতেছে।”

রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর এই আবেদন পত্র এবং মহারাজ মহাতাপ

মাধবলাল সেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।

কৃষ্ণকিশোর ঘোষ।

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

হারকানাথ মিত্র।

অন্নবাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

দয়ালচাঁদ মিত্র।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ডাঃ।

প্যারীচাঁদ মিত্র।

দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজ।

হারকানাথ মলিক।

ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শিবচন্দ্র দেব।

সিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভরতচন্দ্র শিরোবনি, সংস্কৃত কলেজ।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঐ

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, নবমীপ।

প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন।

শ্যামাচরণ সরকার।

দেবেন্দ্র মলিক।

মুরলীধর সেন।

রামনাথ লাহা।

মাধবকৃষ্ণ সেট।

শ্যামাচরণ দে।

প্রিয়নাথ সেট।

কালীকৃষ্ণ মিত্র।

প্যারীচরণ সরকার।

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী।

কৃষ্ণবাস পাল।

কৃষ্ণকমল গুপ্তাচাঁদ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এবং অল্প ২০৮৩ জনের স্বাক্ষর।

চাঁদের প্রেরিত স্বস্ত্র্য আবেদন পত্র বন্ধেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন ।
বন্ধের বাছা বাছা আরও ২০।২২ জন সম্ভ্রান্ত লোক সঙ্গে ছিলেন । তন্মধ্যে
পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারী
চরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্দাদিকারী, কৃষ্ণদাস গাল, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়,
মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।

রাজা সভ্যশরণ ঘোষাল আবেদনকারিগণের অগ্রীগীর্ণে আবেদনপত্র পাঠ
করিলে পর ছোট লাট স্তর লিসিল বিডন বাহাদুর সেই আবেদনের উত্তরে
আশাশ্রয় প্রত্যুত্তর দিয়া বলিয়াছিলেন, “১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ না
ঘটিলে স্তর জন গ্রাণ্ট মহোদয়ই একাধা সম্পন্ন করিতেন । আমি সে সময়েও
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, এখনও করিব ।” কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে
এবারেও বিভাগাগর মহাশয় বহু চেষ্টারও বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ করিতে
বিকলমনোরথ হইয়া অল্প উপায়ে এ কার্য সাধনে অগ্রসর হইলেন । কুলীনগণ
অগ্রসর হইয়া এই প্রথার পরিবর্তন করিতে সম্মত হন কিনা বিভাগাগর মহাশয়
তাহারই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন । তাহার চেষ্টায় সকলই সম্ভব হইত এবং
তিনি সে বিষয়ে যত্নের ক্রটি করেন নাই । তারপাশা নিবাসী বাবু রাসবিহারী
মুখোপাধ্যায় দেবীঘরের মেল বন্ধন ভঙ্গ করিয়া সর্দাদারী বিবাহে সম্মত হইলেন
এবং বিভাগাগর মহাশয় সে সময়ের সম্ভ্রান্ত সামাজিকগণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন
তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল :—

নানাশুণ্যলঙ্ঘিত

শ্রীযুক্ত রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর মহাশয়

মদনুগ্রাহিকেষু

জয়দেবপুর, ডাওয়াল, ঢাকা

বিসম্বৎসরাননমস্কার পুরঃসরং নিবেদন মিদম্—তারাপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাস-
বিহারী মুখোপাধ্যায় কলিকাতার আসিয়াছেন । তাহার নিকট শুনিলাম
কুলীনগণের মধ্যে সর্দাদারিক বিবাহ প্রচলিত করিবার নিবন্ধ তিনি উজ্জ্বল
হইয়াছেন এবং স্বয়ং সর্দাদায়ে সেই প্রথা অবলম্বনে প্রস্তুত হইবেন স্থির
করিয়াছেন । তিনি কহিতেছেন এবিধে মহাশয়ের সম্পূর্ণ যত্ন, উৎসাহ ও মনোযোগ

আছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবার বিষয়ে মহাশয় যে স্রবিশেষ যত্ন করিবেন সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উল্লিখিত কার্য সমাধা কালে আমি উপস্থিত থাকি। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত আছি, কিন্তু মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক পত্র না পাইলে, আমার তথ্য যাইতে সাহস হইবেক না। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তদনুসারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমি আর ১০।১২ দিন কলিকাতায় আছি, তৎপরে কার্যবশতঃ হানান্তরে যাইব। আমার অভিলাষ এই, যাইবার পূর্বে মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক অনুগ্রহ লিপি প্রাপ্ত হই।

আমি আবার মাসে অতিশয় অনুস্থ হইরাছিলাম, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইরাছি। মহাশয়ের সর্বাদীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে আজ্ঞা হয়, কিম্বিকিমিত্তি ১৯এ পৌষ ১২৮২ সাল।

অনুগ্রহাকাজিঞঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

জাজিপাড়া নিবাসী বাবু তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয়কে, মাহতটুলী (ঢাকা) নিবাসী বাবু রাসবিহারী রায় মহাশয়কে, কালীপাড়া (ঢাকা) নিবাসী বাবু ভ্রামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয়কে উল্লিখিত পত্রের এক এক প্রতিলিপি প্রেরণ করেন। ঐ সকল পত্রের পাঠ ও স্বাক্ষর একই রূপ। কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই সর্বভারী প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা কার্যে পরিণত হইরাছিল কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে কুলীনকন্ডারা এখনও অনেক স্থলে অত্যধিক মাত্রায় পূর্বোন্নিখিত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অশেষ প্রকার হুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার যদি কোন ভাগ্যবান সন্তান পুরুষ অভ্যাসিত হইরা বিভাগসাগর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং এই অশেষ হুঃখের আকর বেষ্টিমন্ত বহুবিবাহের পথরোধ করিতে পারেন, তাহা হইলেই যত্নের অসংখ্য বালিকা, স্ত্রীঘনে ও ঘৌষনে সংসারধর্ম্মের অধিকারিণী হইরা সেই মহাপুরুষের পূজার নিযুক্ত হইবে এবং হৃদয়ের অন্তরতম স্তরে প্রবাহিত কৃতজ্ঞতার গুণ্য-তোয়ার

জ্ঞান করিয়া ছোট্টকরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে এবং কোটি কণ্ঠে বিভাসাগর মহাশয় ও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণকারীর জ্ঞতি বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইবে।

এই সকল সামাজিক বৈষম্য ও ভ্রমবন্ধন জীবাতিয় অশেষ ক্লেশ নিবারণে বিভাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় যে সর্বদাই ব্যাকুল হইত, তাহার গুঢ় কারণ তিনি তাঁহার হৃদনার পরিসমাণ্ড স্মৃত্ত আয়তচিত্রে লিখিয়াছেন, “যে ব্যক্তি রাইমণির দয়া, সৌভাগ্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদৃশ্যের কলভোগী হইয়াছে, সে যদি জীবাতিয় পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃত্য পামর ভ্রমণে নাই।” তিনি স্বীয় হৃদয়-মূলভ সহিকুতা, কোমলতা ও পরদুঃখকাতরতার ক্রোড়ে শৈশব ও বালা জীবন অতিক্রম করিয়া চিরকৃতজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যেখানে, যে আকারে, যে পরিমাণে জীবাতি অত্যাচারিত ও নিপীড়িত, সেই সেই খানে, সেই মহাপুরুষ সেই পরিমাণ পরাক্রমের সহিত দুর্জলের বলরূপে, অবলার আশ্রয়রূপে, সমাজ-স্বকলমে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার বহুবিবাহ বিবরক গ্রন্থের একস্থানে তিনি যে গুরুতীত্র আক্ষেপোক্তিপূর্ণ কোমল মিষ্ট অশ্রুদ্বারা প্রবাহিত করিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে সেদূর মুক্ত হৃদয়ের আকুল কণ্ঠনিদান অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, সেই আক্ষেপোক্তির পশ্চাতে, স্বপ্নে অনুভূত যে দুঃখবলি লুক্কায়িত, নিম্নোক্ত কয়েক ছন্দে তাহার আভাস অতি স্পষ্টভাবে অনুভূত হইবে :—

“একদা প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের তৃতপূর্ণ গবর্ণর জেনারেল মহাশয় লর্ড বেন্টিক অতি নৃশংস সহগমন প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, কৃতসঙ্কল্প হইয়া, প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের পরামর্শ বিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহার সকলেই স্পষ্টবাক্যে কহিয়াছিলেন, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, বাবতীর লোক বৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইবেক, এবং সিংসন্দেহ, রাজবিদ্বেষে অত্যাখ্যান করিবেক। মহামতি, মহাসম্মত গবর্ণর জেনারেল এই সকল কথা শুনিয়া, ভীত বা হতোৎসাহ না হইয়া কহিলেন, যদি, এই প্রথা রহিত করিয়া, একদিন আমাদের রাজ্য থাকে, তাহা হইলেও ইংরেজ জাতির নামের স্বার্থে সৌরভ ও রাজ্যাধিকারের সম্পূর্ণ

সার্থকতা হইবেক। তিনি, প্রজার দুঃখ দর্শনে, দয়াজিহ্বিত ও স্বতঃপ্রসূত হইয়া, এই নহংকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা সেই ইঙ্গরেজ জাতির অধিকারে বাস করিতেছি। কিন্তু অবস্থার কত পরিবর্তন হইয়াছে। যে ইঙ্গরেজ জাতি, স্বতঃপ্রসূত হইয়া, রাজ্যত্যাগভয় অগ্রাহ্য করিয়া, প্রজার দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন; এক্ষণে স্বতঃপ্রসূত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা বারংবার প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। হায়!

“তে কেহপি দিবস গতাঃ”

সে দিন গিয়াছে।

“যাহা হউক, আবেদনকারীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশের মুসলমান, বা অজ্ঞাত প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, উভয়বিধ প্রজাবর্গের নিকট অপরাধী হইবেন; অথবা, প্রজাবর্গ অসন্তুষ্ট হইবেন, এই ভয়ে অভিভূত হইয়া, আবেদিত বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করিবেন একথা কোনও মতে শঙ্কের হইতে পারে না। ইঙ্গরেজ জাতি তত নির্দোষ, তত অপলার্থ, তত কাপুরুষ নহেন। যেরূপ অনিতে পাই, তাঁহারা রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এ দেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই; সর্ব্বাংশে এদেশের শ্রীযুক্তিমাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য।

“এস্থলে, একটি কুলীন মহিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া কান্দ থাকিতে পারিলাম না। ঐ কুলীন মহিলা ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জোঁটা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার নাকি বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। আমি কহিলাম কেবল চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালের জোর থাকে, আমরা এবারে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। তিনি কহিলেন, যদি আর কোনও জোর না থাকে, তবে তোমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। কুলীনের মেয়ের নিতান্ত পোড়া কপাল, সেই পোড়া কপালের জোরে যত হবে তা আমরা বিলক্ষণ জানি। এই বলিয়া, মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক, কিরংকণ ক্রোড়স্থিত শিশু কন্তাটির বুথ নিরীক্ষণ করিলেন, অনন্তর সজ্জননয়নে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ হইলে, আমাদের আর

কোন লাভ নাই ; আমরা এখনও যে সুখভোগ করিতেছি, তখনও সেই সুখ ভোগ করিব। তবে যে হতভাগীরা আমাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে যদি তাহারা, আমাদের মত, চিরহুঃখিনী না হয় তাহা হইলেও আমাদের অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। এক্ষণ আক্ষেপ করিয়া সেই কুলীন মহিলা কহিলেন, সকলে বলে, এক জ্রীলোক আমাদের দেশের রাজা ; কিন্তু, আমরা সে কথায় বিশ্বাস করি না ; জ্রীলোকের রাজ্যে জ্রীজাতির এত দুঃখবস্থা হইবে কেন ? এই কথা বলিবার সময়ে তলীর স্নান বদনে বিবাদ ও নৈরাশ্র একপ মুম্পট ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, আমি দেখিয়া, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলাম।

“হা বিধাতঃ ! তুমি কি কুলীন কন্ডাদের কপালে, নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগ ভিন্ন আর কিছুই লিখিতে শিখ নাই। উল্লিখিত কুলীন কন্ডার জন্মবিদারণ আক্ষেপবাক্য আমাদের অধীশ্বরী ককণাময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সাতিশর লজ্জিত ও নিরতিশয় হুঃখিত হন সন্দেহ নাই।

“এই দুই কুলীন মহিলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :—ইহার দুপুত্রবির। ভ্রূ কুলীনের কন্ডা এবং স্বকৃতভ্রূ কুলীনের বনিতা। জ্যেষ্ঠার বয়ঃক্রম ২০।২১ বৎসর, কনিষ্ঠার বয়ঃক্রম ১৬.১৭ বৎসর। জ্যেষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর, তিনি এপর্যন্ত ১২টা সাত্র বিবাহ করিয়াছেন। কনিষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ২৫।২৬ বৎসর ; তিনি এ পর্যন্ত, ২৫টির অধিক বিবাহ করিতে পারেন নাই।”

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিভাগাগর মহাশয়ের একপ সঙ্কল্প ছিল যে, বহুবিবাহবিষয়ক প্রহের ইংরাজীতে অনুবাদ করিবেন এবং একটা বার ইংলণ্ডে গমন পূর্বক কোটি কোটি প্রজাপুত্রের, জননীতানীয়া মহারাজী ভিক্টোরিয়া সন্দেহ বজের অসংখ্য রমণীর কাতরতাপূর্ণ অশ্রুজল অঞ্জলি পুরিয়া রাজ্যী সন্তাবণার্থে অর্পণ করিবেন, এবং ভারতেশ্বরীকে তাহার একথাও জিজ্ঞাসা করিবার বড় সাধ ছিল যে, যে দেশে পুণ্যপ্রোক্ত পরম সাধবী রমণীর মনি ভিক্টোরিয়া রাজত্ব করেন, সে দেশে নারীজাতির এত দুর্দশা কেন ? ভগবানের কৃপায় শক্তিশালিনী অবলা কি দুর্দশার দুঃখ দূর করিতে বিমুখ হইয়াছেন। *

বঙ্গদেশের ছয়দুর্গ, বঙ্গ-সমাজ আরও কতকাল এই বৈষম্য-কিন্দ্রাটে নিপীড়িত হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, অসংখ্য বঙ্গীয় বালিকাগণের অনৃষ্ট-লিপি-দোষে এমন সুত্রত, সাধননিরত ও পরাক্রমশালী মহাত্মার সাধু সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই কাল আসিয়া সেই মহাত্ম্য রত্নাধার বিভাগসাগর-দেহ হরণ করিল! এ শুভ সঙ্কল্প কল্পনায় রহিয়া গেল—মুকুল কীট-দংশনে স্নিগ্ধ হইল! আমরা অশ্রু মোচন করিয়া বলি, যত দিন না বিধাতার কৃপা হয়—যত দিন না আর কোন মহাপুরুষ অভ্যাসিত হন, তত দিন হে বঙ্গীয় রমণীগণ! তোমরা তোমাদের অশেষবিধ দুঃখের গীত বন্ধ কর, হৃদয়ের সজ্ঞাপ হৃদয়ে লুকাইয়া রাখ, প্রাণের অশেষ ক্লেশ-রাশি অন্তঃপুরের নির্জন প্রান্তে, আবর্জনারাশিও ছাড় তু পীকৃত কর—যাহাদের হৃদয় নাই—যাহারা সে মর্ষ বেদনার কিছুমাত্র বুঝিবে না, বরং উচ্চকণ্ঠে নিজেদের সংকীর্তি ও তোমাদের সুখ সমৃদ্ধির পরিচয় পাড়িতে সদা ব্যস্ত, তাহারা যেন জানিতে না পারে।

বিভাগসাগর মহাশয় যে কেবল বিধবাবিবাহের প্রচলন ও বহুবিবাহের নিবারণ চেষ্টা করিয়াই কান্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি সামাজিক সর্ববিধ উন্নতিসাধন-কল্পে নিরত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কৃত সমাজ-সংস্কার ও সামাজিক উন্নতি বিষয়ক নিম্ন-লিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় :—

প্রতিজ্ঞা পত্র

আমরা ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি :—

- ১। কন্যাকে বিদ্যালিক্ষা করাইব।
- ২। একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে (কন্যার) বিবাহ দিব না।
- ৩। কুলীন, কংসজ, শ্রোয়িত্র অথবা মৌলিক ইত্যাদি গণনা না করিয়া স্বজাতীয় সংপাত্রে কন্যা দান করিব।

এবং তাঁহার বহুবিবাহ প্রচেষ্টা আবেশপোড়িতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। দারাদশ বাবু বলেন :—বাবা বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে সিং বহুবিবাহ গ্রন্থ লিখিয়া কলিকাতা হাঙ্গামা দারাদশ বাবু হাতে দিয়া বলিবে যে, “যেহে রাজ্যের দেশে যেহেদের দুঃখ হুতে না কেন?”

৪। কন্ডা বিবধা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিব ।

৫। অষ্টাদশ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না ।

৬। এক স্ত্রী বিত্তমান থাকিতে আর বিবাহ করিব না ।

৭। বাহার এক স্ত্রী বিত্তমান আছে, তাহাকে কন্ডাদান কুরিব না ।

৮। যেক্রপ আচরণ করিলে প্রতিক্রিয়াসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তাহা করিব না ।

৯। মাসে মাসে স্ব স্ব মাসিক আয়ের পঞ্চাশতম অংশ নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিব ।

১০। এই প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া কোন কারণে উপরি নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাশ্রুত হইব না ।

উল্লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে ১২৫ জন লোকের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের কেহ কেহ আমাদের দেশে বিশেষভাবে সুপরিচিত । সেই মহোদয়গণের কেহ কেহ লোকান্তরিত ; অপব কেহ কেহ জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁহারা উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন কিনা বলিতে পারি না । তবে বিভাগাগর মহাশয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত, উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রের মর্মানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার আচার আচরণই চিরকাল তাহার প্রমাণ প্রদান করিবে ।

ইংরাজ-রাজত্বের স্বত্বপাতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক ক্রমে ক্রমে অধিক মাত্রায় সুরাপান করিতে শিক্ষা করেন । এই গরল সেবন করিয়া মত্ততা জনিত অলীক আমোদে লোক যখন উন্মত্ত এবং সেই আমোদের প্রলোভনে আকৃষ্ট লোকের সংখ্যা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যখন সুরাসেবনে অর্থ, মান সম্মান, পরিশেষে জীবন নাশ হইতে লাগিল, যখন বঙ্গজননীর রত্নসম পুত্রজন সকল অকালে অতীতের অন্ধকারে লুকাইতে লাগিল, তখন বঙ্গীয় সমাজের আর এক সুস্থ ৬ প্যারীচরণ সরকার মহাশয় মাদক সেবন নিবারণে আগ্রহর হইলেন । তিনি বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান ও বিদ্বান লোক ছিলেন । তাঁহার উদ্যোগে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে “বঙ্গদেশীয় মাদক সেবন নিবারণ সভা” (Bengal Temperance Society) স্থাপিত হয় । এই সভার প্রতিষ্ঠাকালে

দেশের অনেকগুলি বড় লোক সহায়তা করিয়াছিলেন। * রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভার সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন ;—“একুশ সভার প্রতিষ্ঠার গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং ইহার উন্নতি কামনার এবং এই ভয়ঙ্কর পাপানুষ্ঠান সকলের আশ্রয়স্বরূপ জুরাপান নিবারণের চেষ্টার এবং বাহারা এই বিষয়ক্ষেত্রে আয়তনাশ করিতেছে, তাহাদিগকে এই বিষয় বিপন্ন হইতে মুক্ত করিতে আমি সর্বদা সর্বপ্রকারে সহায়তা করিতে প্রস্তুত।”*

এই মাদক-সেবন-নিবারণ সভার প্রথম অধিবেশন দিবসে বহুসংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী এবং অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া চিরজীবন বিভাগাগর মহাশয় এই সভার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম অনুষ্ঠান সভায় পাদ্রী ডাল সাহেব, ইন্সপেক্টর উড্ডো প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অনেকগুলি বক্তৃতা হওয়ার পর বাবু পারীচরণ সরকার মহাশয় গোপনে বিভাগাগর মহাশয়কে কিছু বলিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। বিভাগাগর মহাশয় গোপনে ইঙ্গিতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন। ক্রমে ডাল সাহেব, উড্ডো সাহেব, শেষে মাননীয় শত্ৰুনাথ পণ্ডিত সকলেই বিভাগাগর মহাশয়কে কিছু বলিবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ পুরুষের ইচ্ছার পরিবর্তন হইল না; তিনি প্রত্যেকের নিকট অব্যাহতি পাইবার জন্ত হাসিমুখে নীরব-প্রার্থনা জানাইয়া বসিয়া রহিলেন। কেহই তাঁহাকে উঠাইতে পারিল না। † এতগুলি লোক অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে উঠাইতে পারিল না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অজ্ঞে তাঁহাকে যতটুকু বুঝিতেন, তদনুসারে তিনি আপনাকে আপনি অধিক জানিতেন। * সভার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা তাঁহার কার্য্য নহে,

* “Hailed with joy the inauguration of their Society, promised to take the deepest interest in its progress, and to give his cordial concurrence to all measures it may adopt for the eradication of the dreadful vice, and the reclaiming of those who have succumbed to its influence.” Taken from Raja Radhakanta Deb's letter to the Secretary, Bengal Temperance Society.

* মাননীয় জজ জিওর্জ ওকলস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সে সভার থাকিয়া সমগ্র ব্যাপারটি স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই নিকট এই ঘটনাসী শুনিয়াছি।



Sungth. King

তাহা বেশ জানিতেন ; জানিয়া গুনিয়া সে কার্যে অগ্রসর হওয়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই যে, যাহা ভাল করিয়া করিতে পারিবেন না বলিয়া বুঝিতেন, সে কার্যে অগ্রসর হইয়া অল্প উপযুক্ত লোকের প্রাণ্য হরণ করিতে ও নিজের অনুপযুক্ততার পরিচয় দিতে কখনও প্রয়াস পান নাই।* উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত স্থানে বসাইতে, ও উপবিষ্ট দেখিতে, তিনি সর্বদাই তৃপ্তি অনুভব করিতেন। তাঁহার এই নীতিজ্ঞানে মাইকেল মধুসূদনের শত ক্রটি উপেক্ষিত, তাঁহার এই সুশ্রদ্ধা ও সুবিবেচনার ফলে ৮২২২ ককাদাস পাল বাহাদুর পেট্রিরটের সম্পাদকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার এই সুবিবেচনার বহুসংখ্যক লোক উপযুক্ত সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে আজও বিরাজিত।

বিভাগাগর মহাশয় ও প্যারীচরণ সরকার মহাশয় আমরণ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিলিত হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই প্যারী বাবুই ঋণ-দারে বিপন্ন বিভাগাগর মহাশয়কে ঋণমুক্ত করিবার জন্য সাধারণ সমক্ষে হিন্দুপ্রার্থী হইয়া স্বসম্পাদিত সেকালের এডুকেশন গেজেটে একটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্যারীবাবু ধনকুবের ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার যাহা ছিল, তাহা দিয়া বিভাগাগর মহাশয়ের সেবা করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁহার সম্মান ও সন্তান ছিল, তাহারই সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু বিভাগাগরের ঋণ পরিশোধ করিতে দেশেব লোক চাঁদা দিবে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সবলদেহ বিভাগাগর মহাশয়ের পক্ষে এ চিন্তা অসহনীয়। তাই তিনি সেটু মন্তব্য বাহির হইবামাত্র বন্ধুবর প্যারীবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বিভাগাগরের ঋণ পরিশোধের জন্য দেশের লোককে বিব্রত হইতে হইবে না। আমার ঋণভার অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, কেহ যেন সেজন্য ব্যস্ত না হন ; তবে বিধবাবিবাহ বিষয়ে যিনি যাহা সাহায্য করিবেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করা যাইবে। এইরূপ অনিচ্ছা প্রকাশে ও আশান্তি উত্থাপনে বাধ্য হইয়া প্যারী বাবু শেষে সাহায্য প্রার্থনার বিরত হইলেন। মহাত্মা প্যারীচরণের মৃত্যুতে কাতর হইয়া, বিভাগাগর মহাশয় রোগ-শয্যায় শারিত থাকিয়াও ডাক্তার ডুবনমোহন সরকার মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, সেই বন্ধুজনোচিত পত্রখানির বাক্যলাব্দ অনুবাদ এই :-

“প্রিয় ভুবনমোহন,

“আমার গভীর দুঃখ এই যে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন, আমি বেঙ্গল টেম্পারেন্স সভার অধ্যক্ষ অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিষ না! আমার এই অভিন্নহৃদয় স্নেহদের শোকপূর্ণ মৃত্যুতে আমার প্রাণে যে কি দারুণ কোভেঙ্ক সঞ্চার হইয়াছে, তাহা তুমি ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই। আমার যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই পরম্পরকে জানিতাম। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এমন নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল যে প্যারী বাবুর মৃত্যুতে আমি আমার প্রিয়তম ও স্নেহভাজন সহোদর হারাইয়াছি। তাঁহার লোকান্তরগমনে সাধারণ জনগণের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। এক দিকে তাঁহার উপযুক্ততা, আদর্শ চরিত্র, আর একদিকে জনসমাজের হিত-সাধনে তাঁহার নিষ্ঠাপূর্ণ একাগ্রতা; অপরদিকে মাদক সেবন নিবারণে কার্যমনোবাক্যে নিবৃত্ত থাকি, সমুদানপ্রিয় ও নীতিমান লোকমণ্ডলীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার শ্রমশীলতার কলঙ্করূপ বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি, ইংরাজী ও বাঙ্গালা বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কীর্তির পরিচয় দিবে।” *

“২৭ নবেম্বর, ১৮৫৭।”

“তোমার স্নেহশীল

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।”

* My dear Bhooban Mohun,

I regret exceedingly that in the present state of my health, of which you are aware, I am unable to attend this evening's meeting of the Bengal Temperance Society. None knows better than yourself the profound grief with which the lamented death of my beloved friend Babu Pyari Charan Sircar has filled me. We knew each other from early youth, and we were so closely attached that in him I have lost a dear and affectionate brother. To the public the loss cannot be easily replaced. His great ability, high character and single-minded zeal in works of humanity rendered him highly useful to society at large, while his devotedness to the cause of temperance, which was manifested in the foundation of the Bengal Temperance Society, in the

বিভাগাগর মজ্ঞশর সুরাগান প্রভৃতি অসদনুষ্ঠানের পরম শত্রু ছিলেন । ইহার নানাবিধ প্রমাণ বিস্তারিত সাক্ষ্যে কেহ কেহ এক্রপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, এইরূপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণের কাহারও কাহারও প্রতি তাঁহার বিরূপ ভাব ছিল, আবার কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞাতসারে এক্রপ আচরণে তাঁহার ব্রহ্মমতা ও সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইত না । ইহার তাৎপর্য্য কি ? সংস্কার-প্রিয় সঙ্গনের পক্ষে এক্রপ ব্যবহার-বৈষম্যের মীমাংসা কোথায় ? সকলেক পক্ষে সম্ভাবজনক না হইলেও ইহার উত্তর আছে । প্রথমতঃ আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির অল্পবুদ্ধিতে তাঁহার সকল কার্য্য সুন্দররূপে বুঝিয়া উঠা কিছু কঠিন । দ্বিতীয়তঃ তিনি হিন্দুগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, শৈশবে, বালাকালে ও যৌবনে হিন্দুভাবে লালিত পালিত হইয়া হিন্দুসংস্কারেই গঠিত হইয়া উঠেন । হিন্দু শাস্ত্রালোচনাও তাঁহার হিন্দুভাবে গঠিত হইয়া উঠিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল ; তাই তাঁহার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল । তিনি যোগ্যতা অনুসারে লোকের অধিকার ভেদ বুঝিতেন, এক শ্রেণীর লোক আমোদ, প্রমোদ, মত্ততা ও বিলাসপরবশ হইয়া চলিবে, তদতিরিক্ত কিছু তাহারা বুঝে না, সহজে বুঝিতেও পারে না । এক্রপ লোকের মুখাবলোকন না করিলে, তাহাকে চিরদিনের জন্য সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত করিলেই যে সে ব্যক্তি সংশোধিত হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতেন, সঙ্গ থাকিতে থাকিতে সংশোধিত হইলেও হইতে পারে, তাহাও বুঝিতেন, তাই দয়াপরবশ হইয়া অনেকের প্রতি কোমল ব্যবহার করিতেন । এই জন্য সেরূপ করিতেন যে তাহাদের নিকট হইতে তদতিরিক্ত কিছু আশা করিতেন না । আর যাহাদের কার্য্য কলাপ, আচার আচরণ হইতে তিনি সমাজের নানাবিধ কলাপ, প্রত্যাশা করিতেন, তাহাদের কেহ সংসঙ্গ সদ্ভাব ও উচ্চ আদর্শের অনুবর্তী হইয়া চলিতে গিয়া বিপদগামী হইলে, তাঁহার হৃৎক, অভিমান ও ক্রোধের সীমা থাকিত না ।

publication of very many valuable tracts in English and Bengali and in other acts, will doubtless be long cherished in grateful remembrance by all lovers and promoters of temperance in this country.

I remain, yours affectionately,

27th November, 1875.

(Sd) Inwara Chandra Sarma.

সে রূপ স্থলে তিনি নিতান্তই বিরূপ হইয়া বসিতেন। গাছে এইরূপ বিরূপ হন, এই ভয়ে, তাঁহার কোন প্রিয়তম বন্ধু, দেশের জনৈক সুসন্তান, সম্রাস্ত মহোদয় নিজের অসদুচ্চানের সংবাদ বহুবিস্তৃত আকারে বিভাসাগর-সম্মিথানে বিবৃত হইরাছে, এবং তিনি তাহা শুনিয়া নিতান্ত ক্রোধাবিত হইরাছেন শুনিয়া, নিজের অগরাধের লঘুতা প্রতিপন্ন করিতে এবং তাঁহার বিরক্তির বিলোপ করিতে যে মার্জনা-প্রার্থনা সূচক পত্র প্রেরণ করেন, তাহার কিয়দংশ এখানে দেওয়া গাইতেছে :—“অল্পদায় সহিত * আপনার গতকল্যকার কথাবার্তা শুনিয়া আমার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইরাছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমি পূর্বরাত্রিতে ৮টার সময় বাবু * *, * *, * *—র

* “Having heard of the conversation you had with my friend ** yesterday evening it becomes indispensably necessary for me to give you a detailed account of my conduct in the garden party complained of. **

The fact was that I accompanied by Babus ***, ***, and ***, reached the appointed place at 9 P. M. on the night previous, some of my friends pressed me to drink, I protested, pleaded ill health but finding too importunate to be refused did at length take two sips. The quantity imbibed was literally not more than a *kutecha*, the remainder of the liquid in the glass being somehow managed to be poured down upon the floor. This was the actual extent of my drunkenness on that night. The following morning I was again pressed to drink, I steadfastly refused. Now as to the other and more serious part of the charge that has been brought against me * *, circumstanced as I was I had no other alternative but to remain where I was. To return home at that hour of the night would have been exceedingly inconvenient and even if it were otherwise I did not like to play the Puritan unnecessarily. Several times I attempted to run away into an adjoining room but was on each occasion compelled to come back by sheer physical force. That I did not quit the company, that very instant, is the only impropriety I have been guilty of, but beyond that I can most solemnly aver that I did not by my act, word or even gesture in any manner encourage or even countenance the proceedings *** I whiled away my time as best I could tell. About half past 12 or 1 o'clock when dinner was ready I finished my meal as hastily as possible, ran to the Bytuckhana before every other member of the party and locked myself up alone in a separate room for the rest of the night.”—Taken from a private letter addressed to Vidyasagar Mohashaya by a very particular and influential friend.

সহিত বাগানে উপস্থিত হই, আমার কোন কোন বন্ধু সুরাপানের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি অস্থখের দোহাই দিয়া অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাঁহাদের অতিরিক্ত পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া শেষে চুইবার একটু একটু খাইয়াছিলাম, বাহা পান করিয়াছিলাম, তাহার মোট পরিমাণ এক কাঁচার অধিক নহে। অবশিষ্ট অংশ সকলের অজ্ঞাতসারে ঘরের মেঝেতে ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সে দিন রাত্রিতে আমার মদ খাওয়া ও মাতলামি করার সত্য ঘটনা এই। পরদিন প্রাতে আমাকে পুনরায় পীড়াপীড়ি করার আমি একবারেই অস্বীকার করিয়াছিলাম—আর খাই নাই।

“একণে এই সংস্রবে আমার বিরুদ্ধে আরও যে গুরুতর অভিযোগ আপনাক্ষ কর্ণপোচর হইয়াছে * * * সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সেই রাত্রিতে কোন রকমে সেইখানে পড়িয়া থাকা ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না। এত রাত্রিতে বাটীতে কিরিয়া আসা নিতান্তই অসুবিধার কথা, আর যদিও তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলেও অকারণে সূক্ষ্ম রোগের বাড়াবাড়ি করিতে তত ইচ্ছা ছিল না। আমি বহুবার মজলিস্ হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিলাম, আমাকে সকলে পড়িয়া জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে। আমার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে সে অপরাধ এই যে, আমি তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি নাই, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কাজে কিংবা কথায় কিংবা ভাবভঙ্গীর দ্বারা, সেখানকার সে বীভৎস ব্যাপারের পক্ষসমর্থন করি নাই। আমি সমগ্র সময় দূরে দূরে কাটাইয়াছি। রাত্রি সাড়ে বারটা একটান্ন সময় আহার প্রস্তুত হইলে, আহাৰাদি করিয়া সন্ধ্যায় বৈঠক খানার আসিয়া একটা শব্দও ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম * * *।” ইনি বঙ্গদেশের একজন সুপরিচিত সুসন্তান। বিভাগাগর মহাশয় চরিত্র ও আচরণ বিষয়ে কত উচ্চ ভূমিতে বিচরণ করিতেন, তাহা উল্লিখিত পত্রাংশে প্রকাশ পাইতেছে। সম্বন্ধের সচ্চরিত্রতার বিপর্যয় সম্পর্শনে তাঁহার প্রাণে গভীর ক্লেশের সঞ্চার হইত, সেই জন্যই বঙ্গের সুখোচ্ছলকারী সুসন্তানগণও তাঁহার নিকটে নিজ নিজ দুর্বলতা ও ভ্রমপ্রবানজনিত অসম্মতচরণের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইতেন। বিভাগাগর মহাশয়ের কাৰ্য্যকলাপ যে কেবল সমাজ সংস্কারে আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, বন্ধুবান্ধবগণের আচরণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে এবং

আত্মশাসনে কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিতে তিনি কখনও হস্তাৎপন্ন ছিলেন না, যদি তিনি আপনি উচ্ছ্বল লোক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার তুল্য সম্মানিত ব্যক্তিগণ কখনই তাঁহার নিকট আত্ম-দোষ কালনের জন্য এত ব্যস্ত বা বিব্রত হইয়া পড়িতেন না। কিন্তু এ কথা সত্য যে, তাঁহার সমাজ-সংস্কার কার্য, তাঁহার বিধবাবিবাহ, প্রচলন চেষ্টা, তাঁহার বহুবিবাহ নিবারণ চেষ্টা, তাঁহার সর্ব প্রকার জনহিতকর কার্যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ঈর্ষাপন্নায়ণ লোক তাঁহার নানা প্রকার ছন্দা রটনা করিয়াছে। কি স্বদেশে কি বিদেশে, কি আধুনিক কালে কি পূর্বকালে, সমাজ-জীবনের প্রবহমাণ স্রোতের বিরুদ্ধে মহামনা সঙ্কে-
 টিসের জায় যখনই কেহ কোন প্রকার পরিবর্তন আনিতে প্রয়াস পাইরাছেন, তখনই সেই মহাপুরুষের যশোদীপ্ত স্মৃতিমান প্রতিষ্ঠার প্রতি অগ্রীতি জন্মাইবার জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির নানা বর্ণের কলঙ্করোমা পাত করিতে মহা ব্যস্ত হইয়া থাকে। বিভাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পান নাই। সর্দার শ্রীমন্তকে সর্বদা সঙ্গে রাখিয়া আততায়ীর হস্তে প্রাণ বাচাইয়া-
 ছিলেন সত্য, কিন্তু ওঠাগ্রে অবস্থিত নিরাকার নিন্দার লেপন হইতে তাঁহার আত্ম-রক্ষা সম্ভব হয় নাই। হৃৎথের বিষয় যে তাঁহার জীবনী প্রণেতার্য্যও এ বিষয়ে কমতর। তাঁহার বাহা ইচ্ছা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরম স্নেহাশ্রম
 ৬/কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বন্ধুমণ্ডলী * সমক্ষে সর্বদাই এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন, যে, “আমার সর্বত্র সমান শ্রুৎ। লোক-
 মুখে শুনিতে পাই যে, এমন কোন অপকীর্তি নাকি নাই, বাহা আমি করিতে পারি না।” বর্ধমাননিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ও গভীর
 আক্ষেপোক্তিসহ অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার বলিয়াছেন যে, “কত দিন বিভাসাগর মহাশয় নির্জনে মনের হৃৎথে এই সকল কথা আমাকেও বলিয়াছেন।” কালীচরণ
 বাবু ও গঙ্গানারায়ণ বাবু উভয়েই বলিয়াছেন যে, যে বিভাসাগর সর্ববিধ
 বিপদের মধ্যে অটল অচল ভাবে দণ্ডায়মান, জায় বিচারে আত্মপর জ্ঞান
 বিরাহিত, সদমুঠানে উৎসাহমাতা, অসদমুঠানে পরমাত্মীয়কে পরিত্যাগ করিতে

* ৬/কালীচরণ মিত্র, ৬/কালীচরণ ঘোষ, ৬/শ্যামচরণ দে প্রভৃতি বহুজন সহকর্মী বহুবার
 গভীর আক্ষেপ সহকারে এই সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের
 নিকট শুনিয়াছি।

অকুস্তিত, তাঁহার প্রতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের অকিঞ্চিৎকর মিল্লার লেশ মাত্রও স্পর্শিবে না ।

বিভাগাগর মহাশয় চিরদিনই সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন । সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণসাধন তাঁহার জীবনের মহাত্ম ছিল, তাঁহার পরলোক গমনের অতি অল্প দিন পূর্বে সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলনে হিন্দুসমাজ যখন টলটলায়মান, যখন লোক আইনের আবশ্যকতা বুঝিয়া ও না বুঝিয়া কেবল “আইন চাইনা, আইন চাইনা” বলিয়া, রাজপ্রতিনিধির রাজত্ববনের চারিদিকে চীৎকার করিয়াছিল, তখনও বিভাগাগর মহাশয় অমূহ ও ভয় দেহ এবং অবসন্ন মন লইয়া ধর্মবুদ্ধির তাড়না ও বহুলোকের অমুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বয়ং স্তর ফিলিপ হচিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং সম্মতি-আইন সন্ধে তিনি যে ক্ষুদ্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য করিতে বিশেষ ভাবে অমুরোধ করিয়াছিলেন । অমুরোধে কল হয় নাই, তাহাতে আধুনিক কালের ভারতীয় রাজকার্য পরিচালনের ব্যবহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন । বিভাগাগর মহাশয় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের নূতন পরিবর্তন সন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা স্মৃতি ও ধর্মবুদ্ধি উভয়েরই সম্পূর্ণ অনুমোদিত । আমরা তাঁহার সেই শেষ সামাজিক কল্যাণ সাধনোপযোগী ‘উক্তিপূর্ণ—অসহায় স্ত্রীজাতির প্রতি সমবেদনার পরিচায়ক’ ব্যবস্থাপত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

“এই সমস্ত কারণ বিজ্ঞানে যদিও আমি বর্তমান আকারে উপস্থিত আইনের পক্ষসমর্থন করিতে পারিতেছি না । আমি ইচ্ছুক করি, বাহাতে হিন্দুর ধর্ম কঠোর হস্তক্ষেপ না করিয়াও বালিকা স্ত্রীদিগকে উপযুক্তরূপে নিরাপদ করা বাইতে পারে, এই আইন সেইরূপভাবে বিধিবদ্ধ হউক । আমি প্রত্যাশ করিতে চাই যে, দ্বিতীয় সংস্কার কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে কোন স্থায়ী বালিকা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করিতে পাওয়া আইনানুসারে দণ্ডনীয় হউক । অধিকাংশ স্থলেই ১৩।১৪।১৫ বৎসর বয়সের পূর্বে বালিকাদিগের দ্বিতীয় সংস্কার কাল উপস্থিত হয় না । আমার পরামর্শমতে আইন বিধিবদ্ধ হইলে, ইহার দ্বারা অধিকাংশস্থলে, অনেক অধিক পরিমাণে বালিকাদিগকে বিপদ হইতে

বাস্তবিকই রক্ষা করা হইবে। অথচ কর্তৃলোপ হইল বলিয়া কেহ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না।” *

ইহার পর শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি প্রদর্শনপূর্বক বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষে বলিয়াছেন :—“সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে বালিকাদিগের দ্বিতীয় সংস্কারকাল উপস্থিত হইবার পূর্বের সম্বন্ধকে অপরাধ বলিয়া গণনা করিলেই সর্বতোভাবে সম্ভব হইবে বলিয়াই বোধ হয়।”

“এইরূপ বিধি প্রণয়নে যে কেবল বালিকাদিগকে অজ্ঞান অজ্ঞাতার হইতে রক্ষা করিয়া জনসমাজের কল্যাণ সাধন করা হইবে তাহা নহে, শাস্ত্রে যেরূপ নির্দেশ আছে, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শাস্ত্রে একরূপ অজ্ঞান্যাহুতানে যে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহা আধ্যাত্মিক এবং তাহা সহজেই লোক উপেক্ষা করিয়া থাকে। আমার প্রস্তাবমত ব্যবস্থা করিলে দণ্ডবিধি আইন দ্বারা ধর্মনির্দেশ অধিকতর ফলপ্রদ হইবে। আমি এবিষয়টা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে গভর্ণমেন্টের মনোযোগদান প্রার্থনা করিতেছি।” †

* “Though on these grounds I cannot support the Bill as it is, I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real, and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance.”

† “From every point of view, therefore, the most reasonable course appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has first menses.

Such a law would not only serve the interests of humanity by giving reasonable protection to child-wives, but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras. The punishment, which the Sastras prescribe for violation of the rule, is of a spiritual character and is liable to be disregarded. The religious prohibition would be made more effective, if it was embodied in a penal law. I may be permitted to press this consideration most earnestly on the attention of the Government.” ***

Note on the Bill to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1882.

(Sd.) Isvara Chandra Sarma,
The 15th February, 1891.

তিনি এই সময়ে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এখানে আর সে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমাদের বোধ হয়, আধুনিক কালের রাজকর্মচারীদের বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত আদৌ পরিচয় ছিল না; বিভাগাগর মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী সমাজ-সংস্কার ও লোক সেবার গুরুত্ব ও বিধুতি অবগত থাকিলে, এক বিভাগাগর মহাশয়ের আগ্রহ ও পরামর্শই রাজকর্মচারিগণ আপনাদের সমস্ত কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত করিয়া আইনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করিতে পারিতেন। সেরূপ ব্যবস্থা না করায়, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্যক সুসিক হয় নাই। ঐ আইন সম্বন্ধে বিভাগাগর মহাশয়ের পূর্ণ সহায়ত্বের অভাব এবং পরিবর্তিত আকারে ঐ আইন বিধিবদ্ধ করার প্রার্থনা হইতে বৃষ্টিতে পারা যাইতেছে যে, বিভাগাগর মহাশয়, যখন তখন, যেমন তেমন পরিবর্তনের প্রার্থী হইয়া কখনও সংস্কার-ক্ষেত্রে কিংবা রাজস্বারে উপস্থিত হন নাই। সুশ্রুতি ও সমাজ-ধর্মের সীমার মধ্যে থাকিয়া যত দূর পরিবর্তন সম্ভব, তিনি স্বদেশবাসিগণের ততদূর মঙ্গল সাধনেই আজীবন প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ সংস্কার প্রার্থনাও সেই ভাবেই পরিচয় দিতেছে। বিভাগাগর মহাশয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই লোকান্তর গমন করেন, আর ঐ বৎসরের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত মন্তব্য-পত্র রাজ-প্রতিনিধি সদনে প্রেরণ করেন, সুতরাং তাঁহার পরলোক গমনের অন্তর্যকাল পূর্বেও যে তিনি লোকহিতসাধনে সমান ভাবে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বিভাগাগর মহাশয়ের হিন্দুতাব ও হিন্দু-বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। ঘটিয়াছিল কি না, সম্মতি-স্বীকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দুতাব ও হিন্দুসংস্কারের রক্ষাকল্পে তিনি অপর কোন আত্মবান হিন্দু অপেক্ষা নূন ছিলেন না। কেহ কেহ দ্বা কয়িতা তাঁহাকে ভ্রান্ত হিন্দু বলিয়া পরম তুষ্টি অহুভব করিয়া থাকেন, ইহা অপেক্ষা জাতীয় অপদার্থতা ও অযোগ্যতার আর কি অধিক পরিচয় হইতে পারে? জাতীয় অধঃপতনের পরাকাষ্ঠা না হইলে আর, লোকের মুখে ও লেখনীতে এক্ষণ লজ্জাকর কথা প্রকাশ পায় না। আমাদের পোড়া কপাল যে, এক্ষণ মহাত্মা লোকের আবির্ভাব ও কার্যকলাপ ভাল করিয়া উপলব্ধি

করিতে এবং সে সকলের উপযুক্ত মূল্য নির্দেশ করিতে পারিতেছি না। তিনি আহায়ে ব্যবহারে চিরদিন সম্পূর্ণ হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন; কখনও ভ্রমক্রমেও অখাণ্ড ও অপের গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণ স্থলে ঐহারা অখাণ্ড ভোজনে ও অপের পানে পুষ্টদেহ, তাঁহারা অবশ্যই নিজ নিজ অচুঠান দ্বারা হিন্দুসমাজ কলঙ্কিত করিয়াছেন, ও অত্যাধি ঐক্লপ কার্যে নিরত রত রহিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিভাসাগর মহাশয় কি পরম হিন্দু নহেন? ঐহারা সর্বদা বহুবিধ বেশভূষার সুসজ্জিত হইয়া পুষ্পোচ্চানের প্রজাপতির স্থায় জনসমাজের দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, এমন কি, যে দেশে অখ্যাপকসমাজও তরল, গরদ প্রভৃতি পট্টবস্ত্র ও শাল বনাত প্রভৃতি নীতবস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত সে দেশের লোকের পক্ষে মোটা ধূতি চাদরে বিভাসাগর মহাশয় কি মনু ৩ পরাশর, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, বায়ীকি ও ব্যাস, প্রভৃতি মহাঋষদের স্থায় পুজনীয় ব্যক্তি নহেন? বর্তমান সময়ের সম্মান ও সম্পদশালী মহাশয়গণের সাক্ষাৎকার লাভ সুহৃৎত ব্যাপার, তাঁহাদের দর্শনলাভাকাজী ব্যক্তির, বহুতর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কিন্তু এই অসংখ্য জনমণ্ডলীর মহাসমারোহপূর্ণ রাজধানী কলিকাতার বাস করিয়াও তিনি নির্জন অরণ্য প্রান্তস্থ তপোবনের পর্ণ-কুটীরবাসী ব্রাহ্মণের স্থায় সকলেরই স্নগভদর্শন ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কেহ কখনও কাহারও দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন নাই।

“তাঁহার আড়ম্বরবিহীন পুষ্পোচ্চানপরিশোভিত নির্জন ক্ষুদ্র ভবনে যিনি বসেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, সুহৃতার, অসুহৃতার, অবসরে ও ব্যস্ততার কখন তাঁহাদের কাহাকেও তিনি ফিরাইতেন না। সম্পদ ও সম্মানের আভ্যন্তর তাঁহার জাতীয় ভাবের ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনুর্তের লক্ষণ সকলের বিলোপ সাধন হয় নাই। আমরা নিকটে থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যত সামান্য লোক হউক না কেন, যে কোন সময়ে উপস্থিত হউক না কেন, অবাধে গৃহের উপরতলে তাঁহার একোঠে উপস্থিত হইতে পারিত। বহু ঘুরের লোক, আলাপ পরিচয় কিছুই নাই, যেন চির অভ্যস্ত পথে তাঁহার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আপনার সুখ দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করিল, কেহবা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ান মনস্তাপের দ্রববহি অঙ্গুলি ডব্বিয়া লইয়া দাঁড়াইল।

কোথার তাহার বক্সী ঘর, কিছুই নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু বিভাগাগর অশ্রদ্ধা-
চালিত তাহার সম্ভাপনল নির্দীপিত করিতেন এবং তাহার শোকের
কারণ নিবারণ করিবার সাধ্য থাকিলে, তখনই তাহা করিতেন। এরূপ
ঘটনা আমরা উপস্থিত থাকিয়া বাহা দেখিয়াছি, সেই সকলের সংখ্যাই নিতান্ত
অল্প নহে।* বর্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের জীবন যাপন বিষয়ে এতদপেক্ষা
উচ্চতর আদর্শ আর কোথায় পাওয়া যায়? সম্পন্ন ও সম্মতশালী হিন্দুগণ
কি বিভাগাগর সমীপে বাস্তবিকই এই উচ্চ নীতি শিক্ষা করিবেন না?
শাস্ত্রজ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য বিষয়ে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না, একথা
বলি না, তবে তিনি যেমন ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠা ও নিষ্ঠাকৃত্য সহকারে শাস্ত্রার্থ
নির্দেশ করিতে এবং তদনুরূপ পথে চলিতে পারিতেন সে বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষতা
করিয়াছেন এরূপ লোক অল্পই দেখিতে পাই। বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর
দীর্ঘস্থানীয় ও সর্বত্র সমাদৃত কোন অধ্যাপক মহাশয় কোন এক
সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে ব্যবস্থাদান লইয়া বিভাগাগর সমীপে উপস্থিত
হইয়াছিলেন, তিনি হুই বিপরীত পক্ষকে শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা দিয়াছেন শুনিয়া,
বিভাগাগর মহাশয় বঙ্গগম্ভীর রবে বলিয়াছিলেন :—“আপনি চান কি ; আপনি ত
বড় মজার লোক ; পূর্বে যে ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন, এখন আবার, ঐ ব্যবস্থা
শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন, মহাশয় আপনিও কিছু লেখাপড়া
শিখিয়াছেন, আমিও কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছি ; আপনি যদি পণ্ডিত বলিয়া
পরিচয় দিতে পারেন, আমিও পারি। কিন্তু তজ্জপ পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক,
যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান
বোধ হয়। বলিতে কি আপনাদের আচরণের অল্প ব্রাহ্মণ্যজাতির মান একেবারে
গিয়াছে।” ব্রাহ্মণের সর্বপ্রধান গুণ মুক্তভাব ও স্বাধীনতা তাহাতে প্রচুর
পরিমাণে বিস্তৃত ছিল। বঙ্গীয় অধ্যাপকমণ্ডলী কি মহাত্মা বিভাগাগরে তাঁহাদের
লুপ্ত সম্পদের পুনরুদ্ধার দেখিয়া আনন্দিত হইবেন না? তাঁহার সদনে জীবনের
এই উচ্চনীতি শিক্ষা করিবেন না? যে হিন্দুস্ত্র সংসার ব্যাধি নির্মোহের উপযোগী
উচ্চ আদর্শের বেরকণ্ডরূপ সে হিন্দুস্ত্র তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃত ছিল।
কিন্তু আত্মকালকার লোক সে হিন্দুস্ত্র ভাবের উপযুক্ত সমাদর করিতে সক্ষম কি
না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

বিভাগাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কার ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে ধর্মশাস্ত্র সকলের অঙ্গুমোদিত। এইটী সুন্দররূপে বৃদ্ধিতে হইলে, ব্রাহ্মণজনোচিত শাস্ত্রচর্চার প্রয়োজন। সেরূপ শাস্ত্র চর্চা না করিয়া বাঁহারা কেবল প্রচলিত আচার আচরণের অধীন হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং বাঁহারা একগুণ অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রয়াসী, তাঁহারাই দেশের সমুহ অনিষ্ট করিতেছেন, এবং তাঁহাদের পক্ষে বিভাগাগর মহাশয়ের সাধু উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে।

যিনি বাঁহাই বলুন, চিন্তাশীল ও আত্মবান হিন্দুগণ বিভাগাগর সমক্ষে চিরদিনই সম্মানসহ নতমস্তক ছিলেন। কোন সামাজিক অসুষ্ঠান কি শাস্ত্র বিবরক কোন জটিল প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহার ব্যবস্থাকেই লোকে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিত। পাইকপাড়া রাজপরিবারে মহাসমারোহপূর্ণ এক শ্রাদ্ধ বাগরে বিভাগাগর মহাশয়ই অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থা মতে ৮ তারিখ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কার্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার নির্দেশ মতে বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক মণ্ডলী যথাযোগ্য সম্মানে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। একগুণ কার্যে তাঁহার প্রধানতার প্রমাণ প্রদর্শনার্থ ঐকশাষি পত্র উদ্ধৃত করা গেল :—

শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মালিয়া,

বিনয়-নমস্কার-পুরস্কৃতঃ নিবেদনমিদম্—

এক্ষণে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিহারী মহাশয় নবদ্বীপের প্রধান নৈরায়িক, সে বিষয়ে আমার অগুণ্যত্ব সন্দেহ নাই। কলকাতার রাজবাড়ীতে এ বিষয়ের আন্দোলন হইয়াছিল, পরিশেষে তাঁহারই প্রাধিক্ত্য নির্দিষ্টবাদে অস্বীকৃত হইয়াছে। অতএব আপনকার সংসার হইতে নবদ্বীপের প্রধান নৈরায়িককে যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিহারী মহাশয়ই ঐ বৃত্তির বার্থ অধিকারী। আমি পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছি, এজন্য উক্ত নিবিতে বিলম্ব হইল। ইতি ২২এ আশ্বিন ১২৯০ সাল।”

(স্বাক্ষর) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্মাঃ—

সাতকীরার জমীদার বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীর প্রাকোপনকে তদীয় ছই বৃত্ত

পুত্রের এক জনের দ্বন্দ্বক ও অপরের ঔরস পুত্র এই দুয়ের (বুকের পৌত্রদিগের) মধ্যে কে শ্রাক্ষের অধিকারী হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া বিলক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কুলগুরু জ্ঞানকীর্জীবন ভায়রত্ব জ্যোষ্ঠ ও উপনীত দস্তককে শ্রাক্ষের অধিকারী স্থির করেন, নবদীপের ব্রজনাথ বিভাগরত্ন মহাশয়ের স্বপক্ষভায়ে প্রবেশ হইয়া অপর পক্ষ তাহাতে আশঙ্কিত করেন, কুলগুরু জ্ঞানকীর্জীবনগ্রন্থ ব্যবস্থাপ্রাপ্ত দস্তক পক্ষীয়ের সীমাংসার ভার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়। তিনি কুলগুরু জ্ঞানকীর্জীবনগ্রন্থ ব্যবহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। এবং শ্রাক্ষের ব্যর্থত্ব সমস্তই তদনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল।

তাহার লোকান্তর গমন কালে বহুসম্মানান্বিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্, সি, আই, ই, মহোদয় যে শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহারই কিয়ৎংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—“অজ্ঞাবধি যদি কুসংস্কারের একপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইহার কিরূপ বল ছিল, সহজে অনুভব করা যায়। সামান্ত লোকে একপ অবস্থার হতাশ হইত, কৃতসংকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মুর্থতা, অজ্ঞদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের ক্ষয়শূন্যতা, নিষ্কর্ম জাতির নিশ্চলতা, অজ্ঞদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির ফল, অজ্ঞদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর। একদিকে নিষ্কর্ম, নিশ্চল ভোজোদীন বঙ্গসমাজ, অজ্ঞদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর।

“আমাদিগের নিষ্কর্ম বঙ্গসমাজ একপ ব্যাপার বড় অধিক দেখা যায় নাই ;—পবিত্রনামা রামমোহনের সময়ের পর, একপ তীব্রশুদ্ধ, একপ সামাজিক ধর্ম, একপ সঙ্কর, একপ অনুষ্ঠান, একপ সিংহবীৰ্য্য বড় দেখা যায় নাই। পুরুষ-সিংহের সম্মুখে সমাজের মুর্থতা ও স্বার্থপরতা হটিয়া গেল, সামাজিক বোকা অসিহন্তে পথ পরিষ্কার করিয়া বিধবাবিবাহ সৰ্ব্বত্র আইন জারি করাইলেন ; বিভাগাগরের গৌরবে দেশ পূর্ণ হইল, বিভাগাগরের বিজয় লাভে প্রকৃত হিন্দুসমাজ উপকৃত হইলেন।” * এত প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতেও তাহার কোনও

জীবনী প্রণেতা তাঁহাকে অহিন্দু প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া কলঙ্ক অর্জন কর্তাবোধ করেন নাই । *

আজ সমাজ-সংস্কার ক্ষেত্র নীরব । অশ্ব সংযোজিত রথ যেমন সারথিবাহীন হইয়া বিপথে বিচরণ করে, পরিচালকবিহীন সৈন্তগণ যেমন পরস্পরের প্রতি অন্তর্চালনা করিয়া অহ্ন-নাশ ও জাতীয় বলের ক্ষয় করে—আজ বঙ্গ-সমাজ সেইরূপ রামমোহনের আশ্রয়স্থল সারথির অভাবে ইতস্ততঃ বিপর্যস্ত, সমাজ সংস্কারকগণ ঈশ্বরচন্দ্রের আশ্রয় মহাপরাক্রমশালী সেনাপতির অভাবে উচ্ছল সৈন্তমণ্ডলীর আশ্রয় চারিদিকে বিক্ষিপ্ত । অবসর প্রাপ্ত দেবেজনাথ ও লোকান্তরবাসী কেশবচন্দ্রের আশ্রয় প্রতিভাশালী পরিচালকের অভাবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজও ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও হীনবল হইয়া আসিতেছে । বঙ্গদেশের ধর্মচিন্তা, ধর্মকৃষ্ণা, সমাজ সংস্কার এবং লোকের অন্তঃকরণ হিতসাধন স্রোতঃ যেন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে । নানাদিকে গুণবান ও কর্মঠ লোকের সংখ্যা অধিক না হইলেও এমন কেহ কেহ আছেন, যাহারা জীবনেব শোণিত বিন্দু বিন্দু দান করিয়া সমাজের নির্মাণপ্রায় জীবনপ্রদীপ কার্যকশে রক্ষা করিতেছেন । ইহা সত্য কথা, কিন্তু ইহাও সত্য যে রাজ্যের কার্য প্রজায় করিলে, যেমন ভাল দেখায় না,—কাজও ভাল হয় না, বীরের কার্য ভীক্রে করিলে, যেমন বীরত্ব বিলুপ্ত হয়—কেশরীর কার্য শূণ্যে করিলে তাহা যেমন কেবল চতুরতার পরিণত হয়, আমাদের দশা প্রায় তাহাই হইয়াছে । আজ ধর্মকর্মে বল, সমাজ সংস্কারেই বল, আর অন্য নানাবিধ সমুদ্রতানেই বল, আত্ম-বিসর্জন করিয়া কৃতার্থ হইবার লোক অতি অল্প । আত্মোৎসর্গ করিয়া শেষ দিন পর্যন্ত জীবনের মহাব্রত পালন করিতে, ঈশ্বরচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে অগ্রসব হন, একরূপ সুকঠিন মেহমণ্ডলবিশিষ্ট সত্যের ও সবার লোক সহসা উপস্থিত হইতে এবং আমাদেরকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারেন, এই আশার আকাশে আভাসের আলোক দেখিতেছি না । সর্বজীবের আশ্রয়রূপী ভগবান যে বিধানে কৃপা করিয়া রামমোহনের লোকান্তর পন্থার সজ্জা সজ্জা ঈশ্বরচন্দ্রের অভ্যাস করিয়া আমাদের সমক্ষে আদর্শপথ সুপরিষ্কৃত

রাখিয়াছিলেন—ঐশ্বরচন্দ্রের অবদশাতেই কেশবচন্দ্রের অভিনয়ের সূত্রপাত ও পরিসমাপ্তি সম্পাদিত হইয়াছিল ; আজ তাঁহার সেই বিদ্যাই কি আমাদের আশ্রয়রূপে, অবলম্বনরূপে, পথপ্রদর্শকরূপে, সমাজ-দেহের পুরোভাগে বিজয়-পতাকা ধারণ করিয়া বীরবেশে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত পুরুষসিংহকে পাঠাইবেন না ? সঙ্কীর্ণতা ও স্থিতিশীলতার সমাজ-জীবন রক্ষা পায় না । গৃহের গৃহসজ্জা সর্বদা মাজা ঘসা করিতে হয়, বস্ত্রাদি ধোত করিতে হয়, দেহের স্নেহতা পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে, দেহের মলিনতা দূর করিতে হয়, মনের ময়লা—আত্মার আবর্জনারাশিও দূরে নিক্ষেপ করিতে হয় । সামাজিক জীবনে আবর্জনারাশি শুধু পীড়িত হইবে, অথচ আমরা সর্ববিধ উন্নতি-পথে দিন দিন অগ্রসর হইব, ইহা কিরূপে বিধিসঙ্গত হইতে পারে ? সকলেই সংস্কার ও উন্নতি পথে অগ্রসর, কেবল সমাজ স্থিতিশীল ও উন্নতিবিমুখ হইয়া থাকিবে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে ? সমাজের আবর্জনাতেও অগ্নি প্রদান কর—মলিনতা দূর হইবে, সমাজ-প্রাণ বিগুহ স্বর্ণ, আপনার উজ্জলতার সকলের মন হরণ করিবে । বিভাগাগর মহাশয় এই আবর্জনারাশি দূর করিয়া সমাজ-জীবনের প্রাণরূপ বিগুহ স্বর্ণকণা সকল সংগ্রহ করিতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কার্যমনোবাক্যে নিযুক্ত ছিলেন । বঙ্গসমাজ বাহাদুরের ঋণে আমরা ঋণী থাকিবেন, বিভাগাগর মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন । তাঁহার জীবনের সমগ্র সময়—উপার্জনের প্রায় সমস্ত অর্থ, বিজ্ঞা বুদ্ধি ও পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল, তাঁহার স্বদেশ বাসিগণের হুঃখ দূর ও সুখবৃদ্ধি করিতে নিঃস্বার্থ করিয়া মানবজীবনের মহান আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন । এক্ষণে বিধাতার রূপায় সমাজ-সংস্কার-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারীর পুত্র সমাগম অপেক্ষায় দ্বামরা আশাপথ চাহিয়া রহিলাম ।

বিভাগাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টার পক্ষ সমর্থন করিয়া অনেক পণ্যমাস্ত্র অধ্যাপক, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে মহানবোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেন্দ্রচন্দ্র ত্রায়বর মহাশয়ের প্রবন্ধই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সে প্রবন্ধের সার সঙ্কলন পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল ।

নবম অধ্যায় ।

জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে

আজ যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের জাতি, হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ববিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজ নিজ আত্মার কল্যাণ সাধন, মানসিক তৃপ্তি লাভ ও প্রভূত জ্ঞানোপাধ্বন করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন, ইহার সূচনা ও শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে বিভাসাগর মহাশয় মহাশ্রী বামমোহন রায়ের পরেই স্থান লাভ করিবেন। বঙ্গের চির গৌরবস্থল রামমোহন যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া বৈদিকধর্ম—উপনিষদের ধর্ম, পরম পূজনীয় ঋষিগণের সাধনলক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে জীবন ক্ষয় করিয়াছেন। তিনি সর্বপ্রায়ে বেদান্ত সূত্রের বাক্যলা অনুবাদ প্রচার করেন। শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণের ভ্রাতৃ, তিনি শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ সকলের বাক্যলা অনুবাদ প্রচার করেন নাই। তিনি সাধারণ লোকমণ্ডলীর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং এই কার্যেই তিনি সর্বস্বান্ত হইয়া পরিশেষে অর্থাভাবে ইংলণ্ড যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর পূজাপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও সেই লোকান্তরবাসী মহাপুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে আত্মবল জীবনব্যয় করিয়া আসিয়াছেন। বিভাসাগর মহাশয় সেই ক্ষেত্রেই বহুবিদ্বতভাবে লোকশিক্ষার পথ সুপ্রস্তুত ও সুপ্রশস্ত করিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। লোকশিক্ষার জন্যই বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা, তাঁহার অক্ষরকীর্তিরূপে ইহা চিরদিন বাক্যলা সাহিত্যের শোভা বর্দ্ধন করিবে, কিন্তু লোকশিক্ষার পথে, তিনি কেবল এইটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার

জ্ঞানবিস্তারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা বহুদূর অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার শিক্ষা-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার তুলনা তাঁহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ততঃ সে লম্বা দূরত্বের তুলনা মিলে না। তিনি যে আপামর সাধারণ লোকের সুশিক্ষা লাভের কল্পনা স্বপ্নং ছিলেন, তাঁহার প্রথম কর্ম গ্রহণের সময়েই তাঁহার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গভর্নর জেনারেল হাডিঞ্জকে অনুরোধ করিয়া ১০১টী বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর বিম্বক্ষে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া সংস্কৃত কালেজে সাধারণ লোকের সংস্কৃত শিক্ষার দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, বিরোধিগণের সর্বপ্রকার বাদ প্রতিবাদের সহস্রর দিয়া তাহাদিগকে নীরব করেন, এবং তাঁহারই চেষ্টায় ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন অল্প সমগ্র সংস্কৃত শিক্ষা ব্রাহ্মণেতর জাতির বালকগণ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি যখন মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়া, এই চারি জিলার অতিরিক্ত ইন্স্পেক্টর ছিলেন, তখন ছোটলাট ছালিডে সাহেবের বাচনিক আদেশে শতাধিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, শেষে ইহাই মনোমালিঙ্গের কারণ হইয়া তাঁহাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করে। তাঁহার অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্মস্থান বীরসিংহের সমগ্র লোকমণ্ডলীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেন। তিনি স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া জন্মভূমি বীরসিংহে উপস্থিত হন। গৃহে উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথমে তাঁহার পিতৃদেব ও জননী-দেবীর চরণ বন্দনা করিয়া এক সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বাল্যকালে পঠদশা হইতেই ছাত্রত্বের টাকা হইতে গ্রামের টোলের জন্ত হস্ত লিখিত সংস্কৃত পুঁথি ও কিঞ্চিৎ বিস্ত সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপ সচ্ছলতার অভাবে সে অভিপ্রায় কার্যোপরিগত হয় নাই। গৃহে উপস্থিত হইয়া পিতাকে বলিলেন “বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামের বালকদিগের সুশিক্ষা লাভের জন্ত নিজ গ্রামে একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিবার মানস করিয়াছি।” জৈষরচন্দ্রের পিতা মাতা উভয়েই এই সুসংবাদ শ্রবণে প্রীতিপূর্ণ অন্তরে অগ্রসর হইয়া পুত্রকে মেহচূষন • দিয়া পুত্রের প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যে দিন সন্ধ্যার সময়ে এই প্রস্তাব হইল, তাহার পরদিনই বিদ্যালয়ের জন্ত স্থান নির্দিষ্ট হইল এবং স্থায়ী বিদ্যালয়ের

কার্যারম্ভ হইল। বিভাগের গৃহনির্মাণ কার্য আরম্ভ করিবার দিনে মজুর পাওয়া যায় নাই। সমুদ্রতানে বিভাগসাগর মহাশয়ের এমন গভীর অনুরাগ ছিল যে, লোকাভাবে কার্যারম্ভ স্থগিত রহিল না। তিনি নিজেই সহোদরদিগকে সঙ্গে লইয়া মৃত্তিকা খনন কার্য আরম্ভ করিলেন! বীরসিংহ বিভাগের পরম সৌভাগ্য যে, যে মহাত্মার উপস্থিতি ও শুভদৃষ্টি লাভার্থে কত দেশবিদেশের লোক সমুদ্রতান ক্ষেত্রে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার জন্ত লাগারিত হইত, সেই মহাত্মা স্বহস্তে বিভাগের বাটার নির্মাণ কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিকে গৃহ প্রস্তুত ও অত্রদিকে বিভাগের কার্য অস্ত্র আরম্ভ হইল, নিকটবর্তী বহুতর গ্রামের বালকগণ শ্রমিক লাভের স্বযোগ পাইয়া দিন দিন আয়োরিত সাধন করিতে আরম্ভ করিল। ৫।৭ দিনের মধ্যেই শতাধিক বালক বিভাগে প্রবিষ্ট হইল। বিভাগসাগর মহাশয় বীরসিংহে বালকদিগের জন্ত বিভাগ স্থাপন করিলেন—বাণিকদিগের জন্ত বিভাগ স্থাপন করিলেন। তিনি এই পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী পল্লীসমূহের শ্রমজীবী, রাখাল ও কৃষক বালকগণের বিভাগিকার জন্ত নৈশ-বিভাগ স্থাপন করিলেন। এই বিভাগের বালকেরা দিনের বেলায় ক্ষেত্রের কার্য করিয়া ও মাঠে গরু চরাইয়া সন্ধ্যার সময় বিভাগে আসিয়া লেখা পড়া শিখিত। বালক-বিভাগ, বাণিক-বিভাগ, রাখাল-কুল প্রভৃতি জ্ঞান বিতরণের সকল দ্বারগুলিই অবৈতনিক। সকলেই সর্বত্র বিনা বেতনে ও বিনা ব্যয় বিদ্যা উপার্জন করিতে লাগিল। এই সকল বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীগণের পুস্তক, কাগজ, কলম, প্লেট, পেন্সিল, প্রভৃতিতে মাসে মাসে প্রায় ৩০০ টাকার অধিক ব্যয় হইত। বিভাগসাগর-মুহুর্ত ৮প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি বিনামূল্যে বীরসিংহের বিভাগে ব্যবহারার্থে বিতরণ করিতেন। এতদ্বিধা ঐ সকল বিভাগের শিক্ষকগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ সর্বসমেত ৩০০।৪০০ টাকা পড়িত। প্রথম প্রথম এই সমগ্র ব্যয় নিজেই বহন করিতেন, তৎপরে যখন তাঁহারই উদ্যোগে এডেড্ কুল সমূহের (Grant-in-Aid) সৃষ্টি হইল, তখনই কিছুকালের জন্ত বীরসিংহ কুলও গবর্ণমেন্ট হইতে সহায়্য প্রাপ্ত হইরাছিল। এই বিভাগ এক্ষণে সেই প্রাতঃস্মরণীয় বিভাগসাগরজননী

ভগবতী দেবীর নামে পরিচিত। বিভাগাগরপ্রতিষ্ঠিত সেই বিভাগান্নিক
“ভগবতী বিদ্যালয়” নামে অভিহিত হইয়া অতাপি জীবিত আছে এক
বীরসিংহ অকলের বালকগণের শিক্ষা লাভে সহায়তা করিয়া আদিতেছে।
বিভাগাগর পুত্র নারায়ণ বাবু সে বিভাগালের উন্নতিকল্পে যত্নের ক্রটি করেন না।
বিভাগাগর মহাশয়, বীরসিংহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বালকবালিকাগণের
বিনা বেতনে ও বিনা ব্যয়ে লেখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা করিয়াই
তাঁহার ধর্ম-বুদ্ধির নিকট অব্যাহতি প্যন নাই। তাঁহার কোন অসুষ্ঠান
কোন প্রকারে অসম্পূর্ণ কিংবা অস্বহীন থাকিত না। তিনি যখন যাহা ধরিতেন
তাঁহাই করিতেন, যাঁহা করিতেন, তাঁহা সর্বানুসন্দের করিয়াই করিতেন।
বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, বিনা বেতনে বালকদের পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া
দিলেন। পুস্তকাদির প্রয়োজন হইলে নিজ ব্যয়ে সে সকল ক্রয় করিয়া দিতেন,
অন্ন সংস্থান না থাকিলে, নিজ গৃহে স্থান দিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণের ভার
গ্রহণ করিয়া নিজেই চরিতার্থ হইতেন। পিতা ঠাকুরদাস গৃহে থাকিয়াই
কর্তৃত্ব করিতেন, জননী ভগবতী দেবী অন্নপূর্ণাবেশে স্বয়ং পাককাঁধা সমাপন
করিতেন এবং নিজে সকলকে সঙ্গেহে ভোজন করাইতেন। গৃহে আহায়েয়
ব্যবস্থা সকলেরই একরূপ ছিল। নারায়ণ বাবু যথেষ্ট গুনিয়াছি যে তিনি
পিতামহ ও পিতামহীর অতি আদরের পাএ হইয়াও আশ্রিত দরিদ্র বালক-
দিগের সঙ্গে সমভাবে আহার বিহার করিয়াছেন। বর্তমান বাঙ্গালী হিন্দু গৃহস্থ !
একটাবার চিন্তা কর, বিভাগাগর মহাশয়ের একমাত্র পুএ, গৃহের প্রত্যেকের
আদরের ধন, নিজের ঘরে আশ্রিত পরের ছেলেদের সঙ্গে সমান সমাদরে
লালিত পালিত হইয়াছেন। এতরূপ করিতে পার ? যদি না পার, তবে
ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত
হইয়াছ ! নারায়ণ বাবু যখন গৌরবভরে বলিয়াছিলেন “চুই বেলা বহুসংখ্যক
দরিদ্র বালকের সহিত সামান্য অন্নব্যঞ্জনে উদরপূর্ণ করিয়া পরম সুখে ঠাকুরদাদা
মহাশয়ের কোঁড়ে নিজে গিয়াছি” তখন তাঁহার সেই উৎসাহপূর্ণ মুখের শোভা
কর্ণে ও হিন্দুগৃহের নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধন স্বরণে সত্যসত্যই আনন্দপ্র-
বিগর্জন করিয়াছিলাম। বীরসিংহ অকলে ডাক্তার পাওয়া যাইত না।
বিভাগাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ উৎকৃষ্ট বালকগণকে নিজ ব্যয়ে

কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া জন্মস্থান বীরসিংহের ও তল্লিকটবর্তী বহুতর স্থানের লোকমণ্ডলীর এই গুরুতর অভাব মোচন করেন। এই বিভাগায়ের অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্র বিভাগাগর মহাশয়ের সহায়তায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া শেষে সন্মান ও সম্পদের অধিকারী হইয়া এক্ষণে সুখে কালযাপন করিতেছেন।

কিন্তু আজকালকার লোক এক্ষণ অসার যে, বিভাগাগর-হেন লোকের উৎসাহ মান ও তাঁহার নিকট সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। অনেক লোকের আপত্তি না থাকিলে, এবং তাঁহার নাম ধাম প্রকাশে আমাদের অগ্রিয় হইবার ভয় না থাকিলে, আমরা দেখাইতে পারিতাম যে, কেবল বীরসিংহ ও তল্লিকটবর্তী স্থানসমূহের কেন, বঙ্গদেশীয় অসংখ্য সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার মেহপূর্ণ উৎসাহ লাভে তাঁহার অর্থসাহায্য ও উপদেশ প্রাপ্তিতে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন এবং এক্ষণে গণনীয় ব্যক্তিগণের তালিকা বৃদ্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন। বিভাগাদান ও জ্ঞান বিস্তারে তিনি যে এদেশীয় জনমণ্ডলীকে কিরূপ অপরিশোধ্য অগণপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার বর্ণনা হয় না, এবং সহজে লোক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। জন্মভূমি বীরসিংহের সর্ববিধ জীবিক সাধনকর্যে মনোনিবেশ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যখনই যেখানে গিয়াছেন, সে স্থানের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দ্বারা কিছু কিছু সদনুষ্ঠান সাধন করাষ্টয়াছেন। বিভাগায় পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া একবার বৈচি গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় বালিকাবিভাগায় প্রতিষ্ঠা করিবার পর বালকদের জন্য একটা ইংরাজী বিভাগায় স্থাপনের জন্য তথাকার সম্ভ্রান্ত ও গণনীয় জমীদার বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ও বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের আগ্রহ জন্মাইয়া দিলেন। তাঁহার অনুরোধ অনুসারে যে বিভাগায় প্রতিষ্ঠিত হয়, অত্যানি সেই বিভাগায় বিহারী বাবুর ব্যয়ে জীবিত থাকিয়া নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

বিভাগাগর মহাশয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁদি গ্রামে তাঁহাদের আত্মীয়তা সূত্রে কিছুকাল অবস্থান করেন, সেই সময়ে সেখানে রাজাব্যয়ে একটা ইংরাজী বিভাগায় প্রতিষ্ঠা করান। এইরূপ যখন যে স্থানে

গিয়াছেন, এবং বখবই সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানে তখনই জ্ঞানবিস্তারের সুবাবুধা করিয়া আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রশস্ততার পরিচয় দিয়াছেন । এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যেই তাঁহার লোকহিতৈষণা জনসমাজের অজ্ঞতা দূরীকরণেচ্ছা এবং মানবসাধারণের উচ্চতর অধিকার লাভের পক্ষ-পাতিতা, তাঁহার সুবহুৎ জীবনের সুদৃড়ভিত্তিরূপে কার্য্য করিয়াছে । অধ্যাপক ব্রাহ্মণ কিল্লপ সংঘত, নিজেঁও, পরহিতাকাজ্ঞী ও লোকবৎসল হইলে আমাদের এত অধঃপতন সহজে নিবারণিত হইত, বর্ত্তমান সময়ে বিভাগাগর মহাশয় তাহার আদর্শস্থল । তিনি জ্ঞানবিস্তারকেই কুসংস্কার দূরীকরণের একমাত্র মহোদ্য বুলিয়া জানিতেন, এবং সর্ব্বত্র তাহারই প্রয়োগে প্রয়াস পাইয়াছেন । তিনি সংযত কালেজের অধ্যাক্ষের পদ ত্যাগ করিবার সময়ে বলিয়াছিলেন :— “স্বদেশীয় জনগণের সুশিক্ষা লাভ—এবং তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সহিত যদিও আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ চলিয়া বাইতেছে ।” তখন তিনি জানিতেন না যে, স্বদেশীয় শিক্ষাবিস্তারে কতদূর অনিষ্টভাবে তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইবে । বিধাতা যে তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এক সুমহৎ কার্য্য সাধন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে রাজসরকার হইতে—পরের তাঁবেদারী হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই । তা পারিবেনই বা কেমন করিয়া ? শিশু কি যৌবনের ভাবী বলবীর্ষের জ্ঞান ধারণ করে ? বর্ণপরিচয়নবিশী বাগক কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার পুরস্কার প্রাপ্তির তৃপ্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে ? বিভাগাগর মহাশয় যখন কৰ্ম্মত্যাগ করিতে রুডসংকল্প, তখন তাঁহার সম্মুখে কেবল বাক্সালা সাহিত্যের পরিচর্য্যাই এক বহুৎ অনুষ্ঠান বলিয়া বোধ ছিল এবং সে সময়ে সে কেবে’ অতি অল্প লোকই নিবৃত্ত ছিলেন, তাই সেই কার্য্যই তখন তাঁহার বিশেষ কার্য্য ছিল । কালচক্রের সুপরিবর্ত্তনে তিনি যে মেট্রপলিটনের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বদেশীয় ঐক্লপ অসংখ্য বিদ্যালয়ের পিতৃহানীর হইবেন, তাহা তখন চিন্তা করেন নাই, এবং তখন তাহা চিন্তা করিবার অবসরও ছিল না । তিনি যে অজ্ঞাতসারে তাঁহার অপ্রকৃষ্টিত আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়া বলিয়াছিলেন :—“আমি জীবনের অবশিষ্ট সমগ্র সময় সেই সুপবিত্রে অনুষ্ঠানে নিয়োগ করিব এবং সেই ব্রত জীবনের শেষ দিনে, আমার চিত্তভঙ্গ্যে

উদ্ঘাপিত হইবে।” তাঁহার সেই আপনা হইতে পরিবাক্ত উক্তির পূর্ণ সফলতা সন্দর্শনে আজ লোক সকল মুগ্ধ ও চমৎকৃত।

১৮৪৮।৪২ খৃষ্টাব্দে যখন বিভাগাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কালেজে চাকরী করিতেন, সেই সময়ে উভয়ে সংস্কৃতবজ্র নামে একটী মদ্রাবজ্র স্থাপন করেন। আপনাদের রচিত গ্রন্থ ঐ বজ্রে মুদ্রিত হইবে, আপনাদের পছন্দমত পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের বজ্র স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সম্বন্ধে বিভাগাগর মহাশয় নিজের বর্ণিত্যছেন :—“যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে সংস্কৃত বজ্র নামে একটী ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানার তিনি ও আমি উভয়েই সমাংশভাগী ছিলাম।” এই সংস্কৃতবজ্র প্রতিষ্ঠাকালে বিভাগাগর মহাশয়কে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রয়োজন সাধনোপযোগী একটী প্রেস বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে শুনিয়া, বিভাগাগর সেটাকে দেখিতে গেলেন, দেখিয়া পছন্দ হইল, কিন্তু টাকা নাই। বিভাগাগর ও তর্কালঙ্কার উভয়ের কাহারও টাকা ছিল না। অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া করিয়া শেষে বিভাগাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধু বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ৬০০ টাকা কর্জ করিয়া প্রেসটী ক্রয় করিলেন। নীলমাধব বাবুকে যে সময়ের মধ্যে টাকা দিবার কথা, সে সময়ে টাকা দিতে না পারিয়া কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এমন সময়ে একদিন মার্শেল সাহেব কথায় কথায় প্রেস ক্রয় ও ধ্বংসের কথা জানিতে পারিয়া বিভাগাগর মহাশয়কে বলিলেন যে মোট উইলিয়ম কালেজের ছাত্রদের জন্য ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের একটী, পরিবর্তিত সংস্করণ ভাল কাগজে মুদ্রণ করিয়া যদি ছাপাইতে পার, তাহা হইলে আমি উহার ১০০ খণ্ড ক্রয় করিয়া তোমার মুদ্রা বজ্রের ৬০০ টাকা ধন পরিশোধ করিয়া দিব। এই আশা পাইয়া বিভাগাগর মহাশয় ককনগর রাজবাটী হইতে পুরাতন ও মূল অন্নদামঙ্গল আনিয়া তাহারই এক নুতন সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং তাহারই একশত খণ্ড পুস্তক বিক্রয়ের অর্থে প্রেসের ছরশত টাকা ধন পরিশোধ হইল।* এইরূপে সংস্কৃত বজ্রের ধনদায়

হইতে অব্যাহতি পাইলেন। অবশিষ্ট পুস্তক বিক্রয়ে যে অর্থ হইল, তদ্বারা প্রেসেরই স্ত্রীবুদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল। বিভাগাগর মহাশয় ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মিলিত চেষ্টায় সংস্কৃতভাষ্য বরায় আয়ুপোষণে সক্ষম ও ক্রমে সচ্ছল অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

কিছুদিন এইরূপ উভয়ের যত্ন ও চেষ্টায় যখন ছাপাখানাটি বেশ চলিতে লাগিল, তখন সেই সময়ে উদয়ময় রোগের দারুণ আক্রমণে বাধ্য হইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতা ত্যাগ করেন। তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের পরেও ইহার কাজ অনেকদিন বেশ চলিয়াছিল। পরিশেষে প্রেসসংক্রান্ত কার্যকলাপ লইয়া বিভাগাগর ও তর্কালঙ্কারের মধ্যে মনোমালিন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ উপস্থিত হইতে লাগিল। বিভাগাগর মহাশয় নিজেই বলিতেছেন :—ক্রমে ক্রমে এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোন বিষয়ে সংশয় রাখা উচিত নহে। একান্ত উভয়ের আত্মীয় পটলডাঙ্গানিবাসী বাবু শ্রামাচরণ দে দ্বারা তর্কালঙ্কারের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাই, হয় তিনি আমার প্রাণ্য আমার দিয়া ছাপাখানার সম্পূর্ণ স্বত্ববান হউন, না হয় তাঁহার প্রাণ্য বুঝিয়া লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্ক ছাড়িয়া দিউন, অথবা উভয়ে ছাপাখানার যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লওয়া যাউক। তদনুসারে তিনি আপন প্রাণ্য লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্ক ত্যাগ স্থির করেন। অনন্তর উভয়ের সম্মতিক্রমে, বাবু শ্রামাচরণ দে, পণ্ডিত তারকনাথ তর্কবাচস্পতি, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন ব্যক্তি, হিসাবনিকাশ ও দেনা পাওনা স্থির করিয়া দিবার নিমিত্ত সাগিন্ নিযুক্ত করেন এবং খাজপত্র দেখিয়া, হিসাবনিকাশ ও দেনাপাওনার মীমাংসা করিয়া দেন। তাঁহাদের মীমাংসা পত্রের প্রতিলিপি তর্কালঙ্কারের নিকট প্রেরিত হইল, তিনি পত্রদ্বারা শ্রামাচরণ বাবুকে জানান, আমি এক্ষণে বাইতে পারিব না। আদালত বন্ধ হইলে, কলিকাতার গিয়া আপন প্রাণ্য বুঝিয়া হউক। কিছুদিন পরে তাঁহার সুত্ব হওয়াতে তাঁহার পত্নী কলিকাতায় আসিয়া, ছাপাখানা সংক্রান্ত স্বীয় পণ্ডিত প্রাণ্য বুঝিয়া লয়েন।” *

বহুপণের মীমাংসার কালে বিভাগাগর মহাশয় অর্ধাংশের মূল্য দিয়া সমগ্র

স্বত্বের অধিকারী হইলেন এবং প্রেসের কার্য নিজেই পছন্দমত চলাইতে লাগিলেন।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকগুলির বিক্রয়কার্যের সৌকর্য্যার্থে “সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়” নামে একটা পুস্তকাগার স্থাপন করেন। ইহার ইংরাজী নাম “সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী।” বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃত যন্ত্র ও ডিপজিটারী তাঁহারই সম্পত্তি ছিল। ঐ উভয় সম্পত্তি কি কারণে হস্তান্তরিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। এখানে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, বিভাগসাগর মহাশয় বিভাগালয়ের পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া এবং সুবিধা ও সুযোগ মত কোন কোন সম্পন্ন লোকদ্বারা স্থানে স্থানে বিভাগালয় প্রতিষ্ঠা করাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। সেই সকল পুস্তক যাহাতে সুন্দররূপে মুদ্রিত হয় এবং সেই সকল গ্রন্থ পাইবার জন্য লোকের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জন লোকও অতিপালিত হয়, এই উদ্দেশ্যে ‘সংস্কৃত যন্ত্র’ ও ‘সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়’ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিভাগসাগর মহাশয় যে সময়ে কল্যাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখনও দেশে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার সাধিত হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষার সুপ্রচারের সূচনা হইয়াছিল মাত্র। সে সময়ে গভর্নমেন্ট যে সকল ইংরাজী বিভাগালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে বালকগণকে পড়াইবার ২টা প্রধান অন্তরায় ছিল, ঐ সকল বিভাগালয়ের ব্যয়বাহুল্য নিবন্ধন বালকগণের দেয় বেতন পরিমাণ অধিক ছিল। এত অধিক ছিল যে, দরিদ্রের পক্ষে সে শিক্ষা লাভের কোন আশা ছিল না, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অতি কষ্টেও সেইরূপ বহু ব্যয়ে নিজ নিজ বালকগণকে ঐ সকল বিভাগালয়ে ইংরাজী শিখাইতে পারিতেন না। সুতরাং তৎকালে গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠিত বিভাগালয়, সকল সাধারণ লোকের পক্ষে থাকিরাও ছিল না বলিলেই হয়। দ্বিতীয় অন্তরায় এই যে, এখানে ধর্মবিহীন শিক্ষাগানের ব্যবস্থা পূর্বাপন্ন চলিয়া আসিতেছে। তির্যন্ধর্মাবলম্বী রাজার পক্ষে ধর্ম শিক্ষাদান বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকাই ভাল, কিন্তু এই নিরপেক্ষতা ও সমগ্র প্রজা-
মণ্ডলীর ধর্মোন্নতি বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন একই কথা। জনসমাজ শিক্ষা-
লোলুপ বালকবৃন্দকে যদি শৈশবে ও বাল্যকালে ধর্মোপদেশ হইতে বঞ্চিত

করে, পরমেশ্বরে ঐতি ও গুরুজনে ভক্তি শিক্ষা না দেয়, নানাবিধ পাপ প্রলোভনের মধ্যে উত্তরকালে আয়রক্ষার সক্ষম হইবার উপযোগী শিক্ষাদানে বিরত হয়, তাহা হইলে অচিরে তাহার বিষয় কল ফলিতে আরম্ভ করে । বর্তমান সময়ে শিশু জীবনে বিশৃঙ্খলা ও বালকগণের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন তাহার পূর্ণ পরিচয় হুল ।*

একদিকে গবর্ণমেন্টের এদেশীয় লোকের জাতীয় ধর্মোন্নতি বিষয়ে নিশ্চেষ্টভাব, অপর দিকে ইংরাজ জাতির পরম গৌরবস্থল বৃট্টীয় মিশনারী মহোদয়গণ ইংরাজের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নানাস্থানে ধর্ম প্রচার ও জনসাধারণের নানাবিধ হিতসাধন মানসে বহুবিধ সদুপস্থানের সুত্রপাত করেন । তাঁহাদের রুত অনুষ্ঠান সকলের মধ্যে সর্বাধিক প্রধান কার্য দুটি ;—১ম, দেশীয় ভাষার চর্চা ও ত্রীভুজি, ২য়, ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনসূর্বক এদেশীয় লোক মণ্ডলীর মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার । এই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করে তাঁহারা দেশের সর্বত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা দান আরম্ভ করিলেন । কলিকাতায় এরূপ মিশনারী স্কুলের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার ডকের স্কুল আজ পর্যন্ত “ডব্‌সাহেবের স্কুল” বলিয়া পরিচিত আছে । ঐ সকল বিদ্যালয়ে অন্ন ব্যয়ে ও বিনা ব্যয়ে সুশিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল কিন্তু লোকের সংস্কার নিবন্ধন গুরুতর বিঘ্ন ছিল । যে বিদেশীয় রাজা ভিন্ন জাতীয় প্রজামণ্ডলীর ধর্মোন্নতিকল্পে সম্পূর্ণ উদাসীন, সেই বিদেশীয় জাতির পুরোহিত ও ধর্মযাজকগণ যোগ আনা বৃট্টীয় ধর্মভাব এদেশীয় লোকদের মধ্যে প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া এখানে কার্য আরম্ভ করিলেন । সুতরাং এদেশীয় সাধারণ লোক আপন আপন সম্বন্ধমণ্ডলকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার বিশিষ্টরূপ সুবিধা কোথাও পাইলেন না । এদেশীয় লোকের পক্ষে হইল উত্তর সঙ্কট “ডাক্তার বাব, জলে কুড়ীর” । লোকের এইরূপ সংস্কার অঙ্গিল যে গবর্ণমেন্ট স্কুলে পড়িলে নাস্তিক হয়, আর মিশনারী স্কুলে পড়িলে বৃট্টীয়ান হয় ।

বাকালীদিগের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে ৮গৌরমোহন আজ্ঞার স্কুলই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । সে কালে সে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করান বিশেষ সম্মানের বিষয় ছিল । কিন্তু ক্রমে ক্রমে

তাহার সে পূৰ্ণ গৌরব অন্তৰ্ভুক্ত হইয়াছে। এইরূপ ভাববৈপরীত্য ও জ্ঞানপ্রাপ্তির নানা প্রকার অসুবিধা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক * উদ্যোগী হইয়া নিম্নলিখিত ৮শতক বোম্বের লেনে “কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল” নামে একটি বিভাগর স্থাপন করিলেন। এই বিভাগয়ের উন্নতিকল্পে ইহারা এবং অন্য কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। পৃষ্ঠপোষক-রূপে বাবু শ্যামচরণ মল্লিক মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে এই বিভাগয়ের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। বিভাগয়ের প্রতিষ্ঠার পর কিছুকাল উপরি উক্ত মহাশয়গণ ইহার পরিচালন ও ব্যয়ভারবহন করিয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল অতীত হইলে পর, বিভাগয়ের কর্তৃপক্ষীরেরা বিভাগয়ের বিশিষ্টরূপ উন্নতির প্রত্যাশায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগসংগর ও বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিভাগয়ের কার্য পর্যবেক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে—মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিলেন। বিভাগসংগর মহাশয় সে সময়ে বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বসিয়া ছিলেন। সংস্কৃত কালঞ্জের অধ্যক্ষতা ও ইন্সপেক্টারী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া বিভাগর পরিচালন বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাই উক্ত বিভাগয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার সহায়তা লাভের জন্য বাস্তব হইয়াছিলেন। বিভাগসংগর মহাশয় ও রাজকৃষ্ণ বাবুকে লইয়া কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ একটি কার্য নির্বাহক সভা গঠন করিলেন। এই সভার সভ্যবাহানে কয়েক মাস কাজ কর্ম বেশ চলিল, সহসা কোন এক অনুপস্থিত শিক্ষকের পদচ্যুতি লইয়া কমিটির সভ্যগণের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হইল। এই বিরোধের ফলে বিভাগরটা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। বাবু তারারাম চক্রবর্তী ও বাবু মাধবচন্দ্র ধর, উভয়ে পৃথক স্থানে ‘ট্রেনিং একাডেমি’ নামে আর একটি বিভাগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে বিভাগরটাও অজ্ঞানি বিত্তমান থাকিয়া পূৰ্ণ স্তুতি রক্ষা করিতেছে! কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের পূৰ্ণ নামই রহিয়া গেল। বিভাগয়ের

* বাবু ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, বাবু মাধবচন্দ্র ধর, বাবু পতিতপাক সেন, বাবু ক্ষমচরণ সেন, বাবু মাধবচন্দ্র পালিত ও বাবু বৈষ্ণবচরণ আচা।

তদানীন্তন কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে এইরূপ মনোমালিন্য ও অনাস্থীয়তা সংঘটনে ও তন্নিবন্ধন গৃহবিচ্ছেদে বিরক্ত হইয়া বিভাগাগর মহাশয়ও বিভাগায়ের তদ্ব্যবধান কার্য পরিচালনা করেন। নানা কারণে তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এ দেশের লোক এখনও স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থের সেবা করিতে আপনাদের কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ কিংবা কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া সাধারণের হিতসাধন করিতে শিখে নাই। এদেশে দশ জনে মিলেমিশে কাজ করিবার সময় এখনও হয় নাই। অতি অল্প বয়সে তাঁহার এই সংস্কার জন্মিয়াছিল এবং তাঁহার সুবৃহৎ জীবনের বহুতর ঘটনায় তাহার শত প্রকার প্রমাণ পাইয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারণার অসুবর্তী হইয়া চলিয়াছিলেন। ক্রমে পাঁচ জনের সহিত একত্র হইয়া কোন কাজ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মন হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছিল।

এইরূপ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া যখন তিনি বিভাগায়ের পরিচালন কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন স্বত্বাধিকারীদের অবশিষ্ট কর্তব্য জন • মিলিত হইয়া কিছুকাল বিভাগায়ের কার্য চালাইলেন। পরিশেষে আপনাদের অবসর ও অতিষ্ঠতার অভাবে এবং বিভাগাগর মহাশয়ের সংস্রব ছিন্ন হওয়াতে বিভাগায় প্রথমে অবসর এবং তৎপরে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া কর্তৃপক্ষগণ আপনাদের অক্ষমতা অতি স্পষ্টরূপে অনুভব করিলেন এবং বিভাগায়ের সমগ্র ভার বিভাগাগর মহাশয়কে দিতে চাহিলেন। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সম্মত হইলে পর, তাঁহারা চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন; বিদায়কালে একটা কমিটি গঠনপক্ষে বিদায় প্রাপ্ত স্বত্বাধিকারিগণের বিশেষ অনুরোধ ছিল। বিভাগায়ের তাঁহাদের কোন প্রকার সংস্রব রহিল না জানিয়া, বিভাগাগর মহাশয় একান্তে পেষে আগ্রসর হইলেন। * তিনি বিভাগায়ের সমগ্র ভারগ্রহণ করিয়া সর্বোচ্চে বিভাগায়ের সুনাম প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধন মানসে

* After the said disruption, the remaining founders, namely Patitpabun Sen, Ganga Charan Sen, Jadav Chandra Palit, and Balshnava Charan Adhya, who had other works to do, having found by experience that Pundit Iswar Chandra Vidyasagar was highly public-spirited and

একটি কমিটি গঠন করিলেন। সে কমিটির সভাপতি হইলেন, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ; রাজা রমানাথ ঠাকুর, বাবু হীরলাল সীং, বাবু রামমোহন ঘোষ, বার হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর মেধর ও বিভাগাগর মহাশয় সম্পাদক হইলেন। * এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যখন বিভাগায়ের কার্য চালাইতে লাগিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও অক্লান্তের উর্বর ক্ষেত্রে যেমন অপর দশটি কার্য সকল হইয়াছিল, এ কার্যও সেইরূপ দ্রুতবেগে উন্নতিপথে অগ্রসর হইল। বিভাগাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আশিবার পর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অতি সুন্দর হইতে লাগিল।

বিভাগাগর মহাশয় যখন যে কাজ করিতেন, তখন তাহা যে নিঃস্বার্থ ভাবে করিতেন, সে সম্বন্ধে প্রমাণের প্রয়োজন নাই, তিনি পরার্থে এত কার্য করিয়াছেন যে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন কার্যের উদার তাব প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হওয়া অনাবশ্যক। তথাপি কেবল প্রমাণসহ ঘটনাবলীর উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়াই বলিতেছি যে, কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের কার্য পরিচালনের জন্ত কেবল একটি কমিটি করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না; বিভাগায় পরিচালনের উপযোগী কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিয়া কমিটির দ্বারা মঞ্জুর করাইলেন। নিয়মাবলীর তালিকার সর্বসমেত ৩৫টি নিয়মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩য়, ৩০শ, ৩২শ, ৩৩শ নিয়মই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—

৩। হিন্দু বালকগণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাথমিক শিক্ষার বাহাতে বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে, তৎসাধনের জন্ত এই বিভাগায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

৩০। অবসর সময়ে বালকগণের ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে অন্ততঃ এক এক জন শিক্ষক সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের রীতি নীতি পর্যবেক্ষণ করিবেন।

thoroughly disinterested, and was competent to manage the School, entrusted the management thereof to the said Pundit.

* In April, 1861 ** a Committee of Management of which Raja Pratap Chandra Singha was the president; and Ramanath Tagore, Hiralaal Si, Ram Gopal Ghose and Rai Hara Chandra Ghose Bahadur were members and the Pundit its Secretary, was formed.

৩১। প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট তিনটা বালক প্রেসিডেন্সি, মেডিকেল কিংবা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বাহাতে পড়িতে পারে, তাহার উৎসাহ বিধানার্থে ছই বৎসর ১০ টাকা করিয়া পাইতে পারে, এরূপ তিনটা ছাত্রগতি বিভাগর হইতে দেওয়া হইবে।

৩২। *বিভাগরের উদ্ভূত অর্থ বেঙ্গল ব্যাংক সম্পাদক ও অপর একজন মেম্বরের নামে জমা থাকিবে।

৩৩। উদ্ভূত অর্থ বিভাগরেরই কল্যাণার্থে ব্যয় করা হইবে। *

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বিভাগরের নাম ছিল কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল : ঐ বৎসরের প্রারম্ভেই হিন্দু মেটপলিটন ইনস্টিটিউশন এই নূতন নামে নামাঙ্কিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এক আবেদন পত্রে উক্ত বিভাগর হইতে ছাত্রগণের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরবর্তী পরীক্ষা দানের অধিকার পাইবার প্রার্থনা করা হয়। এই আবেদন পত্রে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং ঐ আবেদন পত্রে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের অন্তর এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষা দানের উপযোগী শিক্ষা দিবার আর্থিক ও অন্তবিধ সমগ্র দায়িত্ব ইহারা গ্রহণ করিতে

8. The object of the Institution is to give an efficient elementary education to Hindu youths in the English as well as the Bengali language and literature.

30. One teacher at least shall be present on each play-ground during the time of recreation to watch over the conduct of the pupils.

31. Scholarships of ten rupees each shall be awarded to three of the most meritorious pupils for two years to enable them to prosecute their studies in a higher educational institution, such as the Presidency, the Medical, or the Civil Engineering College.

32. The funds of the School shall be deposited in the Bank of Bengal or in any other Bank, in the name of a Member and the Secretary.

33. Surplus assets shall be appropriated to the benefit of the institution in such manner as the Committee of Management may decide upon.

* Taken from the old Records of the Metropolitan Institution, published by the present Authorities of the Institution.

প্রতিশ্রুত হইরাছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সম্ভ্রান্ত সদস্য রাজা রমীনাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ মহোদয়ের ইহাতে সেনেটের সমস্তরূপে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে বিভাগসংগঠনের বাটী ভাড়া লইয়া একটা গোল-মাল হয়; যে বাটীতে বিভাগসংগঠনের কার্য্য হইত, তাহার মালিক খেলাচন্দ্র ঘোষ নির্দ্ধারিত ৫০ টাকা ভাড়ার পরিবর্তে ১০০ টাকা মাসিক ভাড়ার দাবি করেন। বিভাগসংগঠন মহাশয় দিতে অসম্মত হন। এই ক্ষেত্রে মকদ্দমা হয়। এই উপলক্ষে বিভাগসংগঠন মহাশয় ভিন্ন অপর সকল সভ্যই ক্রমে ক্রমে বিভাগসংগঠনের প্রতি আগ্রহ শূন্য হইয়া পড়েন। ক্রমে ইহার ভাল মন্দ সকল ভারই বিভাগসংগঠন মহাশয়কে দিয়া তাঁহার অবসর গ্রহণ করেন। উত্তর কালে বিভাগসংগঠন মহাশয় ইহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বত্ববান হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিয়া থাকিয়াছেন।

পূর্বে পুস্তকনির্ণয় প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা প্রভৃতি স্থাপনের জায় বিভাগসংগঠন প্রতিষ্ঠাও একটা পুণ্য কার্য্য ছিল। অল্পব্যয়ে বা বিনা ব্যয়ে বালকগণ জ্ঞানোপার্জন করিতে পাইবে, এই আকাঙ্ক্ষা পরিচালিত হইয়াই অনেকে বিভাগসংগঠনের প্রতিষ্ঠা করিতেন। বিভাগসংগঠন মহাশয় প্রভৃতিও ঐ প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়াই এইরূপ বহুব্যয়শীল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, আজকাল বিভাগসংগঠন স্থাপন এক প্রকার ব্যবসারে পরিণত হইয়াছে, স্বদেশীয় বালকগণকে বিদ্যা দান একটা উপার্জনের দ্বার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ব্যবসায় বিভ্রাট গেমস সর্বত্র অপরিহার্য্য, এখানেও সেইরূপ হইবে ইহা আশা বিচিত্র কি? ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিভাগসংগঠন মহাশয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিভাগসংগঠন হইতে ছাত্রগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা সকলে উপস্থিত হইবার জন্য আবেদন প্রেরণ করেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, লোক ইহার দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া ধনবান হইবে, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই বিভাগসংগঠন স্থান বিভাগব্যবসার আরম্ভ হইয়াছিল। এখনও এ ব্যবসায় বেশ চলিতেছে, তিনি যথাসম্ভব পণ করিয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আজ কাল লোকে এই পথে যথাসম্ভবের সংস্থান করিতেছে। বিভাগসংগঠন মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীপে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়া পরে সম্ভ্রান্ত সদস্যগণের কাহারও কাহারও সহায়তা পাইবার যথেষ্ট আশা পাইয়া বিনা বেতনে কালেজ ক্লাস খুলিয়াছিলেন। কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ঘোর

পরিভাষার বিষয় যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না । এইরূপে ব্যর্থকাম হইয়া বিদ্যালয়গর মহাশয় পশ্চাৎগত হইবার লোক ছিলেন না, প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রতিবৎসরই আশাভীতরূপ সম্বোধনক হওয়াতে কালেজ খুলিয়া বালকগণের উচ্চ শিক্ষা লাভ সুলভ করিবার আকাঙ্ক্ষা নিরন্তরই তাঁহার মনে আগ্রহকর রহিল । তিনি কশ্মীরে ও ব্রিষ্টামে, স্বজনমণ্ডলীতে ও নির্জনে সর্বদাই ইহার সত্ত্বপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

ইহার পর ক্রমে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের লোকান্তর গমনে মেট্রপলিটন ইনস্টিটিউশনের সমগ্র দায়িত্ব বিদ্যালয়গর মহাশয়ের উপর পতিত হইল । ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বিদ্যালয়গর মহাশয় একাকী মেট্রপলিটনের সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া সর্ববিধ কলাগাণনা করিয়া আসিয়াছেন । এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ও বাৎসরিক পরীক্ষার ফল সর্বদাই বেশ সম্বোধনকর হইলেও ইহার সমাক শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিদ্যালয়গর মহাশয় সর্বদাই নিজ হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন । বিদ্যালয়ের এত অধিক অর্থ সর্বদা থাকিত না, যে তাঁহার মনের মত কার্য গুলি সে অর্থে সুসম্পাদিত হয় । মেট্রপলিটনের শিক্ষকগণ অত্যন্ত বিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক অধিক বেতন পাঠাতেন, তিনি বিদ্যালয়ের অন্তর্গত যে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত বা ক্রয় করাইতেন, সে সকল দ্রব্য তাঁহার পছন্দমত করিতে অনেক অর্থ ব্যয় হইত । সে কালে ও একালে অনেক সময় নিজ হইতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে একদিন এক মুহূর্ত্তের অন্তর্গত বিদ্যালয়ের সঞ্চিত অর্থে আয়োদর পূরণ চেষ্টার কল্পনাও করেন নাই ! কত সময়ে হাজার হাজার টাকা বিদ্যালয়ের তহবিলে মজুত থাকিত, কিন্তু পারিশ্রমিক বলিয়াও একটা পরমা কখনও বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে আদায় করেন নাই । তিনি যে কিরূপ গোভলু ব্যক্তি ছিলেন, এই ঘটনাই তাহার অদ্ব্যকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । *

* The present authorities say in their printed declaration that :—
“He (the Pundit) never made any profit out of the income of the Institution. He did, however, take loans occasionally from the fund of the Institution, but the same was always repaid.”

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে বিভাগাগর মহাশয় নিজের বিভাগায়ের কার্যের সমাক্ষুবিধা সাধনের জন্য মাননীয় অজ্ঞাচারকানাথ মিত্র, রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর ও আপনাকে লইয়া একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেন এবং এক, এ, ও বি, এ, পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবার জন্য উপরি উক্ত তিন জনের স্বাক্ষরিত আর এক খানি আবেদন পত্র দ্বিতীয় বার প্রেরণ করেন। এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন সুপরিচিত সমস্ত, রাজা রমানাথ ঠাকুর এবং ডাক্তার রাকেন্দ্রলাল মিত্র উক্ত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই আবেদন পত্র * প্রেরণ করিয়া তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিশ্চিন্ত না থাকার কারণ এই যে তাঁহার এই চেষ্টার বিরুদ্ধে ইংরাজ বাঙ্গালী উভয় পক্ষই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীত্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজ সমস্তগণ বিভাগাগর মহাশয়ের এই উদ্ভব স্বাক্ষর বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেন, বিভাগাগর মহাশয় বিভাগায়ের তদানীন্তন সহকারী সভাপতি (Vice Chancellor) ই, সি, বেলি মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সুস্পষ্ট অভ্যাস পাওয়া যায়। সেই পত্র খানি এই :—

ই, সি, বেলি মহোদয় সমীপে—

প্রিয় মহাশয়,

আপনাকে সবিনয়ে জানাইতেছি যে আমাদের বিভাগায় হইতে এক, এ, ও বি, এ, পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবার প্রার্থনাসূচক পত্রখানি সিন্ডিকেটের অজ্ঞকার সভায় উপস্থিত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি। এ কথা বলা বাহুল্য যে, আপনার সহায়তা লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে, কখনই আমি এ বিষয়ে অগ্রসর হইতাম না। গত বৎসর আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই বলিয়া এ বিষয়ে গত বৎসর কোন চেষ্টাই করি নাই, আমি জানি না, সেনেটের অন্ত্যস্ত সমস্তগণ এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করেন, কিন্তু আপনাকে জানাই যে আমাদের পক্ষীয় একজন মিটার সটক্লিক্ ও মিটার এটকিন্সন্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং এটকিন্সন্ সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে যদিও প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহার

* এই সংস্করণ কালক্রমে পরিবর্তিত হওয়ায় পাঠ্যে ভাটপে।

আপত্তি আছে, তথাপি তিনি আমাদের প্রার্থনাপত্র মঞ্জুর হওয়ার পথে বাধা তুলাইবেন না। যদি সমগ্রগণ উচ্চশিক্ষা দান বিষয়ে দেশীয় অধ্যাপকগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে অসম্মত হন, সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে এইটা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে সংস্কৃত কালেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে, কিন্তু তথার দেশীয় শিক্ষকগণের দ্বারা এই এপর্যন্ত সে কার্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, আমরাও আমাদের বিভাগেরের অল্প ঐ দেশীয় লোক নিযুক্ত করিতে সক্ষম। সচেষ্ট থাকিব। আমরা এই বিশ্বাস যে, সুবিবেচনা ও বিশেষ সতর্কতা সহকারে নির্বাচন করিলে, দেশীয় শিক্ষকগণ উচ্চশিক্ষা দানে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইবেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইবে যদি জানা যায় যে, ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিবার অল্প ইংরাজ অধ্যাপক নিযুক্ত করা ভিন্ন উপায় নাই, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তরুণ কোন উপযুক্ত ইংরাজ অধ্যাপক নিযুক্ত করিব, বিভাগটীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য সিদ্ধির পক্ষে কোন প্রকার সত্বেও অবলম্বনে ক্রটি হইবে না। বিভাগেরের শিক্ষকগণকে কিরূপ বেতন দেওয়া হইবে, আমার বোধ হয়, কেহ কেহ তাহা জানিবার অল্প অন্তর্য বাঞ্ছা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর আমি যেরূপ অর্থ বুঝি, তাহাতে এই সকল আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি রাখার কোন প্রয়োজন নাই। নিয়োগকারী ও নিযুক্ত ব্যক্তিগণের উপর সে বিষয়ের মীমাংসা করিবার ভার থাকাই উচিত; শিক্ষকদিগের উপযুক্ততা ও বিভাগেরের অর্থের উপযুক্ত ব্যয় এই উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা কার্য করিব। আমি আমার জীবনের আর সমগ্র সময় বিভাগের পরিচালন কার্যে নিয়োজিত করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে আমি আশা করি, শিক্ষক নিযুক্ত করা এবং তাঁহাদের বেতন নির্ধারণ করিবার ভার আমার উপর থাকিলেই ভাল হয়।

আমাদের এই বিভাগটীকে তাই ক্রমে পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনাকে অধিক আর কি বুঝাইব। মধ্যপ্রদেশের গৃহসংগণ ১২ টাকার দৈনিক বেতন দিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ছেলেদের পড়াইতে সম্পূর্ণ অক্ষম; অল্প দিকে বর্ষ বিষয়ে মত পরিবর্তনের আশঙ্কা নিবন্ধন তাহার মিশনারী কলেজে বাসকদিগকে পঠান না। এক্ষণে উভয় সঙ্কটস্থলে অধিকাংশ বাসক প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া, কলেজে প্রবেশ করিবার যোগ্য আনাইয়া

সঙ্গেও, কোথাও পড়িতে পার না। তাহাদের পক্ষে এই বিভাগের মহোপকার সাধন করিবে।

এই বিভাগের পরিচালন ভার অল্প বারকানাথ মিত্র, বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং আমার উপর স্থাপিত আছে। উচ্চশিক্ষা দিবার উপযোগী সুব্যবস্থা করিবার শক্তি সামর্থ্য বিষয়ে, আমাদের সম্পূর্ণ সুবিধা আছে, কিন্তু তথ্যাদি যদি কোন প্রকার অভাব উপস্থিত হয়, আমরা নিম্ন হইতে তাহা পূরণ করিব। আমি বিশ্বাস করি, ইহারা পাঁচ বৎসরের অন্ত বিভাগের পরিচালন বিষয়ক এই দায়িত্ব গ্রহণ করাতে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে হইয়া কালেজ ক্লাস খুলিবার অনুমতি দিবেন। নিষেদন ইতি তারিখ ২৭শে জানুয়ারী ১৮৭২।

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন,

(স্বাক্ষর) জে.ব্রচন শর্মা।"

যাহা হউক বহু বাগবিতণ্ডার পর এই বৎসর হইতে মেট্রপলিটন ইনস্টিটিউশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়া এক, এ, পরীক্ষার ছাত্র প্রেরণ করিবার অনুমতি পাইল। তদনুসারে ১৮৭৩/৭৪ চুই বৎসরে, কালেজের পাঠ সমাপ্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পাইয়া কালেজ ক্লাস খোলা হইল বটে, ছাত্রও অনেকগুলি হইল, কিন্তু বিভাগাগর মহাশয় পদে পদে বাধা পাইতে লাগিলেন। প্রথম বাধা সর্বসাধারণের ধারণা যে এ চেটোর কোন ফল হইবে না। কারণ এই যে, মেট্রপলিটানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযুক্ত শিক্ষক সে সময় পাওয়া সুকঠিন ব্যাপার ছিল। বিভাগাগর মহাশয়ের জ্ঞান উদ্যোগী পুরুষের চেটোতেও যে মেট্রপলিটন প্রবল হইয়া উঠিতে পাবিবে এ বিশ্বাস তাহার বন্ধুগণেরও ছিল না। সুতরাং ছাত্রগণের মন ভাঙ্গিয়া যাওয়া অপরিহার্য। ছাত্রদিগের মনে কৃতকার্য হইবার পক্ষে সন্দেহ হওয়াতে, তাহারা আপনা হইতে চলিয়া বাইবার চেটো করিতে লাগিল। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প, এইরূপ জনরব প্রচারিত হওয়াতে কালেজ ক্লাসের বালকগণের অতিভাবকগণও চিন্তিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অনেক সময়ে সময়ে বিভাগাগর সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনাদের আশঙ্কার কথা জানাইয়াছেন। বিভাগাগর জনরব উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু বার্ষিক-সম্মেলন লোকের কেহ আসিয়া বিরক্ত করিলে, তিনি চিন্তিত হইতেন। সকলকেই আশ্বাস বচনে বিদায় করিয়াও নিজে সর্বথা সময়ে

সহপাঠ অবলম্বন করিতেন। এই অনুষ্ঠানের সিদ্ধি কল্পে তাঁহাকে যে পরিমাণ রেশ ও ভাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তেজ্ঞ আগ্রহ সহকারে প্রতিদিন কার্যকলাপ পরিদর্শন করিতে হইত, তাহার উপর আবার তাঁহাকে প্রতিদিন এত নিরাশার কথা শুনিতে হইত, যে, তাহাতে তিনি চির, অল্প কাহারও পক্ষে ঐরূপ বিত্তিষ্ট প্রকার বিপদ ও নানাবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্যে তিল তিল করিয়া লক্ষ্যপথে আগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইত না। আকাশ-পথে ব্যবস্থাপিত মৎস্ত ক্রম্ভ ভেদ করিতে অনেক বীরবেশধারী রাজপুত্র গাত্ৰোত্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণবেশধারী তিথারী পার্থই কেবল সে হুহুহু কার্ণো কৃতকাৰ্য্য হইয়া রূপদলিনীর বরমাণ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন ও বহুসংখ্যক রাজকুমারকে যশে পরাজিত করিয়া সূর্যমুখ নারীরন্ত্র ভ্রোণদীকে লাভ করিয়াছিলেন। বিভাগাগর মহাশয়ও ভবিষ্যতের অঙ্ককারময় আকাশ-পথে ব্যবস্থাপিত লক্ষ্যভেদ করিয়া—বহুসংখ্যক প্রবল পক্ষের প্রতিপক্ষতা উপেক্ষা করিয়া—বহু লোকের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, কীৰ্ত্তি মন্দিরের পরম প্রিয়তমা কন্যা বিজয়-লক্ষ্মীকে লাভ করিলেন। ১৮৭৫ গুটাক্ষে ৮ই জানুয়ারী তাবিশ্ব বিজয়লক্ষ্মী-লাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যে প্রীতির উপহার বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার অবিকল প্রতিমূর্তি এখানে প্রাপ্ত হইল। ১৮৭৪ গুটাক্ষের শেষভাগে যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে বিভাগাগর পরিচালিত মেট্রপলিটন স্কুল-সারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৮৭৪ গুটাক্ষের এফ্., এ, পরীক্ষার ফল যখন বাহির হয়, বিভাগাগর মহাশয় সে সময় কলিকাতায় ছিলেন না। স্বাস্থ্যোত্তির মানসে গড়মাটাড়ের বিশ্রাম-ভবনে বাস করিতেছিলেন। গেজেট বাহির হটলে পরীক্ষার ফলদর্শনে আনন্দে বিচলন হইয়া* অবিলম্বে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আনন্দ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে বাতুলবাগানে বসুন্ধে না উঠিয়া বামপুকুরে পরীক্ষোত্তীর্ণ গুণবান যুবকের শিড়গৃহে উপস্থিত হইলেন। যুবক ও যুবকের শিড়কে ডাকাইলেন। সঙ্গেহে যোগেন বাবুকে বলিলেন, “কি রে, ভয় পাউয়াছিনি যে,” তাহার শিড়ার পূর্ক উৎকর্ষায় অল্প দিষ্ট তৎসমা করিয়া যোগেন বাবুকে বলিলেন, “তুই আমার বাড়ী গান” এই বলিয়া তিনি বাড়ী গেলেন। যোগেন বাবু উপস্থিত হইলে তিনি কি করিলেন শুনিতে চাও? সে ঘটনাটীও বিভাগাগর মহাশয়ের জন্মের গভীর

উচ্ছ্বাসের পরিচায়ক। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া নিজের বহুখ্যা পুস্তকের আলমারি খুলিলেন। বহু অর্থ ব্যয়ে স্বর্ণাক্ষরে নামাঙ্কিত ও সুবর্ণ-লতাপাতা মণ্ডিত উৎকৃষ্টরূপে বাঁধান ত্রায় ওয়াটার স্কটের সমগ্র “ওয়েটার্স উপস্থাপাবলী” যোগেন বাবুকে উপহার দিলেন। গ্রন্থাবলীর ১ম পুস্তক ওয়েটার্সের ১ম পৃষ্ঠায় যে কথাকয়টি তাঁহার লক্ষ্যের পতীয় আনন্দের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, আমরা তাহা তাঁহারই হস্তাক্ষরে যথাবৎ তুলিয়া দিলাম। তাঁহার কাৰ্য্য কলাপের বিশেষত্ব এই যে, তিনি যখন যাহা করিতেন তাহাতে তাঁহার সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতেন। ঢালিয়া দিতেন বলিয়াই নিজের পছন্দমত বাঁধান স্কটের গ্রন্থাবলী নিজের পুস্তকাগার হইতে বাহির করিয়া গুপ্তবান্ সুবককে উপহার দিলেন! বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিজ্ঞানাগরপ্রসক্ত পুরস্কার প্রাপ্তমস্তকে গ্রহণ করিয়া নিজেই অমর হইয়াছেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি কালেজ ক্লাস খেলা হইলে পর বিজ্ঞানাগর মহাশয় পদে পদে বাধা পাইয়াছিলেন। দৃঢ়প্রকৃতি বিজ্ঞানাগর একবার নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কালেজের সমস্ত বালককে ডাকাইয়া বলেন, “দেখ্ রোজ রোজ গোলমালে আবশ্যক নাই তোরা কে কে চলে যেতে চাপ্ বল, এখনই বা, আমি কালেজ ক্লাস চাই না। কেউ না থাকে সেও ভাল, তবু গোলমাল চাই না। আজ বল, কে কে যাবি?” সকল বালকই নীরবে দণ্ডায়মান। কেহ কোন কথা বলে না। তখন তাহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথম বালককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল “আমি আর কোথাও যাব না।” একে একে সকল বালকই তখনই সাহসে ভর করিয়া বলিল “আমরা পাগ হই আর কেগ হই, এখানেই থাকিব, অস্ত্র কোথাও যাব না।” তখন বিজ্ঞানাগর মহাশয় খুসি হইয়া বলিলেন, “তোদের জন্ত আমার কি ভাবনা নাই, অস্ত্র কালেজে পড়িলে যেমন পড়া হইত, এখানেও যাতে তা হয়, সে পক্ষে কোন অসম্ভাব হবে না, তোরা গোকের কপার নাচিস্ না।” •

• • কৃতপূৰ্ণ হুজুর ও পড়াসা সম্পাদক ও হিটবাণীর কৃতপূৰ্ণ সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ব. এ. মহাশয় নিজ এই ঘটনা-সংগ্ৰহে ব্যক্তি। তাঁহারই বিকট হেটুপরিচয় কালেজের বৈদ্যব র্ত্তিহাস শুনিয়াছি।

Awarded

to Jagindra Chandra Bose
at the close of his brilliant
Career as a Student
in the Metropolitan Institution

Sancaashundar Purmah

8th January 1875-

সটরিক সাহেব মেট্রপলিটনের আশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতা সন্দর্ভনে অর্থাৎ
হইয়া বলিয়াছিলেন, “পণ্ডিত তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন।” * কালেজের প্রথম
বৎসরের পরীক্ষাতেই এমন সুফল ফলিল যে মেট্রপলিটন দ্বিতীয় গতিতে
উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাহাতে মেট্রপলিটন কালেজের অক্ষয়
কীর্ষির সূত্রপাত হইয়াছে, বাহাতে বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর মধ্যে শিক্ষার
সুপ্রচার সাধিত হইয়াছে, যে কার্য্য সাধন দ্বারা বিভাগাগর মহাশয় বর্তমান
শিক্ষাপ্রোতকে বহু বিস্তৃত আকারে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন,
মেট্রপলিটনের সেই উচ্চ শিক্ষাপ্রোতের সর্ব্বোচ্চ দ্বারটী ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উন্মোচিত
হইয়াছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রপলিটন কালেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষার প্রথম
ছাত্র প্রেরিত হয়। এই পরীক্ষার বিভাগাগর মহাশয়ের কালেজ হইতে যে
সকল ছাত্র পরীক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাদের সংখ্যা ও পরীক্ষার ফল বিশেষ
সন্তোষজনক হইয়াছিল। মোট ১৬ জন ছাত্র পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। +
পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভাগাগর মহাশয়ের আগ্রহ ও উৎসাহ
শতগুণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতিপূর্বে নিজ ব্যয়ে মেট্রপলিটন ইন্সটিটিউশনের
লাইব্রেরী করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে বিভাগায়ের উদ্ভূত অর্থ বহুমুখ্য ও
প্রয়োজনীয় প্রকল্প সকল ক্রম ক্রমে লিপিতে লাগিলেন। বিভাগায়ের পুস্তকালয়,
বিভাগায়ের অন্ত্যস্ত প্রবাদি বখাসম্ভব স্তম্ভর ও বহুমুখ্য করিতে লাগিলেন।
শিক্ষকগণের উপর এইরূপ আদেশ ছিল যে তাঁহারা বাগকগণকে প্রহার
করিতে পারিবেন না। মিষ্ট কথা শাস্তভাবে সকলকে বিভাগায়ের নিয়মাবলী
করিতে বলিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, কল বিভাগায়ের শিক্ষকগণ সে নিয়ম পালন
করিতেন না। আমাদের জনৈক প্রচেষ্টা বহু সেকাডল তাঁহার বিভাগায়ের
শিক্ষক ছিলেন। অপর শিক্ষকগণ বিভাগায়ের মহাশয়ের ই আদেশ পালন
করিতেন না, তিনিও করিতেন না, প্রয়োজন মত বাগকগণকে প্রহার

* “Pandit has done wonders.”

+ বন্দোপাধ্যায়—অরবিন্দনাথ, কালীপ্রসাদ, কৃষ্ণনাথ, নন্দলাল। ভট্টাচার্য্য—অক্ষয়কুমার,
বিদ্যাপ্রসাদ। চক্রবর্তী—বহুনাথ, কুমারবিহারী, পূর্ণচন্দ্র। চট্টোপাধ্যায়—সোপানচন্দ্র। দত্ত
—যোগেন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র। দত্ত—প্রাণকৃষ্ণ। মৈত্র—বেঙ্গলচন্দ্র। দাস—কলকাতার। দাসগৌড়ী—
আত্মতোষ।

করিতেন, বিভাগসাগর মহাশয় অনুসন্ধান করাত্তে তিনি তাহা স্বীকার করেন। এই অপরাধে বিভাগসাগর মহাশয়ের বিচারে তাঁহার অবসর গ্রহণ করিতে হয়, অজ্ঞাত শিক্ষকেরা কি বলিয়া অবাহতি পাইয়াছিলেন বলিতে পারি না।

শিক্ষকগণের বেতন বিষয়ে বিভাগসাগর মহাশয় প্রায় সুরুহস্ত ছিলেন। তাহার প্রধান কারণ এই যে, মেট্রপলিটন ইন্সটিটিউশন তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ ছিল না। তিনি ইহাকে কামধেনুরূপে লাগন লাগন করিয়া আত্ম-পুষ্টি সাধন করিতে কোন দিন প্রয়াস পান নাই, বিভাগসাগরের জীবিক সাধনে ও তদ্বারা স্বদেশীর সুখ ও বালকবৃন্দের সুশিক্ষা লাভের লক্ষ্যে উদ্ধারনে সমস্ত অর্থই ব্যয় করিতেন, বিভাগসাগর সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ মন্তব্য এই যে, একদিন একটা পরস্য বিভাগসাগর হইতে নিজে গ্রহণ করেন নাই, এতদপেক্ষা মহত্তর গুণ এই যে, তাঁহার উন্নতিকল্পে কত সময়ে কত টাকা নিঃসৃত হইতে ব্যয় করিয়াছেন তাতা পাটবার প্রত্যাশা রাখেন নাই। এই জন্তই শিক্ষকগণের প্রতি সর্বদা যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারিতেন। শিক্ষকগণের কেহ পীড়িত হইয়া কিছুকালের বিদায় প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার অন্ন সংস্থান না থাকিলে, পুরা বেতনে ২৩০৪ কি ৫ মাসের বিদায় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এরূপ সদাশয়তার প্রমাণ তাঁহার বিভাগসাগরের শিক্ষকসম্প্রদায় অনেকেরই দিবেন। তাহারও কাজ কর্ণে সম্বল হইলে, প্রায়ই বেতন বৃদ্ধি তাহার পুরস্কারের আকার ধারণ করিত।

বিভাগসাগর পরিচালন কার্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু লোক নিবৃত্ত করিলে, সে সকল লোককে কিন্তু কার্যের ভার দিলে কিন্তু কার্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন এবং কিন্তু উপযুক্ত লোককে কত টাকা বেতন দিলে, ভাল দেখায় এ সকলই তিনি বুঝিতেন, কিন্তু তাঁহার এক প্রধান গুণ বা প্রধান দোষ ছিল, তাহা এই যে, তিনি যখন কাহাকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহার কথায় তিনি মরিতেন বাচতেন, বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার উপর যোগ আনা করতেন, এইরূপ লোকদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সময়ে সময়ে না জানিয়া লোকের প্রতি অস্বাভাবিক অবিচার করিয়াছেন, এরূপ অবিচার হলে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ তাঁহার প্রতি অস্বাভাবিক অসন্তোষ প্রকাশিত করিয়া দীর্ঘবে দণ্ডভোগ করিতেন, অপর কেহ কেহ

স্ট্রাইট বাক্সে তাঁহার বিবেচনার ঘোষ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া বাইতেন, এক্ষণ দৃষ্টান্ত যে একেবারেই বিরল, তাহা নহে । পরলোক গমনের অন্তদিন পূর্বে তিনি কোন এক বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার গিথিত মন্তব্যের মধ্যে সে ভাবের আভাস দিয়াছেন । তিনি বিশ্বাসী ব্যক্তির কথাই অনেক সম্রাট লোককে লক্ষ্যপাশে গুরুত্ব দিতে অথবা বিনামূল্যে অপরাধী হ্রি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আমাদের পক্ষে গভীর আক্ষেপের বিষয় । কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিই এইরূপ ছিল । তিনি আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন :—“পূর্বে সকল লোককে সং বলিয়া মনে করিতাম । কিন্তু সরলভাবে লোককে বিশ্বাস করিয়া এ জীবনে পদে পদে প্রবিক্ত হইয়াছি, শেষে দেখি যে ‘ঠক বাচ্চু’তে গা ওজড়’, কেউ আর বাধ বার না । আমি আগে ছিলাম মতিলাল শীল, এখন হইয়াছি দ্বারকানাথ ঠাকুর,” অর্থাৎ মতিলাল শীল অপরিচিত হলে লোককে ভাল বলিয়াই হ্রি করিতেন, আর দ্বারকানাথ ঠাকুর অপরিচিত হলে ঠিক তাহার বিপরীত ধরিতা রাখিতেন, ক্রমে যাহাকে ভাল দেখিতেন, তাহাকেই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেন । এই কথার মধ্যে তাঁহার লোককে বিশ্বাস করিয়া পদে পদে বিক্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি দীর্ঘকাল এক্ষণে লোকের দ্বারা বিশ্বাস হইয়াও সহজে সাবধান হইতে পারিতেন না । তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি জনপ্রিয় লোক ছিলেন, সহজে লোকের প্ররোচনার মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, এইজন্য তাঁহাকে জীবন-ব্যাপী ক্রেশভোগ করিতে হইয়াছে, কোন দিনই তাঁহার হৃৎকের বিরাম হয় নাই ।

এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে কালের কাব্য সম্পাদনে কালেকটী উত্তরোত্তর উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে লাগিল । এই বিভাগের, প্রীতি সাধন পক্ষে তিনি কয়েক জন শিক্ষাদানে নিপুণ পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠাভাজন শিক্ষকের সহায়তা লাভে কৃতকার্য হইয়াছিলেন । স্বর্গীয় প্রমথকুমার লাহিড়ী মহাপ্রের নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে মলে মলে ছাত্র সমাগম ও তৎকার্য আর্থিক সম্বলতা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । আমরা বিভাগের সৃষ্টি হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ ৩ পর্যন্ত বিভাগের

* ইহার পূর্বে কংগ্রেসে তাঁহার লোকান্তর বন্ধ হইলেও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার পরিশ্রমে কল্য বলিয়া বলা বাইতে পারে ।

কৃতকার্যতার তালিকা প্রস্তুত করিলাম। ১৮৮১, খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন হইতে বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রথম ছাত্র প্রেরিত হয়। ১২ বৎসরে ৪২৮টি বুঝ উক্ত বিভাগের হইতে বি, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ৩০টি বুঝ এম্ এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায় যে গড়ে প্রত্যেক বৎসরে ৪১^১/_২ টি, বি, এ, এবং ২^১/_২ এম্, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এম্, এর পরিবর্তে বি, এ পরীক্ষাতেই অনার্স (honours) দিবার ব্যবস্থা হয়। তদনুসারে ১৮৮৫ হইতে ১৮৯২ পর্যন্ত আট বৎসরের মধ্যে মেট্রোপলিটন হইতে মোট ৮৬ জন অনার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়। শুণানুসারে ইংরাজীতে একবার ২য়, একবার ৪র্থ ও ৮ম, একবার ৫ম, একবার ৭ম ও আর একবার ১ম স্থান অধিকার করে। অঙ্কবিজ্ঞান একবার ২য়, একবার ৪র্থ ও আর একবার ৫ম স্থান অধিকার করে। মনোবিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র একবার ৪র্থ অপর বার ৫ম স্থান লাভ করে। ঐতিহাসে একবার ১ম স্থান অধিকার করে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বি, এল্ পরীক্ষা দিবার অনুমতি-প্রার্থনাপত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পবিগৃহীত হইলে পব, মেট্রোপলিটন হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭৩ বৎসরে ৫১৩ জন বি এল্ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। গড়ে প্রতি বৎসরে পড়িল ৪২^১/_২, ইংলিশের মধ্যে হইতে (১৮৮৩, ৮৫, ৮৬, খ্রীষ্টাব্দে) তিনটি ছাত্র পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ১০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দৃষ্টে জানা যায় যে, এরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী সুফল গবর্ণমেন্ট কলেজ ভিন্ন অন্য কোথাও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ বিদ্যালয়ের মহাশয় লোকান্তরিত, সুতরাং মেট্রোপলিটনের জন্য প্রাণপাত করিয়া পাঠিবার লোক নাই, উক্ত বিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যাপক ও সংগ্রহী লোকান্তরিত অধ্যাপক নগেন্দ্র নাথ ঘোষ (N. N. Ghose, Esqr.) বিদ্যালয়ের বিরোধে শোক প্রকাশার্থে আদ্যুত সভায় বসিয়াছিলেন, “তিনি ইমানী প্রায়ই অনুহ ও শয়ানত থাকিতেন, কিন্তু যদি দৈবাৎ তাঁহার উঠিবার সময় হইত, তবে তাঁহার হুর্দল চরণ হুবাণি তাঁহাকে সর্বোগ্রহ কালেজ অভিমুখে লইয়া বাইত।” * এরূপ প্রাণের জিনিস

ভবিষ্যৎ স্বদেশের হিতোদ্দেশে বিদ্যালয়ের সেবা কর জন করিতে পারে ? অর্থে স্বদেশানুরাগ জন্মায় না। ঈর্ষাপরায়ণতার স্বদেশের হিতসাধনেচ্ছার স্ফূর্তিও অল্পের উদয় হয় না। সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া পরোপকার সাধনে আগ্রহ হইলেই কেবল উন্নীতিরূপ স্ফূর্তির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। জ্ঞান রমেশচন্দ্র, বিদ্যালয়গর মহাশয়ের বহু যত্নের বিদ্যালয়টির বর্তমান কর্তৃপক্ষগণের অগ্রণীকরণে দণ্ডায়মান। বিদ্যালয়গর মহাশয়ের প্রতি তাঁহার পত্নীর প্রীতি ও অনুরাগ আছে, তাঁহার অবসরও আছে। তিনি বঙ্গ জননীর স্নেহস্থান, স্নেহস্থানের জ্ঞান মায়ের অকৃত্রিম স্নেহস্থানের আবহাওয়ার প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির রক্ষার যদি যত্নপর হন, তবে মেট্রপলিটন পূর্বের জ্ঞান গৌরব-স্বীকৃত বক্ষ্যে আত্মপরিচয় দানে সক্ষম হইবে।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়। বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া অবধি বিদ্যালয়গর মহাশয় সমান অনুরাগের সহিত ইহার ত্রিভুজ সাধন করিয়া আনিরাছেন। তাঁহাব এট কাণ্ডে বিশেষ সুবিধা হইবে এই ভরসা তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় জামাতা বাবু সুর্য্যকুমার অধিকারী বি, এ, মহাশয়কে মেট্রপলিটনের সম্পাদকের কার্যভার অর্পণ করেন, তৎপরে ক্রমে তাঁহার কার্যকুশলতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কাণ্ডের অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। সুর্য্যাব্য ১৩ বৎসর কাণ্ড মেট্রপলিটনের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্ডের কার্য হইতে অবসর গ্রাপ্ত হন। বিদ্যালয়গর মহাশয় এত দিনের পুরাতন কণ্ডচারী জামাতাকে বিদায় দিবার সময়ে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিলে ভাল দেখাইত, তাহা করিতে পারেন নাট। তিনি যে ইচ্ছা-পূর্বক করেন নাট, তাহা নহে—তাঁহাব কাণ্ডের অধ্যক্ষ জামাতাকে এতরূপ নিঃস্বন্দ ভাবে বিদায় দিবার সময়েও তিনি আপন প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া কার্য করিয়াছিলেন। কোন কারণে কাণ্ডের উপর বিরক্ত হইবার সময়ে, পুত্র, কন্যা, জামাতা কি শ্রালক এ সকল বিচার করিয়া, পুত্রের বেলা এক রকম ও আত্মীয়ের বেলা আর এক রকম বিরক্ত হওয়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। সর্বত্র সমান ভাবে বিরক্ত হইতেন। এবং তাঁহার কলণ সর্বত্র এক রূপই হইত। অপর কোন যোগ্য ব্যক্তি কাণ্ডের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিরোধভাজন হইলে, তিনি বাহা করিতেন, জামাতার বেলায়ও তাঁহাই করিয়াছেন। তিনি

যে আদালতের মত দশজন লোক হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন উপকরণে গঠিত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ।

বিভাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর গমনের পর কেহ কেহ মেট্রপলিটন ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিভাসাগরের প্রাপ্য নহে, এই উপলক্ষ করিয়া বহু একটা গোপযোগের সূত্রপাত করিলেন । এই গোপযোগের মীমাংসার জন্য গোপযোগকারিগণ আদালতের সাহায্য গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলেন । কিন্তু নারায়ণ বাবুর সুবিবেচনার আদালত পক্ষান্তর বাইবার প্রয়োজন হয় নাই । জ্ঞার রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় প্রভৃতি বহু সংখ্যক গণ্য মান্ত মহাশয়দিগের হস্তে নারায়ণ বাবু বিভাসাগরের বর্তমান কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন । এক্ষণে প্রশ্ন এই, যে, বিভাসাগর মহাশয় মেট্রপলিটনকে আপনার সম্পত্তি ভাবিতেন কি না ? তিনি যে ভাবে তাঁহার অপরামর সম্পত্তির ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার কোন সম্পত্তিকেই তিনি বিশেষ ভাবে আপনার ভাবিতেন না । যে ভাবে অত্যন্ত সম্পত্তি নিজের ভাবিয়াছেন, মেট্রপলিটনকেও ঠিক সেই ভাবে নিজের ভাবিয়াছেন । পাখকা এট, অত্যন্ত সম্পত্তিজাত অর্থে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের দেহাবরণে সহায়তা করিয়াছে, মেট্রপলিটনের সম্পত্তিতে তিনি কখন পুঙ্খমুখ হন নাট । মেট্রপলিটন নিজের সম্পত্তিই দশ জনের সেবার লাগাইয়াছেন । গাছারা মেট্রপলিটনের অপর দশ জন স্বত্বাধিকারী উপস্থিত করিয়া বিভাসাগর মহাশয়ের উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারাষ্ট তাঁহানকে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, মেট্রপলিটনের অসুস্থতা বাটী নিষ্কাশনের সময়ে যে বাশীকৃত টাকা জমা করিয়াছিলেন, সেই জমা পরিশোধের জন্য তিনি উক্ত খাতে লিখিয়াছিলেন যে, জমা পরিশোধ হইবার পূর্বে, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার সম্পূর্ণ স্বত্বত্বকৃত মেট্রপলিটনের জমী ও তাঁহার অত্যন্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া উত্তমর্ণের সমস্ত জমা পরিশোধ হইবে । তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ—এই বলিগণের মধ্যমূসারে কার্য করিতে বাধ্য রহিলেন । • যে জমা পরিশোধ করিতে তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা

* In this deed Pundit says that he had not created any other encumbrance upon the land, that he is the absolute proprietor of the

চিরজীবন বাধা, যে বাটী নিৰ্মাণ করিবার জন্য তিনি আপনাকে ও নিজ উত্তরাধিকারিগণকে দাবী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই ঋণ পরিশোধের জন্য মেট্রপলিটনের ভূমি ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তিও বিক্রয় হইতে পারিত এবং তাহাতেও ঋণ পরিশোধ না হইলে, উত্তরাধিকারিগণ চিরজীবন ঋণভার বহন করিতে বাধ্য হইতেন, সেই সম্পত্তির পূর্ণ সৌভাগ্যের অবস্থার আর পাঁচ জনের দাবী করিতে আসা এবং সেটরূপ দাবী সঙ্গ্ৰহ করিবার জন্য ছুটাছুটি করা কি মহতের লক্ষণ ? দেহের শোণিত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া ও জীবনের চিন্তা শ্রোতের রেণু রেণু অর্পণ করিয়া যখন বিভাগাগর মহাশয় মেট্রপলিটনের পঠন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন—যখন বর্ষার ঘনতীক্ষ্ণ বারিধারা কেবল তাঁহাকেই মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছিল, তখন কেহ সূক্ষ্ম বেশে পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই ! যখন তিনি খত লিখিয়া আপনার ও উত্তরাধিকারিগণের সর্বনাশ সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন কেহ অগ্রসর হইতে পারেন নাই ! তখন মেট্রপলিটনব নূতন উত্তরাধিকারিগণ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া বিভাগাগর কৃত পর্বত পরিমাণ ঋণভার আপনারা পরিশোধ করিবার ভার লইয়া বিভাগাগরকে ঋণমুক্ত করিতে অগ্রসর হইতে পারেন নাই ! যদি সমগ্র সম্পত্তি বিভাগাগর মহাশয় ৫ তাঁহার উত্তরাধিকারীর নহে, তবে নারায়ণ বাবুকে স্রুগুং অট্টালিকাসহ ভূমির স্বাধিকারী স্বীকার করিয়া কালেক্টর বাবদ চিরদিনের জন্য মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি দিবার প্রয়োজন কি ? প্রকৃত কথা এই যে, কয়েক জন নূতন স্বাধিকারী উপস্থিত হইলেও উদয়মণ্ডলীর সহজে তাঁহাদের দাবী তত প্রবল বলিয়া বোধ হয় নাট। বিভাগাগর মহাশয় মেট্রপলিটনকে নিজের সম্পত্তি মনে কবিতেন, তাহাতে ক্রুর বিন্দুবাত্র সন্দেহ নাই, পরলোক গমনের পূর্বে তিনি যে কমিটী করিয়া তাঁহাদের হস্তে কালেক্টর ভারার্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, অত্যধিক অসুস্থতা বশতঃ সে ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। মেট্রপলিটনের বর্তমান অভিভাবকগণ

same and that the creditor will be entitled to realise the debt from the land pledged and from any other property belonging to him, and that he and his heirs will be bound by the deed." Extract taken from the statement published by the present Authorities.

ঐহাদের বিবরণীতে সে কথার উল্লেখও করিয়াছেন! সেই কমিটি যদি গঠিত হইত, এবং সে কমিটি গঠিত হইলে, ঐহাদের উপর কার্যের ভার পড়িত, ঐহারা যদি নিজ নিজ দায়িত্বের অধীন হইয়া কার্য করিতেন তাহা হইলে কি নুতন স্বাধিকারীদের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত? সেক্ষেপ কমিটি গঠিত হইলে পর, ঐহাদের সমক্ষে কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না, অগ্রসর হইলেও তাহাতে কোন ফল কণিত না। এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বিভাগের বিভাগসাগর মহাশয়ের নিজ সম্পত্তিই ছিল, তিনিও তাহাই মনে করিতেন কিন্তু চিরদিন ঐ সম্পত্তি পরার্থেই রাখিয়াছিলেন।

এদেশীয় যুবকগণকে শিক্ষাদান বিষয়ে যেক্ষেপ ব্যবস্থা করিলে, অধিক পরিমাণে সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, বিভাগসাগর মহাশয় সে বিষয়ে যথাসম্ভব চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। কিন্তু সর্বদাই বলিতেন “বাংলাদেশের সুশিক্ষাগত পিতা মাতা ও গৃহশিক্ষার উপর নির্ভর করে।” এই সম্বন্ধে একবার একস্থানে কথাবার্তা হইতেছিল। প্রসঙ্গক্রমে একজন বলিলেন “জেনারেল এসেছিলেন আজ কাল ভাল পড়া হইতেছে” বিভাগসাগর মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “উ—হঁ, সে কথা ঠিক নহে,”—অপর ব্যক্তি বলিলেন, “কেন মহাশয়? বিভাগসাগর মহাশয় বলিলেন :—“আমি যখন ইন্সপেক্টরী কার্য করিতাম, সেই সময় একবার মেদিনীপুর অঞ্চলে পথে যাইতে যাইতে এক স্থানে নদী পার হইতে হয়। সেখানে পার হওয়ার ব্যবস্থা বড় সুন্দর। একখানি ডোঙা একগাছি নগিতে (বীশ) বাধা থাকে। ঘাটে পারের পরসাদী পাটনীকে দিয়া নিজে নৌকায় উঠিয়া নগি গাছি উঠাইয়া নিলে ছই চারি খাচা দিয়া পর পারের গিয়া উঠিতে হইত। পর পারের গিয়া নগিক্ত নৌকাখানি আটকাইয়া রাখিয়া গোক নিজেই কাছে চলিয়া যাইত। আবার যখন ওপার হইতে কেহ আসিত সে এক্ষেপ উপায়ে এপারে আসিয়া পাটনীকে পরসাদী দিয়া চলিয়া যাইত। আমাদের দেশে এই যে সব কালেজ আছে, এখানেও ঠিক সেইরূপ পরসাদী ফেল, নিজে নগি ঠেল, পার হইতে চলে বাও।”

• বিভাগসাগর মহাশয়ের পরম প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত বাবু হারকামণি ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট এই পরসাদী গুলিগাছি।

আর এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা উপাধিকারিণীদের শিক্ষার পরিমাণ ও লাভালাভ বিষয়ে কথাবার্তা হইতেছিল। বিভাগসমূহ মহাশয় গভীর দুঃখের সহিত বলিলেন “দেশে শিক্ষা বিস্তার কিছুই হয় নাই! কেমন হয়েছে, জান, একবার গুনিয়াছিলাম যে বিলাত হইতে একরকম কণ আনিতেছে, তাতে একদিকে একটা বাছুর (গোবৎসা) আর একদিকে কতকগুলো আঁক (ইকু পণ্ড) প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। তার পর ক্রমে একদিকে আঁক হইতে রস—রস হইতে শুড়, শুড় হইতে জিনি প্রভৃতি প্রক্রিয়া, অল্প দিকে গোবৎসার ক্রমোন্নতি হইতে চুষ্ট, চুষ্ট হইতে ছানা প্রভৃতি প্রক্রিয়া যোগে সন্দেশ তৈয়ার হইতেছে। ১০১৫ জন লোক, নানাবিধ ছাপা হাতে কলের মুখে বসিয়া সন্দেশের পাক হইতে নানাবিধ আকারের সন্দেশ প্রস্তুত করিতেছে। সন্দেশের রং ও ছাপ দেখিয়া লোক মোহিত হইয়া যায়। আর তার হাঁচই বা কত প্রকার! কেহ বা তাগর্শাস, কেহ বা আব, কেহ বা আতা, কেহ বা গোলাপ জাম প্রভৃতি করিতেছে। কিন্তু চাকিয়া দেখ, সবগুলিরই একই তার, একই স্বাদ! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ভিত্তানও ঠিক সেইরূপ একপাকৈ তৈয়ারি মাল, কোনটীতে বা এম, এ, কোনটীতে বা বি, এ, কোনটীতে বা এল, এ, কোনটীতে বা এন্ট্রান্সের ছাপ দেওয়া আছে, যখন চাকিতে গাঠ, তখন দেখি, সবই এক পাকের জিনিস।”^{*} যে শিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের দেশের লোক পৌরবে ক্ষোভবদ্ধ, তিনি সে শিক্ষার অসারতা যথেষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন এবং ইহার পরিবর্তন অসম্ভব বলিয়া অনেক সময়ে উাহাকে গভীর আক্ষেপ করিতে গুনিয়াছি।

এই সকল ক্রটি সত্ত্বেও তিনি এই শিক্ষার বিস্তারেরই দেশের কথঞ্চিৎ কল্যাণ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং লোকসমাজের সেই কল্যাণসাধন স্মরণ করিয়াই নিরন্তর ইহার প্রীতি সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হইয়া দেশে শিক্ষা বিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার শেষ ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রকাশ করিয়া আমরা বিষয়াস্তরে অগ্রসর হইব। বাঙ্গালা সাহিত্য স্টন ও বালাকসমূহকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহদান

* বেঙ্গলিগটনের শিক্ষক ও বাঙ্গালার মহাপ্রভুর মিসপাএ বাবু রজন্য যে মহাপ্রভুর নিকট এই গল্পটি গুনিয়াছি।

ও উৎকৃষ্ট পুস্তকনির্মাচনমানসে গভর্নমেন্ট যখন সর্ব প্রথম সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটি (Central Text Book Committee) গঠন করেন, তখন সে সময়ের শিক্ষাবিভাগীয় ডাইরেক্টর এটকিন্সন সাহেব বিভাগাগর মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং বিভাগাগর মহাশয় সে পত্রের যে উত্তর দিয়াছিলেন, সেই দুখানি পত্র এখানে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর সমীপে

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,

বিভাগায়ের পাঠ্য পুস্তক নির্মাচনের জন্ত যে কমিটি গঠিত হইতেছে, তাহাতে আপনার নামটি দিবার অনুমতি দিবেন কি? বাঙ্গালা ও ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকের তদন্ত ও পরীক্ষা করাই কমিটির কার্য হইবে, এই জন্তই এই কমিটিতে যোগ্যতর দেশীয় সুপণ্ডিতগণের সহায়তা লাভ নিতান্ত আবশ্যক। এই কারণে আপনি আমাদের এই কার্যের সহায়তা করিতে সম্মত হইলে, আমি নিতান্ত অনুগৃহীত হইব।*

আপনার বিশ্বাসভাজন

১১ই জুলাই ১৮৭৩।

ডব্লিউ, এস, এটকিন্সন

ডব্লিউ, এস, এটকিন্সন মহোদয় সমীপে

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১১ই তারিখের পত্রোত্তরে জানাইতেছি যে, বিভাগায়ের পাঠ্য পুস্তক নির্মাচন কমিটির সভা হইবার প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মত হইতাম। কিন্তু দুটি কারণে আমি এত অনুবাদ রক্ষা করিতে অপারগ হইতেছি। উক্ত

July 11-73.

* My dear Pandit,

Will you allow me to add your name to the Committee upon school books? The enquiries of the Committee are to be extended to Vernacular school books as well as English, and it is therefore necessary to secure the help of the best native scholars.

I shall be much obliged if you will give us the benefit of your service.

Sincerely yours,

Pandit Iwar Chandra Sarma,

(Sd.) W. H. Atkinson.

কমিটী যে সকল পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করিবেন, আমি গ্রহকাররূপে সে সকলের কল্যাণার্থী হইব, এক্ষণ হলে ঐ কমিটীতে বিচারকরূপে আমার আসন গ্রহণ করা, কোন ক্রমেই ভীষণ হইবে না। এতদ্বিন্ন আমার এক্ষণও মনে হয় যে, আমি কমিটীর সভ্যরূপে উপস্থিত থাকিলে, আমার পুস্তকাদি সবক্কে অল্পেব সম্পূর্ণ মুক্তভাবে মহামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট হইবে। এক্ষণ হলে আমি কোন মতেই আমাকে উক্ত কমিটীর সভ্যপদ গ্রহণে প্রলুব্ধ করিতে পারিতেছি না।^১ এবং আমার অনুরোধ যে সে জন্ত আপনি আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। *

আপনার বিশ্বাসভাজন

কলিকাতা ১৩ই জুলাই ১৮৭১।

(স্বাক্ষর) শ্রীদেবচন্দ্র শর্মা।

এদেশীয় লোকমণ্ডলীর শিক্ষাগত ও জ্ঞানোন্নতিসাধনের জন্ত তিনি কিরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে প্রম করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের উল্লিখিত পত্র দ্বানিই তাহার সুন্দর নিদর্শন স্থল। তিনি মেট্রপলিটনের ধনভাণ্ডার হইতে কোন দিন একটী পরসা গ্রহণ না করিয়া এবং পাঠ্য নিরীচন (Central Text Book Committee) কমিটীর গঠন কালে তাহার অধিনায়কত্বে নিম্নস্থিত ইংরাজ, স্বার্থ ও পরার্থের সংগ্রামে, পাছে অজ্ঞাতসারেও স্বার্থরক্ষায় অধিকতর মনোযোগী

13th July 1873.

* My dear Sir,

In reply to yours of the 11th instant I beg to inform you that I would have gladly accepted your invitation to serve in the School Book Committee, but on two considerations I feel constrained to decline it. As an author I am directly interested in the decision of the Committee, and I do not therefore think it right to take a part in their deliberations. Besides, I am inclined to think that my presence in the Committee may interfere with a free and unreserved discussion of the merits and demerits of the books. I hope you will therefore kindly excuse me if I cannot persuade myself to comply with your request.

Yours sincerely,

(Sd.) Jyara Chandra Sharma.

W. N. Atkinson, Esqr., M. A.

হন, এই ভয়ে ডাইরেক্টর এটকিন্সন সাহেবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি বর্তমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ নীতিরই ঋণীত সগ্রামণ করিয়া স্বাধীন ও নিষ্ঠার স্মৃতি স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতার স্মরণ ও স্মৃতিস্তম্ভ মঙ্গল-পরিণোদিত বর্তমান সভ্যতাভিমাত্রী বঙ্গ-সম্মান বিজ্ঞানাগর-চরণ কি আশ্রয়ণি দিতে ও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে শিখিবেন না! ইহাতেও যদি আমরা না শিখি, তবে আর শিখিব কোথায়? আমাদের সত্য সত্যই দুর্ভাগ্য যে এক্ষণ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে থাকিতেও স্বদেশের নানাবিধ হিতসাধনের চেষ্টা, বিপাকে পড়িয়া বিপথে পরিচালিত হইতেছে। হুঃ এই যে, কিশোর কাল অতিক্রান্ত হইতে না হইতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সুপবিত্র নবীন দেহে এত স্বাধীনতার কলঙ্করোণা পাত হইয়াছে। সঙ্গদয় সাহিত্য সেবকমণ্ডলী যদি দয় করিয়া বিজ্ঞানাগর প্রদর্শিত পথে অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সুখ ও সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না এক বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের শিক্ষা ও জ্ঞান বিভ্রাবের আগ্রহ কিরূপ পরিমাণে সফল হইবে।

বিভাগাগর মহাশয়ের উদ্যোগ ও উদ্ভবের ফলস্বরূপ মেট্রপলিটন ইন্সটিটিউশন এরূপ বহুসংখ্যক বিভাগায়ের পিতৃহানীয়া। বিভাগাগর মহাশয়ের অনুকরণ সর্ব প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রদূত ১ গিটি কালেক্টর মহাপ্রভ করেন। তাঁহাদের অপবিত্রীম আগ্রহ ও উৎসাহের ফলে গিটি কালেক্টর দ্বারা আদ্র পোষণে সক্ষম হইয়া উঠে। ক্রমে গিটি কালেক্ট ও অধ্যাপক প্রথম ও দ্বিতীয়শ্রেণীর কালেক্টর + অধ্যাপক ও উন্নতি সহজসাধ্য হইয়া আসিয়াছে।

৩. শ্রীযুক্ত আবদুলবাক্বাস বক্ক, শ্রীযুক্ত দুর্গাধোহন দাস, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত উদেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বহোবলভগবৎ উদ্যোগে ও পরিচয়ে সিন্ধি কান্টনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

† রিপন কালেজ একমাত্র শ্রীমুক বাবু কলেজপ্রবাস অধ্যাপনাধ্যায় বহানয়ের ভেটীত অধ্য-
বসারের কল। বর্ষীয় কেশবকান্ত সেন প্রতিষ্ঠিত আলবার্ট কালেজ, বিলাত এত্যাগত পণ্ডিত
শ্রীমুক গিরিশচন্দ্র বহু পরিচালিত বঙ্গবাসী কালেজ, হেট্রপলিটনের কৃতদুর্গ অধ্যাপক শ্রীমুক
বাবু কুশিরাব বহু প্রতিষ্ঠিত সেন টোল ইনস্টিটিউশন একতর মাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজ কলিকাতার বাহিরেও নানা স্থানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বহুসংখ্যক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দরিদ্র বঙ্গের বহুসংখ্যক নিকৃষ্ট ছাত্র মণ্ডলীর উচ্চ শিক্ষা লাভ ও জ্ঞানোপার্জনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে । সাফাৎ ও পরোক্ষ ভাবে বিভাগগর মহাশয়ের এই সকলের মূল । বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত কলেজের * অভিভাবকগণ ইহার অল্প বিভাগগর মহাশয়ের নিকট সম্পূর্ণ কণী । ঐ সকল বিভাগগরের কর্তৃপক্ষগণ বিভাগগর মহাশয়ের অল্প কিছু করেন এক্ষণ প্রত্যাশা করা কি অস্তায় ? বিভাগগর স্বতীচিহ্ন প্রতিষ্ঠার অল্প স্তার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বহু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন । এতদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? আধুনিক বাঙ্গালার সর্বপ্রধান সুদৃঢ় ঐশ্বর্যচন্দ্রের স্বত্তি রক্ষার বাহারা প্রয়াস পাইবেন, তাঁহারা তদ্বারা আয়প্রসাদ ও অনরত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন । অর্থের সন্ধান করিবার এক্ষণ সুযোগ অধিক পাওয়া যায় না । বিভাগগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, তাঁহাদের ইচ্ছা থাকিলে স্বদেশবৎসল বঙ্গবীর বিভাগগরের স্বতিরক্ষা অতি সহজ কথা ।

* পুণ্যলোকা মহারাষ্ট্র স্বদেশী সি. আই. মহোদয় পরিচালিত বহুবন্দুর কলেজ, মহারাষ্ট্রাধিপতি কুবিহাৰাধিপতি প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া কলেজ, মহারাষ্ট্র বহুবন্দারামের প্রতিষ্ঠিত রাজ কলেজ ঢাকার জগন্নাথ কলেজ, উত্তরপাড়া কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, ভাঙ্গলপুর ভেজনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত কলেজ, বেঙ্গল স্যাসেন্স কলেজ, ন্যাংইল ভিক্টোরিয়া কলেজ, ষ্ট্রীট এন্ড, গি. কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, পাবনা কলেজ, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

দশম অধ্যায় ।

—:~:—

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পরিণয়পাশে আবদ্ধ হন। তাঁহার শৈশব ও বাল্য জীবন যথাবৎ ইতি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহে তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সূচনা হইল। ঈশ্বরচন্দ্র যে উত্তরকালে রসজ্ঞ লোক হইবেন, বিবাহ-রজনীতেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে, কোন বন্ধুর গৃহে বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, নানা প্রকার হাস্যরসের অন্তরঙ্গ লোক যখন আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, তখন বিভ্রাসাগর মহাশয় বলিলেন :—“আজ কাল বিবাহে আর তেমন আশোদ নাই। বরকেও তেমন সঙ্কট পরীক্ষায় আজকাল আর পড়িতে হয় না।” ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুদিগের কেহ কেহ সে কালের গল্প এক আধটা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে, বিভ্রাসাগর মহাশয় বলিলেন :—“এখন আর কি আছে? সে কালে বর বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতে তাকে তার ক’নে খুঁজিয়া লইতে হইত। ছালনা তলায় গুড় দৃষ্টির সময়ে একটা বার চারিচক্ষে দেখা হয় কিনা সন্দেহ, সেই দেখায় বাসর ঘরে আসিয়া ক’নে খুঁজিয়া বাহির করা কিল্পপ কঠিন কাজ। আমার বিবাহের সময়ে বাসর ঘরে পা দিতে না দিতে আমাকে বলিল, ‘তোমার ক’নে খুঁজিয়া বাহির কর।’ ক’নে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে শুনিয়া মগ্ন মুগ্ধিলে পড়িলাম। গৃহ প্রবেশ করিতে না করিতে আমার উপর ক’নে খুঁজিয়া লইবার হুকুম হইল; আমি দেখিলাম সেই ঘরের দরজার ভিতর থেকে আমার সেই অপরিচিতা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে খুঁজিয়া বাহির করা আমার কণ্ঠ নয়—আমি তাহারা চিন্তিয়া শেষে আমারই বরসের বেশ একটা টুকটুক

করশা মেয়েকে ধরিয়া, বলিলাম, ‘এই আমার ক’নে ।’ যেমন ধরা অমনি এক মহা গুপগোল পড়িয়া গেল । কে কার হাড়ে পড়ে, কে কোথা দিয়া পলাইবে, তার পথ পার না । আমি বাকে ধরিছি, তাকে খুবই ধরিছি, তার আর পলাইবার উপার নাই । আমি তার হাত ধরিয়া বলিলাম, ‘তুমিই আমার ক’নে ; তোমাকে হ’লেই আমার ঘর চলবে । আমি আর অন্য ক’নে চাই না ।’ সে মেয়েটাত বাপের মারে গেলুমরে বলিয়া চীৎকার করুক । গিন্নীবারী গোছ দুই একজন নিকটে আসিয়া বলিল, ‘ও তোমার ক’নে নয়, ওকে ছেড়ে দাও ।’ আমি বলিলাম, ‘ছাড়িব কেন ? খুঁজে নিতে বলছি, আমি খুঁজিয়া এইটাকেই বাহির করিয়াছি, এইটা হ’লেই আমার বেশ মনের মত হবে ।’ তার পর সেই মেয়েটা হাতে পারে ধরিয়া বলিল, ‘আচ্ছা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার ক’নে বা’র ক’রে দিচ্ছি । তখন আপনারাষ্ট ক’নে আনিয়া হাঙ্গির করিল ।’ বিবাহ-বাসর সঙ্কটে বিভাসাগর মহাশয় পরিহাসপ্রিয় আত্মীয় স্বজনের হাতে এইরূপে নিস্তার পাইলেন । আর কেহ বড় তাঁহাকে নাড়া চাড়া দিল না ।

অতি অল্প বয়স হইতেই সুযোগ পাইলেই ঈশ্বরচন্দ্রের রসিকতার তাল ফাঁক খাইত না । কালেজে কাব্য শাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় একবার “গোপালের নমোস্তম্ভ মে” এইটাকে ৪র্থ চরণ করিয়া সকলকে শ্লোক রচনা করিতে বলিলে, তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে বিজ্ঞাসা করিলেন :—“মহাশয়, কোন গোপালের বিষয় বর্ণনা করিব ? এক গোপাল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন, আর এক গোপাল বহুকাল পূর্বে বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন । এ দুজনের কোনটা ?” ছাত্রের এই সুসঙ্গত রক্তকান্ত স্নেহ-তরঙ্গে যোগ দিয়া পণ্ডিত বলিলেন, “বেশ বেশ, বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর ।”

বিভাসাগর মহাশয়ের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ কালের মধ্যে প্রথম চৌদ্দ বৎসর নিরন্তর অশান্তির মধ্যে কাটিয়াছিল । ইহার কারণ এই যে বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সখীনা বধূর সন্তানাদি না হওয়াতে পরিবারের সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং যে কোন লোক যখনই কোন ঔষধাদির কথা বলিতাছে, প্রবীণারা তাহাই বৃশসাত্যাক খাওয়াইতেন । পরিশেষে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের কার্তিক মাসের শেষ দিবসে বিভাসাগর মহাশয়ের

একটা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই পিতার একমাত্র পুত্র শ্রীমুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিহারী (বন্দোপাধ্যায়)। তৎপরে ক্রমান্বয়ে চারিটা কন্যা সন্তান হয়। জ্যেষ্ঠা হেমলতা, মধ্যমা কুমুদিনী, তৃতীয়া বিনোদিনী, কনিষ্ঠা শরৎকুমারী।

৮ দৈবরক্তে বিভাসাগর

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|--|--|--|
| পুত্র শ্রীমুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিহারী (বন্দোপাধ্যায়) — এক পুত্র ও তিন কন্যা জ্যেষ্ঠা কন্যা ঈশ্বরী হেমলতা দেবী | (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব) বাবু গোপালচন্দ্র সমাজপতি — দুই পুত্র — ঈমান হুসেনচন্দ্র, ঈমান জ্যোতিচন্দ্র (সমাজপতি) মধ্যমা কন্যা ঈশ্বরী কুমুদিনী দেবী | (মধ্যম ভ্রাতৃত্ব) জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় — তিন পুত্র ও চারি কন্যা তৃতীয় কন্যা ঈশ্বরী বিনোদিনী দেবী | (তৃতীয় ভ্রাতৃত্ব) বাবু সুধাকুমার কবিকারী — তিন পুত্র ও চারি কন্যা কনিষ্ঠা কন্যা ঈশ্বরী শরৎকুমারী দেবী | (কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব) বাবু কলিকৈকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — দুই পুত্র ও এক কন্যা |

বিভাসাগর মহাশয় অত্যন্ত পিতৃমাতৃবৎসল ছিলেন। তাঁহার পিতৃভক্তি ও মাতৃপূজার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্বে দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পিতৃমাতৃসেবার যে চিত্র অঙ্কিত হওয়া অবশ্যক, তাহার তুলনায় সে আভাস কিছুই নহে। জনক জননীকে সুখী করা তাঁহার জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। নিজের নানাবিধ সুখের চিন্তাকে তিনি পিতামাতার তৃপ্তি বিধানের জন্য অবাধে বলি দিতে পারিতেন। একে ত বাল্যকাল হইতেই একদম ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, নিজের সুখের দিকে কোন দিনই নৃষ্টিপাত করেন নাই। চিরকাল আয়নিগ্রহ ও আত্মশাসনের অধীন হইয়া চালাইতেন; পরন্তু কোথাও কোন প্রকার সুখের কারণ বিস্তরান থাকিলে, পিতামাতার অনুরোধে সেটুকুও বিসর্জন দিতেন। এই জন্য অনেক সময়ে তাঁহার পারিবারিক সুখ ভোগের ব্যাধত কল্পিত হইত। তিনি তাঁহার পিতামাতাকে চিরদিন বেবতা বোঝে পূজা

করিরাছেন। শিক্তাতাপূজার আজ কাল তাঁহার তুল্য অনুরাগী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবতার আদেশে, দেবসেবক বেল্লপ আত্মনিগ্রহ করিতে পারেন, তিনি পিতামাতার আদেশে তাহাই করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের নিরতিশয় নির্ভীকতার বাধা হইয়া পিতা ঠাকুরদাস বলোপাখ্যার বিবর কণ্ঠ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহকর্তারূপে গৃহেবু ও অভিভাবকরূপে প্রতিবেশিগণের তাবৎ কাজকর্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, আর জননী গৃহীণীরূপে পরিবারবর্গের ও আত্মীয়রূপে প্রতিবেশিগণের সেবা শুশ্রূষায় নিরত নিযুক্ত থাকিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতার অবস্থান পূর্বক কাজকর্ম করিতেন এবং একান্তবর্তী পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ ও ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের লজ্জা বধন যত টাকার প্রয়োজন হইত, তাহার সরবরাহ করিতেন। নিত্য প্রয়োজন হইলে, কখন কখন জননী, পত্নী ও পুত্র কল্যাসহ কলিকাতার বাস করিতেন, কিন্তু পিতামাতার জীবদ্দশার ও তৎপরে, বিবাহিত জীবনের দীর্ঘকাল একাকী কলিকাতার বাস করিতেন। তদীয় পত্নীও পুত্রকল্যাসহ বীরসিংহের বাড়ীতেই অনেক সময়ে বাস করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের স্বীয় ও পুত্রকল্যার সেবা অপেক্ষা অপর দশ জনের সেবাই অধিক করিয়াছেন। কোন প্রয়োজন কিংবা অমুঠান উল্লেখ বিদ্যাসাগর মহাশয় বাটী গমন করিলে পরিবারবর্গের অপেক্ষা প্রতিবেশিগণের ও অপরিচিত বিপন্ন গ্রাম্য লোকদিগের অধিকতর আনন্দ হইত, কারণ তাহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অনুবিধা ও বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিত। তিনি যখন দেখানে থাকিতেন, সেখানে ঈশ্বর, নতুন কাপড়ের বস্তা আর চকচকে টাকা, আধুলি, গিকি, ছয়ানি ও পরমা সুমুগাই সঙ্গে থাকিত। পরিভ্রমণের তিনটি অভাব—ঈশ্বর অন্ন ও বস্ত্র; লোকের এই অভাব মোচনে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত সদা মুক্তভাবে অপেক্ষা করিত। বীরসিংহ ও তৎসংশ্লিষ্ট তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মুক্তভাবে এইরূপ ধন বিতরণের সংবাদ প্রচারিত হইলে পর, পত্নী সমূহের কুটীরে এইরূপ ধন বিতরণের সংবাদ প্রচারিত হইলে পর, একবার শুধার তাঁহার অবস্থানকালে, কতকগুলি চট্টলাক সমবেত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাতি করে। দস্তাদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহে অনেক টাকা পাইবে। বাড়ীতে সে সময়ে অনেক লোক। যাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে বলবৎ দস্তাদিগের সমাগমে সকলেই

ଭରେ ଉଡ଼ୁନାହିଁ । ୧୦:୧୦ ଜନ ଲୋକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବିବା
 ଗୃହ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ଦେଖିବା, ସକଳେହି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର ଦିନା ପଳାୟନ କରିବେ ବାଧା
 ହୁଏନେ । ମିତ୍ରା ମାତା ଓ ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଦ୍ୟାମାମର ମହାଶୟ ପଳାୟନ
 କରିବା ଶ୍ରୋତବ୍ୟ କରିବେ । ଡାକାହିତରା ଡାକାର ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାହିଲ,
 ପାହିଲେ କିଛି ଟାକା ଆଦାର କରିବ । ତାହାକେ ନା ପାହିବା ଏବେବେ ଗୃହେବ
 ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ଅପହରଣ କରିବା ନୁହେଁ ବାଧ୍ୟ । ବିପନ୍ନ ବିଦ୍ୟାମାମର ସେହି ସାହିତ୍ୟେହି
 ଶାଂଖ୍ୟ ଧାରା ସଂବାଦ ପାଠାହିଲେ । ପ୍ରାୟ:କାଳେ କଳିର ଅବତାର ଧଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ବଂଶୀଧାରୀ
 ମୁନିଷ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଆସିବା ଦେଖା ଦିଲେ । ବୀରସିଂହେ ହାଜିର ହୁଏତ
 ମର୍ଦ୍ଦାକ୍ଷେ ମନ୍ଦିରର ବାସନ୍ତ ନାହିଁ ଦେଖିବା, ତାହାର ମେଞ୍ଚାକ୍ଷୁଟା ଏକଟୁ ବେଶୀ ଗରମ ହୁଏ ।
 ଏବଂ ଠାକୁରନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ମହାଶୟ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ମାହେବକେ ବଲିଲେ, “ଆମିନି
 କୁଳୀନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଛେଲେ ବଳିଆ ଆପନାର ମର୍ଦ୍ଦାକ୍ଷ ରାଧିତେ ପାରି, କିଛି ଏ ସବୁକେ
 ଆପନାକେ କିଛି ଦିଅତେ ପାରି ନା ।” * ଏହି ବଳିଆ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ମହାଶୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 ଓ ଧର୍ମରେ ସଂସାରର ନିତ୍ୟ ବାସନ୍ତା ଧାରା, ବାଟୀ, ବାଟୀ ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରମ କରିବେ
 ଗଲେ । ବୁଦ୍ଧର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନିଜର ସଂହାରଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପାଞ୍ଚର ବୁଦ୍ଧବନ୍ଦକେ
 ନୁହେଁ ବାଟୀର ସନ୍ତାନ ଅନିବାର୍ତ୍ତ ନାହିଁ କପାଟିକେ ଆସନ୍ତ କରିବାହିଲେ ! କେମିତି
 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାଏ । ସଂସାରର ମର୍ଦ୍ଦାକ୍ଷ ତାର ମଧ୍ୟର ଉପର ପଡ଼ିଲେ ବିପଦର ମଧ୍ୟ
 କେମିତି ବାଧା ସମ୍ବଳତା ଅନୁକୃତ ! ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏତାଦୃଶ ଧୃଷ୍ଟତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୁଦ୍ଧବନ୍ଦର
 ନାରୋଗୀ ମାତେବର ମର୍ଦ୍ଦାକ୍ଷ ଧର୍ମର ଅଗ୍ରଣୀ ଗଲେ, ତିନି ବଲିଲେ :—“ଏ ବାମୁନେର
 (ଠାକୁରନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟର) ଏତେ କି ଜୋର ଯେ, ଆମାର ମୁଖର ଉପର ଅବାଧ
 ଦେଖି ଯେ, ଏକ ପରମାତ୍ମା ନିବନ ! ଆଉ ଏ ବାମୁନେର ଅଜ୍ଞାତନାମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର
 ଦିକେ ଅନୁଗ୍ରହ ସହେତୁ କରିବା ବଲିଲେ :—ହୁଏତ ଅତି ଆକର୍ଷଣର ବିଷୟ, ଏ
 ଡୋଞ୍ଡାଟା (ବିଦ୍ୟାମାମର ମହାଶୟ) କି ସକଳେହି ଲୋକ ; କାଳ ଡାକାହିତ ହୁଏତ
 ଆଜି ସକଳେହି ବାଟୀର ସନ୍ତାନ କପାଟି ଖୋଲିଦେ ।” ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମର କାନ୍ଦିବାର
 ବଲିଲେ :—“ହୁଏତ ଉନି ସାମାନ୍ତ ଲୋକ ନୁହେଁ ; ଉନି ବାଞ୍ଛା ଆମିନେ ଜାଣନାବାଦେ
 ଡେମୁଟି ବାବୁ ଆସିବା ହୁଏତ ସହିତ ସାକ୍ଷୀ କରିବା ଆପନାକେ କୃତାର୍ଥ ବଳେ
 କଲେ ! ଗୁଣା ବାଧ୍ୟ ଯେ ବଡ଼ାଟି ଓ ଛୋଟାଟିର ସହିତ ଓ ହୁଏତ ବହୁତ ଆହେ ।” †

* ସହୋଦର ମହାଶୟ ବିଦ୍ୟାମାମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ୨୦ ପୃଷ୍ଠା ।

† ସହୋଦର ମହାଶୟ ବିଦ୍ୟାମାମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ୨୦ ପୃଷ୍ଠା ।

অবজীর্ণ প্রভু ভাবেদার কাঁড়িদারের অবানবন্দী গুনিয়া গন্ধিত মন্তক মন্ত করিণ—
সে ভীষণ ক্রকুটির তরঙ্গরেখা তাঁহার ললাট প্রান্তে বিলীন হইল। মহারাষ্ট্রের
প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি-বাবুর সুবন্ধিম বদনমণ্ডলের উদ্ভেজনা ঘন কালিমায় পরিণত
হইল, বাবুসাহেবের মুখে আর কথা সরে না, বিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তও মুক্তামাগার ছায়
সে বিবাহভরা, ললাটের শোভা বহুদূর করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ভীক না হইলে
সুযোগ পাইবামাত্র দুর্জলের প্রতি অত্যাচার করে না। আবার দুর্জলপীড়ক
প্রবলের শক্তি সামর্থ্যের কয়নাতেও অবসর হইয়া পড়িলে, ইহাই শু
স্বাভাবিক। আমাদের এই অজ্ঞাতনামা বীরকেশরী সভয়ে ও নতমস্তকে
বিনা দক্ষিণায় লেজ শুটাইলেন। কায় ক্রেশে কার্য্য শেষ করিয়া প্রাণ লইয়া
পলায়ন করিলেন এবং নিজের আড়ডার আসিয়া টাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এই
ডাকাইতির পর ইহাতেই পাঠকের পূর্ণ পরিচিত সফার শ্রীমন্ত গৃহ-রক্ষকরূপে
নিযুক্ত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় আসিলে, যখন
ছোটলাট জ্বালিডে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন প্রসঙ্গক্রমে
বীরসিংহের বাটীতে ডাকাইত পড়ার কথা উঠিল, ছোটলাট সমস্ত গুনিয়া
অবাক হইয়া বলিলেন, “আপনার বাটীতে ডাকাইত পড়িল, আর আপনি
তাহাদিগকে বাধা না দিয়া, পরিজনসহ পলাতন হইয়া পলায়ন করিলেন ?
এ শু ভয়ানক কাণ্ডকথা !” বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন :—“আপনারা
মজার লোক, প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলেন তাতে বলিলেন ‘কাণ্ডকথা’ আর ৩০।৫০
জন লোকের সম্মুখে একা প্রাণ দিলে, বলিতেন ‘তাইত লোকটা বড় আহাশুক,
এক লোকের সাম্মুনে একা এগুয়ে মিথ্যা মিথ্যা প্রাণটা দিল। আপনাদের
মনের মত কাজ করা কঠিন, এগুলোও দোষ, পেছুলেও দোষ।”

বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
কয়েকটা পাঠশালা উঠিয়া যায়, ঐ সকল পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ • উদ্বারের
অল্প নিত্যন্ত নিকৃষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আপনাদের বিপদের কথা
জানাইলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার শৈশবগুরুকে নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে

* ইকরতজ চট্টোপাধ্যায়, হরচন্দ্র আচাৰ্য, ঊষাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণ্ডুখণ্ড চট্টোপাধ্যায় ও
কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ।

নিরন্তরীণ বাগকণপকে বর্ণপরিচয় পড়াইবার অস্ত্র নিবৃত্ত করিলেন। অপর সকলের পূর্ণ উপার্জন অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অস্ত্র কোন কোন স্থানে কাজ কর্ত্তের সুবিধা করিয়া দিলেন, আর তাঁহাদিগকে উপক্রমণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া পকতত্ত্ব, রামায়ণ প্রভৃতি শিখাইবার ভার, সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিজ্ঞানতত্ত্বের উপর অর্পণ করিয়া বসিয়া দিলেন, এই সকল গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত হইলে, অধিক বেতনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিজ্ঞানগরে নিবৃত্ত করাইয়া দিলেন। *

যে কোন কারণেই হউক, লোক বিপদে পড়িয়াছে শুনিলে, অতি সহজেই তাঁহার সুকোমল হৃদয় বিবাদিত হইত। তাঁহার হৃদয়-কন্দর হইতে পর-হৃৎ-য-মোচন-বাসনার সুবিমল ধারা নিরন্তর কলস্রোতে প্রবাহিত হইত। বিপন্ন ব্যক্তি হস্ত প্রদারণ পূর্ব্বক করুণা-কণার প্রার্থী হইবামাত্র, সেই সুনির্ম্মল ধারায় প্রবাহিত মন্দাকিনীর প্রাণপ্রাণ স্নিগ্ধগরি পানে নীত হইতে পাঠিত। সেই সাধু প্রকৃতির অধীন হইয়াই গ্রামা গুরুমহাপ্রয়গণের বিপদের সংবাদ অবগত হইবামাত্র তাঁহাদের সুখ ও সুবিধা সাধন কবিয়াছিলেন।

একাদশতমী বৃহৎ পরিবাসে সর্বদা যে সকল অসুবিধা সংঘটনের সম্ভাবনা, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের পিতৃগৃহে সেরূপ অসুবিধার অভাব ছিল না; তবে ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সুবিবেচনায় সে সকল অসুবিধা কিয়ৎ-পরিমাণে নিষারিত হইত। বিশেষতঃ পিতামাতার জীবদ্দশায়, বিজ্ঞানাগর মহাশয়, সংসারের অস্ত্র অথব্যয়ের ভার পিতার উপর এবং গৃহে গৃহিণী-পনার ভার জননীর উপর দিয়া নিশ্চিত ছিলেন। কোন বিষয়ে তাঁহারা যেক্রপ ব্যবস্থা করিতেন, তাহাই অবনত মস্তকে মানিয়া চণিতেন। কিন্তু পিতামাতা উপদ্রুত 'জোঠ পুত্র'র অভিপ্রায় না বুঝিয়া, প্রায় কোন কাজ করিতেন না। পরস্পর পরস্পরের উপর এইরূপ নির্ভর করিলে, সংসারধর্ম্ম সর্বদাই সুকল ফলিয়া থাকে।

ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবী বীথলীবন লাভ করিয়া পরম সুখে সম্প্রত্য জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দুই জনে সবার সবারে বেশ মিষ্টকতা গোন্ধের 'মুটিনাটি' 'টুঙ্গোরামুরি' চণিত। ঠাকুরদাস একটু

কক প্রকৃতির দোক জ্বিলেন, আর ঠাকুরণী একটু সম্বরে কলহের পাখে পদার্পণ করিতেন। একত্র সময়ে সময়ে কর্তা গিন্নীতেও মনোমালিন্য ঘটত। তবে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। বিশেষতঃ গৃহিণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে, বনবটাপূর্ণ আড়ম্বরে তিনি বধন চারিদিক কল্পিত করিয়া একাকিনী গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া অভিমানের স্বভাব শয়ন করিতেন, তখন তাঁহার মানভঙ্গনের এক মহোৎসবের ব্যবস্থা-পত্র ঠাকুরদাসের পুটিনিতে থাকিত; তিনি প্রয়োজন মত সেই ঔষধ সংগ্রহ করিয়া প্রয়োগ করিবামাত্র মানভঙ্গন হইত। পাঠক! যেন মনে করেন না যে, বিভাগাগর মহাশয়ের প্রাণ পিতা ঠাকুরদাস, কৃন্দাবন বিহারী কাপা-চাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতেন। মানিনী ভগবতী দেবী—অভিमानে অক টানিয়া নিজের কুঠরীতে প্রবেশ করিলে, ঠাকুরদাস ঔষধ অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিতেন। যেমন পীড়া সেইরূপ ঔষধ চাইত; ঔষধ সংগ্রহ না করিয়া গৃহে ফিরিতেন না। সেই ঔষধ একবার মাত্র প্রয়োগ করিলে ঠাকুরদাসের মান ভঙ্গন হইত। ঠাকুরদাস দেখানে পাঠিতেন, এমটি সুরহৎ রোগীকে কি কাতলা মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। মাছটাকে আনিয়া গৃহিণীর মান-মন্দিরের দ্বারদেশে কিংবা নিকটবর্তী কোন স্থানে সজোরে আছাড় মারিয়া নিক্ষেপ করিতেন। মন্ত্র পাঠের শব্দ চুইতে না চুইতে, গৃহিণী অশ্রুমাচন করিতে করিতে দ্বার খুলিতেন এবং বটি ও ছাই লইয়া মাছের নিকে আগমন হইতেন। কর্তা মাছটী আছড়াইয়া ফেলিয়া গল্লীবে তাবে দণ্ডায়মান, গৃহিণী মন্ত্রের নিকট হইতে না হইতে, কর্তা বলিলেন, “খবরদার, মাছে হাত দিও না বলছি” গৃহিণী বলপূর্বক মাছ কুটিতে ঘাটতেন। কর্তা বাধা দিয়া বলিতেন, “আমার হুকুম না পোলে, আমার মাছে যে হাত দেবে, সে টেটুটী পাবে।” চ’লে জল, মুখে হাসি, ঠাকুরণী অকাতোত্তরে রণে আগমন হইতেন, আর ঠাকুরদাস, অশ্রুজলে—হাসির তরঙ্গলীলা দর্শনে মুগ্ধ মনে কণকাল অপেক্ষা করিয়া বিবরাস্তরে চলিয়া গাইতেন। নবীন বনুয়া অন্তরাল হইতে এই সুখের সম্মিলন সম্বর্ধনে কাতপূর্ণ আত্ম অবগুষ্ঠনে লুপ্তপ্রিত করিতেন। •

ভগবতী দেবী এক বিচিত্র উপাধানে গঠিত হইয়াছিলেন। পরিচয় কখনও

• শ্রীমত্ নারায়ণচন্দ্র বিহার্য্যের নিকট এই ঘটনাদি শুনা গেল। তিনি বলিয়াছেন, “ঠাকুরদাস বড় মাছ কুটিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। বড় মাছ পাইলে, কুটিতে, রাধিতে ও লোককে

কাতর হইতেন না। দিনে হটক, রাত্রিতে হটক, পরিশ্রমের পরিমাণ অল্পই হটক বা অধিক হটক, গৃহে পরিবারবর্গের সেবার্থে হটক বা অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্যাতেই হটক, কখনও বিষুধ ছিলেন না। দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলকে আহার করাইয়াও নিজে সহজে আহার করিতেন না, ঐরূপ অনশনে অপেক্ষা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন উপবাদী অতিথি কিংবা কোন দরিদ্র লোক একমুঠি ভাতের অল্প আসিয়া উপস্থিত হয়। অল্প ব্যঞ্জন লইয়া আহায়ে বসিতেছেন, এমন সময়ে কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই অল্প ব্যঞ্জনে তাহার সেবা করিয়া, হয় নিজে উপবাসে কাটাইতেন, না হয় বৃদ্ধিগের কেহ পুনরায় তাহার আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিয়া দিলে, তবে অপরাহ্নে আহার করিতেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে নিজের গৃহ-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেন, বাজারের ফেরত লোক দানাহার না করিয়া কেহ দ্বার অতিক্রম করে কি না। এক্ষণ লোককে যাইতে দেখিলে, ডাকিতেন, মান করিতে বলিতেন, মান করিলে পর একমুঠা ভাত খাইয়া, না হয় চারিটা অলপান লইয়া যাইতে বলিতেন। এক্ষণ পরদুঃখকাতরা ও পরসেবাপরায়ণা সমগ্র গৃহলক্ষ্মীরূপে যে গৃহে বিরাজ করিতেছেন, সে গৃহের প্রতি দেবতা প্রসন্ন হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? সত্য সত্যই এই স্নগ্ধিণীর জীবদশার ঠাকুরদাসের স্মৃৎস্বপ্ন পরিবার ভগবানের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভে পরম সুখে কাটাইরাছে।

তিনি যে কেবল পতি, পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, প্রভৃতি পরিজনবর্গের সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিংবা তিনি যে কেবল গৃহ-দ্বারে অপেক্ষা করিয়া দুঃখী জনের দুঃখ হরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন, তাহা নহে, পরের দুঃখ দূর করিবার অল্প ভাঁহার পাড়ার পাড়ার বেড়ান রোগ ছিল। সকল ধরের সংবাদ লইতে ও সকলের অভাব মোচন করিতে সর্বদাই উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার এই ধাতুটুকু ঈশ্বরচন্দ্রে যোগ আনাই পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে জননীর কথা উপস্থিত হইলেই মাতৃ-ভক্ত সন্তান বলিতেন :—“আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাত্তশের

খাত্তাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাই বড় বাহ গেলে তাঁহার হৃৎ, কষ্ট, রোগ, শোক, রাগ, ঘেব সুদূর মধ্যে সকলই তিরোহিত হইত।”

একাত্তর মাত্রও পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্ধান, ইহা (Glory) গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি।” •

ভগবতী দেবী বড় সরলহৃদয়া রমণী ছিলেন। লোকের হৃৎকষ্টের কথা শুনিয়া তিনি হির থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ বিপন্ন ব্যক্তি যদি দরিদ্র হইল, যদি কোন প্রকারে তুলিতে পাইতেন যে, কোন অসহায় পুরুষ বা স্ত্রীলোক সাহায্যভাবে ক্লেশ পাইতেছে, তাহা হইলে কখনও অমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনি নিরন্তর পরসেবাতেই সমরাস্তিত্য কবিতেন। বীরশিংহ গ্রামের অনেক দরিদ্র লোক এখনও সাক্ষ্য দিতেছে যে, তিনি নিবারায়ী জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের বাড়ীতে, পীড়িত লোকদের পথের ব্যবস্থা করিতে, তাহাদিগকে ঔষধ খাওয়াইতে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন; অনেক সময়ে তাহাকে সন্ধান করিতে গিয়া দেখা যাইত যে, তিনি কোন অশুভ জাতির ঘরে বসিয়া সে বাড়ীর রোগীর পথের বা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, অনেক সময়ে সাপ ও মিছরি সঙ্গে থাকিত, তাহাদের রাখিবার লোক না থাকিত, নিজে বাড়ী আসিয়া তাহাদের অস্ত্র পথা রাখিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে অতিদীর্ঘ অভ্যাগত ও দরিদ্রের সেবা করিতেই তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত।

একবার বাড়ীর অস্ত্র বিভ্রাসাগর মহাশয় ছয়খানি লেপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। বিভ্রাসাগর মহাশয়ের জননী লেপ করখানি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। জননীর নিজের ব্যবহারের অস্ত্র এবং বাটীর অস্ত্র কাহারও কাহারও অস্ত্র সেগুলি আসিয়াছিল। প্রতিবেশিগণের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন, তাহারা শীতে বড় ক্লেশ পাইতেছে—এমন শক্তি নাই যে, শীত নিবারণের উপযোগী বস্ত্রাদি ক্রয় করে। সেট জননীস্বামী গৃহিণী সেই দরিদ্র গৃহস্থকে একখানি লেপ দিয়া, অবশিষ্ট করখানিও শেষে এইরূপে নিত্য অসচ্ছন্দ ও শীতক্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া বিভ্রাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন :—“ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপ করখানি শীতে বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের অস্ত্র লেপ পাঠাইয়া দিবে।”

• এইটা তাহার নিজের উক্তি। যা ও হেলে, ১৪ ভাগ, ৭৭ পৃষ্ঠা।

তদন্তরে পুত্র জননীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “ঐরূপ ভাবাপন্ন লোক-
দিগকে ও বাড়ীর লোকদিগকে দিয়া তোমার নিজের জন্ত একখানি লেপ
রাখিতে হইলে, সর্বদমেত করখানি লেপ পাঠাইব লিখিবে। তোমার পত্র
পাঠিলে আবশ্যকমত লেপ পাঠাইব।” ভগবতী দেবীর হৃদয়-পুষ্পোদ্ভানে দয়া-
শীলতা ও পরতঃপকাস্তরতার ঐরূপ কত বে মল্লিকা, মালতী, সুশ্রী, গন্ধরাজ
প্রমুখিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না এবং তাহার বহু বিকৃত উল্লেখের
স্থানসম্বলনও সম্ভবপর নহে।

হারিসন সাহেব যখন ইনকমট্যাক্সের কার্যভার প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর
জেলায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি একবার বীরসিংহ ও
তল্লিকটবর্তী গ্রাম সকল পরিদর্শন করিতে গমন করেন। বিজ্ঞানাগর
মহাশয় সে সময়ে বাটীতে ছিলেন। মায়ের নিকট অন্তরঙ্গ সিঁড়ি-
লিগান হারিসন সাহেবের আগমন সংবাদ দিবারাত্র জননী বলিলেন,
“তা ছেলেটিকে একবার আগমনের বাড়ীতে আনিবি না? তাকে একবার
আমাদের বাড়ীতে আনিয়া কিছু খাওয়াইলে ভাল হইত।” বিজ্ঞানাগর
মহাশয় হারিসন সাহেবকে জননীর অতিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। সাহেব
বলিলেন :—“তিনি নিজে নিমন্ত্রণ না করিলে আমি যাইব না।” তদনুসারে
বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের জননী স্বনামে বে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই
পত্রখানি এখানে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীশ্রীহরি:—

শরণ

অশেষশুণ্যশ্রয়

শ্রীমুখ ৮৮ এন্ড হেবিসন মহোদয়

পরম কল্যাণভাজনেষু

সম্মেহসম্ভাবণমাবেদনমিহম্

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঐশ্বরচন্দ্রের নিকট শুনিলাম, আপনি সন্ধ্যা কলিকাতা
প্রতিগমন করিবেন। আমার নিত্য মানন, দয়া করিয়া তৎপূর্বে একবার
বীরসিংহের বাড়ীতে আগমন করেন, তাহা হইলে আমি দার পর নাই

আহ্লাদিত হই। *প্রার্থনা এই, আমার বাসনা পরিপূরণে বিমুখ হইবেন না ।
ইতি ২ ফাল্গুন ১২৭৫ সাল ।

গুভাকাক্ষিণ্যাঃ

(স্বাক্ষর) শ্রী ভগবতী দেব্যাঃ ।

সাহেবের আব্দার পূর্ণ হইলে পর, সাহেব নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন । সাহেব বাঁকালা বুঝিতে পারেন শুনিয়া, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের জননী বড়ই আহ্লাদিত হইলেন । নিম্ন হস্তে পকাশ বাল্লন ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া সাহেবকে খাওয়াইতে বসিলেন । সাহেব আসিয়া এদেশীয় প্রথা অনুসারে ভূমিতে আরু পাতিয়া নত মস্তকে প্রণাম করিলেন । ভগবতীদেবীও পুণ্যবাৎসল্য সহকারে আশীর্বাদ করিয়া এক এক করিয়া ঘেটীর পর ঘেটী খাইতে হয়, তা নিজে নিকটে বসিয়া দেখাইয়া দিতে লগিলেন । হারিসন সাহেব বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মায়ের এই উদারতা, প্রেমময়তা ও ভাগবান্নার মুগ্ধ হইয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে বলিলেন :—“আমি আপনার ঘাটিতে আসিয়া, এখানে আহার করিয়া, সন্ধ্যাপরি আপনার মায়ের করুণ স্বভাব ও আদর যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি, চিরদিন এ স্মৃতি আমাব মন প্রাণ অপিকার করিয়া থাকিবে ।”

প্রসঙ্গক্রমে হারিসন সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কত টাকা ?” ভগবতী দেবী কমলীভতার সগজ আপদে মুগ্ধকমল আঁতুত করিয়া মধুমিষ্ট স্বরে বলিলেন :—“কেন, আমার চার ঘড়া ধন ।” ঈশ্বরচন্দ্রকে ও সারি সারি দণ্ডারমান অপর তিনটী পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন, “আমার এষ্ট চারি ঘড়া ধন ।” হারিসন সাহেব ভগবতী দেবীর এষ্ট সট্ঠভব শুনিয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিলেন :—“ইনি সামান্য স্ত্রীলোক নহেন । এমন যা না হ'লে কি এমন ছেলে হয় ?” আমরাও ব্রিটিশ একরূপ উপকরণে গঠিত না হইলে কি একরূপ পুত্ররূপ লাভ ব্যতীত তার ভাগ্যে ঘটে ?

বীরসিংহ অকলে এক প্রকার মেটে মোতালা ঘর প্রস্তুত হইয়া থাকে । অনেককে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই স্তম্ভিকানিহিত গৃহ সকলের মোতা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন । বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বহু পরিবারের স্থান সমুদান হওয়ার উপযোগী বৃহৎ বাড়ীর মধ্যেই একরূপ একখানি সর্বদা সুন্দর

গৃহ ছিল। হারিসন সাহেব গৃহনির্মাণের পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, “পাকা বাড়ী এর কাছে হা’র মানিরাছে।” *

আহার করাইয়া শেষে বিভাগাগর মহাশয়ের জননী সাহেবকে বলিলেন, “দেখ বাছা! তুমি যে কাজ লইয়া আসিয়াছ—এ বড় কঠিন কাজ, খুব সাবধান হইয়া এ কাজ করিবে, যেন গরীব চুখী লোক প্রাণে মারি না যায়, তাহার। যেন তোমারে আপনার লোক মনে করিয়া জুখী হইতে পারে। তুমি সর্ব্বদা সকলের কথা ভাল করিয়া শুনিবে—লোকের চুখ কষ্ট দূর করিতে আগপণে চেষ্টা করিবে, তুমি এমন ভাবে এখানে কাজ করিয়া যাইবে, যে তুমি চলিয়া গেলে এখানকার লোক চিরদিন যেন তোমার নাম করে। তুমি বাহাতে চুখীর বন্ধ হইয়া এখান হইতে যাইতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।”

হারিসন সাহেব মেদিনীপুরে অবস্থান কালে বিভাগাগর মহাশয়ের মারের উপদেশ মত চলিতে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাই আজও মেদিনীপুরের লোক ভক্তিসহকারে তাঁহার নাম কবিয়া থাকে।

বিভাগাগর মহাশয়ের জননীর শাস্তমুষ্টি লাভণ্যে ঢল ঢল করিত। আমরা পাঠকপাঠকগণের নরনৈব দৃষ্টি বিধানার্থে সেই দেবীমূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি এখানে প্রদান করিলাম। সেই চিত্র অঙ্কনের একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। পাইকপাড়া রাজবাটিতে হড্‌সন নামে একজন সাহেব চিত্রকর রাজবাটির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। বিভাগাগর মহাশয়ের সর্ব্বদাই সেখানে গতিবিধি ছিল। রাজারা তাঁহাকে গুরুদেবের স্তায় ভক্তি করিতেন। বিভাগাগর মহাশয়ের সে কালের মূর্ত্তি যে কত সুন্দর ও জনন মুগ্ধকর ছিল, তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সে সময়ের প্রতিভার উদ্যাদিত মুখের প্রতিচ্ছবি লইবার জন্ত হড্‌সন সাহেব বড়ই সাধ্য সাধনা করেন। তিনি প্রথমতঃ সন্দেহ হন নাই, পরিশেষে সাহেবের অত্যধিক পীড়াপীড়িতে ব্যাধ হইয়া সম্মত হন, সেই চিত্রের প্রতিচ্ছবি পূর্বে প্রেরিত হইয়াছে। হড্‌সন সাহেব চিত্র প্রেরিত করিয়া পারিশ্রমিক কিছুই লইতে সম্মত হন নাই। বিভাগাগর মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও সাহেবকে টাকা লওয়াইতে পারেন নাই।

* আমরা বীরসিংহ হইতে এককল বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।



ଜନନୀ ଭଗବତୀ ଡେବୀ ।

রাজার বিদ্যালয়গর মহাশয়ের চিত্র দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া সাহেবকে বিজ্ঞাসা করেন যে, “আমরা এত অর্থ ব্যয় করিলাম কিন্তু বিনাব্যয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে আমাদের অপেক্ষার উৎকৃষ্টতর ছবি তুলিয়া দিলে কেন ?” সাহেব রাজাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, “টাকার কাজে আর সুখের কাজে অনেক প্রভেদ ।” বিদ্যালয়গর মহাশয় জেগিলেন সাহেবকে টাকা লগয়ান বড়ই কঠিন । লোকটা কিছু শক্ত লোক । তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বয়ং পিতা মাতাকে কলিকাতায় আনাষ্টলেন এবং হুঙ্গুন সাহেবকে দিয়া বহু অর্থব্যয়ে তাঁহাদের ছই জনের ছই খানি প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করাইয়া লইলেন ।

পিতামাতাকে কলিকাতায় আনাইয়া জননীকে বলিলেন :—“মা, পাটকপাড়া রাজাদের বাড়ীতে একজন খুব ভাল প’টো এসেছে, তাহার দ্বারায় তোমার একখানি ছবি তুলাইয়া লইতে চাই ।”

মা । হুব, আমাব আবার ছবি কি হবে, ছি—ছি ।

ঈ । ছবি কি তোমার অস্ত্র ? ছবি আমার অস্ত্র, একখানা ছবি থাকিলে, যখন যেখানে থাকি, প্রাণটা কেমন ক’র’ল একবার দেখবো ।

মা । (একথাও আর জবাব নাই দেখিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও) তবে তোর যা ইচ্ছা তাই কর ।

ঈ । সাহেবকে এখানে আনবো, না তুমি আমার সঙ্গে সেখানে যেতে পারবে ?

মা । প’টো সাহেব । না বাপু আমি সাহেবের সাম্নে ছবি ভোগাতে বসতে পারবো না ।

ঈ । সে খুব ভাল লোক, আমার একখানা ছবি এঁকেছে, তার দাম নেরনি, আমাকে খুব ভালবাসে, তার সামনে বসতে দোষ নাই ।

মা । তা তোর যা ইচ্ছা কর, তবে আমি অস্ত্র কৌশলও যেতে পারবো না বাবা, যা করবি এখানে এনে কর ।

ঈ । সেখানে সব যোগাড় আছে । সে আড্ডা তামিরা এখানে আনতে গেলে, হয়ত ছবি ভাল হবে না ।

মা । তুই যখন থরছিল, তাকে এঁটে উঠতে পারবো না । তা তোর যা ইচ্ছা করবে, গেলেও তোর সঙ্গে যাব ত । নিজে হ’লে লোকে ত আর আমায়

নিশ্চয় করবে না, তোরই নিশ্চয় করবে। বলবে বিজ্ঞানাগর মাঝে পাঁকপাড়া রাজবাড়ীতে ছবি তুলাইতে নিয়ে গিয়েছে। তা তোর সঙ্গে যাব। *

কয়েক দিন যাতায়াত করিয়া পিতা মাতার ছবি প্রস্তুত করাইলেন, প্রাণ্য অশ্রু স্নান সাহেবকে কিছু বেশীই দিলেন। ছবি দুখানি প্রস্তুত করাইয়া নিজের গৃহে পছন্দ মত স্থানে বসাইলেন। ফরাশডাঙ্গা ও খরমাটাড়ের জন্ত স্বতন্ত্র ছবি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পিতা মাতার জীবদ্দশায় ও তাঁহাদের লোকান্তর গমনের পর যখন যেখানে থাকিতেন, আমরণ পিতা মাতার মূর্তি সমক্ষে প্রণত হইয়া তবে জল গ্রহণ করিতেন। আমরা স্বচক্ষে তাঁহার একরূপ আচরণ দেখিয়াছি এবং ইহার সাক্ষ্য দিতেছি।

এই প্রবীণা চতুর্থী মূর্তিপূজার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। বিজ্ঞানাগর মহাশয় আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন :—“আমার মা বলিতেন, যে দেবতা আমি নিজ হাতে গড়িলাম, সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন করে? বাশ, খড়, নড়ি মাটিতে ঠাকুর গড়ে পূজা ক’বে কি ধর্ম হয়?” + ইহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার ধর্মজ্ঞান, কেমন স্বাভাবিক, কত সরল ও নির্মূল ছিল!

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্রকে ও জ্যেষ্ঠ পৌত্র নারায়ণচন্দ্রকে অত্যন্ত ভাগ বাসিতেন। এত ভাগ বাসিতেন যে, তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাত্র বলিয়া ইহা বা কতকটা অন্তের শাসনের অতীত ছিলেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় একবার পিতাকে বলিলেন :—“আপনি না নিরামিহাণী? আপনাকে কে নিরামিহাণী বলে? আপনি চুটীবেলা ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাইতোছেন। তবুও আপনি নিরামিহাণী!” কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ পৌত্র উভয়েই বালাকালে ঠাকুরদাসের বিশেষ ভাবে চিহ্নিত সৈন্ত ছিলেন।

এই ভাবে যখন দীর্ঘকাল ধরিয়া সংসারের দিন গুলি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিতেছিল, সেই সময়ে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশ, জন্মভূমি ও স্বভবন ত্যাগ করিয়া কালী বাসের মানস করিলেন, এবং শঙ্কুচক্রের দ্বারা

* আমরা বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সুখে এই বিষয়টী শুনিয়াছিলাম।

+ এই কথা বলার বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের আত্মতর্পণের কেহ কেহ আমার উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহার নিজ মুখে ইহা শুনিয়াছি। তবুও স্নেহভাজন শ্রীমত নোপাধ্যায় সুখোপাধ্যায়ও (নারায়ণ বাবুর শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠা) এই ভাবের কথা তাঁহাকে বলিতে ওনিরাছেন।



শ্রীমৎস্বামীজী মহাশয় —

জৈবরস্ক্রের নিকট নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময় তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পীড়া নিবন্ধন মূর্খিদাবাদের সন্নিকটস্থ কালী গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। তৃতীয় মহোদয় নব্বুজের পত্রের দ্বারা পিতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিতান্ত ভয় ও বিষম মনে, অতি অকুল ভাবে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এই :—

“তিনি বিদেশে একাকী অবস্থিতি করিবেন তাহা কোন ক্রমেই পরামর্শমিচ্ছ নহে। স্বয়ং সমুদায় আহরণ করিয়া আপনায় আশ্রয়ানি নির্মাণ করিবেন, তাহাতে কষ্টের একশেষ হইবেক। যে ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি এত পরিবার, তিনি শেষ বয়সে একাকী বিদেশে কাগ হরণ করিবেন, ইহা আপনকা হৃৎখ ও আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে? সুতরাং এ অবস্থায় তিনি একাকী কালীতে বাস করিবেন, ইহা আমি কোন মতে সহ্য করিতে পারিব না। সে রূপ করিলে তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না। যদি তাঁহার সেবা ২৫ পরিচর্য্যায় নিম্নিত্ত কেহ কেহ সঙ্গ যাইতে পাবেন, তাহা হইলেও আমি কণকিঃ সম্মত হইতে পারি, নতুবা তাঁহাকে একাকী পাঠাইয়া দিয়া আমরা এখান নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে কাগ বাপন করিব, ইহা কোন ক্রমেই ধর্ম্ম নহে। আশ্রয় কণা বলিতে পারি না, আমি কোন মতে আমায় মনকে সঙ্গবাদ দিতে পারিব না। যদি নিতান্তই তাঁহার যাইবার মানস হইয়া থাকে, এতরূপ তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না। তুমি তাঁহার চরণাবরিন্দে আমার প্রণিপাত, জানাইয়া কহিবে, যে পাছে আমার মনে হৃৎখ হয়, এই ভাবিত্তর তিনি অশংক্যকার অনেক কষ্ট সহ্য কবিয়াছেন, এক্ষণেও সেই খল্লিষ্ঠার আব কিছু সহ্য করুন; আমি সম্বর বাড়ী যাইবার চেষ্টায় রহিলাম। সেখানে পৌছিলে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির করিব নতুবা অকস্মাৎ একরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রমে এক উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করিয়া কালী বাস করিলে, আমি মর্মান্বিতিক বেদনা পাইব। যাহা হউক যেক্রমে পার আপাততঃ তাঁহার এ অভিপ্রায় রহিত করিবে এবং তিনি আপাততঃ ক্ষান্ত হইলেন এই সংবাদ সম্বর কালীতে আবার নিকট পাঠাইবে, বাবৎ এ সংবাদ না পাই তাবৎ আমার হৃৎখানা দুঃ হইবে না। ২৪ দিন কোন মতে এখান হইতে যাইতে পারিব না, নতুবা

অল্প আশি প্রদান করিতাম, বাহা হউক বেক্সে পার তাঁহাকে কোন যত্ন কান্ত করিবে, নিতান্ত কান্ত না হন, এই রবিবার বাড়ী হইতে আসিতে না দিয়া, আমাকে সংবাদ লিখিলে, আমি বেক্সে পারি বাটী যাইব। আমি কারিক ভাল আছি, ইতি তারিখ ৩০এ অগ্রহায়ণ ।

শুভাকাঙ্ক্ষণঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মাণঃ ।

শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেন যে, পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কান্দিবাসের প্রবল বাসনার মূলে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন বিশেষরূপে কার্য্য করিয়াছিল। একদিন ঠাকুরদাস রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন যে, অতি দূরায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নানা প্রকার বিপৎপাত হইবে। বীরসিংহের বাটী শ্মশান হইবে। ঈশ্বরচন্দ্রের সহোদরবিচ্ছেদ ও বন্ধুবিরোধ ঘটবে। আত্মীয় শ্বশুর বিরূপ হইবে। এই সকল মানিকর চিন্তার মধ্যে পড়িয়া ঠাকুরদাস ভাবিলেন, চারি দিক সুগ্রসন্ন থাকিতে থাকিতে গৃহ ত্যাগ করিয়া দেবধাম কান্দিক্ষেত্রে জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তিনি দূরায় গৃহত্যাগ করিয়া কান্দি যাইবার অল্প ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই অল্প বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টা, অনেক সাধ্য সাধনা, বিস্তর কান্নাকাটী করিয়াও পিতার সঙ্কল্পের বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার রচিত বোধোদয়ে লিখিয়াছেন, “স্বপ্ন সকল সত্য নহে, অমূলক চিন্তা মাত্র।” কিন্তু তাঁহার পিতৃদেবের স্বপ্ন দর্শন কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃত ঘটনার সঙ্গিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পৈতৃক বাসভবন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আত্মীয় ও বন্ধু বিচ্ছেদের ত কথাই ছিল না।

এই পত্র প্রাপ্তি ও উহার সমগ্র অংশ পিতাকে শুনান হইলেও তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া কান্দিবাসের অল্প পূর্ব্ববৎ উৎসুক হইয়া রহিলেন। সুতরাং কান্দিতে দূরায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কর্তার মনের ব্যগ্রতার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পত্র লেখা হইল। তিনিও সর্ব্ব কষ্ট পরিত্যাগ করিয়া পিতার চরণ দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন। কতক পাহীতে ও কতক পন্থারূপে এইরূপে অকাতর পরিভ্রমে সমগ্র পথ অতিক্রম করিয়া গৃহে পৌঁছিলেন। পিতার সঙ্কল্প ত্যাগ করাইতে বিধিযত চেষ্টা করিলেন, অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন,

কান্না কাটাও করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পিতার প্রতিজ্ঞার বিপর্যয় ঘটিল না ; অবশেষে নিরুপায় হইয়া ঠাকুরদাসের পরম শ্রিয়পাত্র পৌত্র নারায়ণচন্দ্রকে লাগাইয়া দিলেন ; নারায়ণচন্দ্রের কান্নাকাটি ও সঙ্গে বাওয়ার আবেদনেও চুকের বিবম পণ ভাঙ্গিল না ।

ঠাকুরদাস গৃহে অবস্থান করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কলিকাতা যাত্রা করিলেন ; অগত্যা বিদ্যালাগর মহাশয় পিতাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার আশ্রয়লেন । পথে এবং কলিকাতার অবস্থানকালেও অনেক অসুস্থতা করিলেন কিন্তু কোন মতেই যখন পিতার অতিশ্রম পরিবর্তিত হইল না, তখন সুখে স্বচ্ছন্দে কালীবাসের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা পাঠান হইল । ঠাকুরদাস জীবনের অবশিষ্টকাল পরম সুখে কলিকাতা অবস্থান পূর্বক শেষে বারাগঙ্গী ধামেই দেহত্যাগ করেন । পিতাকে কলিকাতা পাঠানর পর হইতে বিদ্যালাগর মহাশয়ের মনে একটা স্থায়ী বিষাদের রেখা-পাত হয় । তিনি সর্বদাই বিষম ভাবে সমস্যাতিপাত করিতেন । অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সে পিতার দূর দেশে অবস্থান নিবন্ধন একাকী অল্পশ্রম অল্প বিশ্রাম করিতেন । কোন প্রকার অসুবিধা কিংবা পীড়ার সন্দেহ তাঁহার মনে উদয় হইলেই, হয় নিজেকে ঘাটতেন, না হয়, তাঁহার সাহায্যার্থ কাহারো পাঠাইয়া দিতেন । কোন দিন কোনও কারণে এক মুহূর্তের জন্য পিতামাতার মুখ সাধনে উদাসীন হন নাট ।

বীরসিংহে অবস্থানকালে ঠাকুরদাসের জননী চুগান্দেবীর লোকান্তরপ্রাপ্তি হয় । মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে সালিধায় গঙ্গাতীরে আনা হয় । বিদ্যালাগর মহাশয় পিতামহীর আকৃত্য উপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শ্রীমতীর সন্মোহ সম্পাদন করেন । বিদ্যালাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের প্রবর্তক বলিয়া পিতামহীর প্রাক্কলিতানে পাছে কোন ব্যাঘাত হয়, এজন্য সেটিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ছিলেন, সেজন্য আশঙ্কার কারণও ছিল । অনেক শত্রুতাও করিয়াছিলেন, কিন্তু শত্রুত্রে বিদ্যারত্ন লিপিয়াছেন, “প্রাচ্যের নিবস অনেক অধ্যাপক তট্টাচারের সমাধায় হইরাছিল, বরদা পরগণার গ্রাম সমস্ত ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব বহুবাহুব অনুমান তিন সহস্র ব্রাহ্মণ কলাহার করেন এক পর বিবস অয়েও গ্রাম হই সহস্র

ঈশ্বর নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিকট এই ঘটনায় ভাবিয়া ।

ব্রাহ্মণ ভোজন করেন। ইহাতে পিতৃসেব পরম আত্মাদিষ্ট হইয়াছিলেন। পর-
বৎসর সপ্তপুত্র সময়ও দাদা পিতৃসেবকে সম্বলিত করিবার অল্প বয়সেই টাকা-
দিয়াছিলেন। অধ্যাপকগণের নিমন্ত্রণার্থ প্রথম যে কবিতাটি প্রস্তুত হয়, তাহা
দুর্লভা দেখিয়া স্বয়ং এই সরল কবিতাটি নিমিয়া দেন—

“পেবন্ত পঞ্চবিংশাহে রবৌ মাতুঃ সপ্তপুত্রঃ

কুপয়া সাধ্যতাং ধীরবীরসিংহসমাগতৈঃ ॥” *

বহুপরিবারের একত্র বাস নিত্য অস্বীতিকর ও অশান্তিজনক বিবেচনা
করিয়া তিনি সহোদরদের সকলের পৃথক পৃথক গৃহ নির্মাণের বন্দোবস্ত করেন।
সকলে একত্র মারামারি কাটাকাটি না করিয়া পৃথক পৃথক বাস করিয়া
পরস্পরের প্রতি আদ্রীয়তা ও সমবেদনা রক্ষা করিয়া চলা অশেষ ভ্রমে মঙ্গলকর
মনে করিতেন, তাই অশান্তির স্থানে শান্তি স্থাপনের অভিলাষী হইয়া
সকলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দরিদ্র ও অসহায় বিদ্যার্থী বালক-
গণের অল্প স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বহু
অর্থ ব্যয় করিয়াও তিনি কিছুতেই পারিবারিক শান্তি স্থাপনে সফলমনোরথ
হইতে পারেন নাই।

এইরূপে পারিবারিক বিবিধ অশান্তির মধ্যে যখন তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা
বিনষ্ট হইতেছিল, সেই সময়ে ১৮৬২ খৃঃ। ১২৭৫ সালের চৈত্র মাসের রাশি
বিগ্রহের সময় অগ্নি লাগিয়া বীরসিংহের পৈতৃক বাস ভবন ভস্মীভূত হয়।
সেই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ বলিকাতার পৌছিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহ
গমন করেন। সকলের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া জননীকে সঙ্গে লইয়া
বলিকাতার আশিতে চাহিলেন। প্রবীণা গৃহিণী দরিদ্র, নিরাশ্রয়, বিদ্যার্থী
বালকগণের বিপদ ও ক্লেশের উল্লেখ করিয়া প্রতিবেশীদের দ্বারা কষ্টের
দোহাই দিয়া, অতিশয় অত্যাগতের পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া
বলিকাতার আশিতে অসদ্বৃতি প্রকাশ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সর্বদা
তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের সুখ চিন্তা করিতেন। তাঁহার
জীবদ্দশায় সহোদরদিগের কাহাকেও পরিজনসহ কোন দিন ক্লেশ পাইতে

হয় নাই, কিন্তু সহোদরেরা যে তাঁহার প্রতি সর্বদা সমুচিত ভ্রাতৃত্বাধার ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না ; বিভাগাগর মহাশয়ের মধ্যম সহোদর ৬ দীনবন্ধু ভ্রাতরত্ন মহাশয় একবার বিভাগাগর মহাশয়ের নামে এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন। কনিকাতার প্রতিষ্ঠিত সংযুক্ত বয় ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ের অংশেব প্রার্থী হইয়া আদালতে অগ্রসর হন। বলপূর্ব্বক কিংবা অজ্ঞার করিয়া কেহ তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণ করিবে, ইহা^১ বিদ্যাাগর কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। মকদ্দমা করা যখন স্থির হইল, তখন আদালতে না গিয়া শানিসী দ্বারা নিশ্চিন্তির অস্ত্র কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন, তদনুসারে দীনবন্ধু ভ্রাতরত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাাগর উভয়ে একটাকা মূল্যের একখানি টাম্প কাগজে একরার পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। এই একরার পরে মাননীয় অজ্ঞ দায়কানাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস মহাশয়কে শানিসী মাত্র করিয়া তাহাদিগের উপর সমগ্র বিচারভার অর্পণ করিলেন। মকদ্দমার বিচারের ফল নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা পত্রের কিয়দংশ :—তিনি (বিদ্যাাগর মহাশয়) দুই শত টাকা কর্জ করিয়া আনিয়া দেন, সেই দুই শত টাকা অবলম্বন করিয়া পুঁজতন অক্ষর ও একটা অকর্ণ্মা কাগরের প্রেস ক্রয় করিয়া ৬মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও আমি উভয়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালাবধি বেলা নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত, অপরাহ্ন পঁচোটের পৰ্য্যন্ত রাতি নয় দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ছাপাখানার কার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলাম।

(স্বাক্ষর) শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ।

দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবানবন্দিব কিয়দংশ :—

১। যে ২০০ শত টাকা কর্জ করিয়া ছাপাখানা করা হয়, তাহা পরিশোধের দায় কাগর ছিল, বলিতে পারি না। তৎসম্বন্ধ তৎকালে কোন কথোপকথন হয় নাই এবং সে প্রশ্ন আমার মনেও উদয় হয় নাই।

২। ঐ ২০০ টাকা পরিশোধ করিবার দায়ীক থাকিবার, কি না থাকিবার ভাব তৎকালে আমার মনেও উদয় হয় নাই।

৩। যখন অগ্রজ মহাশয় ঐ টাকা কর্জ করিয়া আনিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহার ব্যবস্তা মহাজনের নিকট দায়ীক থাকা আমার বিশ্বাস ছিল।

৩৪। * * সমান্ত সামান্ত ব্যর তিনি করিতেন আমার সহিত পরামর্শ করিয়া হইত না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণনা পত্রের কিয়দংশ—* * ঐ বস্ত্রের সহিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কখন কোন সংস্রব নাই। তিনি কহিতেছেন সংস্কৃত যন্ত্রের সংস্থাপনে ও উন্নতি সাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এজন্য উহাতে তাঁহার অংশ আছে, কিন্তু আমি তাঁহাকে কখনও উক্তরূপ পরিশ্রম করিতে বলি নাই ও দেখি নাই। * * ইতি ২৫ আশ্বিন ১২৭৫ সাল

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাক্ষী বাবু শ্রীমাচরণ দে :—* * “বাদীর (দীনবন্ধু) স্বত্ব থাকা জানি না ও বাদীকে ছাপাখানায় পবিত্র্য কবিত্তে দেখি নাই ও শুনি নাই। বাদী আমার নিকট যাতায়াত করিতেন, কখনও ছাপাখানায় পরিশ্রম করা বলেন নাই।

(স্বাক্ষর) শ্রীশ্রীমাচরণ দে।

সাক্ষী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যাবতী :—“বাদীকে কখন পরিশ্রম করিতে দেখি নাই এবং বাদীর অংশ থাকা বাদী কি প্রতিবাদী, কি তর্কালঙ্কারের মুখে শুনি নাই।

(স্বাক্ষর) শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যাবতী।

মহামহিম শ্রীযুক্ত অনারেব’ল দ্বারকানাথ মিত্র

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়েষু।

শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবীত্যাগ পত্র :—গত ১১ই অক্টোবর আপনাদিগের নিকট একবার, বর্ণনাপত্র ও ইসবনবীসির দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলাম কিন্তু নামান্ত্র বিষয়ের নিমিত্ত সহোদরে সহোদরে বিরোধ করা নিত্যন্ত ক্লান্তিকর কার্য্য বিবেচনা করিয়া শিথিল্য দিতেছি যে, সংস্কৃত যন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ে আমার স্বত্ব ও অংশ থাকার যে দাবী করিয়াছিলাম আমি সে দাবী পরিত্যাগ করিলাম। উক্তর কালে উক্ত সংস্কৃত যন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ে আমি বা আমার ওয়ারিসন কেহ কখনও কিছু মাত্র দাবী করি বা করে সে বাতিল ও নামজুর। ১৭ই অক্টোবর ১৮৬৮।

(স্বাক্ষর) শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিচার :—* * বাদী “সংস্কৃত বস্ত্রে ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকাদিতে তাঁহার স্বক
ও অংশ থাকার দাবী পরিত্যাগ করিলেন। উত্তর কালে তিনি বা তাঁহার
ওরারিগন কখন কিছুমাত্র দাবী করিলে তাহা বাতিল ও নামজুর হইবেক।”
ইত্যাদি বিবরণে দস্তবরদারী দাখিল করার আর অধিক উদ্বৃত্ত করা অনাবশ্যক
হওয়ার উত্তর পক্ষের সাক্ষাতে

চূড়ান্ত আজ্ঞা হইল যে : -

বাদীর দাবী ডিসমিস্ হইল এবং উত্তর পক্ষকে এই ফরজালার এক এক
খণ্ড নকল দেওয়া যায়। ইতি ১৮ই অক্টোবর ১৮৬৮।

(Sd) DWARKA NATH MITTRA

(=d) DOORCA MOHAN DASS.

এই ঘটনাতে দীনবন্ধু জ্ঞানরত্ন বিফলচেষ্টে হইয়া কিছুকাল সহোদরের
সাহায্য গ্রহণ স্থগিত রাখেন, কিন্তু বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের নিজের মুখে তিনিরাতি
যে তিনি গোপনে মধ্যম ব্রাহ্মণের অঞ্চলে সংসাব থরচেব টাকা বাধিয়া দিয়া
বলিয়া দিতেন :—“মা—এই নাও, দীনোকে বলোনা, আমি আমি তোমাদের
ক্লেশ হইতেছে, এই টাকার সংসাব থরচ চালাইবে।” দীনবন্ধু জ্ঞানরত্ন গোপনে
এইরূপ সাহায্য গ্রহণের বিষয় অবগত হইয়া ঐ টাকা বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে
ফেরত দেওয়াইরাছিলেন। *

* দীনবন্ধু সম্পর্কে বিবৃত বিষয়ে—শব্দচন্দ্রে ও আঘাতে বিশেষ মত বেধ দা থাকিলেও
কি কল্প জানি না, তিনি সাধারণ সমীপে আহার অনাতিজ্ঞতা পাঠ্যবাহুজ্ঞ তাঁহার সমালোচনা
পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠার লিখিতোক্তন :—“অসাধারণ বীণাভি সম্পন্ন পণ্ডিতমহাশয় দীনবন্ধু জ্ঞানরত্ন
মহাশয়ের বর্ষা একজন বেশহুঁটেব বিদ্যাংসাহী পণ্ডিতমহাশয় ও অসাধারণ লোক ছিলেন।”
আমি শু কই তাঁহার এই সকল গুণ পৌরব অপরূপের প্রকাশ পাই নাই, বরং সংস্কৃত
জীবনচরিতের ১ম সংস্করণের ৩১ পৃষ্ঠার বর্ণনা লিখিতোক্তন :—“তিনিও (দীনবন্ধু) বিদ্যাশাসন
মহাশয়ের জ্ঞান পরোপকারপটায় ছিলেন। * * কলেরা প্রকৃতি বেশবাসী সাংসদক পীড়ার
মধ্যে দীনবন্ধুও পাড়ার পাড়ার গ্রামে গ্রামে লোকের সেবা করিয়া বেড়াইতেন। এই সকল
গুণের জন্য বিদ্যাশাসন মহাশয় তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।” কিন্তু শব্দচন্দ্রে নিজে ১৮৬৮
খ্রীষ্টাব্দে পূর্বোক্ত বক্তব্য রচনা ইহবার পূর্বে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাশাসন মহাশয়কে এক

এই সকল ঘটনার বহু পূর্বে দীনবন্ধু ভায়রর ডেপুটী মেজেষ্ট্রেটী কর্তৃক অস্ত্র চোর্থকে অস্বরোধ করেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় 'নিজের সহোদরের চাকুরীর অস্ত্র কেনন করিয়া ছোটলাটকে বলিবেন, তাই ভাবিয়াই অস্থির। ২৪ বার বলিবার মানস করিয়াও বলিতে পারিলেন না, শেষে সহোদরের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া একদিন ছোটলাটকে বলিলেন, “একটা কথা কয়দিন ধরিয়া বলিব মনে করি, তা আর বলিতে পারি না।” ছোটলাট কথাটা জানিবার অস্ত্র যেমন পীড়াপীড়ি করিলেন, অমনি বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সে কথা বলিবার প্ররক্তি চলিয়া গেল। ছোটলাট যতই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সে কথা বলিবার প্ররক্তি ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। বিজ্ঞানাগর মহাশয় কথাটা কিছুতেই বলিতে পারিলেন না। সে দিন আর সে কথা বলা হইল না। সপ্তাহ কাগ পরে যখন পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, তখন ছোটলাট ঐ কথা জনিবার অস্ত্র আবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সাহেব বলিলেন, “আজ আপনাকে আটক করিব।” শেষে বহু কষ্টে বিজ্ঞানাগর মহাশয় মধ্যম সহোদরের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন ছোটলাট বলিলেন :—“এই কথাটা বলিতে এত নারাজ হইবার কারণ কি? এত দিন বলিলে যে কোন কালে চাকুরী হইয়া যাইত, হুগসিতে খালি ছিল।” পরে তিনি বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে বলিলেন, “কোথাও খালি আছে কি না জানিয়া আপনাকে লিখিব।” পরবর্তী সপ্তাহে

পত্রে লিখিতেন :—“মধ্যম দাদা মহাশয়ের জবানবন্দী বর্ণিত আদিকারি, তিনি ভাগ পাইবার উদ্যোগে আইন, ভাগ পাইবার কিছু কারণ বর্ণন না।” তৎপরে ঐ মাসের ৩১ তার পত্রে লিখিতেন :—“এখানেও নবমের মাসে ৩১ তারিখের অভিসন্ধি আছে, অনর্থক কেন পাগলামী করেন।” বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠদিকের প্রতি প্রেছাবিক্যের পরিচায়ক অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করিতে গেলে লোকান্তরিত বৈবন্ধুর প্রতি অবিচার অতি অজ্ঞই হইবে। কিন্তু কনিষ্ঠের অস্বস্তিভর ও তৃতীর ৩২ বৎসর বাপ্পী জ্যোতের সহকারিতার সূত্রকে বিজ্ঞানাগর মহাশয় যত্নপূর্ণ অগ্রহণের অন্তরালে লুকাইত হইবে। তাই সে সকল বিষয়ের বর্ণন বিবরণে আপাততঃ বিরত রাখলাম। শত্ৰুপক্ষ জনসমক্ষে নিজ নিষ্ঠুর পরিচয় পাইতে পারেন, কিন্তু যিনি বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সংসার জীবনের স্বপ্নস্থান পরীক্ষা করিবার মানবও আগ্রহ হইয়াছেন, তাঁহার নিকট শত্ৰুপক্ষ ও অস্ত্র অনেক কৃপাশ্রয় মাত্র।

প্রবন্ধকার।

দীনবন্ধু ভ্রাতার ডেপুটীর কর্মে নিযুক্ত হইয়া বরিশাল যাত্রা করিলেন ।^{*} দীনবন্ধুও বিদ্যালয়গর মহাশয়ের ভ্রাতা পরোপকার-পরায়ণ ছিলেন । হেমিওপ্যাথি চিকিৎসার অগ্রজের ভ্রাতা তিনিও পারদর্শী হইয়াছিলেন । কলোরা প্রভৃতি দেশবাসী সংক্রামক পীড়ার সময়ে দীনবন্ধুও পাড়ায় পাড়ায়—গ্রামে গ্রামে লোকের সেবা করিয়া বেড়াইতেন । এই সকল গুণেব অল্প বিদ্যালয়গর মহাশয় তাঁহাকে সর্বদাই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ।

গৃহদাহের পর যখন বাটা গিয়াছিলেন, সেই সময় গ্রামেব কেহ কেহ তাঁহাকে ইষ্টকনিষ্ঠিত বাটা প্রস্তুত করাইতে অনুরোধ করেন, তিনি স্বাভাবিক হাসিভরা মুখে বলিলেন, “গরীব বান্ধের ছেলের পাকা বাড়ী, লোকে স্নানে হাসকে বে । কোন রকমে মাথা রাখিবার একটু স্থান হইলেই চলিবে ।”

সেখানে জননীর ও অজ্ঞাত সকলেব বাসেব উপযোগী গৃহাদি প্রস্তুত করাইতে যে ব্যয় পড়িল, সে সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু পূর্বো-
 মিথিত ছারিসন সাহেব কর্তৃক প্রশংসিত স্নানব গৃহখানি আর প্রস্তুত হইল না । সে বাটার শোভা ও সৌন্দর্যের পরিচায়ক সেই সুবৃহৎ গৃহখানি ভগ্নবালিতে পরিণত হইয়া এখনও বর্তমান আছে ।

বিদ্যালয়গর মহাশয়েব পিতামাতা মোটা মোটা, সাদা সিদা লোক ছিলেন । তাঁহারা পরিশ্রম করিতে, পরের উপকার ও সেবা করিতে এবং সর্ব প্রকারের অসুবিধা সহ করিতে পারিতেন । অলঙ্কারাদি পছন্দ করিতেন না । ঐ সকলকে দেশে দান্য ও স্বল্প বুদ্ধির প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন । বহু-
 দলা অলঙ্কারাদি ব্যবহারে অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়, দণ্ডিদের গতি উপেক্ষার ভাব অঙ্কার বলিয়া, অলঙ্কার পরিধানে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনভিনত ছিল । তাই গৃহে বস্ত্রাও অলঙ্কারাদি পাইতেন না । বাবুদানা বাড়িবে বঁলিয়া, মিহি সূতার কাপড় পছন্দ করিতেন না ; দৈবাৎ কখনও কলিকাতা হইতে ঐক্লপ উপায়ে পরিবেষ্টিত আসিলে তাঁহারা বিরক্ত হইতেন ।

^{*} ইতিপশ্চিৎ সংস্কৃত বাণ্যার অসত্য না হইলেও উহা উগ্রহীতা সিলাম, কারণ বিদ্যালয়গর জননীর সহিত তাঁহার কোন সংশ্লিষ্ট নাই ।

† বীরসিংহের সন্তের পাখুরা বিদ্যালয় স্কুলে গোপীনাথ সিংহের নিকট রই উকিলী পরিচালি । কলিকাতার তখনও বাটা নির্মাণের কাজবাঙ ছিল না ।

বিভাগাগর মহাশয় অল্প লোকের সর্ব প্রকার সুখ ভোগের সুবিধা করিয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিলেও নিজে ঠিক পিতা মাতার প্রেরণিত পথে চিরদিন চলিয়াছেন। সখের জিনিস ব্যবহার করিবার প্রয়োজিত কখনও তাঁহার মনে স্থান পাঠিত না। লোককে দিবার সময় ভাল কাপড়, ভাল খাবার, বাজারের বাছা বাছা জিনিস আনিতে, কিন্তু নিজের বেলায় থান খুঁটি, মোটা চাদর চটি জুতা, সামান্য আহার এই সকলেই সন্মাসক্ত! তিনি সমগ্র জীবনে যে অল্প উপার্জন করিয়াছেন, অল্পের হইলে সে ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে ধনবান লোক-সমাজে গণনীয় ব্যক্তি হইত, কিন্তু তিনি স্বোপার্জিত ধনরাশি দরিদ্রের সেবার ব্যয় করিয়া, নিজে দরিদ্রের ভায় জীবন যাপন করিয়াছেন, এবং আমরণ পিতৃপিতামহ প্রদর্শিত দরিদ্র ত্রাণার্থের বেশে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন ইত্যাদি বিভাগাগর মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষত্ব। তিনি কোন দিনই উচ্চপদস্থ সম্মান লোকের উপযোগী পরিচ্ছদের অস্বীকার করেন নাহ। গরীবের বঞ্চারে জনসমাজে বিচরণ করিতেন।

একবার বিভাগর পরিদর্শন উপলক্ষে হুগলী জেলাব কোন এক গণগ্রামে গমন করেন। এই ঘটনার বহু পূর্বে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত নাম পল্লীগামের প্রান্তরে রাখালবালকগণের কাঠে কাঠে নিনাদিত হইয়াছে। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা, বৃদ্ধ, বালিকা ও স্বতী সকলেই বিভাগাগর-মুখি দেখিবার জন্য লালায়িত। বেলা দশটা হইতে বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী গৃহস্থদের গৃহ সকল স্ত্রীলোকে পূর্ণ হইয়া গেল। গৃহের জানালায়, তারের পাশে, ছাদের উপর, এমন কি প্রবীণার পথের ধারেও দণ্ডায়মান। বিভাগাগর আসিবেন আসিবেন করিয়া বহু বিলম্ব হইয়া গেল। বাহাদুর ছাদে ও পথের ধারে আতপতাতে উত্তপ্ত হইতেছিলেন তাঁহাদের ক্রেশের সীমা ছিল না। বিভাগাগর দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন-হর্ব্যের সর্বজরী কিরণ রেখা সকলও পরাজয় করিয়াছে, এমন সময়ে একটা গোল উঠিল, 'বিভাগাগর আসিতেছেন', চারিদিকে উৎসাহ ও আগ্রহ—স্থলের ছেলেরা আপন আপন আসনে শান্তভাবে বসিতেছে, শিককেরা আপন আপন পরিচ্ছদ শুছাইয়া একবার ভাল করিয়া নিবাস কেলিতেছেন, বাহিরে বিভাগরের কর্তৃপক্ষ বিভাগাগর মহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান। মেয়েরা যে যেখানে ছিলেন, সেইখান হইতে

অবশেষে-বার প্রশস্ত করিয়া পূর্ণ চুটিতে বিভাসাগর দেখিবার জন্ত তাকাইয়া আছেন। বিভাসাগর আসিলেন, সম্মুখ দিরা চলিয়া বাইতে লাগিলেন, কিন্তু মেয়েদের কেহই দেখিতে পাইলেন না। কেহই বিশ্বাস করিলেন না যে, বিভাসাগর আসিলেন। কেন দেখিতে পাইলেন না, কেন তাঁহার আসা বিশ্বাস করিলেন না? এক প্রবীণা অগ্রসর হইয়া সমাগত মণ্ডলীর পুরোভাগে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—“হ্যাঁ গা, বিভাসাগর কই? তিনি কি এলেন না?” তখন দলস্থ একজন বলিলেন :—“এই যে বিভাসাগর মহাশয়।” বৃদ্ধা বিশ্বাসবিস্তারিত নেত্র বিভাসাগর মহাশয়ের মুখের দিকে কণকাল তাকাইয়া, বলিলেন :—“আ আমার গোড়া কপাল! এই মোটা চাদর গারে উড়ে বেয়্যা দেখিবার জন্ত রোদে ভাজা ভাজা হলুম! না আছে গাড়ী, না আছে ঘড়ি, না আছে চোকা চাপুকান।” * তাহাকে গবীষ হুঃখী হইতে পৃথক্ করিবার কোন উপায় ছিল না।

ক্ষীরপাইনিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি, মনো-মোহিনী নাম্নী একটা বিধবা কস্তার পাদিগ্রহণেচ্ছ হইয়া কলিকাতার বিভাসাগর মহাশয়ের শরণাগত হন।† তদনুসারে বিভাসাগর মহাশয় সেই বিবাহ সমাপন মানসে বাটী গমন কবেন। তিনি বাটী পৌঁছিলে ক্ষীরপাই বাসী হালদার মহাশয়েরা এবং অসংখ্য অনেক সদ্ভাষ লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করেন। বিভাসাগর মহাশয় সহজে এরূপ ভাবে এক ব্যক্তিকে সহায়তা হইতে বঞ্চিত কবিত্তে সম্মত হইবার লোক ছিলেন না। কিন্তু বাহার্য্য ইতি পূর্বে বহুবার বিধবাবিবাহের অমুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ বহুসংখ্যক সদ্ভাষ লোক বহুবিধ কারণ দর্শাইয়া এই কার্য্যের সহায়তার বিরত থাকিতে বহু সাধ্য সাধনা করায়, অগত্যা বিভাসাগর মহাশয় ঐ বিবাহে কোন সংশয় রাখিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সমাগত মণ্ডলী কট-চিস্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাপনন করিলেন। এই সময়ে সহোদর শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন

* একবার আমার পীড়ার সময়ে আমাকে দেখিতে আসিতা আমারই ব'টাই হইত। তখনসঙ্গে এই ঘটনাদি উল্লেখ করিয়াছিলেন।

† ১২৭৬ সালের আবারে এইটা ঘটনাছিল।

লিখিয়াছেন :—“বীরসিংহার করেক জন প্রাচীন দীনবন্ধু জায়রত্বে মধ্যমাগ্রজ, রাধানগর নিবাসী কৈলাসচন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদিগকে (বর কত্তাকে) আশ্রয় দিয়া (বিদ্যাসাগরের) বাটীর অতি সম্মিহিত অপর এক ব্যক্তিব বাটিতে রাখিয়া উহাদের বিবাহ কার্য্য সমাধা করেন ;” * আমাদের বক্তব্য এই যে, “বীরসিংহার কয়েকজন প্রাচীন” কি এক দীনবন্ধু জায়রত্বে ? আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে সহোদর শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন উক্ত প্রাচীন মণ্ডলীর একজন প্রধান ছিলেন। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিমতে ও অজ্ঞাতদ্বারে তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ বাটিতে সুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিবার সাহস বিদ্যারত্ন ভিন্ন অজ্ঞ কাহারও সম্ভবপর ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হওয়া যেমন তেমন লোকের পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আর অগ্রজাশ্রিত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহায়তা না থাকিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিপ্রেত কার্য্য বীরসিংহে সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত না। আমরা বীরসিংহ হইতে যে সংবাদ আনিয়াছি, তাহাতে প্রকাশ যে :—শঙ্কুচন্দ্রই উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন।† উদ্যোগকর্তাদের অগ্রণী হইয়া, মৃত মধ্যমাগ্রজের স্বন্ধে সমগ্র দোষভাগ অর্পণ করা বিদ্যাসাগর-সহোদরের পক্ষে ভাল হয় নাট। বিদ্যারত্ন মহাশয় স্মরণিত বিদ্যাসাগর চরিতে বলিতেছেন :—“এই বিবাহে অগ্রজ আত্মরিক কষ্টানুভব করেন, তোমরা তাঁহাদের নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিবার অজ্ঞ এই গ্রামে এবং আমার সম্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে।”‡ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই

* সহোদর শঙ্কুচন্দ্র নিজ সঙ্গীত জীবন চবিতের ২০৪ পৃষ্ঠায় মৃত দীনবন্ধুর স্বন্ধে ই অগ্রজ ব্যাপারের সমগ্র দোষ ভাগ অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেশ ত্যাগের প্রকৃত কারণ ও তাহাতে তাঁহার নিজের পূর্ণ সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত হওয়ার প্রতিবাদ পৃথকের (৪১ পৃঃ) দীনবন্ধুকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার পুত্র গোপালচন্দ্র ও কনিষ্ঠ সহোদর কৈলাসচন্দ্রের উপর সমগ্র ভার চাপাইয়া নিজে দূরে থাকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পাঠক আমার পরবর্তী অনুসন্ধানের কল পর পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

† পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহ মহাশয়ের উক্তি। তিনি নিজে বর্তমান এবং নিজে আমার নিকট সাক্ষ্য দিয়াছেন।

‡ শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন সঙ্গীত জীবনচরিত ২০৪ পৃঃ।

ঘটনার এরূপ দারুণ মর্মেবেদনা পাইয়াছিলেন যে, সে রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে অনাহারে ক্ষুধাচিত্তে শ্রিয় অন্নভূমি, সাধুর বাড়ী ঘর চিরদিনের অল্প ভাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। আসিবার সময়ে সহোদরদ্বিগকে ও সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীদিগকে বলিয়া আসিলেন, “তোমরা আমাকে দেশভাগী করাইকূল।” গদাধর পান, গোপীনাথ সিংহ প্রভৃতি শত্ৰুচক্র কর্তৃক বিশেষ ভাবে অত্যাচার হইয়াও বিবাহে উপস্থিত হন নাই, বিভাসাগর মহাশয় এ সংবাদে কিঞ্চিৎ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। * স্বদেশবৎসল ও অন্নভূমির সুসন্তান ঈশ্বরচন্দ্রকে গৃহ-বহিষ্কৃত ও চিরনির্ধারিত করিয়া বিভাসাগর মহাশয় প্রভৃতি বীরসিংহের যে কি অনিষ্ট সাধনট করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনার শেষ হইবাব নহে। যে দিন তিনি স্নানবদনে ও অঙ্গপ্রাণিতবন্ধে জননী অন্নভূমির ক্রোড় শূণ্য করিয়া প্রাস্তুর প্রান্তে অঙ্গুষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেদিনই বীরসিংহের সর্বনাশসাধন হইয়াছিল। এই অশকল্পের অনুরোধগণ বিভাসাগর মহাশয়ের জননে যে কি তীব্র শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবাব নহে। তাহাব কিঞ্চিদ্ভাষ্য তাঁহারই উক্তিভেদে প্রকাশ পাইবে। শেষ দশায় কলিকাতায় অবস্থান কালে যখন কুহু পল্লী

* শত্ৰুচক্র প্রতিবাদ পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: “আমি বিভাসাগর মহাশয়ের একান্ত বর্ষিত। * * * অগ্রত মহাশয়ের অসংখ্যদের সত্য জামি য় বিবাহ লিপ্ত বহিলম না এম বিবাহে বাই নাই।” এ সম্বন্ধে আমায়ের অধিক বলিবাব নাই। গোপীনাথ সিংহ মহাশয় এখনও বর্তমান। তিনি নিজে আমাদিগকে এ কথা বলিয়াছেন। আরও অনেক বলিয়া থাকেন কিন্তু সে সকল আপাততঃ ভাগ করিয়া একই খাত সংগ্রহ সমাপ্ত নৈবে দেওয়া বাইতেছে:—

“এ নমঃ সর্বমঙ্গলং”

১৯০২—১৯০৪ ভাষ্য।

সবিরল সমস্তার নিবেদন যথ

মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে “পূজাপার আমায় লিখিব। ঈশ্বর শত্ৰুচক্র বিবাহের মহাশয় গোমার বিবাহে লিপ্ত ছিলেন কি না।” তদুত্তরে আমি বলিঃ অল্প করার করিতেছি যে কেবল টক মহাশয়েরই সম্পূর্ণ বৃত্ত এবং অন্নভূমিরই চরা নির্ধারিত ঘটনাগুলি। তিনি যেগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমার চিরকালই মনে থাকিবে। ইতি—

সম্পাদক

শ্রীমুদ্রায় লিপ্য।

বীরসিংহের গ্রাম্য চিত্র সকল তাঁহার স্মৃতি-পথে উদ্ভূত হইত, তখন প্রাণটি দেহ-
ত্যাগ করিয়া স্মৃতি-শিবিকারোহণে বীরসিংহ অভিযুগে ছুটিত, তখন অজস্র-
ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেন, এরূপ অশ্রু জল আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি ।
অশ্রুপাত করিয়া দাক্ষণ মনঃকোভের পরিচায়ক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া
বলিতেন, “আর সব শেষ হইয়াছে ।” এই সময়ে একবার ‘বীরসিংহ-জমনীর
পত্র’ বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা * তাঁহার হস্তগত হয় । সেই পুস্তিকাস্তম্ভত
কাতরতার ভাবে তাঁহার কোমল জদর আর্দ্র হয় ; বহুক্ষণ জ্ঞানন করিয়া বাটী
ঘাটবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন । তদনুসারে বাটীর মেরামৎ কার্যও আরম্ভ
হয়, কিন্তু ক্রমে পীড়ার বৃদ্ধি হওয়ার আব প্রতিক্রিয়া ভঙ্গের ও জন্মভূমি দর্শনের
অবকাশ হয় নাই ।

এইরূপ নানাবিধ সাংসারিক নির্যাতননিবন্ধন কি দাক্ষণ বিবাদ-বিবে
বিদ্যাাগর মহাশয়ের জদর অর অর হইয়াছিল, এবং তিনি সংসার-মুখে
কত দুঃখ বীতশ্রদ্ধ হইয়া গড়িয়াছিলেন, বৈরাগ্য-মার্গ অবলম্বন পূর্বক নির্জনবাসের
অন্ত তাঁহার প্রাণ কিরূপ আকুল হইয়াছিল, নিরদিবিত কয়েক খানি
পত্র তাঁহার অত্যাশ্রিত প্রমাণ প্রদান কবিতেছে । কোন কোন পত্র এবং
কোন কোন পত্রের অংশ এখানে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীশ্রীঃ

শরণম্

পূজাপাদ শ্রীমদ্ব্যাক্তদেবী শ্রীচরণারবিন্দম্—

প্রণতি পূর্বকং নিবেদনমিদম্—

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার জগৎকালের
অন্তেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত

* সেই স্বাক্ষরবিহীন পুস্তিকা দাক্ষণ বাবুর রচিত ও প্রেরিত বলিয়া, জানা গিয়াছে ।
পত্র চন্দ্র বলেন, এই পুস্তিকার কথা সত্য নহে । সত্যকে অসত্য করা এবং অসত্যকে সত্য করা
তাঁহার পক্ষে অতি সহজ বলিয়াই বোধ হয়, কারণ একখানি রেজিষ্টারী বোতলসহ উক্ত পুস্তিকা
আমার নিকট রহিয়াছে । তাহাতে দেখানকার ডাক্তরের ঐ সময়ের সম তারিখ বিশিষ্ট
মোহরের ছাপও আছে । পত্র চন্দ্র এবং অজ্ঞ যে কোন ভ্রাতৃলোক সত্য নির্ণয়ের জন্য তাহা
দেখিতে ইচ্ছুক, তাহাও অবশ্য আসিয়া দেখিতে পারেন ।

কোন সংশয় রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মানব ও শরীরের বেকার অবস্থা ঘটনাছে তাহাতে পূর্বের মত নানা বিষয়ে সংশয় থাকিলে অধিক দিন বাচিব এরূপ বোধ হয় না। একজ্ঞ হিব করিয়াছি, মৃতদুর পারি নিশ্চিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ মিত্রত ভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি। মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটাবাব সম্ভাবনা। স্মৃতবাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি, তাহা বলা যায় না। একজ্ঞ কৃতজ্ঞগণপুটে বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সম্ভানের অপরাধ মাফকর করিবেন। আপনকার নিজা নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত মাস মাস যে ঐশ টাকা পাঠাইয়া থাকি মৃতদিন শরীর ধারণ করিবেন কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটবেক না। তদ্ব্যতিরিক্ত আপনকার শিষ্টকৃত্য ও মাংসাত্মক ব্যয় নিম্নোক্তার্ণে বার্ষিক দুই শত টাকা প্রেরিত হইবেক। যদি কখন কোন বিষয়ে আমার কিছু বলা আবশ্যক বোধ করেন পত্রদ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি অশ্রদ্ধার আপনকার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি এবং পুনঃবার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি, যদি আমার নিকট থাকা অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতজ্ঞ বোধ করিব এবং আপনকার চরণ সেবা করিয়া চরিতার্থ হইব। ইতি ১২ই আগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

(স্বাক্ষর) ভৃত্য শ্রীকেশবচন্দ্র পণ্ডিতঃ—

শ্রীশ্রীশ্রিঃ

শরণম্

গুণালঙ্কৃত শ্রীমতী দিনময়ী দেবী

কল্যাণনিলয়ে

ভৃত্যশ্রীকেশবচন্দ্র পণ্ডিতঃ

আমার সাময়িক জীবনভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে বিষয়ে অশ্রদ্ধা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের বেকার অবস্থা ঘটনাছে • • • । এক্ষণে ভোমার নিকটে এ জন্মের

মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখন কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, ক্ষমা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে। তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের স্বকর্ণাবেশ করিবেন। তোমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, বিবেচনা, পূরক চণিলে, তদ্বারা স্বচ্ছন্দরূপে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন্ন হইতে পারিবেক। পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া চলিবে, নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেশ পাঠিবে এবং অজ্ঞেরও বিলক্ষণ ক্লেণদায়িনী হইবে। ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

শ্রুতাকাক্ষিকঃ—

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মাঃ—

ক্রমান্বয়ে দীনবন্ধু জ্ঞানবদ্র, শম্ভুচন্দ্র বিজ্ঞানবদ্র ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাতঃকালে এক এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল পত্রের সমগ্র ভাগের উল্লেখ নিম্নরোজন বোধে আমরা সেই সকল পত্রের কেবল বিশেষ বিশেষ অংশের উল্লেখ করিতেছি :—মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুকে :—“একণে তোমাদের নিকট জ্ঞানবদ্র মত বিদায় লইতেছি, যদি কখন কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি ক্ষমা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে। যদি কখন কোন বিষয় আমার জ্ঞানান আবশ্যক বোধ কব, পত্র দ্বারা জানাইবে, আর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থে মাসিক আনুকূল্য গৃহণ অভিমত হইলে, তদর্থে মাসে মাসে ৭০ টাকা পাঠাইতে পারি। এক কালীন অধিক দেওয়া আমার শক্তিবহির্ভূত।”

তৃতীয় সহোদর, শম্ভুচন্দ্রকে :—“একণে তোমাদের নিকট * * * তোমার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ বিষয়ে যে আনুকূল্য করিতেছি, যতদিন আমার দিবার সজ্জি ও তোমার লইবার ইচ্ছা থাকিবেক ততদিন তাহা করিব, কোন ক্রমে তাহার ব্যতিক্রম ঘটবেক না। * * * পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই যথাসম্ভব সকল লোকের সহিত বিশেষতঃ প্রতিবেশি-বর্গের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে, তাহা হইলে নিব্বিরোধে ক্ষমারবাত্তা নির্বাহ করিতে পারিবে।”

কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্রকে :—পূর্ববৎ সমস্ত। তৎপরে—“যদি সাংসারিক ব্যয়

নির্লিপ্ত আনুতুল্য গ্রহণে অভিক্রটি হয়, মাস মাস ত্রিশ টাকা পাঠাইতে পারি। তুমি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছ তদ্বিষয়ে কিছু সাহায্যও করিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত আর পারিব না, কাবল এক কাপীন অধিক দেওয়া আমার শক্তিবহির্ভূত।”

তৎপরে বীরসিংহবাসী দ্বৈতভাস্কর গদাধর পাণ্যক যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই :—

নানা গুণালঙ্কৃত শ্রীযুত গদাধর পাণ্যক

কলাগভাস্কর

শ্রীভাণীকাদ পূর্বক মাবেদনমিদম্

নানা কাবল বশতঃ স্থির কবিয়াছি আর আমি বীরসিংহার যাউব না। তুমি গ্রামের প্রধান, একত্র তোমাছারা গ্রামস্থ সর্বসাধারণ লোকের নিকট এ অশ্লের মত বিদায় লইতেছি এবং সকলকে যথাযোগ্য পণ্য, নমস্কার ও আশীর্বাদ জানাইয়া বিনয় বাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি, ‘দি কখনও কোন দোষ করিয়া থাকি, সকলে দয়া করিয়া আমার ক্ষমা করিব।’ সাধাব্যয়ের হিতার্থে গ্রামে যে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্থ নিরুপায় লোকদিগের মাস মাস যে কিছু কিছু আনুতুল্য করিয়া থাকি, আমার শক্তি থাকিতে ঐ সকল বিষয় রহিত হইবে না। কিছু কাল চহল আমার মানব ও শরীরের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। সুতরাং অধিক দিন বাঁচিব এক্ষণ বোধ হয় না। যত দিন বাঁচিব, যদি শুনিতে পাই, তোমরা সকলে স্বচ্ছন্দ কালযাপন করিতেছ, তাহা হইলে হারশরনাই স্থগী হইব। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

শ্রীভাণীকাদঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীমদ্বরচন্দ্র শর্মাঃ—

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্ ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শিতুম্বেব শ্রীচরণারবিন্দেব—

প্রণতিপূর্বকঃ নিবেদনম্—

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার কণকাসেক্ষণেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন

সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেকোন অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে, সাংসারিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এক্ষণ বোধ হয় না। একান্ত স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভৃতিকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার প্রতিলিপি শ্রীচরণসমীপে প্রেরিত হইতেছে, যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবেন।

সাংসারিক বিষয়ে আমার মত ইতস্তাঃ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাজকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এই প্রাচীন কথা কোন ক্রমেই অযথা নহে, সংসারী লোকে যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের এক জনেরও অন্তঃকরণে যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাহি, সে বিষয়ে আমার অগ্রমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণ অবস্থার সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্রেশ ভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্ত্তার কর্ম্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এক্ষণ সংসার জন্মিয়াছে, আর তাহার উচ্ছেদ করা অনাবশ্যক।

এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণে আমার বক্তব্য এই, পিতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কৃতান্তলিপিতে কাতরবচনে শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, রূপা করিয়া এ অধম সম্বানের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবেন।

কারাগারভিত্তিক ধর্মে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছি। ধন পরিশোধ না হইলে, লোকালয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বাহ্যতে সঙ্ঘর ধনযুক্ত হই, তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। ধর্মে নিহতি পাইলেই কোন নির্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব। • • • আপনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়নির্বাহার্থে বাহা প্রেরিত হইয়া থাকে, যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন, কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটবেক না। ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ।



ਮਾਇਕਾ ਮਾਇਕਾ

বিভাগসমূহ মহাশয়ের ঘোষনে প্রস্ফুটিত, লাষণ্য-লীলায় ভবজ্যামিত মুখ-কমলের চিত্র দর্শনে—বার্দ্ধক্যের চিত্রে গভীর বিষাদের ঘন রেখাপাত দেখিয়া অনেকে ক্ষুণ্ণমনে দীর্ঘ নিবাসভরে—কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ‘মহাশয় এমন অতুল প্রতিভা ও কমনীয়তাব কসুম-কান্তিপূর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি, কালিমার পরিণত হইল কেন ?’ এই উপরোক্ত পত্র) কথখানিই কি ভীষণ সম্ভব দিতেছে না ? যিনি স্বদেশের নানাবিধ হিতসাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বদেশীয় অনেক লোকের দ্বারা পদে পদে প্রত্যাশিত, বিপদে নিষ্কপ্ত ও নিগ্রহগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে শাস্তির স্থান কোথায় ? পরিবার পরিজন সকলে যদি কথঞ্চিৎ অনুকূলভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রিয় সাধন করিতেন, তাহা হইলেও তিনি বোধ হয় সংসাবে বিন্দুপ্রমাণ শাস্তি সন্তোষের স্থান পাইতেন । কিন্তু তিনি কর্তব্যের আবজ্ঞানে ও হৃদয়ের উত্তেজনায়, সংসার মক্‌ভূমিতে, স্বার্থপরতার উত্তপ্ত কঙ্কর ও বালুকারাশির উপর ছুটাছুটি করিয়াছেন । আর্ন্ত ও বিপদের পার্শ্বে কোঁটা কোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, আর সংসারের প্রবন্ধনার হাতে নিপীড়িত হইয়া যখন প্রিয় পরিজনবর্গের সুশীতল ক্রোড়ে শাস্তি লাভের আশার ছুটিয়া গিয়াছেন, তখনই বাধা পাইরাছেন, তখনই তাঁহার পিপাসার জল মৃগকৃৎসিকার পরিণত হইরাছে, আর অমনই কুরুদণ্ডে ও ক্লান্তমনে শতভাষে উত্তপ্ত সংসার প্রান্তরে বসিয়া পড়িয়াছেন—তাঁই ভয়মনে, পৃষ্ঠদ্বয়ে পিতামাতার নিকট, সহধর্ম্মিণীর নিকট, সহোদরদিগের নিকট, চির বিদায় চাহিয়াছেন । সে বিদায় প্রার্থনার মধ্যে কত বিনয় ! সংসারসত্ত্ববর্ণে কত সময়ে কত অপরাধ হইরাছে, তাহা স্মরণ করিয়া বিনীতভাবে কেমন কমা প্রার্থনা ।

বিভাগসমূহ মহাশয় যে দারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইয়া এই সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সে চিন্তারানির প্রকৃত পরিমাণ ও শুক্ল তীক্ষ্ণর শিষ্টদেব তির অপর কেহই সুন্দররূপে বুঝিতে পারেন নাই । পিতার পত্রের প্রকৃত্ত্বরে বিভাগসমূহ মহাশয় আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রখানির কিয়ৎকণ এখানে প্রদত্ত হইল :—‘‘আপনি লিখিয়াছেন, ‘তুমি যে চোরের উপর অভিমান করিয়া ভূমিতে ভাত খাও’, এ অভি অসুচিত । আর তুমি যে এমন সময়ে বৈরাগ্য অবলম্বন কর, সে কেবল আমার মনে বেদনা জন্মান মায় । এ বিষয়ে আমার বিবেচন এই যে, সংসারের সংশ্লেষ পরিত্যাগ করাত্তে আমার কোন

অংশে অণুমাত্রও ক্ষতি বোধ না হইয়া বরং সর্বাংশে সম্পূর্ণ লাভ বোধ হইয়াছে। এত দিন অশেষ প্রকারে লাজনা ভোগ ও অহোরাত্র আন্তরিক বাতনা ভোগ করিতেছিলাম, এক্ষণে সকল প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়াছি। অধিক আর কি নিবেদন করিব, আমার খেন নরকভোগের পর স্বর্গবাস লাভ হইয়াছে। এমন স্থলে আমার চোরের উপর অভিমান করিয়া ভূমিতে ভাত খাওয়া হইতেছে, একথা সঙ্গত হইতে পারে না। বাহা হটক এবিষয়ে আপনি আমার জন্ত কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা উদ্ভিগ্ন হইবেন না। অতঃপর আমি অনেক অংশে মনের সুখে কাল বাপন করিতে পারিব তাহার সন্দেহ নাই, তবে আমি একরূপ করাতে আপনকার মনে বেদনা জন্মান হইয়াছে লিখিয়াছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি হুঃখিত হইতেছি, আমি বহুদিন অবধি সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরক্ত হইয়াছি। তথাপি আমার নিত্য মানস ছিল, আপনকার ও জননোদেবীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত সংসারে লিপ্ত থাকিয়া কালব্যাপন করিব। কিন্তু উত্তরোত্তর সকলোই আমার উপর এত নিদ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সকল পক্ষ হইতেই এত অভ্যাচার হইতে লাগিল যে, আমার ক্ষমতার আর সে সকল সহ্য করিয়া কাল হরণ করা হইয়া উঠিল না। আমি আপনকার শ্রীচরণে অকপটজ্ঞপ্তরে নিবেদন করিতেছি, নিত্যস্থ অসহ্য না হইলে, আপনাদিগের জীবদ্দশার কমাচ সংসারযাত্রায় বিমজ্জন দিতাম না। কিন্তু সকল বিষয়ে সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, আপনকার ক্ষোভ করিবার তাদৃশ কোন কারণ নাই। পুত্রের ক্রেশ নিবারণ হইয়াছে এবং পুত্র মনের সুখে কালহরণ করিতেছে, ইহা শ্রবণ করিলে, পিতার অন্তঃকরণে নিঃসন্দেহ আনন্দ জন্মিয়া থাকে। আমি অসহ্য ক্রেশ হইকে নিস্তার পাইয়াছি এবং মনের সুখে কালহরণ করিতে পারিব, তাহার উপায় করিয়াছি সুতরাং এবিষয়ে আপনার হুঃখিত না হইয়া বরং আহলাদিত হওয়াই সম্ভব।”

শত প্রকার অগ্নির সজ্জটন নিবন্ধন বিভাসাগর মহাশয়ের অন্তরে যে হুঃখের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল এবং বাহ্য জীবনের শেষ দিনে জাঁহাজ চিত্তভ্রমে নির্লিপ্ত হইয়া, পিতা, মাতা, পত্নী ও সহোদরদিগকে পত্রাদি লিখিয়া, গ্রামবাসীদিগের নিকট সর্ববিদ্য গ্রহণ করিয়া এবং পিতার নিকট সেই সকল পত্রের প্রতিলিপি প্রেরণ করিয়া জন্মের সেই ক্ষোভ ও হুঃখ কিংবদন্তি

দ্বিতীয় জীব ধারণ করিল মাত্র। সহোদরদ্বিগের প্রত্যেকেই গভীর আক্ষেপপূর্ণ পত্র লিখিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের চিন্তাবিনোদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু জায়রত্ন ও তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিজ্ঞানতত্ত্বের পত্রাংশই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু জায়রত্ন লিখিয়াছিলেন :—“এই লিপি দৃষ্টে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আমাদের যেকোন সম্বন্ধ তাহাতে আমার এ দৃষ্ট দেহ ভূমিসাৎ বা ভয়াবশেষ না হইলে বিদায় লইতে বা দিতে পারি না। তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিভৃতভাবে থাকিলে স্ত্রী শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জগতেব আবণ্ড বিস্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন এই ভাবিয়া স্বচ্ছন্দমনে আপনকার নিভৃতভাবে অবস্থানের অনুমোদন করিতেছি।” * * *

বিজ্ঞানাগর মহাশয় মূচিবাম বন্দোপাধ্যায়ের বিবাহ ব্যাপার বিবস্ত্র হইয়া কলিকাতা প্রত্য্যাগমন করিলে পর, সাতাদশ শম্ভুচন্দ্র বিজ্ঞানতত্ত্ব মহাশয় সন ১২৭৬ সালের ২০শে কাঠিক তাবিখে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের পত্রোত্তরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রের অংশ :—“মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া অবশি মৃত্যুতুলা হইয়াছি, আপনি যে আর দেশ আসিবেন না ও মৃত্যু কামনা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় ও দেশের লোকের দুর্ভাগা বলিতে হইবে। কারণ মহাশয় হঠাৎ দেশের লোকের ঐশ্বর্য্য ও চঃখ নিবারণ হইতেছে। মহাশয় আমাদের প্রতি আকৃপ করিতে পারেন, এতাবৎকাল আমরাগকে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন, আমরা আপনার অবাধ্য হইলে অবশ্যই চঃখ হঠাৎ পারে, * * * যে দাদা আমাকে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন, যে দাদা আমার কণার উপর সমুদ্র বিশ্বাস করিয়াছেন, যে দাদা আমা বই জানেন না, যে দাদা আমার মনের কল্প দ্বীর সহিত মনস্তর করিয়াছেন, * যে দাদা আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া, স্বত্তর বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে দাদার প্রসাদে এতাবৎকাল এসেণে (বীরসিংহে) একাধিপত্য করিয়াছিলাম, সেই দাদার সহিত যে আমি নানা প্রকার অসব্য-কার করিয়াছি, * * * *।” তৎপরে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখের পত্রে বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বনের অতিপ্রার অবগত হইয়া তৎপরে

* জয়রত্নের অন্ত ঐশ্বর্য্যজন্যই নীতায় নির্ভাসন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সন ১২৭৬ সালের ২রা পৌষ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ :—
 “আপনার ১২ই অগ্রহায়ণের রেজেষ্টারি পত্র ২৮ অগ্রহায়ণ পাইয়া আমাদের
 জ্ঞৎক্ষপ হইল। নানা কারণে মহাশয়ের মনে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে আর কণ-
 কালের অল্প সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারো সহিত কোন
 সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। ইহাতে অতিশয় দুঃখিত ও মৃতকল্প হইয়াছি। * *
 এক্ষণে আমার প্রার্থনা যদি কোন বিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকি তাহা হইলে,
 মহাশয় আমাকে শাসন করিতে পারেন। আমি এতাবৎ কাল মহাশয়েরই
 অনুগত ও আশ্রিত আছি, বোধ করি পিতৃদেব ও মাতৃদেবী অপেক্ষা মহাশয়ের
 প্রতি অধিক ভক্তি করিয়া আসিতেছি। বরং এতাবৎকাল দেশে অবস্থিতি
 করায় পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আমার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যদি
 কোন উপদেশ দিতেন, তাহা না শুনার মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত আমার
 মনান্তর ঘটিত। আমি স্বপ্নেও কণকালের অল্প মহাশয়ের অনিষ্ট চিন্তা করি
 নাই। মহাশয় আমার কথায় বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে অপর লোক ও ভ্রাতৃ-
 বর্গ ও মহাশয়ের পত্নী ও পুত্র কখন কখন মহাশয়েরও প্রতি বিরক্ত হইতেন। * *
 এক্ষণে মহাশয় সংসারাত্মন ত্যাগ করিতে যে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা কেবল
 আমার শুভাগ্য প্রযুক্তই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই।”

এই সকলের দ্বারা বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে যে, বিভাসাগর মহাশয়
 স্ত্রী পুত্র ও সহোদরগণের দ্বারা সংসার-জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই।
 কেবল সুখী হইতে পারেন নাই তাহা নহে, অনেক স্থলে নিতান্ত
 অনুশীলী হইয়া মনের ক্রেশে দিন যাপন করিয়াছেন, কিন্তু এই সকল অশান্তিকর
 ব্যাপারের মধ্যে কখনো কাহারও সুখ সাধনে বিমুগ্ধ ছিলেন না। সংসারে
 সাধারণ লোকে ও বিভাসাগর মহাশয়ে প্রভেদ এই স্থানে। তিনি ঐহাদের
 আচরণে মুগ্ধ ও বিরক্ত, তাঁহাদেরই সেবার চিরজীবন নিমুক্ত। কেবল একমাত্র
 পুত্র নারায়ণচন্দ্র নিজ দোষে দীর্ঘকাল পিতার দেহ ও মমতার বশিত ছিলেন।
 পিতা পুত্রের এই দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদের মধ্যে, পুত্র অনেক সময়ে পিতার
 প্রিয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই দ্বারী কলের ঐশ্বর্য
 হয় নাই। শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবু পিতার জীবনীবিবরণ যে সকল কাগজ পত্র
 অনুগ্রহ করিয়া আমার দিয়াছিলেন, সেই সকলের মধ্যে তাঁহার বিচ্ছেদ শত

প্রকার অভিযোগপূর্ণ সনামী ও বিনামী পত্রাদি তাঁহার জ্ঞাতসারে আমার হস্তে আসিয়াছে; তদুপরি বুঝিতে পারা যায় যে, পুত্রের বিরুদ্ধে বিভাগাগর মহাশয়ের অসন্তোষবহিঃ প্রকাশিত রাখিতে অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সকলের মধ্যে নারায়ণ বাবুরও অনেকগুলি পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে সন ১৯২৫ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যে পত্র পাঠ করিলে পাষণ্ড বিগলিত হয়, তাহাতে বিভাগাগর মহাশয়ের বিরক্তির কারণ, তাহার গুরুত্ব, পুত্রের গভীর অনুতাপ ও অনুরাগপূর্ণ ক্ষমা প্রার্থনার ভাব, পিতার নিকট পুত্রের আব্দার ও দাবি দাওয়া এবং পিতার প্রতি ভক্তিপূর্ণ পূজার ভাব, পূর্ণরূপে পরিবাস্তব হইতেছে, তাই এই পত্রের * প্রারম্ভ ভাগই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীচরণারবিন্দেষু— প্রণতি পূর্বকঃ নিবেদনম্—

আপনার চরণ-রূপায় আমার সকলই হইয়াছে। যেমন হটক দশ টাকা উপার্জন করিতেছি, সম্মানেরও অভাব নাট, বাহিরে দেখিতে আমি পরম সুখে আছি। কিন্তু আমার অন্তরে অহরহঃ বিষম কাট দংশন করিতেছে। বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়াছি, অপর কোন কামনাই মনোমধ্যে উদয় হয় না, কেবল মাত্র আপনার চরণ সেবাই এ দাসের মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পূর্বকৃত পাপগুলি ক্ষরণ হইতেছে ও মন অনুতাপে বিকৃত হইতেছে, কেবল মনে হইতেছে হায় ! যদি সে সকল পাপ কার্য দ্বারা পিতৃচরণে অপরাধী না হইতাম ! যেমন পাপ করিয়াছিলাম তেমন প্রতিফলও প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ আপনার চরণতলে থাকিলে কি বলিয়া গণ্য হইতাম, আর এখনই বা কেমন হইয়া আছি। জনসমাজে হেয় হইয়া আছি। ও, সকলও সম্বন্ধ করিতে পারিয়াছি, কিন্তু আপনার এ বরদে পীড়ার সময়ে আমি আপনার চরণ সেবা করিতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি চূর্ণাঙ্গোর বিষয় হইতে পারে। আমার জীবনের প্রধানতম কর্তব্য প্রতিপালন করিতে পারিলাম

* শ্রীমুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিহারী মৌরবতরে আমার বসিয়াছিলেন যে, “আবাবের কথা বলিতে কি! বাবার প্রতি যেমন কোন অধিকার করিবেন না। তাঁহার প্রকৃত মহত্ব রক্ষা করিতে যদি আমার হীনতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন, তাহাতে কুণীত হইবেন না।” আমি এখানে নারায়ণ বাবুর সেই বহুভক্তির আশ্রয় লইয়া উপরি উক্ত পত্রখানির আধিকাংশ প্রকাশ্যে দাখলী হইলাম।

না। আপনি একবার ৬শিতামহ দেবের চরণ সেবার্থে কালীধামে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় আপনার এক আত্মীয় বলিলেন, “বিদ্যাসাগর, এমন গরমের দিনে কালী ধাবে বড় ভয়ের কথা।” আপনি অগ্নান বদনে উত্তর দিলেন “Duty (কর্তব্যসাধন) করিতে যাব, তাতে প্রাণের ভয় করিলে চলিবে কেন,” সেই হঠাৎ মগাপুরুষের উচ্চারিত বেদবাক্যগুলি এ অধর্মের অন্তরে খোদিত হইয়া আছে। আজ আমি নিজ কর্তব্যদোষে সেই Duty (কর্তব্যসাধন) কবিত্তে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি।

আমি এখন আপনার নিকটে ঘাইতে চাই না। যখন আপনি এ অধর্মের মুখের দিকে তাকাইতেও অনিচ্ছুক, তখন আমি কোন সাহসে আপনার নিকটে বা সম্মুখে দাঁড়াইতে ঘাইব। আমি অন্তরালে থাকিব। চাকরের দবকাব হইলে চাকর ডাকিয়া দিব, কোপাও ঘাইতে হইলে চাকরের মত ঘাইব। চাকরের মত থাকিব, ক্রম অনুগ্রহ হয়, অনুমতি হয় নিকট ঘাইব। নচেৎ একধারে কুকাবেব মত থাকিব। আমি যেমনই হই আপনার পুত্র। আমারও অর্ধেক বয়স গত হইল। যেমন হটক আপনার একটা পোত্র আছে। যদি বাচিয়া থাকে, তাহাকে মহাশয়ের পবিচয় দিতে হইবে। যদি পুত্রকে পা দিয়া ঠেলিয়া গেলেন, তাব পোত্রটা জনসমাজে কি বলিয়া মুখ দেখাবে, তাহা অপেক্ষা আমার ত গলায় পা দিয়াছেনই। তাহারও গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলুন। দিক জীবন গইয়া থাকা আপেক্ষা মৃত্যু ভাল, আমি এত দিন মৃত্যুর আশ্রয় লইতাম, তাব মধুরভাবিনী আশা আমাকে বাচাইয়া রাখিয়াছে। বাপ মায়ের নিকট ক্ষমা পাটবার আশা কখনই ছাড়া যায় না। এ কালে ত আমার অদৃষ্ট এই হইল, কিন্তু আমার পরকালের পথটা বন্ধ করিবেন না। যদি আপনার চরণ সেবা করিতে না পাইলাম, তবে কিসে পরকালে উদ্ধার পাইব। আপনি একবার রাগেষে বর্জিত মনে—আপনার কথিতুল্য মাথুরা ও মনের উচ্চতার তলসতচিত্ত হইয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনার অধম সন্তানকে ভাসাইয়া দিলে মহাদ্যার পৃথিবীব্যাপী সুনামে একটু কলঙ্ক স্পর্শিবে কি না? যে ব্যক্তি সহিষ্ণুতার আধার, ধাঁহাং বেহ কন্মার বাসস্থান, ধাঁহাং শরীরে মারাত্মকী চির বিরাজিতা, পরের হুঃণ শুনিলে ধাঁহাং চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হইতে থাকে, সেই দয়ানীল মহাপুরুষ নিজের হস্ততায়

অনুভূতানলে দৃষ্টি, ভয়ঙ্কর একমাত্র পুত্রকে অসহোচে ভাসাইয়া দিবেন এ কথা ব্রহ্মস্রোতসেও মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না ।

পিতঃ, এক দিনের অল্পও আমার জীবন সার্থক হইরাছে । আমার বিবাহের পর মহাশয় আপনার তৃতীয় সহোদরের পুত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, “নারায়ণ স্বস্তঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার স্মৃতি উজ্জল করিয়াছে, অধিক কি নারায়ণ এই বিবাহ করিতে আমি চরিতার্থ হইরাছি।” পিতঃ, ইহা জন্মে আমার আর ইহা অপেক্ষা স্মৃতি সোভাগ্য কি বাহনীর? ইহাই আমার বর্গস্মৃতি । আপনি রাজাধিরাজ অগম্যাত বাপ, আর আমি কীটানুকীট ছেলে ; আমার কৃত কার্যের দ্বারা এককণের অল্পও যদি মহাত্মার মনে অনুমাত্রও সন্তোষ জন্মাইতে পারিয়াছিলাম, তাহাই আমার পরম সোভাগ্য, গুরুতর তপস্তার ফল । পিতঃ ! হায় আমি যে এই পত্রে বারবার পিতঃ পিতঃ পিতঃ বলিয়া সোধোদন করিতেছি, ইহাতেই আমার রোমাঞ্চ হইতেছে, কিন্তু অভাগার জীবনে “বাবা” এই মধুর শব্দে ডাকা হইল না । প্যারী বখন আমাকে বাবা বলিয়া ডাকে, তখন আমার চন্দর আনন্দে নাচিয়া উঠে, আর পরক্ষণেই সেই আনন্দ বিবাদ-সাগরে পরিণত হয় ; আমারও অমনই তখনই তাহার মত বাবা বলিয়া ডাকিতে সাধ যায়, কিন্তু ডাকিতে পাইব না, বুঝা আশা, এই ভাবিয়া অমনই মৃতকর হই । আর তাবি যদি আমি হতভাগ্য আপনার পুত্র না হইতাম, মনের মত পুত্র থাকিত, তাহা হইলে সেও প্যারীর মত বাবা বলিয়া ডাকিলে আপনারও কত আনন্দ জন্মিত । কিন্তু আমি হতভাগ্য জন্মিয়া আপনকার সকল স্মৃতি ব্যাঘাত জন্মাইরাছি । যদিও হইরাছিলাম মরিয়া বাই নাই কেন ?

মহাশয় একাকী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন । আজ যদি গোপালও • থাকিত তাহা হইলেও সকল দিক রক্ষা পাইত । • • • সুতরাং বহু পরিবার পরিত্রুত হইয়াও আপনি একাকী ; ছেলে, জামাই, তাই একজনও মনের মত হইলে, তাহার উপর তার কেলিয়া পীড়ার সময় দশ দিন নিরুতভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন । বখন বখন আপনার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক মুখ ও কীণ

• বিদ্যালোচনার মহাপ্রবর্তন জ্যোতির্জ্ঞ জামাতা গোপালচন্দ্র মহাপ্রবর্তিত । ইহাকে বিদ্যালোচনার মহাপ্রবর্তন বলা হইতেছে এবং ইহা অপর সকলেরই সমান প্রেরণা দিচ্ছেন ।

দ্বয়ে কথা কহা আমার মনে উদয় হয়, তাহার উপরে সকল বস্তুটি পোয়না মনে পড়ে, অথবা পীড়িত হইয়া একমাত্র চাকর সহায় লইয়া কণ্ঠীটাকে বাওয়া মনে হয়, তখন ভাবি, এখনও কেন বাঁচিয়া আছি। আর নিজ কণ্ঠদোষের জন্ত জিহ্বা টানিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

এক কালে বে মহাপুরুষ, যে বৈষ্ণবগুণের আধার, যে great peerless man (তুলনাবিহীন মহাপুরুষ) যে demigod (মানব-দেবতা) আহারকালে আরশোলা চিবাইয়া গিলিয়া অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, কেননা আরশোলা জানিলে অপরের খাওয়া হইবে না, সেই মহাত্মা এমন অমাব্যুহী শক্তি ধরিয়াও নিজের ছেলেকে ক্ষমা করিলেন না! দোষ যত গুরুতর হউক না কেন, ক্ষমার নিকট সকলই তুচ্ছ, তাতে আবার বাপ মায়ের কাছে। আমাকে চরণে আশ্রয় দিলে কেহ দোষ দিবে না, বরং মহাপুরুষের মহত্বেরই পরিচয় দেওয়া হইবে। কি আর অধিক জানাইব, আর একবার কৃপা করিয়া অমাব্যুহ গুণার্ঘ্য গুণের পরিচয় দিয়া নিজের হতভাগ্য পুত্রকে চরণ-সেবার নিযুক্ত করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, সৰ্ব্বপ্রকারে শিশুদোষের মনের মত হইতে পারি কি না, ভাল হই আর মন্দ হই, সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোকের মধ্যে এ হতভাগ্যই প্রথম। কাহার জন্ত কি না করিয়াছেন, আমার জন্ত একবার লোকাভীত ক্ষমাগুণের পরিচয় দিয়া অভাগাকে পায়ে স্থান দিয়া একবার শেষ পরীক্ষা করুন, সাহস করিয়া বলিতে পারি, একক্ষণের জন্ত, কোন বিষয়ে অধুনাও আপনার অসন্তোষের কাব করিব না। সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিব, এক মুষ্টি আহার করিয়া আপনার চরণসেবার জন্ত জীবন রক্ষা করিব। কুকুর যেমন অন্নমুষ্টি খাইয়া নিরন্তর প্রভুর চিত্তাহুবর্তন করে, এ হতভাগ্যও কুকুরের অধম হইয়া প্রভুর পদতলে পড়িয়া থাকিবে।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫।

(স্বাক্ষর) মহাশয়ের

হতভাগ্য পুত্র।

এই পত্রে বিভাগসংগ্ৰহ মহাশয়ের সাংসারিক সুখ ভ্রংশের পূর্ণ আভাস এক নিরাশা ও অশান্তির গূঢ় কারণগুলির বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রে বিভাগসংগ্ৰহ মহাশয়ের মহত্বের সূত্র অথচ সমুদ্রল চিত্র দেখিতে পাওয়া

বার। পাঠক, এই পত্রখানি লিখিষ্ট চিন্তে বার বার পাঠ করিলে অনেক লোকের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই পত্রখানি বিচ্ছেদলগ্ন শিতা পুত্রের সখরু বিধরে বাকীলা সাহিত্যে বক্তব্য ভাবে স্থান পাইবার সম্যক উপযোগী। এই পত্র পাঠে বিভাসাগর মহাশয় একমাত্র পুত্রের প্রতি প্রেমের হইরা কিছুকাল পুত্রকে সপরিবারে কলিকাতার ও সুরাসভার আপনার নিকটে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে শেষ পীড়ার সময়েও নিকটে থাকিয়া পরিচর্যা করিতে ডাকিয়াছিলেন। নানা ঘটনা সূত্রে পুত্রের প্রতি অনেক সময় বিরূপ থাকিলেও পুত্রবৎ, পৌত্র ও পৌত্রীগণের প্রতি তাহার গভীর মেহের কল্পনাদী নিরন্তর নীরবে প্রবাহিত ছিল, তাহাব পরিচায়ক কয়েকখানি পত্র এখানে প্রদত্ত হইতেছে। * পাঠক তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে লোক স্বদেশ বিদেশের অসংখ্য ছাত্রী লোকের হৃৎগ নিবারণে সদা ব্যস্ত ছিল, সে ছাত্রবান পুরুষ পুত্রের পরিবাববর্গের প্রতি একদিন এক যুদ্ধোত্তের জন্ত উদ্যমী ছিলেন না।

শ্রীশ্রীহবি:

শবদম্

বৎসে ভবসুন্দরি †

শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি নানা কারণ বশত অনেক দিন তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। সেজন্য বোধ করি তুমি অতিশয় চঃখিত আছ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছ। আমি এত দিন তোমার পত্র না লিখিয়া অজ্ঞার কণ্ঠ করিয়াছি তাহার সন্মোহ নাই।

* বিভাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনের মধ্যে বাকীরা আমার বিচ্ছেদ বিবাসভাজন, তাহারের প্রকৃত সংস্কারের উপর নিষ্ঠুর করিয়া আমি এই বিবাস করিষ্ট বাণ্য হইয়াছিল যে বিভাসাগর মহাশয় পুত্রের প্রতি যেমন অসমত ছিলেন, পুত্রবৎ পৌত্র ও পৌত্রীগণের প্রতিও সেইরূপ বিরক্ত ছিলেন। আমার একজন বিবাস করা অজ্ঞার হইলেও অতিবিবাস নিবন্ধন একজন অজ্ঞার করিয়া দিলাম। এই জন্ত ই সকল পত্রের বিবাসানতা বিধরে অগ্রসংস্কারও আবশ্যক বোধ করি নাই। যে সূত্রে আমার এ জন্ম সংশোধিত হইল, তাহার সহিত সাধারণের ইষ্টানিষ্টের কোন সংশ্লিষ্ট নাই তাই তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

† Srimati Bhabasundari Devi,
Vidyasagar's house,
Biralugha.

আমি কলিকাতার অতিশয় অসুস্থ হইয়া দশ দিবস হইল কয়ার্টাফ আসিয়াছি। কলিকাতার বিলক্ষণ অসুখ ভোগ করিয়াছি এখানে আসিয়াও ভালরূপ আরাম হইতে পারি নাই। এখানে আর ৮।১০ দিন থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় যাইব। কলিকাতায় গিয়া যেন তোমার পত্র পাই। কুম্ভ বোধ করি এক দিনে আমাকে ফুলিয়া গিয়াছে। তাহাকে কাছে বসাইয়া খওয়াইতে বড় ইচ্ছা হয়। তাহার সম্ভাষণ বাক্যগুলি সর্বদাই মনে পড়ে। ইতি—

১লা চৈত্র ১২৮৫ সাল।

ভতাকাজিকণ:

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণ:

শ্রীশ্রীহরি:

শরণম্

বৎসে ভবশ্রুদ্ভারি

এই পত্রের মধ্যে তোমাদের চৈত্র মাসের ৬০ বাটি টাকা পাঠাইতেছি, পঞ্চ সংবাদ লিখিয়া নিক্ষেপ করিবে। মুণী, কুম্ভ, প্যারী ও হুদিকে আশীর্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে এবং বলিবে তাহাদের জন্য আমার বড় মন কেমন করে। আবার কত দিনে তাহাদিগকে দেখিতে পাইব। তাহারা কেমন আছে লিখিবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। ইতি—

১লা চৈত্র ১২৯২ সাল।

ভতাকাজিকণ:

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণ:

সদয়হ সম্ভাষণমাবেদন মিতম্ *

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমার জননী দেবীর পেটের অসুখ ভাল হইয়াছে এবং তোমরা সকলে ভাল আছ আর তুমি বস্ত্রবিচার পড়িতেছ, কুম্ভ-মালা কথামালা পড়িতেছে, এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া ব্যরণরনাই আহলাদিত

হইয়াছি। 'তোমরা মন দিয়া দেখা পড়া লিখিবে। ভাল লিখিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে অতিশয় ভাল বাসিব। তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিবে। আর কখন যদি লিখিতে পারে, তাহাকেও পত্র লিখিতে বলিবে। তোমাদের পত্র পাইলে আমি অতিশয় আনন্দিত হইব।

এর একমাস হইল আমার পেটের অসুখ হইয়াছে। এখনও ভাল হইতে পারি নাই। অতিশয় দুর্বল হইয়াছি। আজ তিন দিন হইল কিছু ভাল আছি। বোধ হইতেছে আর ৪৫ দিনে ভাল হইতে পারিব। তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। তোমার ঠাকুর মা, পিসিমা, এবং সুরেশ, যতীশ, হরিমোহন, রামকমল প্রভৃতি এবং রাণীরা সকলে ভাল আছেন। তোমার জননী, কুন্দ, প্যারী, মতি ইহাদিগকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহ সজ্ঞাষণ বলিবে। দুর্বল আছি বলিয়া তোমার জননীকে পত্র লিখিতে পারিলাম না। তোমাকে না লিখিলে হয় ত তুমি রাগ করিবে এক্ষণ তোমাকে লিখিলাম। আজ আর লিখিতে পারিব না। ইতি—১লা আষাঢ় ১২২১ সাল।

পত্রাকাক্ষণ:

শ্রীকেশবচন্দ্র শর্মা:

শ্রীশ্রীহরি:

শরণম্

বৎসে ভবভূক্ষরি

এই পত্রের মধ্যে একশত পঞ্চাশ টাকা নোট আঠাইতেছি। পঁয়ছ সৎবাদ ও তোমাদের মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া নিরুবেগ করিবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। আমি অভ্যাসি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাট। সুগাণিনী দিহিকে আমার স্নেহ সজ্ঞাষণ জানাইয়া বলিবে তাহার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। দুই তিন দিনের মধ্যে তাহাকে পত্র লিখিব। হেমলতা কহিলেন, মাস মাস ৮০, অশী টাকা পাঠাইলে তোমাদের সব বিষয়ে সুবিধা হয়, এক্ষণ ঐ দ্বিলাবে ৮০, অশী টাকা আর সাবক খাজানার বাবতে ৭৫, পঁচাত্তর টাকা দিলাম। সমুদয়ে ১৫৫ এক শত পঞ্চাশ টাকা হয়। হেমলতা

এখানে পাঁচ টাকা লইয়াছেন, বাকী একশত পঞ্চাশ টাকা প্রেরিত হইল।
ইতি ৩রা চৈত্র ১২৯১ সাল।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শ্রীশ্রীহরচন্দ্র শর্মাঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্

মৎসে ভবসুন্দরি

তোমার পত্র পাটয়াছি এবং তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে
আশ্বাসিত হইয়াছি। আমি অতাপি সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইতে পারি নাই।
অতিশয় দুর্বল আছি। বাটার সকলে ভাল আছেন। মুগা, কুম্ভ, প্যারী,
মতি ইহাদিগকে আমার আশীর্বাদ ও মেহ সম্ভাষণ জানাইবে। তাহাদিগকে
মনে করিলেই চক্ষে জল আইসে। গুনিলাম মুগার এখান হইতে বাইতে
ইচ্ছা ছিল না। বাইবার আগে জানিতে পারিলে, বাইতে দিতাম না। মধ্যে
মধ্যে তোমাদের সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। ইতি ২৬শে চৈত্র
১২৯১ সাল।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শ্রীশ্রীহরচন্দ্র শর্মাঃ

সংসার ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া আত্মীয়বর্গের অনেককে যেমন পত্র
লিখিয়াছিলেন, পুত্রবধূকৈও নিয়মিত পত্রে মনের ঐক্লপ ভাব ব্যক্ত করেন।
এই পত্র পাঠে বুঝা যায় যে, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সর্বাপেক্ষা
অধিক টাকা ইহাদের জন্য নিষ্কারিত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্

ভবসুন্দরি

আমি তোমাদের নিকট এ জন্মের মত বিদায় লইলাম। তোমাদের নিকট

নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত, আপাততঃ ১৫০ একশত পঞ্চাশ টাকা নিষ্কারিত
করিয়া দিলাম । ইতি

শ্রীশ্রবরচন্দ্র শীরা

শ্রীহরি:

শরণম্

বৎসে ভবানুস্মরি

এই পত্রের মধ্যে আশী টাকার নোট পাঠাইতেছি, পঁহুঁ সংবাদ ও তোমরা
সকলে কেমন আছ তাহার সংবাদ লিখিয়া নিরুবেগ করিবে । আমি সেউরুপই
আছি । অভ্যাপি সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইতে পারি নাই । বাটার আর সকলে ভাল
আছেন । মৃণা, কুল, প্যারী ও মতিকে আমার স্নেহসম্ভাষণ বলিবে । তাহাদের
অল্প সর্বদাই মন কেমন করে । মধ্যে মধ্যে চক্ষে জল পড়ে । আমি ৩৪ দিনের
মধ্যে একবার কল্যাণট্যাংক যাইব । সেখানে ৪৫ দিনের অধিক থাকিব না ।
ইতি ৩০শে বৈশাখ ১২৯২ সাল ।

শ্রীশ্রবরচন্দ্র শরণম্:

শ্রীশ্রবরচন্দ্র শরণম্:

পত্রের পঁহুঁ সংবাদ কলিকাতার ঠিকানায় লিখিবে ।

শ্রীহরি:

শরণম্

প্রাণাধিক তাই পারীমোহন •

তুমি পত্র লিখিতে পারিরাছ ইহাতে আমি কত আনন্দিত হইরাছি ।
বলিতে পারি না । তুমি মন দিয়া লেখা পড়া করিবে তাহা হইলে আমি
তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইব । তুমি প্রতি মাসে, দুইবার আমাকে পত্র
লিখিবে ।

তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে আনন্দিত হইলাম । আমি
এখন অনেক ভাল আছি । বাটার আর সকলে ভাল আছেন । মতিমালা,

* Babu Pyari Mohan Banerjee,
Vidyasagar house,
Boersingha,
Kharar.

কুম্ভমালা, মৃণালিনী ও তোমার জননীকে আমার স্নেহ সস্তাবণ জানাইবে।
ইতি ২৭শে পৌষ ১২৯২ সাল।

গুণাকাজিকণ:

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণ:

শ্রীশ্রীহরি:

শরণম্

স্নেহ সস্তাবণমাবেশনমিদম্ *

তোমার পত্র পাঠিয়াছি এবং তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে
নিক্রোধ ও আশ্লাদিত হইয়াছি। এক খানা বাকলা মাপের জুতা গিথিয়াছ
হুই তিন দিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিব। মনোযোগপূর্ব্বক পড়িলে আমি অতিশয়
সন্তুষ্ট ও আশ্লাদিত হইব। তোমার মাতা, কুম্ভ, প্যারী ও মতিকে আমার
আশীর্বাদ ও স্নেহ সস্তাবণ বলিবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। আমি
সেইরূপই আছি। ইতি ৩১শে চৈত্র ১২৯১ সাল।

গুণাকাজিকণ:

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণ:

পুত্রের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ পত্রখানি পাঠিয়া তাঁহার মনের ভাব
যে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় স্বলে নারায়ণ বাবুর কৃতজ্ঞতার
পরিচায়ক এক খানি পত্র এখানে প্রেরিত হইল।

* পরম কল্যাণভাজন

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী প্রেমানন্দেবু

বিদ্যাসাগরের বাটী

বীরসিংহ (খড়ার)।

(পাঠক ভেবেবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় পুত্রের নারায়ণচন্দ্রের বাটীই বারবার বিজ্ঞেয় বাটী
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।)

শ্রী:—

শ্রীচরণাবির্কেষু—

প্রগতি পূর্বকং নিবেদনম্—

পিতৃদেব, 'এবার মনে করিয়াছিলাম, যে আমার সমস্ত দুঃখের কথা জানা-ইয়াছি, এক বার মহাশয়ের পদতলে নিপতিত হইয়া আমার তাক্সা কপালের শুভাশুভ বল দ্বিগুণ করিয়া লইব। কিন্তু নির্ভর মৈব হতভাগ্যের তাক্সা কপালকে শতধা বিচূর্ণিত করিয়া দিল।

স্নেহময়ী জননীদেবীকে এ আশ্রয় মত হারাষ্টয়া সংসারে একবারে অসহায় হইতে হইত, মা মর্য্যা ছেলের মত কামিয়া বেড়াইতে হইত, কেবল, দয়াময় পিতৃদেবের সদয় ব্যবহারে প্রকৃতিস্থ হইয়া আছি। মহাশয়ের চরণ ছাড়া হওয়া অবধি মাতৃদেবীকে চরণাপ্রিত হইয়া কালযাপন করিতেছিলাম, জন্মধুর 'মা' বলিয়া মাকে ডাকিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছিলাম, কিন্তু বখন মা আমার হতভাগ্য পুত্রকে নিরাশ্রয় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, বখন সংসার মল্লকারময় দেখিতে লাগিলাম, সেই দুঃসময়ে, পিতৃদেব কৃপা বিতরণ করিয়া হতভাগ্য সন্তানকে চরণে আশ্রয় দিলেন। সেই কৃপাবলে এই হতভাগ্য মাতৃশোক সঙ্ক করিতে পারিতেছে। হতভাগ্যের প্রতি যে এত দূর কৃপা করিবেন, তাহা কি স্বপ্নেও কখনও আশা করিয়াছি ? জানিতাম এ আশ্রয় মত এ হতভাগ্যের ভাগ্যদীপ নির্মাণ হইয়া গিয়াছিল। এবার, আপনায় সম্মুখে সাহস করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি, দোতলার উপরে গুইবার অনুমতি পাইয়াছি, ভরসা করিয়া মহাশয়ের সহিত দুই একটা কথা কহিয়াছি, এক বিন সন্ধ্যার সময় জল খাবার চাহিতেছিলাম, মহাশয় নীচে ছিলেন, তনিতে পাইয়া হেমলতাকে কহিলেন, ও তুমি, তোর লামা জলখাবার চাহিতেছে, কথাগুলি শুনিয়া আমার বিবাসপূর্ণ হৃদয়ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সকল কৃপাগুলিতে এ হতভাগ্য চরিতার্থ ও কৃতজ্ঞত্ব বইয়াছে। অন্তরে একটা অনির্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাকে বলে Intoxicated with joy আমার ভাই হইয়াছে। বহুদিন অসহায়ের পর উপায়ের আহার পাইলে শোকের অন্তরে বেগম একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তি আছে, ১৪ বৎসরের পর মহাশয়ের শ্রীমুখের বচনানুসৃত পান করিয়া হতভাগ্যের অন্তরাত্মা পবিত্র

পরিচর্য হইয়াছে। এক একটা রূপার পরিচর্য পাইয়াছি আর আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়াছি। আর কেবল সেই সময় এই ভাবিয়া জঁহর বিবীর্ণ হইয়াছে যে যদি এই রূপাটুকি আমার ছাঃখিনী না দেখিতে পাইতেন তবে আমার জীবন সার্থক হইত। মা গো! একবার চাহিয়া দেখ মা! তোমার হস্তভাঙ্গা নারায়ণ শিতচরণে আশ্রয় পাইয়াছে। মা! তুমি যে অন্তিমকালেও হস্তভাঙ্গা সন্তানের অঙ্গ ব্যাকুল হইয়া কর্তাকে ডাক কর্তাকে ডাক, ১০।১২ বছরের মনের স্নঃখের কথা বলিয়া যাই আমার নারায়ণকে দিয়া যাই, বলিয়াছিলে, এখন একবার দেখ মা! দরমার কর্তা তোমার অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন। মা! এক বার দেখ, বাবা তোমার অঙ্গ কত ব্যাকুল হইয়াছেন। যতই জননীর মেহ ভাবিতেছি ততই হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতেছে।

আশনি আমার প্রতি যতটুকু রূপা প্রদর্শন করিয়াছেন তোমাকেই আমি চরিতার্থ। মরণ কালে ইহা ভাবিয়াও সুখে মরিব, যে পিতৃদেব অপরাধী অনুরূপবস্তুর সন্তানকে ক্ষমা করিয়াছেন, আপনায় চরণে ক্ষমারই তিথারী ছিলাম, কতবার পদতলে পড়িয়া কাদিবার বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মহাশয় শোকসন্তপ্ত বলিয়া সাহস করি নাই। আমি আর ঐ চরণ ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমার হৃদয়ে যে ভাবটা শুদ্ধ হইয়াছিল, সেই ভাবটা মহাশয়ের রূপা দৃষ্টিতে সরস ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আর কি ছাড়িয়া থাকিতে পারি? আপনাকে কিছুমাত্র বিরক্ত করিব না, কর্তৃত্ব, ঘন কিছুই আশা নাই, আশা, পদতলে পড়িয়া থাকিব। মহাশয়ের তামাক, সাজিব, বিজ্ঞানা করিয়া দিব, জুতো বুজিব, বিশেষ গমন করিলে সঙ্গে মোট বহিয়া যাইব। পবিত্রতম আপনায় চরণ ও স্বর্গীয় মাতৃদেবীর চরণ স্মরণ করিয়া জানাইতেছি, আমার মনে অপর বাসনা নাই। মাতাদিগের মত থাকিয়াই আমি সুখী হইব। আপনার বাটীতে বাহাই ইউক্, আমাকে কেব লাহনা কক্ক্, কাপ থাকিতে তুলিব না, চকু থাকিতে দেখিব না, মা আমাকে কাদালী করিয়া দিয়াছেন, আমি কাদালী বেশেই আছি, আর সেই ভাবেই কালযাপন করিব। আপনার পদসেবার অঙ্গ সর্বভাগী হইব, সকল সুখে অলাভলি দিব, পূর্বকৃত সমস্ত পাপের আরশিত অঙ্গ দেব ও ঐশ্য আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়া রাখিব।

আমি আপনাকে আর একটা নিবেদন করিব। যদি এক্ষেপে একেবারে নিজের নিকট রাখিতে সম্মত না হইলেন, তবে আপাততঃ অপারের মত আমাকে মূল্যে একটা কিছু হউক করিয়া দিন। কর্তৃপক্ষগত বাবদার ও চরিত্র দেখিয়া যদি সম্মত হইলেন, তখন চরণসেবার অনুমতি করিবেন, আমার তাহা হইলেই দুই বেলা ত্রিচরণ দর্শন ঘটবে। ফলকথা আমাকে বেঙ্গলে হউক চরণে আল্পর্শ দিতেই হইবে। আমার নিজের আকিস্ ও লোকেল বোর্ড আকিস দুইটা আকিসের কার্য সুচারুরূপে চালাইয়া মারামমতান্ত্র বিদেশীয় কর্তৃপক্ষগণের মনে সন্তোষ জন্মাইতে পারিতেছি, আর দরামার পিতৃদেবের সন্তোষ জন্মাইতে পারিব না? নিরুদ্ভা থাকিতে আমার আর সাহস হয় না। মহাশয়কে ছাড়িয়াও আর থাকিতে পারিব না।

হেমলতা, মাতৃসেবীর গহনা ও বাসনের চাবীকাঠি আমাকে দিতেছিলেন, কিন্তু সে সমস্ত মহাশয়ের চরণে পছন্দাইয়া দিতে হেমলতাকে বলিয়াছি। ইতি তারিখ ২৮শে ভাদ্র ১২৯৫ সাল।

হস্তভাগ্য ভূতা

শ্রীনরায়ণ শঙ্করঃ।

এই ঘটনার কিছু কাল পূর্বে একবার অত্যধিক শীড়ার সময়ে আমি না বুঝিয়া বলিয়াছিলাম—এত পরিশ্রমে শরীর দিন দিন ঠগ ও ক্লম হইয়া পড়িতেছে, শরীর পাত না করিয়া কিছু দিনের জন্য আপনার বিশ্রাম স্থান পশ্চাটোড়ে গিয়া বাস করিলে হইত না? এই কথার উত্তরে তিনি অতি আন্তরিকতায় অঙ্গশূন্য নরনে বলিলেন, “আমার কি বাবার পথ রেখেছি? এই এক কাজে আমি আপনাকে এমন জড় করে কেলিছি যে কোথাও বাইবার উপায় নাই।” এই কথা বলিয়া অঙ্গশূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া হস্তহিত একখানি তালিকা পুস্তক আমার সম্মুখে কেলিয়া দিলেন। তাহাতে মাসিক দানের হিসাব থাকে। ঐরূপে নিষ্কণ্ট হওয়াতে তালিকার শেষ পাত্রে দেখিলাম, মাসিক দান ৮০০ আট শত টাকারও কমিক অধিক। এ তালি সমস্তই পরীক্ষিত হুঃখিনিগের মাসিক বৃত্তির হিসাব। এতদ্বির সাময়িক ও এককালীন দান স্বতন্ত্র ছিল। অভিমান করে ঐ হিসাব পুস্তক আমার সমক্ষে মিক্ষেপ করিয়া ঐমিহিতে ঐমিহিতে বলিলেন :—“আমার এক আত্মীয়-হৃদয়ের হাতে

২৫০০ টাকা দিয়া তিন মাসের অল্প বিদায় লইয়া গন্ত বৎসর একবার খন্দা চাড়ে গিয়াছিলাম। বাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছিলাম যে, মাস মাস বাহার বাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দিবে। আমার এমন পোড়া কপাল যে, এক মাস বাঠতে না বাইতে চারিদিক হইতে সংবাদ বাইতে লাগিল, ‘আমাদের পেটে ভাত নাই, উনানে হাঁড়ি চড়ে না, কেহই মাসহারার টাকা দেয় না।’ বাহার উপর ভার ছিল, তাহাকে লিখিলাম, অবাব নাই, শেষে লোকের তাগাদার জালায় কলিকাতার ছুটিলাম, আসিয়া আত্মীয়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—‘লোকে মাসহারার পার নাই কেন?’ স্নেহ উত্তর দিলেন, ‘অল্প কার্যের বড় ভিড় ছিল, তাই পাবি নাট।’ এই বলিয়া তিনি গা ঢাকা দিতেছিলেন, আমি লজ্জার মাথা খাটরা বলিলাম, ‘আচ্ছা না পারিয়াছ টাকাগুলি আনিয়া দাও, আমি যাহাকে যাহা দিবার নিজে দিয়া যাব।’ আমার সেই পরমাত্মীয়টী বলিলেন, :—‘হাঁ—তা—টাকা—টা—অল্প—বাবদে খরচ হইয়া গিয়াছে।’ বিভাগাগর মহাশয় যখন আমার নিকটে এই কথাগুলি বলিতে-ছিলেন, তখন হুঃখ, ক্ষোভ ও অভিমানের সমান সমাবেশে তাঁহার মুখে এক বিচিত্র ভাব দেখিয়াছিলাম; বিষাদপূর্ণ উত্তেজনার ভাবে বলিলেন, “তখনই ২৫০০ টাকা কর্কট করিয়া আনিয়া প্রত্যেকের তিন মাসের দেয় বৃত্তি এক-বারে দিয়া, অবশিষ্ট ছুই মাসের অল্প বিশ্রাম করিতে গেলাম।”

বিভাগাগর মহাশয়ের এই জীবনব্যাপী বিবিধ প্রকারের হুঃখ কষ্টের মধ্যে দু একটা স্নেহের বিষয় ছিল। শেষ দশর কলিকাতার কল্যাণলিকে লইয়া যখন বাজড়বাগানের বাটীতে বাস করিতেন, সেই সময় তাঁহার বালক দৌহিত্রেরা তাঁতার পতন আরামের স্থল হইয়াছিল। সান্ত্বিতা-সম্পাদক শ্রীবৃদ্ধ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর বতীশচন্দ্র সমাজপতি তখনও বালক; ইঙ্গলিগকে লইয়া এবং কনিষ্ঠা কস্তার পুত্রদ্বয়কে লইয়া সর্বদা আমদে কাল যাপন করিতেন। শ্রীমান সুরেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, এক এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বিভাগাগর মহাশয়ের বসিবার ঘরে পরিবারের সকলে মিলিত হইতেন। কস্তারা এক এক কোণে এক এক জন গাড়াইতেন, দৌহিত্র-গুলি কেহ বা দক্ষিণে কেহ বা বামে কেহ বা সম্মুখে কেহ বা পশ্চাতে গাড়াইত। বিভাগাগর সন্ধ্যার সকলকে লইয়া গল্প করিতেন। মধ্যে মধ্যে

সকলেই চর্কিত ভাষুলের উসেদার হইতেন, সকলকে একবারে দেওয়া সম্ভব হইত না, তাই পর্যায়ক্রমে পরে পরে পান দিতেন। তাঁহার প্রসাদী পান পাওয়াটা কতটা ও দৌহিত্রদের একটা বিশেষ সম্মান ও লাভের ব্যাপার ছিল। প্রসাদের প্রার্থী হইবামাত্র বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিতেন, আচ্ছা একটু বিলম্ব কর, পানে 'সম্বর' দেই। তাহার অর্থ এই যে পান খাইতে খাইতে একবার তামাক খাইতে হইবে। পানে 'সম্বর' দিয়া পরে গুণানুসারে পরে পরে সকলকে পান দিতেন। ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশু-দৌহিত্র শুভে (রামকমল) তাঁহার পরম প্রিয় পাত্র ছিল। এইরূপ পারিবারিক সাক্ষ্যসমিতিতে এই শিশুই প্রধান নটের কাণ্ড করিত। বিজ্ঞানাগর মহাশয় ইহাকে উপহার দিবার অল্প নূতন সিকি, ছয়ানী, আখুণি ও টাকা সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতেন। সে বালক চাহিবামাত্র তাহাকে দিতেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “দাদা, তুমি কাকে ভাল বাস?” শিশু বলিত “দাদামশাই, তোমাকেই খুব ভালবাসি, আর তোমার চেয়ে তোমার ঐ নূতন নূতন সিকি ছয়ানীকে বেশী ভালবাসি।” বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিতেন, “সকলেই তাই বলে, তবে তুমি বোঝ না তাই বলে ফেল, অস্ত্রেরা ও কথা স্বীকার করে না।”

বৈরাগ্যের ভাবপূর্ণ পত্রাদি লিখিয়া আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করার পর যখন বিজ্ঞানাগর মহাশয় কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত চিত্তে নিচ্ছন্ন বাস সন্ভোগ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার জননী দেবী কান্দি বাসের অল্প কর্তার নিকট গমন করেন। কান্দিবাস মনঃপুত না হওয়াতে শেষে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বীরসিংহে প্রতিগমন করেন। আগিবার সময়ে কান্দি হইয়া আসেন। সেখানে কর্তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কর্তাকে বাকী আনিবার অল্প অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাস তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কান্দিতেই থাকিতে চাহিলেন এবং গৃহীণীকেও কথার থাকিতে বলিলেন। ভগবতীদেবী কর্তার কথার উত্তরে বলিলেন, “তোমার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আমি যেখানেই থাকি, এই কান্দিতে আসিয়া তোমার আগে মরিব, আমার পর তুমি যাইবে। তাই বলিতেছি, এখনও কিলক আছে, বাকী চল।” ভগবতীদেবী যাহা বলিয়াছিলেন দৈববাণীর ভাষা তাহাই

ঘটিয়াছিল। ঠাকুরদাস পীড়িত হইয়া আগরকাল সন্নিহিত বোধে কলিকাতার ও বীরসিংহে সংবাদ দেন। তদনুসারে ১২৭৭ সালের ২রা কান্তন তারিখে দীনবন্ধু ও শঙ্কুচন্দ্র জননীকে সঙ্গে লইয়া কাশীযাত্রা করেন। এ দিকে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব-কর্ম ত্যাগ করিয়া পিতৃপরিচর্যার জন্য কাশী যাত্রা করিলেন। উপযুক্তরূপ সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধাদির সুব্যবহার ঠাকুরদাস আরোগ্য লাভ করিলেন। ১৫ই কান্তন ঈশ্বরচন্দ্র, জননী ও সহোদরদিগকে পিতার সেবার নিহন্ত্র-রাখিয়া কলিকাতার প্রেত্যাগমন কবেন। ঠাকুরদাস ক্রমে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন বটে, কিন্তু ভগবতী দেবী কান্তন চৈত্র হুটা মাস কাশী বাস করিয়া বৎসরের শেষ দিনে বিষম বিহুচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি পুত্র কন্তা পৌত্র পৌত্রী দোহিত্র দোহিত্রী, আত্মীয় স্বজনে চারিদিক পরিপূর্ণ ও সুপ্রসন্ন দেখিয়া, কঠোর নিকট পদধূলি চাহিতে চাহিতে ও সতুলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে লোকলীলা সংবরণ করেন। ঠাকুরদাস বদ্ধ বয়সে নিতান্ত বিপন্ন ও বিষন্ন হইয়াও গৃহলীকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমার আমি আর কি আশীর্বাদ করিব, তুমি পুণ্যবতী স্ত্রী, আপনার পুণ্য আপনিই আগে চলিলে, তোমারই জিত হইল।”

জননীর মৃত্যু সংবাদে ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মাতৃহীন বালকের মত সর্বদাই বোধন করিতেন। জননীর মৃত্যু কালে নিকটে থাকিতে ও সেবা করিতে পান নাই বলিয়া, নিরন্তর ক্ষুধাচিত্তে সর্বদাই কালাতিপাত করিতেন। কাশীপুরের গঙ্গাতীরে মাতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া একবৎসর কাল সর্বপ্রকার সুখ পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে স্বস্ত্রে পাক করিয়া, একাহার, নিরামিষ ভোজনে দিন যাপন করিতেন। যখন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িতেন, তখনই কেবল পত্নী দিনময়ী দেবী পাকাদি কার্যে সহায়তা করিতে পাইতেন; একবৎসরের জন্য বিনাশা, ছত্র ও কোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি দীন দুঃখীর জায় কারক্রেপে দিন যাপন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল জননীর শোকে অতি বিষম ভাবে নির্জনে বাস করিয়াছেন। মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র তলস্ত চিত্তে জননীর শুণাবলী ধ্যান করিতেন। জননীর লোকান্তর গমনের দীর্ঘকাল পরেও প্রেমস্রবসে যখন একবার তাঁহার পরমারাধ্যা গুণময়ী মাতার শুণের উল্লেখ করিতে



৩ ব্রহ্মনাথ মুখোপাধ্যায়।

হইরাছিল, তখন তিনি নিতান্ত অসুস্থ ; তাঁহাকে অসুস্থশরীরে শিশুর ভার কাতর ক্রম্ভনে অতিভূত হইতে দেখিয়া, আমি বলিরাছিলাম, “আপনাকে এক কষ্ট দিব জানিলে, আমি এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতাম না।” শুণবান পুত্র অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার কষ্ট দিলে কোথায় ? তুমিত আমার বহুত্ব কার্য করিলে, তোমার প্রয়োজন সাধনেও ত এখন আমার মায়ের কথা মনে পড়িল, মায়ের নামে দুর্কোঁটা চক্ষের জল পড়িল, এও ভাল ; এতই দুর্দশা যে, সর্বদা সকল সময়ে পিতা-মাতাকে স্মরণ করিতে পারি না।”

মাতৃবিয়োগে ঈশ্বরচক্রেয় মনে কিরূপ হারী বিবাদের সৃষ্টি কবিয়াছিল, তাহার প্রিয় সুহৃদ কৃষ্ণনগরনিবাসী ৮ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃবিয়োগে যে সাধনা পত্র লিখিরাছিলেন, তাহাতেও তাহার সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। সন্দেহ ব্রজবাবু পত্রখানিকে একরূপ মূল্যবান উপহার বলিয়া মনে করিতেন যে, উক্ত পত্রের আবরণের উপর সহস্রে লিখিয়া রাখিরাছেন, “যাবজ্জীবন এই পত্রখানি বন্ধ করিয়া রাখিব।” সেই পত্রখানি এই :—

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শরণম—

সাদর সন্তাষণমাবেদনম্—

চণ্ডীর (ডিপজিটরীর পূর্বতন ম্যানেজার বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়) মুখে শুনিলাম, গত গুরুবার জননীদেবী মানবলীলা সংবরণ করিরাছেন। সকল দিক্ বিবেচনা করিরা দেখিলে তাহার দেহান্ত সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হইরাছে। তিনি দান্তানামুক্ত হইলেন এবং আপনাকে জীবিত দেখিয়া দেহত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে আপনার দশদিক্ শূন্য হইল। অন্তঃপুর সংসার-মাত্রা কেবল বিড়ম্বনার স্থান হইরা উঠিল। যে কয় দিন জীবিত থাকিবেন, আর অদ্বৈতময় দেহ সন্তাষণ করিতে পাইবেন না। বাহ্য হটক আপনি তাঁহার শেষ দশায় তৃপ্ততা করিতে পারিরাছেন এবং অক্লিম সময়ে সন্নিহিত থাকিরা তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বা তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার অবকাশ পাইরাছেন, ইহা আপনার পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা মনে, কিন্তু আপনাকে বেকরূপ জানি তাহাতে আপনি বিলক্ষণ মাতৃদেব ছিলেন,

সুতরাং সহসা মাতৃশোক সংবরণ করা আপনার পক্ষে বিভাগ সহক ব্যাপার হইবেক না।

এই সংবাদ শুনিয়াই আমার আপনার নিকট বাইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ১৫১৬ দিন হইতে শিরোরোগ ও 'নিদ্রার' ব্যাধাত বিলম্ব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। একেই অতিশয় দুর্বল, তাহাতে এই কয় দিনে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। এ অবস্থার স্থানান্তরে বাওয়া আমার পক্ষে কোন মতে সম্ভাবিত নহে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও মতে বাইতে সাহস করিতে পারিলাম না। অপরাধ মার্জনা করিবেন। ইতি ১৬ই মাঘ ১২৮৪ সাল।

স্বদেবাক্ষরঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা :

বিবিধ অশান্তি ও দুঃখ কষ্টের সংসারে একে একে তাঁহার শ্রিয়জনগুলি বিদায় গইতে লাগিলেন। পূর্বে জননীর দেহভাগ নিবন্ধন দীর্ঘকাল নিঃস্নান বাসে কালাতিপাত করিয়াছেন। সে শোকের সংবরণ হইতে না হইতে, আর এক ভীষণ দুর্ঘটনার বিভাগাগর মহাশয়কে এক কালে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ১২৭২ সালের ২৩এ মাঘ বিভাগাগর মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত ব্রহ্মপ সর্বজনপ্রিয় পরম মেহাম্পদ ভোক্তা আমাত্য গোপালচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় দারুণ বিন্ধুচিকা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে বিভাগাগর মহাশয় দীর্ঘকাল হতাশ ও বিষম ভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। এই ঘটনাসূত্রে পারিবারিক জীবনে যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহারও উল্লেখ আবশ্যিক। ভোক্তা কস্তা হেমলতা দেবী বনন জীবনব্যাপী বিবাদ ও বহুবার পরিচারক বৈষম্যাত্মকতার সূচনা করিলেন, তখন বিভাগাগর-পরিবারে এক মহা শোকের ব্যাপার চলিতে লাগিল। কস্তার তরুণ জীবনে বেশভূষার পরিবর্তন ও আহারাদির সংঘর্ষ শিশুসঙ্গে গভীর মনোবেদনার সৃষ্টি করিল। এই দুঃখকষ্টপূর্ণ সংসারের সর্ববিধ অসুবিধাকে সাহসে বরণ করিতে, কস্তার কোমল প্রাণে যে রেশ হইয়াছিল, সমস্তর পিতা মিলে তাহার জংশ গ্রহণ করিয়া জনসমাজসমক্ষে পারিবারিক জীবনের

উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কল্পা যখন নিরামিষ-একাহারে গ্রাণ ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বিভাগ্যগর মহাশয় অতি স্বাভাবিক ভাবে মংস্ত ত্যাগ করিলেন ও রাত্রির আহার কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেন। যখন আহারে বসিতেন, হুঃখিনী বিধবা কল্পার কঠোর জীবন বাপনের কথা মনে হইত, আর আহারে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিতেন না। কল্পা মংস্ত ত্যাগ করিয়াছে, এই চিন্তার প্রবলতার তিনি মংস্তাদি মুখে জ্বলিতে পারিতেন না, রাত্রিতে আহারের সময়ে, কল্পা উপবাসিনী, এই চিন্তাতেই তাঁহার ক্ষুধা তৃপ্তা আপনা আগুনি লোপ পাইত।

আমরা সমাজ সংস্কার অধ্যায়ের সূচনায় এক স্থানে বলিয়াছি :—“সুপ্রবীণ পিতা নিজের অন্নবরজা বিধবা কল্পার বৈধবানুষ্ঠানের বিষাদরাশির মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষে বালিকা পত্নীকে পাইয়া পরম সুখে কাল বাশন করিতেছেন, কোমলপ্রাণা কল্পা ও ভগ্নীকে ব্রহ্মচর্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কি এইরূপ হইবে?” বিধবাবিবাহের পথপ্রদর্শক নারীসুহৃৎ বিভাগ্যগর মহাশয়ের পারিবারিক জীবনে করুণজনক অভিজ্ঞাবকের আদর্শ চিত্র কি পরিস্ফুট হয় নাই? যেখানে ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন, সেখানে কার্যাতঃ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা কিরূপে কল্পার এইরূপ পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অনুকরণের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিছু দিন পরে বিধবা (জোঠা) কল্পাট বহু সাধ্য সাধনায় পিতার নিরামিষ ভোজন ও একাতারের নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কল্পা এরূপে হুঃখিনী হইলে, পিতা মাতার সহানুভূতিই কল্পার পরম সম্পদ। চুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশের অনেকেই সে সমবেদনা প্রকাশের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবগত নহেন, সে বিষয়ে বিশিষ্টরূপ চিন্তাও করেন না।

কান্ধিতে জননীর মৃত্যু হওয়ার্তে দীর্ঘকাল আর কান্ধি বাইতে সম্মত হয় নাই। পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় বহুকাল পুত্রের সুখাবলোকনে ব্যক্তি, তাই পুত্রকে একটীবার একদিনের জন্য কান্ধি বাইতে অস্বরোধ করিয়া নির-
লিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন :—

“প্রীতীকর:—

শরণম্

গুভানুধ্যায়ি শ্রীঠাকুরদাস দেবশরণঃ

পরমগুভানীর্কাদ-বিজ্ঞাপনমিদম্—আমার ৮৩ বৎসর বয়স হইল, বিশেষতঃ এই অবসর সময়ে সর্বদা আমার ত্রাস্তি হইয়া থাকে, তুমি আমার বংশের শ্রেষ্ঠ, এতাবৎকাল তুমি আমার ভরণ পোষণ প্রভৃতি করিতেছ, এক্ষণে আমার মানস তোমার মুখ দর্শন করি। অতএব লিখি, যতপি তুমি শরীরগতিক সচ্ছন্দরূপ সুস্থ থাক, তাহা হইলে ইতি মধ্যেই এখানে এক দিনের জন্ত আসিয়া আমার মানস পূর্ণ করিবে। ইতি ঐষ্ট পৌষ।”

বিভাগসাগর মহাশয় এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র পিতৃচরণ দর্শন মানসে কান্ধি যাত্রা করেন। কয়েক দিন পিতার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সর্বপ্রকার সুখ ও সুবিধা সাধন করিয়া পরে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তৎপরে ১৪ই চৈত্র ঠাকুরদাসের পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া একে একে অনেকেই কান্ধিতে উপস্থিত হন। সন ১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখ সন্ধ্যার প্রাকালে ঠাকুরদাস হৃৎকণ্ঠময় সংসার তার উপযুক্ত পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তে রাখিয়া পরিজন ও পুত্রপুত্রের জোড়ে দেহ ত্যাগ করিলেন। পিতার মৃত্যুতেও ঈশ্বরচন্দ্র অনাথ বালকের জায় রোদন করিয়াছিলেন। বিলম্ব হইতে দেখিয়া সকলে তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্য মরণ করাইয়া দিলে, তিনি শান্ত ভাবে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া আড়ম্বর-বিহীনভাবে আপনাই পিতার মৃতদেহ মণিকর্ণিকার ঘাটে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। সাহায্য করিবার জন্ত অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। বিভাগসাগর মহাশয় বহু লোকের সমাগম দেখিয়া, ‘আমরাই সমস্ত করিব।’ এই বলিয়া নিষ্ট কথার ভয়লোকদিগকে বিদায় দিলেন। অস্তোষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে দ্বান ভূর্গাদি শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া পিতা মাতার শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সুপণ্ডিত, জ্ঞানী ও সুপ্রবীণ বিভাগসাগর মহাশয় চিরজীবন পিতা মাতার সর্ববিধ সুখ সাধনে পরম তৃপ্তি অহুতব করিয়াছেন; যা বাশের অহুগত হইয়া চলাই তাঁহার পরম দর্শ বলিয়া জান ছিল এবং সেই বিভাগ অহুসারে সর্বদা দেবভাষাষে পিতা মাতার সেবা করিয়াছেন। আজ, সেবক, শেষ দেবতা হারাইয়া চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। আজ সে মধুসূর্তি

মাতৃদেবীও মাই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সংকল্পশীল ও জ্ঞাননিষ্ঠ শিশুদেবকেও স্বহস্তে
 প্রশান-ভয়ে পরিণত করিয়া আসিলেন। তাই আজ বালক অপেক্ষা অসহায়
 হইয়া রোদন করিতে করিতে রজনী বাপন করিলেন। তাঁহার পক্ষে বালকের
 জ্ঞান রোদন করা অতি স্বাভাবিক। ঠাকুরদাসের জ্ঞান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ধর্মনিষ্ঠ ও
 ত্রিভাকলাপসম্পন্ন আদর্শ হিন্দু গৃহস্থ অধিক মিলে না।* তিনি ধর্মবোধে
 গৃহকর্ম সকল সম্পন্ন করিতেন, ধর্মবোধে তিনি বৃগবাপী ক্লেশ স্বীকার করিয়া
 ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রুতিকা লাভের সজ্জায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দিবারাত্রি
 সন্তানের জ্ঞানোন্নতির জন্য শ্রম করিয়াছিলেন। নিজের উপার্জিত সামান্য
 আয় হইতে সম্ভবমত শতবিধ সদনুষ্ঠানে নিজ পরিবারবর্গকে নিরুক্ত রাখিতেন ;
 সেই জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র বংশগুণে ও পারিবারিক সদনুষ্ঠানাদির সুবাস্তাবে আশীশব
 শ্রুতিকা লাভ করিয়াই লোকসেবাপরায়ণ পুরুষরূপে পরিণত হইয়াছিলেন।
 বহুসংখ্যক অনাথ বালক তাঁহার বীরসিংহের বাটিতে লালিত পালিত ও শিক্ষা
 প্রাপ্ত হইয়াছে। একদিনের অন্তও তাহার পরগৃহে বাস করিয়াছে বলিয়া
 মনে করিতে পারে নাই ; কারণ ঠাকুরদাস, প্রিয়তম পৌত্র নাবায়ণ ও সেই
 সকল অনাথ বালকদের আহার বিহারে কিছুমাত্র তায়তমা করিতেন না।
 এক্ষণ উচ্চ উদার লোকহিতৈষণার জোড়ে পালিত হইয়াই বিভাগাগর দ্বার
 সাগরে পরিণত হইয়াছিলেন। জেমস্ মিল, জনষ্টার্টমিলের শ্রুতিকালাভে
 সহায়তা করিয়া অগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ঠাকুরদাস নিজ অধ্যবসায়
 ও সাধনা গুণে ঈশ্বরচন্দ্রকে জনসমাজের সুসদৃশ্যে পঠন করিয়া জেমস্ মিলের
 জ্ঞান অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মিল শিশুবিদ্যাগে আপনাকে বালকের
 জ্ঞান অসহায় বোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রও শিশুবিদ্যাগে অজ্ঞাতাঙ্কিত ছিন্ন
 তরুর জ্ঞান ভুলশারী হইয়াছিলেন। ঠাকুরদাস গ্রামবাসীর প্রতি এক্ষণ
 অসুস্থ ছিলেন যে, তাঁহার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে নিত্যকাল বিদুল বলিয়াই বোধ
 হয়। বিধবাবিবাহ বিষয়ে গ্রামবাসিগণের মধ্যে বাহারা বিদ্রোহী ছিলেন
 তাঁহারা সুযোগ পাইলে ঠাকুরদাসের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন
 না। প্রসঙ্গক্রমে বিভাগাগর মহাশয় একবার জাহান্নাবাসের তলানীস্থান ভেপুটী
 ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র খোবাল মহাশয়কে ঐ কথা বলেন। খোবাল মহাশয়
 বক্ষঃস্থলে ব্রহ্মণে বাহির হইয়া বীরসিংহে উপস্থিত হন। সেখানে ঠাকুরদাসের

শিক্বেহ সন্তোষ করিয়া বলিলেন, “বিভাসাগর মহাশয়ের নিকট গুনিয়াছি, গ্রামের লোক আপনার উপর বড় অত্যাচার করে, তাঁহাদের নাম আমাকে বলিতে হইবে।” ঠাকুরদাস হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “সে কলিকাতার থাকে, কার মুখে কি গুনিয়াছে, তাহার কথা উপর নির্ভর করিয়া এখানকার কাহাকেও কিছু বলিও না। ইহারা সকলেই আমার উপর সদাশ্রম।” বোবাল মহাশয়কে এই কথা বলিয়া গ্রামবাসীগণকে গোপনে সংবাদ দিলেন যে হাকিম বিধবাবিবাহবিবাহী পক্ষের লোকদের দোরায়ের কথা কোথা হইতে গুনিয়া আসিয়া আমার নিকট নাম চাহিতেছেন। আমি কাহারও নাম করি নাই, বরং বলিয়াছি আমার সঙ্গে সকলের বেশ সম্বাদ আছে। তখনই হাকিমের সামনে এক একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বাইবে। তাহ হইলেই সব গোল মিটিয়া যায়। * এরূপ লোক নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

মানসিক উত্তেজনা ও উত্তেজনা নিবন্ধন পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বিভাসাগর মহাশয়ের শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাঁহারও বিশ্রুচিকা রোগের লক্ষণ দেখ দিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অনেকে কাঙ্গী ত্যাগ করিয়া সেই দিনই কলিকাতা যাত্রা করিতে পরামশ দিলেন। বিভাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা, সেই থানেই আত্মকৃত্য শেষ করিয়া কলিকাতার আসিবেন। তিনি এইরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অশোচাবস্থার ঔষধাদি সেবন নিষিদ্ধ বলিয়া অবশেষে সকলের পরামশ মত সেই রাত্রিতেই কলিকাতা আসা স্থির হইল। কলিকাতার আগমন করিয়া ক্রমে অল্পে অল্পে ঐ বোধ করিতে লাগিলেন। ধ্যানমগ্নে শ্রাদ্ধাদি কার্য সন্ধান করিয়া বহুকাল অতি নিরুত ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সহজে কোথাও কোন কার্যে লিপ্ত হইতেন না। বিশেষ প্রয়োজনে কাহারও কর্তৃক অত্যধিক অসুস্থ হইলেই কেবল তাঁহাদের কার্যকলাপে যোগ দিতেন, নতুবা সর্বদা নির্জনবাসেই কালাযাপন করিতেন। নির্জনবাসকালে জ্ঞানচর্চা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্যক অধ্যয়নই তাঁহার জীবনের শেষজাগরণ প্রধান কার্য হইয়াছিল।

* ঐদৃক বায়ারদেহ বিভাসাগরের নিকট এই ঘটনাটি গুনিয়াছি।

শরীরের অবস্থা দিন দিন নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িতেছে যদিহা বিভাগস্বরূপ মহাশয় সময়ে সময়ে এক একখানি অস্ত্রিম বিনিয়োগপত্র (উইল) দ্বারা নিজের সম্পত্তি ও তাহার আর হইতে কিরূপ ব্যয় হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। তাহার সর্বশেষ উইলের যে যে অংশ সাধারণের জানিবার উপযোগী তাহাই এখানে প্রদত্ত হইল ।)

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অস্ত্রিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্বতন সমস্ত বিনিয়োগ নিবস্ত হইল।

২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ নাথ সিংহ, আমার ভাগিনের জনপুত্র নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন জনকে আমার এই অস্ত্রিম বিনিয়োগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম। তাহারা এই বিনিয়োগ পত্রের মন্ত্রালুদ্বারা বাবতীর কার্য নির্বাহ করিবেন।

৩। আমার সম্পত্তির উপস্থাপন হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতি, কুটুম্ব, আত্মীয় প্রভৃতির ভরণ পোষণ ও কতিপয় অস্থানীয় ব্যয় নির্বাহ হইয়া আসিতেছে, ঐ সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, আমার উত্তমর্ণেরা দেয় প্রকৃতির লোক নহেন। কার্যদর্শীরা তাহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রাপ্তি প্রচলিত থাকিয়া তাহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবং মৃত আত্মীয় ও বন্ধুসিংহের পরিবারবর্গের জন্য বিভাগস্বরূপ মহাশয় তাহার উইলে যে মাসিক দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার মোট সমষ্টি ৫৬১ টাকা, আর বৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪৫। এতদ্বিত্তি, প্রয়োজন হইলে অপর ৬ জনের সম্বন্ধে ১০৫ টাকার বৃত্তি নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং এই শেষোক্ত বৃত্তি দান বিষয়ে কার্যদর্শনগণের উপর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত বৃত্তি দানের কমত দিয়াছিলেন। তাহার অন্তর্থা হইলে, সে সকল বৃত্তি দান বিষয়ে বিবেচ্য ব্যক্তির উদ্বেগ আছে।

১৪। আমি অবিভ্রমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্থাপন হইতে যে অনুরাগে
যে রূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে :—

| | | | |
|----|--|-----|--------------|
| ১। | অন্নভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয় | ১০০ | টাকা |
| ২। | ঐ ঐ চিকিৎসালয় | ৫০ | টাকা |
| ৩। | ঐ ঐ অনাথ ও নিরুপায় লোক | ৩০ | টাকা |
| ৪। | বিধবাবিবাহ | ১০০ | টাকা |
| | | | মোট ২৮০ টাকা |

উইলের ১৪শ প্যারার নির্দেশনাত দানের তালিকা দৃষ্ট বঝা যায় যে,
তাঁহার কি কি কার্যের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ ছিল। এদেশের শিক্ষা
বিস্তার ও বিধবাবিবাহ প্রচলনপক্ষে যে তাঁহার জীবনব্যাপী অনুরাগ ছিল,
তাঁহার অন্তিম বিনিয়োগ পক্ষেও তাহার বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৫। যদি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পালিত,
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত এই তিন জন আমার দেহান্ত সময় পর্যন্ত আমাব
পরিচরক নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে কার্যদর্শীরা তাঁহাদের প্রত্যেককে
এককালীন ৩০০ টাকা দিবেন।

১৬। এইক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্থাপন আছে, যদি উক্তর কালে
তাঁহার পক্ষতা হয়, তাহা হইলে ঐহাকে অথবা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্বন্ধ
করিলাম, কার্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনানুসারে তাহার ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৭। আবশ্যক বোধ হইলে কার্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ
বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে
বিক্রয় হইতেছে, আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ সুখোপাধ্যায় বাবু
জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন, তাৎকাল পর্যন্ত আমার
পুস্তক সকল ঐ স্থানে বিক্রীত হয়। তবে এক্ষণে যেহেতু সুপ্রাণীতে
পুস্তকালয়ের কার্য নির্বাহ হইতেছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ও তদ্বিবন্ধন

কতি বা অসুবিধা হইলে, কার্যাদেশীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন । *

এই উইলের তারিখ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২৮৭ সাল ; †

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,
) মোঃ স্কনিকাতা ।

উইলের সাক্ষী ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । শ্রীনীলমাধব সেন । (ডাঃ)
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় । শ্রীযোগেশচন্দ্র দে ।
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন । শ্রীবিহারীলাল ভাঙ্কড়ী ।
শ্রীভ্রামাচরণ দে । শ্রীকালীচরণ ঘোষ ।

তিনি সন ১২৮৩ সালের শেষভাগে বাজুড়বাগানে স্বরূপ নূতন বাড়ীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের পরম প্রিয় পুস্তকালয়টিকে স্থান্য করিয়া সাজাটেরা মনের দীর্ঘকালস্থায়ী হুঃখ দূর করিলেন । পুস্তকোচ্চারণ পরিশোধিত নির্জন কুহু বাটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আনন্দ এট ছিল যে, একাকী বসিয়া লেখা পড়া করিবার বিস্তর অবসর পাটাতেন, এবং দিবারাত্রি কোন না কোন একখানি পুস্তক লইয়া জ্ঞানচক্কা বা শাস্ত্র পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন ।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি প্রাথমিক বিলাত-বাগ্মিন্যের পৃষ্ঠপোষক হইয়া যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে নানা কারণে বিলাত যাওয়ার বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছিলেন । শেষে আবার আধুনিক কালের কাহারও কাঙ্ক্ষিত, বিশেষতঃ মিউজিয়ান শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র গুপ্তের বিলাত গমনে সন্মতি ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন । এই সময়ে

* নানা কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতে এই ব্যতিক্রম হইয়াছিল ।

† ইহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া বজুড়বাগানে এই উইল পরিবর্তনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কাহ্যতঃ হইয়া উঠে নাই । ইহার শোকাভরত সময়ে অত্যন্তকাল পুস্তক উহার অভিপ্রায়বদ্ধ এক সংশোধিত উইল প্রস্তুত হইয়াছিল, অপরাপর অংশ অনুযোজিত হইলেও বেটুপলিটন কলেজে সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিবার অবসর লইতে দিয়া পীড়া হুঁড়ি হুঁড়ি পড়িলেন আর সংশোধিত উইল স্বাক্ষর করা হয় নাই ।

একবার জ্যোত দৌড়ি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিলাত বাইবার জন্ত অন্তত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এতদূর প্রস্তুত হইয়াছিলেন যে, গোপনে জননীর অনুমতি লইয়া বিভাসাগর মহাশয়ের অজ্ঞাতসারেই বিলাত যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্রের জননী অতি বুদ্ধিমতী রমণী। তিনি এই সকল গোপন আয়োজন দেখিয়া বলিলেন, “তুমি ছেলে হয়ে যেমন আমাকে না বলিয়া যাইতে পারিতেছ না, তোমাকে বাইতে দিবার আগে যেহেতু ব’লে আমারও কি বাবাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়?” • তখন সুরেশচন্দ্র বিলাত যাত্রার বিশেষ প্রতিবন্ধক দেখিয়া অনন্তোপায় হইয়া মাতামহের অনুমতি প্রার্থনার স্বযোগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। আর বিলম্ব সহ্য না, এমন সময় একদিন এই কথা বলিবার জন্ত কতবার যে বিভাসাগর সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন তাহা বলিবার নহে। তিনি দৌড়িদের বারংবার ছুটুছুটিতে সন্দেহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোব কিছু দরকারি কথা আছে বলিয়া বোধ হয়, তা কিছু থাকে ত বল্না।” সুরেশচন্দ্র বলিলেন, “আমি বিলাত যাইব?” বিশ্ববিনিষ্ট রহস্তেব স্বরে বিভাসাগর মহাশয় বলিলেন, “কি? বারিষ্টার হয়ে এসে চাকবীর জন্ত আমারই উদ্দেশ্য করবি তো?” তারপরে রহস্ত ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “টাকা কড়ির বড় অনটন হইয়া পড়িয়াছে, এ অবস্থার আর হয় না।” বালক তখন নিতান্ত নিরাশ ও বিপন্ন হইয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, শেষে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয় ও বাবু কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের উপরোধে ও অনুরোধে তিনি দৌড়িকে বিলাত পাঠাইতে সন্মত হন। কিন্তু পরিশেষে পীড়া বৃদ্ধি হওয়ার সে চেষ্টা আর কার্যে পরিণত হয় নাই।

এই বিলাত যাওয়ার কথাবার্তা লইয়া বাটার ভিতরে একদিন বালক জননীর সহিত কথা কহিতে কহিতে বলিয়া ফেলিলেন, “আমার বাবা থাকলে কি আর তোমার বাবার কাছে আশ্রয় করিতে যাইতাম?” এই কথা করতী জননীর কণ্ঠে বহুসম বিদ্ধ হইল, এদিকে বিভাসাগর মহাশয় উপরের জানালা

* জ্যোতা কল্পা এই সকল সন্দেহই পিতার বিশেষ মেহের পাত্রী ছিলেন। তাই সকল বিষয়ে পিতার নিকট আশ্রয়, উপরোধ ও অনুরোধ চলিত। চলিত বলিয়াই অনেক সময়ে দুঃখ পাইলেই একমাত্র সহোদরের জুখ ও সুবিধাসাধনে বিবৃত হইতেন না।

হইতে দৌহিত্রের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন। ঐ কথা তাঁহার কণ-গোচর হইবামাত্র তিনি দৌহিত্রকে ডাকেন এবং ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, গভীর কোভ ও অভিমানে বহুক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, “তোরা আমাকে পর ভাবিস। সে থাকলে তোদের জন্ত ঘাড়া কবিত, আমি তার চেয়ে ক্লি কম করিতেছি?” শেষে অশ্রুশচক্স নিজেই অন্ন বৃদ্ধির দোহাই দিয়া দোষ স্বীকার করিয়া বহু পীড়াপীড়িতে তবে দাদামহাশয়ের মানতজন ও কোভ নিবারণ করিতে সক্ষম হন।

একটা দুটা কি ততোধিক অথচ অন্নসংশাক বহুবাক্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিরূপ যত্নের সহিত আহার করাইতেন, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু একটা ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। একবার রায় রামগতি মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ও শ্রীকৃষ্ণপুর নিবাসী জমিদার শ্রীমুক্ত দারকানাথ মিত্র মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দারিক বাবুর একটা ছোট ছেলেকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। আহারের সময় নিকটে বসিয়া কে কোন তরকারি পাক করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিতেছেন, মিত্র মহাশয়ের বালক-পুত্র বিভাসাগর-বাটীর বৃহৎ আরোহণ আরম্ভ করিতে পারিতেছে না। বিভাসাগর মহাশয় নিকটে বসিয়া ঐ একবার দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া শেষে হুতা ত্যাগ করিয়া নিজে জননীর মত অন্ন বাছন মাখিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রাস প্রস্তুত করিয়া তাহার পাইবার সুবিধা করিয়া দিলেন। সরলতা, উদারতা ও সেবার ভাব এই ঘটনাটিতে কেমন পরিফুট হইয়াছে! এতদ্বিধ বৃহৎ ব্যাপারে, সমারোহের কার্যে তিনি এদেশীয় পদ্ধতি অনুসারে বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত উপবাসে অপেক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মণ ভোজন হইতে ইতর জাতীয় প্রত্যেক লোকটার আহারের পরিসমাপ্তি না হইলে নিজে আহার করিতেন না। কত মিষ্ট কথাই অত্যাসক্তের অত্যর্থনা করিয়া শেষ পর্যন্ত পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রতি সমানর প্রদর্শন করিতেন। তৃতীয়াবশতঃ আজকালকার দিনে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল হইয়া পড়িতেছে।

১২৮০ সালের শেষ ভাগে বাহুবাবাগানের বাড়ীতে আসিবার পূর্বে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বিভাসাগর মহাশয় অনেক সময়ে বাস করিয়াছেন। সুতরাং ঐ পরিবারের আবার বৃদ্ধ সকলেই

যে তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইরাছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রথম চাকরীর অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিধবাবিবাই প্রকৃতি সর্ববিধ অনুরূপে বিভাগাগর মহাশয় তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র রাজকুমার বাবুর সহকারিতা পাইয়াছেন, এবং দীর্ঘকালের একত্র বাস নিবন্ধন সকলেই' যেন তাঁহার আপনাব লোক হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ একটা ক্ষুদ্র বালিকা সমান্তর করে ক দিনের জন্য রাজকুমার বাবুর গৃহে শোভিতরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিভাগাগর মহাশয়ের শিশুপ্রিয় জন্মের দীর্ঘকালস্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল। বালিকাটির নাম ছিল প্রভাবতী। বালিকার রাজত্ব বিস্তার, তাঁহার বিচ্ছেদ এবং তদ্বিবন্ধন বিভাগাগর মহাশয়ের কাতরতার পবিচায়ক করে ক পণ্ডিত "প্রভাবতী সস্তাষণ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

প্রভাবতী সস্তাষণ।

বৎস প্রভাবতী ! তুমি সকলেব মমতা পরিত্যাগ করিয়া, একেবারে নরনের অন্তরাল হইয়াছ, কিন্তু আমি অনন্তমনাঃ হইয়া, একরূপ অবিচলিত দ্বৈতভাবে, নিরন্তর তোমাব অনুরূপ করি যে, তুমি এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার নরনপথেব অতীত হইতে পার নাই। প্রতিক্ষণেই আমার স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যেন তুমি বসিয়া আছ, আমার অন্তরমানে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, নীনা (১) বলিয়া কবপ্রসারণপূর্বক কোলে হইবার নিমিত্ত কহিতেছ, যেন তুমি উপরের জানালা হইতে দেখিতে পাইয়া, আর না বলিয়া, সলীল কর-
'সকালন সহকারে, আমার আহ্বান করিতেছ; যেন আমি আহ্বাব করিতে গিয়াছি, তুমি, তোর সঙ্গে খাব বলিয়া, আমার কোলে আসিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছ, যেন আমাব কোলে বসিয়া আহ্বার করিতে করিতে কৌতুক কথিবার নিমিত্ত, রাগী শোলো (২), বলিয়া আমার জানুতে মস্তক বিস্তৃত করিয়া, পীঠাপরি শরন করিতেছ, যেন আমি আত্মরাস্ত্রে আসন হইতে

(১) নেনা।

(২) রাগী গইল। আমি আদর করিয়া তোমাব রাগী বলিয়া আশ্বাস করিতাম, তুমিও কখন কখন কৌতুক করিয়া আমরাস্ত্রে রাগীপদে নিঃকল করিতে। তোমার এই মল্ল-
শরনালীনা অবলোকন করিয়া ব্যক্তিগতরূপেই পুলকিত হইতেন।



Raskrihna Banerjee

উপান করিবামাত্র, তুমি আমার সহিত বগড়া করিতেছ, আর সকলে আফ্লাসে গদগদ হইয়া, উৎসুকচিত্তে শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন (৩)।
 যেন আমি বিকালে জল খাইতে গিয়াছি, তুমি কোলে বসিয়া আমার সঙ্গে জল খাইতেছ, এবং জল খাওয়ার পর, তুমি (৪) মে বলিয়া, আমার মুখ হইতে সুগারী বহির্গত করিয়া লইতেছ ; যেন তুমি, বাহিরে আসিবার নিমিত্ত, আমার জোড়ে আরোহণ করিয়াছ, এবং সিঁড়ি নামিবার পূর্বকণে আমার চিবুকধারণ পূর্বক কহিতেছ, নাফাস্নি পড়ে যাব, আমি কৌতুক করিবার নিমিত্ত কহিতেছি, না আমি লাফাব ; তুমি অমনি তোমার জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিতেছ, দেখ দিকি মা (৫)। যেন তোমার দাদারা, ভাঙে আর তোমার ভাগ বাসিবেন না, এই বলিয়া পরিচাল করিতেছে, তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া, পাছে আমি না ভাগ বাসি, এই আশঙ্কায় ভাগ বসবি, ভাগ বসবি (৬), এই কথা আমার, অল্পপমের শিরশ্চালন সহকারে, বারংবার কহিতেছ (৭), যেন আমি, খাব খাব বলিয়া, তোমার মুখচুষনের নিমিত্ত, আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছি, তুমি, এই খা বলিয়া, ডাইনের

(৩) তুমি এই তৃতীয় বগড়াকালে একদা বহুজ্ঞা বা কানিষ্ঠা'র অন্তঃকালনাশ করিতে যে, তৎকালে 'নষ্ট'র সামবেদন জন্মে অনিস্কটন'র আনন্দস্বাভা'র অকৃতপূর্ণ (কৌতুকরসে উজ্জ্বলিত হইত। যন্ত্রণা, এই ব্যাপার ১৩ মণ্ডর ও ১৩ সীতলর বোধ হইত যে, তাহা প্রত্যেক কারিবার নিমিত্ত, অনেক ভৎসন'কাব লগ্ন'রমান পারিত।

(৪) ছুখানি ।

(৫) তুমি এমন ভীষণভাবা ছিল যে কখন সাহস করিয়া পাড়ি চড়িত পার নাই, এবং সেই ভীষণভাববশত, পড়িয়া ঘাইবার আশঙ্ক'র, সিঁড়ি নামিবার পূর্বকণে, আমার সাবধান করিয়া দিতে ।

(৬) ভাগ বাসিবি, ভাগ বাসিবি ।

(৭) এই বিষয়ে এক দিনের ব্যাপার অরুণ করিল। সন্ধ্যা বিলম্ব হইয়া যায়। আমি বাহিরের ব্যস্ততার বলিয়া আছি, তুমি বাড়ির ভিতরে বসে ঘরের জামান'দ টাড়াইয়া, আমার সঙ্গে কোণপকণ করিতেছ, এমন সময়ে নন্দী কৌতুক করিবার নিমিত্ত করিল, ভাঙে আর তোমার ভাগ বাসিবেন না। তুমি অমনি শিরশ্চালন পূর্বক বসবি, ভাগ বসবি বলিয়া আমার বারংবার দ্বিজ্ঞাসা করিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন আমি ভাগ বাসবি বলিয়া, অবিলম্বে তোমার পড়া দূর করিলাম, সে দিবস সকলের অজ্ঞান'র, আর ভাগ বাসবি না, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলাম, তুমিও প্রতিবারেই, না ভাগ বসবি এই কথা কহিতে লাগিলে। অবশেষে, আমার দুঃসন্তোষ দেখিয়া, তুমি কিঞ্চৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া যখন, তুমি ভাগ বসাবি, আমি ভাগ বসবো, এই কথা একদা যখন বহুজ্ঞা ও স্নেহের সহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তৎকালে সঙ্গীত বাজিবারেরই অজ্ঞান'র অন্তঃকৃতপূর্ণ প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল। আমি যখন বহু, বাব'জীবন এই ব্যাপার বিস্তৃত হইতে পারি না ।

গাল কিরাইরা দিতেছ; আমি, খাব না বলিরা, মুখ কিরাইতেছি; তুমি, তবে এই খা বলিরা, বামের গাল কিরাইরা দিতেছ, আমিও খাব না বলিরা, মুখ কিরাইতেছি; অবশেষে তুমি, আর কিছু না বলিরা, বেন উপারান্তর নাই ভাবিরা, আপন অধর আমার অধরে অর্পণ করিতেছ।

এই রূপে আমি সর্কক্ষণ তোমার অবলোকন, এবং তোমার সহিষ্ণু কৌতুক ও কথোপকথন করিতেছি; কেবল তোমার কোলে লইরা, তোমার লাভণ্যময় কোমল কলেবর পরিম্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না। এক দিন, দিবাভাগে, নিদ্রাবেশ ঘটিয়াছিল, কেবল, সেই দিন, সেই সময়ে, ক্ষণ কালের নিমিত্ত, তোমার পাইরাছিলাম। দর্শনমাত্র, আত্মলাদে অধৈর্য হইরা, অভূতপূর্ব আগ্রহসহকারে কোড়ে লইরা, প্রগাঢ় স্নেহভরে বাহু দ্বারা পীড়নপূর্বক, সজলনয়নে তোমার মুখচুসনে প্রকৃত হইতেছি, এমন সময়ে এক বাক্তি, আহ্বান করিরা, আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। এই আকস্মিক নিদ্রাভঙ্গ দ্বারা, সে দিবস, যে বিবম স্ফোভ ও মনস্তাপ পাইরাছি, তাহা বলিরা বাক্ত করিবার নহে।

বৎসে। তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যদি তুমি এত সস্তর পলাটবে বলিরা স্থির করিরাছিলে, (৮) সংসারে না আসাই সর্বতোভাবে বিধেয় ছিল। তুমি অল্প দিনের জন্ত আসিরা সকলকে কেবল মর্শ্বাত্তিক বেদনা দিরা গেলে। আমি যে তোমার আদর্শনে কি বিবম যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবার ভাবিতেছ না। আমার যে আহার বিহার, শয়ন, উপবেশন কোন বিঘ্নে অণুমাত্র স্নেহ নাই। আহারের সময় অধিক দিন, শোণসংবরণে অসমর্থ হইরা, নয়নজলে অল্প ব্যঞ্জন দূষিত করি; একাকী উপবিষ্ট হইলে, তোমার চিত্তায় একান্ত মগ্ন হইরা অবিজ্ঞানত অশ্রুপাত করি; রাত্রিকালে শয়ন করিরা, অধিকাংশ সময়ই, অনন্তচিন্তে তোমার চিন্তা করি; কখন কখন, ভাবনাভয়ে, বেন বখার্বট তোমার কথা গনিতে পাইলাম, এই মনে করিরা চকিত হইরা উঠি। কলন্ত: তুমি যে

৮) তুমি, ১৩২ শকের ২৩এ দ্বাদশ সোমবার জন্মগ্রহণ করিরা, ১৩৩০ শকের ৪ঠা কাঙ্কন সোমবার বরনৌলা সংবরণ করিরাছ, দুইরাং তোমার বয়সক্রম তিন বৎসর বয়স হইরাছিল।

আমার কিরূপ যাতনায় নিকিণ্তু করিয়া গিয়াছে, তাহার কিকিছাত্ত অসুস্থত্ব করিতে পারিতেছে না ।

বৎসে ! তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই ; তাহা থাকিলে, তুমি কদাচ এরূপ আচরণ করিতে না । বলিতে কি, তুমি অত্যন্ত মারাবিনীর ব্যবহার করিয়াছ । কতিপয় দিবসমাত্র, অতিমাত্র স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করিয়া, তুমি অকস্মাৎ নিতান্ত নির্দম ও নৃশংসের আচরণ করিলে । এরূপ করিবে জানিলে, আমি কখনই তোমার দেহপাশে ও মমতাজালে বদ্ধ হইতাম না । পূর্বাশ্রয় বিবেচনা না করিয়া, যেমন নিতান্ত নির্যাসের কণ্ঠ করিয়াছিলাম, তুমি তেমনিই আমার সমুচিত প্রতিফল দিয়াছ । তোমার এই অতর্কিত নৃশংস আচরণ দ্বারা যে উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাতে অস্বস্তি : এই মহোপকার হইয়াছে, যে আমি আর কখন এরূপ যন্ত্রণাভোগের পথ প্রস্তুত করিব না । বৎসে ! তুমি যে আমার কি অপকার করিয়াছ, তাহা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই । আমি স্থূলপতঙ্গ প্রাণ ছিলাম, এবং বাচাতে তোমার প্রীতিলাভ হয়, তাহাও প্রাণপণে যত্ন করিতাম । কিন্তু তুমি, তাহাব বিনিময়ে, আমাব বন্ধঃস্থলে বন্ধঃসহায় করিয়া গিয়াছ । বাহা করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার নির্দম, নিরুদয়, নৃশংস ও কৃতঘ্ন বলিতে পারি ।

বৎসে ! কিছু দিন চটল, আমি যে অবস্থায় অবস্থাপিত হইরাছি তাহাতে আমার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হয় না । সংসার নিতান্ত বিরল ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে । এক পদার্থ ভিন্ন আর কোন বিষয়েই প্রীতি বা সুখ বোধ হইত না । তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে । একমাত্র তোমার অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতাম । নানা কারণে, বধন, চিত্ত আন্তরিক অনুরোধ ও উৎকট বিরাগে পরিশুদ্ধ হইয়া, সংসার কেবল যন্ত্রণাভবন প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে তোমার কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, সর্বশরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত । বৎসে ! তোমার কি অদ্বিতীয় শক্তি ছিল, বলিতে পারি না । তুমি অদ্বৈতমতাদ্বৈত গৃহে প্রাণীপুত্র প্রাণীপের, এবং মকছুমিতে প্রভূত প্রেমবশের কার্য্য করিতেছিলে । অধিক আর কি বলিব, ইলাহী : তুমিই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইরাছিলে । সুতরাং তোমার অসহায়ে আমার কি অবস্থা ঘটয়াছে, তাহা তুমি অনারাসেই অসুস্থত্ব করিতে পার ।

কিন্তু, এক বিষয় ভাবিরা, অনেক অংশে আবাসিত হইয়াছি। বৎসে ! তুমি এমন শুভক্ষেপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, যে ব্যক্তিমাজেই তোমার মোহিনী মৃতি ও মাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়া পুলকিত হইতেন। তুমি সকলের নরনতারা ছিলে। সকলে তোমার আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। অনেক পরিবারের সহিত আমার প্রেয়স ও পরিচয় আছে; কিন্তু কোন পরিবারেই, তোমার জ্ঞান, অবিসংবাদে সর্বসাধারণের নিরন্তর প্রেয়স ও আদরভাজন অপত্য নিরীক্ষণ করি নাই। * * * * *

এই ক্ষেপে তুমি সংসারসংক্রান্ত সকল লীলা * সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। বোধ হয়, যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক, উত্তর কালে অশেষ যন্ত্রণাভোগ অপরিহার্য, ইহা নিশ্চিত বুদ্ধিতে পারিয়াছিলে, এই জন্মই জৈন শ্রম সময় মধ্যে, সংসারযাত্রাসংক্রান্তিক সকল সাধ সম্পন্ন করিয়া, সম্বর অজ্বরিত হইয়াছ। তুমি স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপমৃত হইয়া আমার বোধে, অতি সুবোধেব কণ্ঠ করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয়ত, অদৃষ্টগুণে চুঃখভোগেব একশেষ ব্যতিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে তুমি কখনই সুখে ও সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা সমাধান করিতে পারিতে না।

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে বিষম ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। পীড়া-কালে তুমি, পিপাসার আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত লাগারিত হইয়াছিলে। কিন্তু অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমার ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই। ঐষধসেবনান্তে, কিঞ্চিৎ দিবার পর, আকুল বচনে, আর খাব বলিয়া, জলের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি লালসা প্রদর্শন করিতে। আমি তোমার কেবল প্রবেশনাবাক্যে সাহায্য করিতাম। যদি তৎকালে জানিতে পারিতাম, তুমি নিশ্চিত পলারন করিবে, তাহা হইলে, কখনই তোমার পিপাসার যন্ত্রণার অন্তর ও কাতর হইতে দিতাম না; ইচ্ছানুরূপ জলপান করাইয়া, তোমার যন্ত্রণা নিবারণ করিতাম। সে বাহা হউক, বৎসে ! তুমি যে পিপাসার আকুল হইয়া, জলপ্রার্থনাকালে, আমার দিকে

* শৈশবলীলা অবলম্বনে জীবনের পরিণত বয়সের বাবতীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানাগর বহাণর করে পদ্ধতি লিখিয়াছেন। তাহাই পরিভাষ্য হইয়াছে।

বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার ক্ষমতায়, বিবিসিক্ত শল্যের দ্বারা নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, সেই মর্শ্বভেদী কাতর দৃষ্টিপাত, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না। যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি, আমার মত পামর ও নৃশংস দ্রিষ্টবনে অধর নাই।

বৎসে! তুমি যে আমার আন্তরিক ভাল বাসিতে, ও আমিও যে তোমার আন্তরিক ভাল বাসিতাম, তাহা আমবা পরস্পরে বিলক্ষণ জানি। আমি, তোমার অধিকক্ষণ না দেখিলে, অত্যন্ত অন্থখী হইতাম; তুমিও, আমার অধিকক্ষণ না দেখিতে পাইলে, অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে, এবং আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে তোমার অদর্শনে, আমি বিষম অন্থখে কালহরণ করিতেছি; কিন্তু তুমি, আমার এত দিন না দেখিয়া, কি ভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বৎসে! যদিও তুমি নিত্যন্ত নিশ্চয় হইয়া, অন্তর্হিত হইয়াছ, এবং আমার নিমিত্ত আকুল হইতেছ কি না জানিতে পারিতেছি না, আব হরত এত দিনে আমার সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইয়াছ; কিন্তু আমি তোমার কদাচ বিস্মৃত হইব না। তোমার মোহন মূর্ত্তি, ব্যবজীবন আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবে। কালসহকারে পাছে তোমার বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায় তোমার সংকীর্ণ লীলা লিপিবদ্ধ করিলাম, সর্বদা পাঠ করিয়া তোমার স্মৃতিপথে আগুরুক রাখিব; তাহা হইলেই, আমার তোমার বিস্মৃত হইবার ভয় রহিল না।

বৎসে! তোমার আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরক্ত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে জন্মপ্তরিগ্রহ করিয়া থাক, যেন অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ কর; আর গীতারা তোমার মেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, বহুপাতোপ করিতে না হয়।

কলিকাতা। ১লা বৈশাখ, ১৭৮৬ শকাব্দা:।

শ্রীশৈবচন্দ্র শর্মা।

এইরূপ ক্ষুদ্র বৃত্তান্ত নানা হস্তে রাক্ষসক বাবুর সহিত বিভাসাগর বহাণেরেয় খনিষ্ঠ সন্ধ্যা হইয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে রাক্ষসক বাবুর সন্তত বিকার

আগ্রহের মধ্যে যে আত্মীয়তার ক্ষতপাত হইয়াছিল, ঐশ্বরচন্দ্র আমরণ বিবিধ আকারে সেই আত্মীয়তার রক্ষা ও বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন।

বিভাগসাগর মহাশয়ের বন্ধুমণ্ডলী উল্লেখযোগ্য। বন্ধুদিগের কাহারও কাহারও দ্বারা সময়ে সময়ে ক্রেশ পাইলেও তাঁহার বন্ধুমণ্ডলী পরম গৌরবের স্থল—পরম আদরে রক্ষা করিবার জিনিষ। ৮ কালীচরণ মিত্র, ৮ এসদ্রকুমার সর্কাধিকারী, ৮ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ দ্বারকানাথ মিত্র, ৮ শ্রামাচরণ দে, ৮ অক্ষয়কুমার দত্ত, ৮ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ গিরিশচন্দ্র বিভাগরত্ন, ৮ দ্বারকানাথ বিভাগভূষণ, ৮ প্যারীচরণ সরকার, ৮ কালীচরণ ঘোষ, ৮ রামতনু লাহিড়ী, ডাক্তার ৮ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ রাজনারায়ণ বসু, ৮ আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ বিভাগসাগর মহাশয়ের বন্ধু বলিয়া পরিচর দিতে গৌরবান্বিত করিতেন। সম্পদে বিপদে পরামর্শ লইতেন এবং প্রয়োজন হইলে পরস্পরে নিগিয়া অনেক দুঃশেষ কালাও কাঁদিতেন। একদা দুর্ভাগ্য বন্ধুজনপরিবেষ্টিত হইতে পাওয়া পরম সুখ, সন্দেহ নাই। বিভাগসাগর মহাশয়ের বন্ধুত্ব, মুখের কথা বা চিঠিপত্রে আবদ্ধ থাকিত না। তিনি সুহৃদ্বন্ধনের সকল অবস্থার সংবাদ রাখিতেন, তাঁহাদের বিপদে মাথা পাতিয়া দিতেন, বন্ধুসেবার কোন ক্রেশকে ক্রেশ বলিয়া মনে করিতেন না।

ইহার আভাস পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষ ভাবে কয়েকগনি পত্র ও কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করা বাইতেছে:—

বিভাগসাগর মহাশয় সৌভাগ্য সেপানের প্রথম স্তরে যখন পদার্পণ করেন, সেই সময়ে বাগ্দিবর সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গাচরণ বাবুর সহিত অল্পক্ৰিম সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিবিধ আকারে তাহার পরিবর্তন ও পরিণতি হইয়া ডাক্তার বাবুর মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার পরিবার পরিজনদের সাবাধ লইতে ও সুরেন্দ্র বাবুর সর্ব প্রকার সুবিধা সাধনে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অনুরাগভরে নিযুক্ত ছিলেন। ইংলেণ্ডে সুরেন্দ্র বাবুর সিক্তিল সাক্ষিস পরীক্ষার সময়ে বয়স লইয়া গোলবোস বাঁধিয়াছিল, বিভাগসাগর মহাশয়ই উক্তোক্তি হইয়া মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয় প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া এখান হইতে বয়সের প্রকৃত বিবরণ প্রেরণ করিয়া সুরেন্দ্র বাবুর

বিপ্লবকার করেন। পুনরায় যখন অল্পবিধ ছদ্মিগণকে পড়িয়া সুরেন্দ্র বাবুর প্রতি আবেগের সিতিলিমানী সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল, তখনও বিভাগসময় মহাশয়ই সুরেন্দ্র বাবুকে সাহসে নিজের মেট্রপলিটন কালোজ শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সে কালের বন্ধুদিগের মধ্যে প্রমথকুমার সর্মাধিকারী মহাশয়ের সহিত বিভাগসময় মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী আত্মীয়তা হুঃ আবেদন ছিলেন। তাঁহার সহিত কিরূপ গভীর আত্মীয়তা ছিল, তাহা বর্ণিত হইবার নহে। "শেষ দশ্য" জীবনের কোন এক গুরুতর পারিবারিক ঘটনার সর্মাধিকারী মহাশয় যে আক্ষেপ ও গভীর চঃখের পরিচায়ক কাতরাক্তিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, অক্লিম সূক্ত ভিন্ন অল্প কাহাকেও সেটরূপ আত্মকথা কেহ প্রকাশ করে না। পরিশেষে সামান্য একটা ঘটনার সর্মাধিকারী মহাশয় কখন হইয়া অক্লেশপূর্ণ এক পত্র লেখার ততস্তবে বিভাগসময় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই :—

শ্রীশ্রীচরঃ—

শরণ—

শ্রীশ্রী বাবু প্রমথকুমার সর্মাধিকারী

ব্রাতঃ।—প্রায় চই সপ্তাহ কাল আমি অত্যন্ত অসুস্থ ও একটা দৈনিক উৎকট পীড়ার আক্রান্ত হওয়ার গম্পন্নোনাশিত বাতিবাস্ত ছিলাম। একজন পরিচারকদিগকে বলিয়াছিলাম, কাহারও আসিত দিননা। বলিবে আমি অভিশয় অসুস্থ আছি, দেখা হইবেক না। এমনকি এই কথাই কান্দ না হইয়া চিরকুটে আপন নাম ও পরিচয় লিখিয়া পরিচারকদিগকে দিতেন, তাহারা ঐ সকল চিরকুট আমার নিকট আনিত, আর যদি কেহ কাহারও পত্র আনিতেন তাহাও আনিয়া দিত। এটরূপ চিরকুট ও পত্র প্রত্যেক অন্ততঃ পচিশ খান তাহার আনিয়া দিরাছে। এক মোদাণীর পুত্রকে তুমি যে পত্র দাও, তাহা আনিয়া দিরাছে, তোমার প্রেরিত যে পত্রের উত্তর লিখিত্তেছি তাহাও আনিয়া দিরাছে, এমন নলে তোমার উল্লিখিত Gentleman's son (কহ লোকের ছেলের) যে পত্রখানি আনিয়াছিলেন, কেবল সেইখানি আনিয়া

আমার দিতে অসম্মত হইল কেন বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার পত্র পাইয়া পরিচারকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা কহিল, 'কোনও ব্যক্তি পত্র আনিরাহিলেন তাহা লইয়া আপনাকে দিতে অসম্মত হইয়াছি, যদি কেহ একরূপ কথা বলিয়া থাকেন, তিনি অস্ত্রায় কহিয়াছেন ; আমরা পত্র লইয়া যাইব না, একরূপ কথা কাহাকেও বলি নাই ; যিনি যখন পত্র আনিরাহেন তখনই ঐ পত্র আপনকার নিকট আনিয়া দিরাছি।' বাহা হউক সম্মান অস্বাভাবন করিয়া পরিচারকদিগকে অপরাধী করিতে সাহস হইতেছে না এবং আপনাকেও অপরাধী ভাবিতে প্ররক্তি হইতেছে না। তুমি এখানকার বৃত্তান্ত কিছুই জান না, সুতরাং তোমার Gentleman's son (ভদ্র লোকের ছেলের) যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে নির্ভর করিয়া উচিত ও আবশ্যক বোধে আমার যথেষ্ট ভৎসনা করিরাছ। ফল কথা এই, আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দয়, সামান্য অপবাদ ধরিয়া অপবা অপরাধ করনা করিয়া আমার নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এই সংস্কার অনেক দিন পূর্বে আমার মনে প্রকট হইয়া ক্রমে বহুমূল হইয়া আসিরাছে, একান্ত তোমার পত্র পাঠ করিয়া সবিশেষ ক্ষুব্ধ বা হুঃখিত হইলাম না। ইতি ১৫ঠি মাঘ ১৩৮৭ সাল।

স্বদেব শর্মা শর্মণঃ—

(স্বাক্ষর) শ্রীদেবরত্ন শর্মণঃ—

বিজ্ঞবর শ্রীশুক রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যখন কল্যাণপলকে প্রথম কলিকাতা ভ্রাম্য করিয়া মেদিনীপুর গমন করেন, তৎপূর্বেই পরম্পরে পরম্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উভয়েই উভয়কে আদরের পাত্র ভাবিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। সেট সম্বন্ধের পরিচায়ক একখানি পত্র এখানে প্রাপ্ত হইল :—

সদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

আপনার নির্মিয়ে পছন্দান সংবাদ পাইয়া সান্তিশর আহলাদিত হইরাছি, কিন্তু বাইরা কিছু অসুস্থ হইরাছেন পাঠ করিয়া হুঃখিত হইলাম। মেদিনীপুর হান ডাণ, দ্বারায় সুস্থ হইবেন ও ভাল থাকিবেন কোন সন্দেহ নাই ; তবে সে হান নুতন, এখানে যেমন সর্বদা আত্মীয়বর্গের মধ্যে থাকিতেন ও সর্বদা



৩ শ্রমমা চরণ দে।

উঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, সেখানে আপাততঃ তাহা স্থগিত। সুতরাং এ নিমিত্ত কিছুদিন মনের অস্থির থাকিবেক, ক্রমে তথ্যও আত্মীয় সম্বন্ধন হইবেক। সন্সারের এই রীতি। নিখিরাছেন Second master (দ্বিতীয় শিক্ষক) অধ্যক্ষবর্গের প্রিয়পাত্র, সুতরাং উঁহার সহিত অন্বয়ন হইলে, অস্থিরের বিষয় বটিতে পারে, অতএব আমার মতে উঁহার সক্তি মিল করিয়া লওয়া ভাল। আর তিনি অভয় হন, ঘরের ভাত অধিক করিয়া খাইবেন, আপনি ধর্ম্মতঃ আপনি কণ্ঠ নির্বাহ করিবেন, তাহা হইলে ধর্ম্মদ্বারে বালাস।

লোকাল কমিটীর (Local Committee) মধ্যে যে সাহেবকে ভয় দেখিবেন মধ্যে মধ্যে উঁহার নিকট গেলেও হানি নাট। বোধ করি, সাক সাহেব তথ্য মাজিষ্ট্রেট। আমি শুনিয়াছি তিনি ভয় বটেন ও বুদ্ধিজীবীও বটেন; বিজ্ঞাপিকার উঁহার অঙ্গুরাগ আছে।

সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন এবং অঙ্গুরাগ পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে মঙ্গল সংবাদ নিখিয়া নিরুদ্বেষ ও স্মৃতি কথিতে আচ্ছা হইবেক।

ভবদেবক শর্ম্ম শর্ম্মণঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীচন্দ্রচন্দ্র শর্ম্মণঃ ।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ ঘোষ, বাবু ক্রমাচরণ দে ও তজীর ভ্রাতা বাবু বিমলাচরণ দে, ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি মহাশয়গণের সহিত সর্ব্বদাই একত্র বাস করিতেন, সুতরাং উঁহাদের সহিত পরস্পর লেখার অধিক অভ্যাস ছিল না। কিন্তু ইঁহাদের কাহারও কোন প্রকার বিপদ আপদে বিভাগাগর মহাশয় আপনাতঃ জন অপেক্ষাও অধিক স্নেহমমতা ও দয়্যের সহিত সেবা করিয়াছেন।

বাবু ক্রমাচরণ দে মহাশয়ের গৃহে এক ভয়ানক পারিবারিক ছর্ষটনা উপলক্ষে বিভাগাগর মহাশয়ই জনে জনে গ্রীণুক্রম সকলের মূখে জল দিয়া ছিলেন। ভ্রাতা বাবুর তুচ্ছবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি অল্প বয়সে বৈধব্যাধনা প্রাপ্ত হন। এই নিদাক্ষণ বিপৎপাতে গৃহের সমগ্র পরিজনবর্গ যখন ধরাশায়ী, বিভাগাগর মহাশয়ই একাকী সকলকে শান্ত করিয়াছেন, তুচ্ছতা হইতে উঠাইয়া যথেষ্ট সন্তোষের বাটী খরিয়াছেন, যত দিন পরিবারের প্রত্যেকে একটু সবল

না হইয়াছে, ততদিন প্রতিদিন নিকটে থাকিয়া নানা উপারে প্রত্যেকের চিন্তা বিনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন।*

এক সময়ে বারানসী ৮কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে দীর্ঘ কালের ভ্রমণ করিয়া বকে নৌকা-বাসে কালযাপন করিতে হয়। বিজ্ঞানাগর মহাশয় অকৃত্রিম সৌজন্য-স্বত্বে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার চিন্তাবিনোদনের জন্য তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া বকে বাস করিয়াছেন। তাঁহার বহুদিগের মধ্যে কার্য পরিবাহক কোন এক সম্মত ব্যক্তির গৃহিণী তাঁহাকে পিতৃস্বাধীনে স্থানান্তর করিতেন, কিন্তু এই রমণী উন্মাদিনী ছিলেন, বিজ্ঞানাগর মহাশয় ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে আহ্বান কবাইতে পারিতেন না। বিজ্ঞানাগর মহাশয় এক সময়ে একাদিক্রমে ভ্রমণ কাল বেলা দশটার সময় সেই কল্যাণীয়া মহিলাকে আহ্বান কবাইতে গিয়াছেন। বহুমাননিবাসী ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন, “তাঁহাদের পরিবারে কোন প্রকার আপদ বিপদে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যই হইত না। বিজ্ঞানাগর মহাশয় যেখানেই থাকুন ঐ পরিবারে কাহারও পীড়া হইলে, কলিকাতার লইয়া বাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন হইতে পারিত না।” গঙ্গানারায়ণ বাবু বলেন, “তিনি ব্রাহ্মণ, আমরা কার্য, এ পার্থক্য আমাদের মধ্য থাকিত না। আমরা সর্বদাই তাঁহাকে আমাদের অভিভাবক, পরমাত্মী, গুরুজন বলিয়া মনে করিতাম।”

তাঁহার এতদূর অনিষ্ট সম্বন্ধে যে কত জনে কত পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সামান্য রূপ বর্ণনারও স্থান সম্বলন হওয়া সম্ভব নাহ। তিনি বহু সেবার জন্য কান্দো ও কলকাতায়, বহুমান ও বরিশাল, কলিকাতা ও কান্দো, ঢাকা ও মেদিনীপুর সর্বত্র ছুটিছুটি করিতে পারিতেন। বহুজনের বিশেষ্মোচনে ও স্থানান্তরে সর্বদা ব্যয় ও আত্মবিক্রম করিতে পারিতেন এবং তাঁহার অসাধ্য কিছুই ছিল না।

* ৮ পার্বত্যকণ্ঠে যে মহাশয়ের বখা পুত্র ঈশ্বর হরেন্দ্র যে মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

† বহুমান নিবাসী ৮ পার্বত্যকণ্ঠে যে মহাশয়ের পরিবার।

তাহাকে তাঁহার বন্ধুরা কিম্বদন্তি সন্মানের চাক দেখিতেন এবং কিম্বদন্তি বন্ধুরা বলিয়া মনে করিতেন, তাহার সেই মেহাজান বন্ধুগণের কাহারও পত্র এবং কাহারও পত্রাংশের দ্বারা তাহাও প্রদর্শিত হইতাত্।

প্রিয় মহাশয়—

১৮ই জুন ১৮৭৪ ।

আমার শরীর ভাল নহে, অর নাই কিন্তু কোন প্রকার উপকাৰ বোধও করিতেছি না । বেশীর ভাগ ইহাব উপর আবার চাপানি হইয়াছে, কাল হইতে মেঘলা হইয়া আরও উপকাৰ করিয়াছে । আপনি কি লোকনাথ বাবুকে লিখিয়াছিলেন ? আমি অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছি । একাদশীর পূর্বে আমাকে লাইতেই হইবে, তা না হইলে সমস্ত উপসর্গগুলি লইয়া অথবা আবার দেখা দিবে । আপনি যদি আমাকে বাঁচাইতে চান শীঘ্রই আমাকে এখান হইতে বিদায় করিবার উপায় করুন । *

আপনার মেহাজান

(স্বাক্ষর শ্রীমাহেন্দ্রলাল সরকার ।

অগাদীশঃ—

চাকা

শ্রম—

৭ই অগ্রহায়ণ ১২৮০ ।

শ্রীচরণকমলে অসংখ্য প্রণামপূর্বক নিবেদনমিঃ

• • • মহাশয়ের পুস্তকগুলি আগাদী বৃন্দাবনের জাহাজে বগরানা হইবে । আমি মঙ্গলবার অপরাহ্নে মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি । সময় পাটলে সে দিনই বগরানা করিতাম । এই পুস্তকগুলি বলা আমার লিখিতে হইতেছে না । আমি আমার মেহাজানের জন্তে ২৩ বৎসর ৪৪, কল্যাণের সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ

* My Dear Sir,

18-6-74.

I am not doing well, no fever but no improvement. And in addition I have got return of the asthma, thanks to the foul weather prevailing since yesterday. Have you written to Lokenath Babu (Dr. Lokenath Mitter)? I have become impatient. I must go before "Ekadosi" or I am sure to have a relapse of the fever with all attendant troubles. If you want to save me, do something quick to send me away.

Yours affectionately

Ed. Mahendralal Sarkar.

করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে ‘আখ্যাত’ ছাড়া আর সকল জলি পুস্তকই ভাগ পণ্ডিতের ঘরের। আমি কলিকাতা থাকা কালেই এই বইগুলি মহাশয়কে উপহার দিব বলিয়া মনে মনে স্থির রাখিয়াছিলাম। এবং সেই সময় অনুসারে আগামী জাহাজে পাঠাইতেছি। যদি মহাশয় গ্রহণ না করেন, অথবা মূল্য দিতে চান, আমি অন্তরে বড়ই আশাত পাইব। আপনি মনেব সহিত পূজা করিতে পারেন, এমন কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে কখনও আসেন নাট বলিয়া, দয়া করা কাহাকে বলে ইহা যেমন বুঝেন, পূজা ও ভক্তি করা কাহাকে বলে, বোধ হয় তাহা ঠিক তেমনরূপ বুঝিতে পারেন না। কিন্তু আমার এই ধারণা যে, আপনার অলৌকিক ক্ষম শক্তির দ্বারা যে একবার আকৃষ্ট হইয়াছে, আপনার অতিমাত্রিক স্বভাব সৌন্দর্য্য দর্শনে যে চিত্রকরের দ্বার মুগ্ধ হইয়াছে, সে আপনার সমস্ত অন্ধানবদনে শ্রাণও বিসর্জন করিতে পারে, আমার এরূপ লেখায় যাহা বোঝাবি হয়, ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আপনাকে যেক্রম মনে ভাবি, তাহার শতাংশও কই লিখিতে পারি ? • • •

আপনার একান্ত আশ্রিত সেবক,

শ্রীকালী প্রসন্ন বোষ।

এইরূপ কত পত্র পত্র ও পত্রাংশ দ্বারা দেখান বাইতে পারে যে, বিভাগাগর মহাশয়ের বহু ও বহুভাজন প্রিয়পাত্রগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সর্বদা প্রণত এবং পারিবারিক ও নিজ নিজ জীবনে, নানা প্রকার অভাবে, তাঁহার উপর কতদূর নির্ভরশীল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় আমাদের নিকট বলিয়াছেন, যখন তিনি সাংঘাতিক পীড়ার মুখোঁ ও শয্যাগত, তখন বিভাগাগর মহাশয় নিরন্তর তাঁহার “উপাধানসম্মিথানে” উপবিষ্ট। যখনই তাঁহার চৈতন্ত হইয়াছে, তখনই দেখিয়াছেন, বিভাগাগর মহাশয় নিকটে বসিয়া আছেন। ক্রমে এক সময়ে রোগীর অবস্থা এতই মন্দ হইয়া পড়ে যে, চিকিৎসক ও চিকিৎসার পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হোমিওপ্যাথির পরিবর্তে এলোপ্যাথিক কোন ইংরেজ ডাক্তারকে ডাকা হইবে কিনা, যখন এই গোল উঠিল, তখন বিভাগাগর মহাশয় নিজে দারিদ্র্য গ্রহণ করিয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ডাকা করিত রছিলেন।

বন্ধুর মাননীয় ৮৮বৎসরীয় শ্রদ্ধা মহাশয়ের পীড়ার সময়েও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন, এবং বন্ধুর মৃত্যুতে গভীর দুঃখে অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল শোকসন্তপ্ত চিত্তে কালাতিপাত করিয়াছেন ।

আমি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি প্রক্লাম্বদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সর্বপ্রথম পারিবারিক অসুস্থতাবশতঃ সময়ে শ্রদ্ধার বিজ্ঞাপন ও সভাপতির পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই পত্রের উত্তরে বিজ্ঞাপন ও সভাপতির পত্র লিখিয়াছিলাম, সেই পত্র এই :—

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

আপনার কস্তার বিবাহ বিষয় অনেক বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। কলকথা এই যে, একজন বিষয় পরামর্শ দেওয়া কোনক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মসমাজবলী, ব্রাহ্মধর্ম আপনকার যেরূপ প্রকাণ্ড আদর্শ, তাহাতে দেবেজবাবু যে প্রণালীতে কস্তার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্মের অসুখাধিনী বলিয়া আপনকার বোধ পাকে, তাহা হইলে ঐ প্রণালী অনুসারেই আপনকার কস্তার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ যদি আপনি দেবেজ বাবুর অবলম্বিত প্রণালী পবিত্রাঙ্গ কবিয়া প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কস্তার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিপক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবেক। ব্রাহ্ম প্রণালীতে কস্তার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্বতোভাবে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এ সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সঙ্গী আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। তবে এই মাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সঙ্গী কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

উপরোক্ত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, একজন বিষয়ে অন্তরের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে; উদ্ভূত স্থল নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্তব্য করাই কর্তব্য, কারণ বাহ্যিক জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তির নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায় তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনকার হিতাহিত বা কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্ট রাখিবেন না।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয়ে স্বয়ং কর্তব্য নিরূপণ করিলেই আমার মতে সর্বাংশে ভাল হয় । * * *

ভবদীয়ত,
(স্বাক্ষর) শ্রীজৈবরত্ন শর্মাণঃ ।

শ্রীযুক্ত বাবু ভূর্গামোহন দাস মহাশয়,

সাদবসন্তাষণসাবেদনম্—

আপনার প্রেরিত একমস্ত্রীর জীবনালেখ্য সাতখানি পছন্দিয়াছি। একখানি দীনবন্ধুকে দিয়াছি, একখানি নিজের লঠিয়াছি। অবশিষ্ট পাঁচখানি বধ্যাসম্ভব যোগ্যপাত্রেরে বিতরণ করিব। পুস্তকখানি আত্মস্থ পাঠ করিয়াছি : এবং মুক্তকণ্ঠ বলিতেছি, একমস্ত্রীর ভূগ্য সদাশয়, উপাবচরিত স্বীলোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক, এষ্ট পুণ্যশীলা মন্ডিত ভূর্গামোহনের সঙ্গন্ধক্ষিণী না হইলে, স্বীয় শত্রুতিসন্ধ প্রবৃত্তি প্রতাপিত্বম্প্রসব প্রকৃতরূপ পরিচয় দিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিতেন না। জৈব পত্নী অকালমৃত্যু, ভবদ্যু পতির পক্ষ, কতদূর আত্মরিক ক্রেশকর হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই অনুধাবন করিতে পারা যায়। সে দিবস যেক্ষণ অমৃত দেখিয়া গিয়াছেন, সেইরূপই আমি। একান্ত এ পত্রখানি এত সংক্ষিপ্ত হইল। ইতি ২২শে পৌষ, ১২৮৮ সাল।

ভবদীয়ত,
(স্বাক্ষর) শ্রীজৈবরত্ন শর্মাণঃ ।

বারাণসনিবাসী ডাক্তার জনবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আত্মীয়তা সূত্রে রাজা কৃষ্ণনাথের • সহিত বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের প্রথম পরিচয় ও ক্রমে আত্মীয়তার সুস্থাপত্য হয়। রাজা কৃষ্ণনাথ অপুত্রক ছিলেন। সমুদ্যানপ্রিয় রাজা কৃষ্ণনাথ জনহিতকর অনুষ্ঠান বিষয়ে বিজ্ঞানাগর

মহাশয়ের পরামর্শ বিজ্ঞাণা করেন। মহাশয় জমিদার কিংবা রাজস্ববণের কাহারও সহিত বিভাগাগর মহাশয়ের আদৌরতা হইলে, তিনি সর্বদাই দরিদ্রপালন ও নানাবিধ সদুপায়ে তাঁহাদের প্ররুতি জ্ঞায়াইয়া দিতেন। রাজা কৃষ্ণনাথের জন্মেরও সেই পরোপকার সাধনেজ্ঞার আকাঙ্ক্ষা প্রবণ করিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষভাবে একটী উচ্চ শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থানীয় লোকের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ মুক্ত করিয়া দিবার সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল। দৈন্যক্লিষ্টপাকবশতঃ এই সদাশয় মহাত্মা ধোবনসীমা অতিক্রম করিতে না করিতে লোকলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে কোমলপ্রাণা—দীনবৎসলা মহারাজী স্বর্ণময়ী সি, আই, উক্ত বয়সে বৈধবাৎসলা প্রাপ্ত হন। সকল স্তরের অধিকারিনী হইয়াও মহারাজী কালের তীক্ষ্ণহার কুঠারাবাতে নবীন জীবনে ছিন্নভিন্ন জায় ভূতলশায়িনী হন। কাণ্ডপ্রোতঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সে জন্মভার ও চিন্তামানি মোত করিলে পর, তিনি তাঁহার পরলোকবাসী স্বামীর অভিপ্রায়মত পথে চলিয়া ও দেশের শক্ত প্রকার কল্যাণ সাধনে নিরন্ত নিযুক্ত থাকিয়া বিভাগাগর মহাশয়ের চির প্রজ্ঞার পাত্রী হইয়াছিলেন। আমরা বিভাগাগর মহাশয়ের চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া কত সময়ে মহারাজীর লোকবৎসলতার শত প্রকার আখ্যায়িকা প্রবণ করিয়াছি। বিশেষতঃ তিনি নিজে কৃতজ্ঞতা-কল অরণ করিয়া এই পুণ্যলীলা রমণীর গুণকীর্তন করিতেন, তাহার প্রমাণপ্রদ দু এক খানি পত্র এখানে প্রদত্ত হইতেছে :—

শ্রীমতী মহারাজী স্বর্ণময়ী, সি আই, মহোদয়া সমীপে,

বিনয়বতমান শ্রদ্ধাঙ্গীকারপূর্বক নিবেদনম্।

বহুদিন হইল, কার্যবিশেষ উপলক্ষে টাকার আত্যাত্মিক প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে, অধুনা লোকান্তরবাসী নিরন্তিনর উদ্যবচরিত রাজীবলোচন রায় দেওয়ানজী মহাশয় সাক্ষিনর দয়া প্রদর্শন পূর্বক, শ্রীমতীর অনুমতি অনুসারে রাজধানীর ধনাগার হইতে আমাকে ৭৫০০ টাকা দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, এ টাকার সুদ দিতে হইবেক না, যখন সুবিধা হইবেক, পরিশোধ করিবেন।

এই টাকা পাইয়া আমি কি পর্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহা বলিবার নয়, বত কাল জীবিত থাকিব, এই মহোপকার আমার জন্মে আগুরুক থাকিবেক। লোকের উপকার করিবার জন্যই শ্রীমতীর অনুগ্রহণ। দেশে অনেক ঐশ্বর্যশালী লোক আছেন, কিন্তু কেহই শ্রীমতীর জ্ঞান সর্বসাধারণের বঞ্চার ধন্যবাদের আশ্রয় ও উপকৃতবর্গের আত্মরিক আশীর্বাদের ভাষন হইতে পারেন নাই।

দীর্ঘকাল, এই ঋণের পরিশোধের সুবিধা না হওয়াতে, আমি অতিশয় কুস্তিত ছিলাম; এক্ষণে আমার সুবিধা হইয়াছে, এজন্য এই পত্রের মধ্যে সাত হাজার পাঁচশত টাকার নোট পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করিয়া। আমার ঋণ মুক্ত করিতে আশা হয়, কিম্বিকেনেতি। * * *

নিয়তগুণকীর্তনগুণতানুচিন্তনকৰ্মণঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণঃ।

কাশিনবাজার রাজধানীতে বিজ্ঞাপন মহাশয়ের প্রেরিত ৭৫০০ টাক পৌছিলে পর, মহারাজী প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সেট পত্রের উত্তরে বিজ্ঞাপন মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই :—

শ্রীমতী মহারাজী স্বর্ণময়ী, সি, আই, মহোদয়া সমীপে,

বিনয়বহুমানগুণতানুচিন্তনকৰ্মণঃ নিবেদনম্।

শ্রীমতীর অনুগ্রহপূর্ণ পত্রে রাজধানীর মঙ্গল সংবাদ অবগত হইয়া সান্তিসহ আনন্দিত হইলাম। আমি পরিবারবর্গের সহিত কায়িক ভাল আছি। শ্রীমতীর পত্রে লিখিত, হইয়াছে “মৎপ্রতি প্রজ্ঞা বিচলিত না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।” এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি সর্ববাদিসম্মত প্রশংসনীয় গুণ। এই দুই গুণ সংসারে অতি বিরল। কিন্তু শ্রীমতীর কার্য পরম্পরা নিরন্তর এই দুই প্রশংসনীয় গুণের সযত্ন পরিচয় প্রদান করিতেছে। এমন স্থলে শ্রীমতীর প্রতি ধ্যায় প্রজ্ঞা না জন্মিবেক, অথবা প্রজ্ঞা বিচলিত হইবেক, তিনি নিত্যস্ব পায়, কিম্বিকেনেতি ৮ই ফাল্গুন ১২৮২ সাধ।

নিয়তগুণকীর্তনগুণতানুচিন্তনকৰ্মণঃ

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণঃ।

খ্রীষ্টক নারায়ণচন্দ্র বিহারের বিবাহের পরদিন কুশলিকানি কোন প্রকার অনুষ্ঠান তখনও সম্পন্ন হয় নাই—সেই সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে—বিভাগাগর মহাশয় নিজেই সে সকলের আয়োজন পরীক্ষণ করিতেছিলেন,—এমন সময়ে কৃষ্ণনগর হটতে ডাক যোগে সংবাদ আসিল যে, বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় সাংঘাতিক^১ পীড়ায় শয্যাগত! বাঁচিবার সম্ভাবনা নহ, তাই কাতরবচনে বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট বিদায় চাহিয়াছেন। সুক্ষমভূগত বিভাগাগর মহাশয়ের সকল অনুষ্ঠান পড়িয়া বহিল! তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। পুত্রের বিবাহের পরবর্তী অনুষ্ঠান সকলের সুসম্পাদনেব আয়োজন করিতে করিতে বন্ধুজনের বিপৎপাতের সংবাদ পাইবামাত্র গৃহে অনুষ্ঠানাদি উপেক্ষা করিয়া একপ দূর স্থান তৎক্ষণাৎ গমন করিতে পারা তাঁহার মত জদরবান্ লোকের পক্ষেই সম্ভব। এই ঘটনাটীতে তাঁহার এবং তাঁহার পরম মেহাশয় বন্ধু ডাক্তার সরকার মহাশয়ের ত্যাগস্বীকার ও সুদয়সেবা সামাজিক জীবনে আদর্শরূপ বলিয়াই মনে হয়।

রায় ব্রহ্মনাথ রায় বাগচর, কৃষ্ণনগর।

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্—আপনকার অত্যন্তকট অশ্রুত ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া, আমি মর্শ্বাত্মিক বেদনা পাটয়াছি। এই ভয়ানক অশ্রুত ঘটনার দ্বারা আপনকার অন্তঃকরণের কিরূপ অবস্থা ঘটয়াছে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিতেছি। আমি মনে করিতাম আপনি সাংসারিক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে মুখী। দৈববিড়ম্বনার আর আপনাকে সেজন্য ভাবিবার পথ রহিল না। সংসার অতি বিচিত্র স্থান। সংসারে আসিয়া, কেহ কখনও সর্বোপায়ে মুখী হইতে পারিবেন, তাহাও সম্ভাবিত নহে।

আমি আপনার জন্ত তত উদ্বিগ্ন নহি। আপনি নানা বিষয় ব্যাসক্ত থাকিয়া অনেক সময় অস্তমন্য হইতে পারিবেন। কিন্তু যিনি গর্ভধারণ দিবস অবধি অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার বিষয় ভাবিয়া আমার আত্মনিক অনুভবের একশেষ উপরিত হইতেছে। তিনি এজন্মের মত হস্তর হৃৎক সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বল কথা এই; পিতা ও মাতা হইয়া অপেক্ষা

অধিকতর মহাপাতকের ভোগ আর নাই। পিতামাতাকে প্রকৃত প্রস্তাব সুখী করেন, এরূপ পুত্র অতি বিরল, কিন্তু অসদাচরণ ও অকালমরণ প্রকৃতি দ্বারা পিতা মাতাকে যাবজ্জীবন দগ্ধ করেন এরূপ পুত্রের সংখ্যাই অধিক।

প্রিয় বিরোগ নিবন্ধন জদযবিদারণ শোকের সহসা সংবরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। এমন স্থলে আপনারা শোক সংবরণ পূর্বক চিন্তের তৈরী সম্পাদন করুন এরূপ অনুরোধ করা বা উপদেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আপনারদের শোকসন্তপ্ত জদয় দৈব অনুগ্রহে অচিরে শান্তিসলিলে সিক্ত হউক, এই আমার প্রার্থনা। ইতি ১২ই আশ্বিন ১২৯১ সাল।

ভবদীয়ত,

(স্বাক্ষর) শ্রীজৈবরত্ন শর্মাঃ।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাগাড়র মহাশয়কে বিজ্ঞানাগর মহাশয় অত্যন্ত স্নেহেব চক্ষে দেখিতেন। মিত্র মহাশয়ের কলিকাতায় অবস্থান কালে উভয় পরিবারেব মধ্যেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি পীড়িত অবস্থায় সুকিয়া ষ্ট্রাটই ছিলেন। পীড়ার সময়ে চিকিৎসার সুবাবস্থা কবিত্তে ও অল্প নানা প্রকারে সে সময় মিত্র পরিবারের তত্ত্বাবধান করিত্তে বিজ্ঞানাগর মহাশয় কট করেন নাই। দীনবন্ধু বাবুর অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ণ স্থান আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয় নাই। বিজ্ঞানাগর মহাশয় এই ক্ষতি দূর করিয়া কত সময়ে দুঃখ গলাশ করিয়াছেন এবং তদীয় বিচ্ছেদে কাতর হইয়া দীর্ঘকাল মিত্র পরিবারের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। কতকগুলি অপোগণ্ড শিশুসন্তান লইয়া মিঞাহিনী যখন চাবিদিক অন্ধকার দেখিয়া অবসর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন বিজ্ঞানাগর মহাশয়ই পরমাত্মীয়ের জায় সর্বদা সংবাদ লইয়াছেন, নিকটে থাকিত্তা আখ্যায় প্রদান করিয়াছেন এবং সংসার-সংগ্রামে ও বালকগণের শিক্ষা বিধানে সহায়তা করিয়া পরলোকগত মিত্র মহাশয়ের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়কে বিজ্ঞানাগর মহাশয় সহোদর-নির্কিংশেবে স্নেহ করিত্তেন। অনেক সময়ে বিধবাবিবাহ ব্যাপারে খাস্তগির মহাশয়কে সহকারিতার আত্মীয়তার আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ডাক্তার

খান্দের মহাশয়ের লোকান্তর গমনের পর তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ খান্দের বিভাগের মহাশয়কে এই পারিবারিক শোক সংবাদ প্রদান করেন। বিভাগের মহাশয় রুমশরীরে বড় বারীতে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে ডাকাইয়া আপন বেগলিননপাশে বস করিয়া বাবুকে হার রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, “বাবা! জোমার বাবার মৃত্যুর পূর্বে একবার সংবাদ দাও নাই। আমার সঙ্গে শেষ দেখাটা হইল না, একবার মুখখানি দেখিতে পাইলাম না, নিজের মত চিকিৎসা করাষ্টেও পারিলাম না। নিজাম পনের মত একটা মৃত্যু সংবাদ পাঠাইলে, জোমার বাবা যে আমার পরমাত্মীয় ছিলেন।”

এইরূপ ঘটনাসমূহের ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। এরূপ ঘটনার সুবিস্তৃত তালিকা এত দীর্ঘ এবং জ্ঞানি বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্কিশেষে তিনি এত লোকের সেবা করিয়াছেন, যে তাহার পূর্ণবয়সসম্পন্ন বিবরণেই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইতে পারে। সুতরাং এখানে এরূপ বিবরণেব উল্লেখ অসম্ভব। প্রশস্তকল্পের বিভাগের মহাশয় পিতৃমাতৃশ্রদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে আত্মবান্ধু ছিলেন, কিন্তু অপরায়ণ বিষয়ে তিনি সাধারণ লোকমণ্ডলী হইতে অনেক উচ্চ অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার নিকট সামাজিকতার হিন্দু বলিয়া, অধিক দাবি, কিংবা অল্প সম্প্রদায় বলিয়া, কোন প্রকার উপেক্ষা, স্থান পাইত না। তিনি লোকসমাজকে নিজের সমাজ বলিয়া মনে করিতেন। সৌজন্য সূত্রে বাহাদুরের সহিত আবদ্ধ হইতেন তাঁহাদের বর্ণেরতরফ কোন প্রকারে অস্বীয়তার বর্জিতা সাধন করিতে পারিত না। পৌরাণিক কালের ভারত সামাজ্যের অস্বীয়র আদর্শপুঙ্খ শ্রীমদ্ভগবৎ নিঃসন্দেহেও শুভকর ভাবে ধারণ করিয়াছিলেন। বর্তমান বর্ণাশ্রম-মানবির ভারতসম্মান বিভাগগব-সদনে শ্রীমদ্ভগবৎ অহরহিত উচ্চনীতির জীবন্ত মূর্তি দেখিতে পাইতেন। তিনি চিরজীবন প্রচলিত জাতিধর্ম প্রভেদ বিস্তৃত হইয়া গুণগত প্রভেদের পরম পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার পিতা-মহের হার তিনিও বাহাকে আচরণে ও গুণে সংলোক দেখিতেন, তাঁহারই সমাদর করিতেন এক নিজের সদকল্প মনে করিতেন। এইরূপ সমাদর করিতে সিয়া তিনি ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিচার করিতেন না। এই দুই শ্রেণীর

প্রভেদ দ্বারা গুণের প্রাধান্ত কখনও ধর্ম করেন নাই। এবিষয়ে তিনি প্রাচীন আর্থা স্ববিগলকেই তাঁহার পথপ্রদর্শক ও আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানাগর মহাশয় সামাজিক জীবনে বড়ই মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমোদ প্রমোদে, আলাপ পরিচয়ে, রঙ্গ রহস্তে অধিত্যৈ ছিলেন। এক স্থানে কোন আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়া জানিতে পারিলেন, গৃহকর্তাকে দৈববিপাকে পড়িয়া প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন বর্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ নুতন আয়োজন করিয়া তবে সকলকে আচার করাইতে হয়। বিজ্ঞানাগর মহাশয় গৃহকর্তাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “ভয় কি, তুমি যত শ্রীষ পার সমস্ত আয়োজন কর, নিমন্ত্রিত সমাগতগণের ব্যস্ততা ও উদ্বেগ নিবারণের ভার আমি লইলাম।” সমস্ত নিমন্ত্রিত লোককে দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রকার গল্পে এক্রপ ভাবে আকৃষ্ট করিলেন যে, কেহই বেলাধিক্যের অন্ত কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করিবার অবসর পাইলেন না।

স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিজ্ঞানাগর মহাশয় সহোদরাদিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহাদের মধ্যে পারিবারিক সখ্যক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের ভগ্নপিতা; সেই সূত্রে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ও তাঁহাকে ভগ্নপিতা সম্পর্কেই সম্বোধন করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দীর্ঘকাল ইটল কাণী বাস করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের লোকান্তর গমনের কিছু দিন পূর্বে একবার আসিয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সাদর সম্বোধনে আসনে বসাইয়া তামাক দিতে বলিয়াই বলিলেন, “তুমি মরিয়াছ নাকি?” “কেন, আমি মোরবো কেন? ম’লে কি আসিতেম?” “আমিও ত তাই বলি, না ম’লে কি আসতে? তা দেখো, আমাকে যেন পেয়ে য’সো না।” ভট্টাচার্য্য মহাশয় তামাক খাইতে লাগিলেন, বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিলেন, “ভোমার শেষটা কান্ধিতে খেলে, মরবার বুঝি আর দায়গা ছুটলো না। তা গেছ ত আবার এরকম স’রে পড় কেন? জান ত কান্ধিবাস করিয়া বাইরে ম’লে কি হয়?” “হাঁ তা ত জানি, তবুও মাঝে মাঝে দায়ে প’ড়ে আসতে হয়।”

“শিশুগিরি শিশুগিরি পালাও, না হলে, কান্নার এগারে ওপাড়ে, ভিতরে বাহিরে অনেক কারাক ; খলি একটু গাঁজা টাঁজা খেতে শিখেছ ত ?” “কেন গাঁজা খেয়ে কি হবে ?” “বলি একটু অভাস রেখো, কি জ্ঞান, কখন কি কাজে লাগে বলা ত বার না ? মনে কর, যদি তোমার কান্নাগ্রাস্তি হয়, তা হ’লে ত শিব হ’বে ? শিব হ’লে তোমার নন্দী ভর্তুকী যখন গাঁজার আলুবাণা ধরবে, তখন টানতে হবে ত ? আগে থেকে অভাস না থাকলে, দম আটকে মরে যাবে, আর তোমার এত সাধের শিবও ফসকে যাবে ।”*

একবার কোন কল্যাণলকে রাজকর বাবুর বাহিরের ঘরে অনেকে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন । সে বৈঠকে অজ্ঞ স্বাক্ষরনাথ মিত্র ও বার কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন । পরীক্ষা একজন লোক অনবরত জানাঘর উঁকি মারিতেছিল । সে বারংবার ঐরূপ করিতেছে দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ডাকাইলেন । সে ব্যক্তি ভয়ে জড় সড় হইয়া নত মস্তকে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল । তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, “বাপু, অন্ত উঁকি কুঁকি মারছিলে কেন ?” সে ব্যক্তি সভয়ে উত্তর করিল, “অজ্ঞ পারিবারিক মিস্ত্রির এসোজন শুনে, তাঁকে দেখবার অজ্ঞ উঁকি মারছিলাম ।” বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, “দেখবার অজ্ঞ উঁকি মারবার দরকার কি ? এঁকে চেন কি ? এঁর নাম কৃষ্ণদাস পাল ; এখানে এঁর চেয়ে যেটা সুন্দর, সেইটাই পারিবারিক মিস্ত্রি ! বল দেখি কোনটা ?” (ইহাদের কেহই সুপুরুষ ছিলেন না, কাজেই ঘরে গত লোক বসিয়াছিলেন, সকলের সমবেত অট্টহাস্তে লোকটা নিতান্ত অগম্য হইয়া পলায়ন করিল । বিদ্যাসাগর মহাশয় একটা টিল ছুড়িয়া তিনটা পালী মারিলেন ।)

আহারাদি বিষয়ে নিতান্ত আক্টীয় হুলে এক প্রকার দোরাদ্বার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ভোজনসমিতি (Gastronomy Club) নামে একটা ক্লাব দল গঠিত হইয়াছিল । এই সভার ২১০ জন মাত্র সভা ছিলেন । সভাসিগের পূর্ণসখ্যা ও নাম সংগ্রহ করা কিছু কঠিন । যাহারা † সে সভার সভা ছিলেন,

* এই আসিপের সম্বন্ধে আশা রায় উপস্থিত ছিলেন ।

† অবসরপ্রাপ্ত সবজ্ঞ ও ক্রম বহিঃস্থ বতীকোষের বর্তমান কাব্যাত্মক জীবন পারক নথ তটীয়াবা, যেটপলিউনের কৃতপূর্ণ শিক্ত † গঙ্গাচন্দ্র রায়, † রাজকর বাবুপাখার এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং ।

ভাঁহাদের মধ্যে জীবিত দুই জনের কাহারও সকলের নাম ঠিক মনে নাট। ইহার মধ্যে মধ্যে দল বাধিয়া নিত্যই আত্মীয় স্থলে এক এক দিন উপস্থিত হইয়া খাইতে চাহিতেন। গৃহকর্তা রহস্যজালে প্রথম প্রথম কিছুই মিবেন না বলিয়া বিদায় করিয়া দিতে চাহিতেন, শেষে সকলে মিলিয়া আহ্বানাদি সমাপনান্তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যগমন করিতেন। কলিকাতা ও তুর্নিকটবর্তী উপনগরেই এ দোরায়াটা অধিক ছিল। ভবানীপুরে পেটের ট সম্পাদক হবিশ্চন্দ্রের বাটীতে ও প্রসিদ্ধনামা উকিল বাবু অন্নদাশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে একরূপ আশ্রমপীড়া মধ্যে মধ্যে উপস্থিত করিতেন। কলিকাতায় ৮ প্রমাচরণ দে মহাশয়ের বাটীতে এবং একরূপ আত্মীয় স্থলেই কেবল এট বিদ্রাট ঘটাতেন। একবার এক গৃহস্থকে এতরূপ পীড়ন করিয়া একটা পুৰ জাঁকাল গোছের আহার জুটিল। কিন্তু পর দিন দলের এক জনের (সম্ভবতঃ ষারিক বাবুর) পেটের পীড়া হইল। সকলের মিলিত সেবাশ্রমের বোঝা আরোগ্যলাভ করিলেন। পীড়ার সময়ে সেবা করিতে করিতে কেহ কেহ বলিলেন ইহার পেটের ক্ষেপ আছে, ইহাকে সভ্যপদ হইতে পারিজন কবিয়া দাও। ততস্তর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন :—“না হে, উহাকে খাবিজ করিলে অর্থ ৯টবে। যে ব্যক্তি Martyr to the cause (এই কাহো প্রাণ দিতে উদ্যত) তাহাকে বিদায় করিয়া দিলে, কাকে নিয়ে থাকবে?”

একবার ভাঁহার এক সাংঘাতিক কারবন্দা হয়। যখন সেই জুজুতিন পীড়ার সূত্রপাত হয়, তখন তিনি খন্দাটাড়ে ছিলেন। রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া অগ্রে বন্ধমানে আসেন। সেখানে চিকিৎসার কোন উপকার না হওয়াতে সেই আধপাকা কারবন্দা লুইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কয়েক দিনের চিকিৎসার সেটা কাটিবার মত হইয়া উঠিল। এট সময় পার্শ্বাশ্রয়বাসী মল্লিক মহাশয়ের বৈয়কিক এক শালিসীর ভার ভাঁহার উপর পড়ে। তিনি বলিয়া ৮দীননাথ মল্লিক মহাশয়ের সহিত শালিসীবিশয়ক কথাবার্তা করিতেছিলেন, আর ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ একাকী শেট কারবন্দা পটলচেরা করিয়া ভাঁহার পুঁজ রক্ত বাহির করিয়া বাধিয়া দিয়া বলিয়া আছেন। মল্লিক মহাশয় বলিলেন, “তবে ডাক্তার বাবুর কাজটা হয়ে যাক না, আর বিলম্ব কেন? তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণ জানিতে পারিলেন, যেটা হইয়াছিল সেটা কারবন্দা, আর তাহা এই

কথাবার্তার মধ্যেই অস্ত্র করাও হইয়াছে । শালিসীর বীমাংসা করিতে করিতে একটা কারবল্লের অস্ত্র চিকিৎসা হইয়া গেল, নিকটই কেহ জানিতেও পারিল না, সামান্য নড়া চড়া কি উঃ আঃ কিছুই না ! বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে, আলোপ করিতে করিতে, শরীরের উপর নিকরবেগে অস্ত্র চলিতে দেওয়া একদিকে, আর পীড়িতের রোগে যন্ত্রণা দর্শন—লোকসন্তপ্তজনের অপ্রজ্ঞল দর্শনে—বিশয়ের বিষাদময় যুগে নিরাশার আত্মনাদ শ্রবণে তাঁহার যে স্বভঃই গভীর কোভ ও যন্ত্রণার উদয় হইত, এগুলি আর একদিকে ! একদিকে আত্মশাসন, আর একদিকে পরহঃপে কাতর ক্রন্দন ! একাধারে এতদ্ব-ভয়ের সমাবেশ কি বিচিত্র দৃশ্য নহে ? এই দৃঢ়তা ও কোমলতার মিশ্রণই তাঁহার জীবনব্যাপী উচ্চতার উপাদান, উপকরণ ও গঠনের কার্য করিয়াছে, এবং টহাতেই সে জীবনের সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ ।

কাহাকেও গায়ের কাপড় দিতে চাইলে, শীতবস্ত্র জুগের ভারটা বাবু ব্রজনাথ দে মহাশয়ের উপর পড়িত । একদিন বিভাগাগর মহাশয় বলিলেন, “দেখ, এখনই গায়ের কাপড় দরকার হয়, তোকেই শালগুয়ালার দোকানে পাঠাই । একজন লোক চিরকাল কষ্ট পাবে ওটা ভাল নয় । তুই কাল আমাকে নিয়ে গিয়ে একবার দোকানটা দেখিয়ে দিস, তা হ’লে এখন টেকে গেলুম, বা দরকার, নিয়ে এসুম । তুই কাল একবার আসিস ।”

পরদিন ব্রজ বাবু যথাসময়ে দেখা দিলেন । দুইজনে একত্র হইয়া বড়বাজারে চলিলেন । পথে ব্রজ বাবুর গ্রাণ বার—বিভাগাগরের সজ্জিত চলিতে গিয়া গ্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িল । তিনচারিবার বিভাগাগর মহাশয় ব্রজ বাবুকে পশ্চাতে ফেলিয়া, শেষে আবার শুভাইয়া লইয়া বলিলেন, “আমার চলটিই কেমন একটু বেশী বেশী, সঙ্গে যারা থাকে তারা পেয়ে উঠে না । এক কাজ কর, তুই এগিয়ে চল, আমি ভোর পেছনে পেছনে যাই ।” পুখে বাইতে বাইতে পরামর্শ হইল যে, শালের দোকানে থরা দেওয়া হইবে না । অপরিচিতের ভায় যাইব, জিনিষ লইয়া চলিরা আসিব ।

বড় বাজারে শালের দোকানে উত্তীর্ণার সময়ে গোলমালে ব্রজ বাবু পশ্চাতে পড়িয়াছেন, বিভাগাগর অগ্রবর্তী হইয়াছেন । উপরের দালানে বিভাগাগরই

* এই ঘটনাটা ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের নিকট পরিচিতি ।

অগ্রে দেখা দিলেন । যেমন সিঁড়ি হইতে উপরের ঘরে পদার্পণ, অমনি শালগুয়ালা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “আটয়ে পণ্ডিতজি, আজ ঠাঁ হামারা সুপ্রভাত হ্যায় ।” বিজ্ঞানাগর মহাশয় ব্রজবাবুকে চুপে চুপে বলিলেন, “ওরে এবা বে চিনেছে রে ।” শালগুয়ালা বলিল, “ক্যা পণ্ডিতজি । আঁগ ক্যা কভি ছিলা রহে থাক্‌সে ?”*

বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে যাহারা কখন দেখে নাট, একরূপ লোক যদি কখন তাঁহাকে তাঁহাব প্রতিদিনের কার্যকলাপের মধ্যে দেখিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে নিতান্ত ব্যরকূঠ লোক বলিয়া মনে করিত । কোথাও বাইতে হইলে, সহজে গাড়ী কি পাল্কি ভাড়া করিতেন না । তিনি সর্বদাই তাঁহার সবল চরণে দুখানি উপবৃত্ত ব্যবহার করিতেন । একবার কোথাও বাইবার সময় কলিকাতা শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়া ট্রেন না পাওয়াতে কিব্বিয়া আসিয়াত ৫য় বাইবার ও কিব্বিয়া আসিবার সময়ে পাঁচ আনা করিয়া দশ আনা গাড়ী ভাড়া লাগে । গৃহে কিব্বিয়া আসিয়া গাড়ী ভাড়া দিবার সময়ে হুঃ করিয়া বলিলেন যে “এই দশ আনা মিথ্যা মিথ্যা গেল ।” নিকটে নারায়ণ বাবু ও অল্প কেহ কেহ ছিলেন, তাঁহারা বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের এই কথার হাসিয়া উঠিলেন হাসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হাসিতেছ কেন ?’ উপস্থিত ব্যক্তিগণের একজন বলিলেন, “এমন কত দশ আনা বাইতোছে ।” তিনি বলিলেন :—“এইরূপ অপব্যয় ?” ‘কেন কত লোক আপনাকে প্রবন্ধন করিয়া কত টাকা লইয়া বাইতেছে ।’ তাঁহার সেই সবল মুখভঙ্গিমায় তিনি উত্তর করিলেন, “তাহাকেই বৃষ্টি অপব্যয় বলে ? সে ত একজনকে হাত তুলিয়া দিলাম, আর কিছু না হটক যে পাইল সে উপকার বোধ করিল ত ? আর এ সে ‘ন দেবায় ন ধন্যায়,’ যে ব্যক্তি পাইল, সে তাহার পারিশ্রমিক বলিয়া লইল, আর আমি দিলাম বটে, কিন্তু আমার কোন উপকারে আসিল না ।” তখন তাঁহাদের কেহ কেহ বলিলেন, “আপনার অর্থব্যয়নীতি এত উচ্চ তাহা বুঝিতাম না”

কোথাও হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া, তাহার মোড়কেব কাগজ ও গড়িগুলি অতি ব্যয়ের সহিত তুলিয়া রাখিতেন । বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের

* ঐহক বাণ ব্রজনাথ যে মহাশয় নিজেই এ ঘটনাদী বলিয়াছেন ।

জ্যোতা কস্তুর পুত্রের সর্বদা নিকটে থাকিতেন । ইহারা তখনও বালক ছিলেন । বিভাসাগর মহাশয় একদিকে বস্তার জলের স্রাব অর্থ ব্যয় করিতেন, কিন্তু অপর দিকে এক বিন্দু দড়ি বা এক টুকরা কাগজ কুড়াইয়া রাখিতেন । এ সকল দ্রব্য ঐক্লপে সংগ্রহ করিয়া বাধিতে দেখিয়া বাগকেরা হাসিত । এক দিন রাত্রিতে বিভাসাগর মহাশয় শয়ন করিলে পর, কনিষ্ঠ দৌহিরা নিতান্ত প্রয়োজনে বাধা হটরা চুপে চুপে আলমারির উপর হটতে সেই দড়ি আনিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গেল । গৃহ প্রবেশ ও আলমারির উপর হাত দিতে না দিতে বিভাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওখানে কে—রে ?” কোন উত্তর নাই, বালক ভয়ে অড়মড় ! দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা কবিরামায় উত্তর আসিল, “আমি যতি” “অন্ধকারে কি করছিস ?” “একটু দড়ি নেবা ।” “এত রাতিতে কেন ?” পরে প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়া তখন বলিলেন, “খা, আমি দিচ্ছি । দাদা !—যখন বুড়ো দড়িগুলি কুড়াইয়া রাগে তখন ভাব, দাদামশাই কি বোকা, কেবল ছেঁড়া দড়ি, আর ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া ময়ে ! এখন চুপি চুপি সেই ছেঁড়া দড়ি সরাইতে আসিগাছ ? বলি, বুড়ো কুড়িয়ে না পাখ লে, এখন এত রাতে দড়ি কোথায় পোত বলত ?”

কোথাও হটতে পত্রাদি আসিলে তাহার ব্যবহারোপযোগী অংশ কাটিয়া লইতেন এবং এইরূপ ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড ঢেবিলের এক প্রান্তে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন । আমরা অনেক ঠাণ্ডাকে ঐরূপ পত্রাংশ কাটিয়া লইতে দেখিয়াছি । প্রয়োজন মত ক্ষুদ্র পত্রাদি লিখিতে ও প্রেসে কাপি দিতে ঐ সকল কাগজখণ্ড ব্যবহার করিতেন । একদিন এক পরিচারিকা রন্ধনের বাটনা বাটিতে বাটিতে শিলখোরা হলুদের জলটুকু ফেলিয়াদিবামাত্র বিভাসাগর মহাশয় সতর্কভাবে বলিলেন, “বলি ও কি হলো ? হলুদের জলটা কেলে দিলে ।” সে দাসী অবাক হইয়া বিভাসাগর মহাশয়ের বুকের দিকে তাকাইয়া একটু রহস্যের স্বরে বলিল, “দাদামশাইএর কত টাকা বাজে, সে দিকে নজর নাই, আর এই হলুদের জলটুকুতে চোখ পড়েছে ।” তিনি বলিলেন, “যেহ হলুদের জলটুকু তরকারিতে দিলে, কাজে লাগতো ত, আমি ত আর টাকা বলে কেলে দিই না, লোককে দিই । ও জলটুকু নষ্ট হবে কেন ?” যে চাতিটী ঘটনার উল্লেখ করা গেল, এই চারিটী ঘটনাই তাহার গৃহকর্মে নিপুণতা, অতি সামান্য

দ্রব্যাদিও যত্নের সহিত রক্ষা করার অভ্যাস এবং ব্যয় বিষয়ে সমদর্শিতার উৎকৃষ্ট পরিচয়স্থল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতেন বলিয়াই তিনি বৃহৎ ব্যাপারে, মহদমুঠানে সর্বস্বান্ত হইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার মত উচ্চ উপাদানে গঠিত মানবের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক।

একাদশ, অধ্যায় ।

লোকসেবায় বিদ্যাসাগর ।

পুণ্যক্ষেত্র ভারতে দান মহাপুণ্যকাণ্ড বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । সকল কর্ম অপেক্ষা দানধর্মের গুণকীর্তনে শাস্ত্রের অনেক অংশ লিখিত হইয়াছে । তাহার কারণও আছে ; দানে যেমন আনন্দভাগ হয়, দানে যেমন অপাখিব পবিত্র স্থানের মধুর আবাদন সম্ভোগ করা যায়, এবং সেই আনন্দভাগ ও পরভূতিসাধনজাত স্থখে কদম যে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে বাস করিতে শিখে, তাহার আভাস সাধারণ লোকের ক্ষুদ্র স্থব সাধনের মধ্যেও ক্ষুদ্র আকারে অনুভূত হইয়া থাকে । মানুষ যখন একবার সেরূপ সবলুষ্ঠানের মধুর আবাদনে মুগ্ধ হয়, তখন আর তাহা ত্যাগ করিতে চাহে না । ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীগোরাধ দুটি ছোট কথায় সমগ্র ধর্মশাস্ত্রের সারতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন, “নামে কৃতি ও জীবৈ দয়া ” এষ্ট জীবৈ দয়া হইতেই বিশ্বব্যাপী বিপুল প্রেমের প্রবাহ মানবজন্মের প্রবাহিত হয় । লোক-সেবাসারথ্য মহাপ্রেমিক বিত্তশ্রীট বলিয়া গিরাছেন, “পরহিতার্থে তোমার দক্ষিণ হস্ত বাহা করিবে, তোমার বাম হস্ত যেন তাণা জানিতে না পারে ।” আমাদের শাস্ত্রেও আছে, “শুশ্রূষানং মহাপুণ্যং ।” দান করা ত ভালই, কিন্তু গোপনে দান করিলে অধিকতর পুণ্যকার্য হয় । ইহার তাৎপর্য্য এষ্ট যে, পরোপকার সাধনে যেন আত্মীয় ও উত্তেজনার উদয় হইতে পারে ; লোকচক্ষুর অগোচরে একপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, আমাদের আত্মদয়ের বিত্তকতা সুরক্ষিত হইবে

এবং নিজের অনুষ্ঠানবিষয়ে অল্প লোকের অজ্ঞতানিবন্ধন উদ্বেজনার সম্ভাবনা অতি অল্প হইবে। তাহার পর আবার সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপর দশ জনের সমক্ষে সাহায্য লইতে যত লজ্জা বোধ করে, নিজের হীনতা স্মরণ করিয়া যত কুণ্ঠিত হয়, লোকের অজ্ঞাতসারে সেই সাহায্য পাইলে, তাহার তত অড়সড় ভাব থাকে না; তাই আত্মহিতার্থে ও পরহিতার্থে “গুপ্তদানঃ মহাপুণ্যঃ।” লোকেব সেবা দুই প্রকারে করিতে পারা যায়। যথা—জীবানব প্রারম্ভ হইতে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আত্মস্থত সন্তোষের তৃষ্ণা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে, পরের ক্ষুদ্রে তৃপ্তি বিধানের জন্ত যে বাসনার সঞ্চার হয়, তখন লোকসেবারূপ মহাপ্রসূতির ক্ষুদ্র অঙ্কুরটী উর্ব্বাবাহুনি প্রাপ্ত হয়। এই খানেই ‘আত্মবৎ সর্বভূতেষু’ এই মহাবাক্যের সফলতার সূচনা হয়, এই মহামন্ত্র সাধন করিতে কবিতো, মানবরুদ্ধর হইতে “অয়ং নিম্নঃ পরোবহিঃ” লঘুচৈতান্যের এই ক্ষুদ্র ভাব ক্রমে তিরোহিত হয়, এই পরিণাম “উদারচরিতানন্ত বহুধেব কুটুম্বকম্” এই মহাতত্ত্ব পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। পরসেবার মানবগণ দেবত্বলাভ করিয়া জগতের আদর্শ নরনারীমণ্ডলী মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন। আব এক প্রকার লোক-হিতসাধন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সামান্য নহে, চিরজীবন পরিশ্রম করিয়া কেহ, শেষ দশায় অথবা মৃত্যুকালে, বহুস্বত্বসম্বিত দুই হাজার, দশ হাজার, কি লক্ষ, কি দুই লক্ষ টাকা কোন সদনুষ্ঠানে দান করিয়া থাকেন। এরূপ পরসেবা আদবণীর সন্মুখ নাট, এবং ইহার দ্বারা জগতের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যেই এরূপ দানের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইউরোপীয় জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া আমরাও এরূপ অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছি। কাঁচাটী সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর হইলেও পুরোঁক্করূপ সহজ ও স্বাভাবিক পরার্থপরায়ণতার তুলনার শেষোক্তটী কিঞ্চিৎ নিম্ন স্থান অধিকার করে। সহজে ও সুদিকাগুলে শৈশবকাল হইতে পিতা মাতা ও পরিবার পরিজনদের অহুত্বিত সাধুদুষ্টিদের অনুবর্তী হইয়া ভিগারীকে ভিক্ষা দিতে দিতে, ধন ও অন্ধের ধন্য ও অন্ধকৃত্তনিত দাক্ষ্য মনস্তাপের প্রতি ক্ষুদ্রের গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে করিতে, ঘোর বিপদের গভীর অন্ধকারে আবৃত মানবের মুখমণ্ডলের দাক্ষ্য বিবাদরাশি

দর্শন করিতে করিতে, শিশুর কোমল জন্মে যে দয়ার সকার হয় এবং সেই বাপ জনকজাত দয়াবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ শিশু যে অনুশ্রম স্বর্গীয় সুখের মধুবিন্দু সংযোগ করে, তাহা হইতে লোকসেবার যে অমৃতসিক্তর দৃষ্টপাত হয়, তাহারই পূর্ণতা সাধন, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন। তাই বলিতছিলাম, ভ্রাতের লোকসেবা— ভারতের সর্বভূতে সমদর্শিতা এক বিচিৎ বস্তু, কিন্তু হৃৎকের কথা বলিতে জন্ম বিদীর্ণ হয়, সে উদার উচ্চ শিক্ষা আমাদের মধ্যে স্থান পাইল না। যে পঞ্চবজ্রের দৈনিক অনুষ্ঠান পূর্বকালে আধ্যাত্মিক নিত্য উচ্চ নীতি শিক্ষা দিত, তাহার অনুষ্ঠানে আর কেহ আগ্রহীল নহে। আমরা আমাদের আচার আচরণ দ্বারা পরার্থ অপেক্ষা আর্থকেই আদরের জিনিষ করিয়া তুলিয়াছি। স্বার্থ ও পরার্থেব সংগামে স্বার্থের জয় ঘোষণায় আমরা দিন দিন অন্ধ হইয়া পড়িতেছি। সুতরাং শাস্ত্রবাক্য শাস্ত্রেই বহিল, অব আমরা বাহ্য তাহারই রক্ষিলাম। আমাদের জীবনে শাস্ত্র বাক্য সফলতা লাভ করিবার সুযোগ পাইল না।

এইরূপ অবস্থার ভিতর যখন বঙ্গদেশেব আর্থপবতা শাখাগোষ্ঠা-গোষ্ঠে বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল, তখন আবার সেই পৌরাণিক হস্তিষ্ঠালের পুনরভিনয় সংঘটিত হইল। অমর পুরুষ বলিরাজ নুতন বৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াই যেন আমাদের সমস্ত মহান আদর্শ দেখাইতে আসিলেন; অথবা মহাবীর কণ কুরুক্ষেত্রেব সন্যাসেব পরিভাগ করিয়া উচ্চ কুলের উচ্চ আদর্শ দেখাইবার জন্য আমাদের মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। পাঠক নিবিষ্ট চিত্তে অনুমান করিয়া দেখ, দেখিবে বলিরাজের হিমাশ্রম ভূমি দানের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানাগর-জীবন দেখিতে পাইবে; দাতা কর্ণের পুত্রদান ও সর্বজন্মের নিদানস্বরূপ কবচকুণ্ডল দান বিজ্ঞানাগরে দেখিতে পাইবে।

অনেক আধ্যাত্মিক তুলিয়াছি, অনেক উপদেশের কথা শুকজন ও উপদেষ্টা-দের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু বালক চন্দ্রবংশীর পৃষ্ঠদেশে, নিজের বাড়ীর চরখাকটা মোটা সুতার প্রোথিত গুল চোটব মত অনতিদীর্ঘ ও অপ্রশস্ত বস্ত্র খণ্ডে কারক্রেমে নিজের লজ্জা নিবারণ করিয়া নিজের চান্দ্রবৃত্তির টাকার

গরীব সহপাঠীদিগকে ততোচিত বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন; নিজের এবং নিজের প্রেমত পরিচ্ছদের পার্থক্য কখনও তাঁহার স্মৃতিভবের ব্যাঘাত জন্মায় নাই। ঈদশ উৎসব ও অত্যন্ত দৃষ্টান্ত কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। ঈদরাত্রি যে কি বিচিত্র উপাদানে গঠিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত হিসাব পত্র এই একটা ঘটনার মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে। কর্তব্য সাধনের জন্ত—লোকহিত সাধনের জন্ত—বিভাগাগর মহাশয় অবলীলাক্রমে নিজের সর্বনাশ সাধন করিতে পারিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার স্মৃতিভব জীবনে নানা ঘটনার মধ্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; আমরা কেবল সেই স্তম্ভিক একত্র মিলাইবার কথঞ্চিৎ প্রয়াস পাইব। প্রস্তুতি কুসুমনিচয়-পরিণোদিত তাঁহার সেই সদমুষ্ঠানের পুষ্পোজ্ঞানের শোভা যে কত মনোহর, কিরূপ হৃদয়-মুগ্ধকর ও উপদেশপ্রদ, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

বিভাগাগর মহাশয় বিভাগায়র সমপাঠীদিগের অভাব মোচন করিতে, তাহাদের পীড়াতে চিকিৎসা ও পথের ব্যবস্থা করিতে এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের সেবা কুশলায় নিযুক্ত থাকিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। বাল্যকাল হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যে কত শত শত রোগীর লম্বাপার্শ্ব ঘামিনী যাপন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। দুঃস্থ বালক এইরূপে ক্রমে সজ্জদর ও সেবাপরায়ণ বৃকে পরিণত হন, সজ্জদর ও সেবাপরায়ণ বৃক ক্রমে এক বিশ্বব্যাপী উদারতার চরম আদর্শে পরিণত হইয়াছিলেন। এক ব্যক্তি কিরূপে আত্মসুখে বিনিময়ে পরের তৃপ্তি বিধানের জীবন ধারণ করিতে পারেন, আমাদের সমক্ষে তিনি তাহার অতুলনীয় দৃষ্টান্তের সুদৃঢ় স্তম্ভ চির-প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ও ৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বঙ্গের অমর কবি শ্রীমধুসূদন যখন ফরাসী দেশের অন্তর্গত ভার্সাইন্স নগরে নানা বিপদে আক্রান্ত হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন, যখন তাঁহার বন্ধীর স্মৃতিগুণ তাঁহার অনটন, অনশন ও পরিশেষে তাঁহার কারাবাসের সজ্জবনা-সংবাদেও নিরুৎসাহে স্তম্ভিত হইয়া সন্তোষ করিতেছিলেন, পুনঃ পুনঃ বিপদের সংবাদ আসিলেও ভারপ্রাপ্ত সজ্জদরগণী যখন কোন ভয় হইলেন না, বিলাত গমন কালে সর্বপ্রকার ভার গ্রহণ করিয়া শেষে যখন গভীর উত্তর পর্যন্ত দিতে তাঁহার

বিদ্যুৎ হইয়া পড়িলেন, তখন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মধুসূদন, নিজের বিপদের প্রকৃত ভাব-
অনুভব করিয়া, বহুজনের ব্যবহারে ভয়ঙ্কর হইয়া, চারিদিক অন্ধকার
দেখিতে লাগিলেন । নিরবচ্ছিন্ন নিরাশার ঘন অন্ধকার যখন তাঁহার গভীর
চিন্তাভাবাক্রান্ত হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিল, তখন সেই অন্ধকার পথে ভাঙিতা-
লোকে কোন মূর্তি অঙ্কিত হইল ? সেই প্রবাসী মধুসূদনের বিবাদের অন্ধকার
ভেদ করিয়া কোন মহাপুরুষের মধুরমূর্তি তাঁহার হৃদয়প্রান্তে উদ্ভিত হইয়া
আশার সকার করিয়াছিল ? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বেই পাঠক বুঝিয়াছেন
যে, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ই সেই মহাপুরুষ । মধুসূদনের সুবিস্তৃত জীবনচরিত্র
পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি বঙ্গের সকল সম্রাট লোকেরই সঙ্গলাভ ও সহযোগ
পুখে সম্মানিত হইয়াছিলেন । কিন্তু বিদেশে বিপন্ন মধুসূদনের স্থির বুদ্ধি একে
একে সমস্ত ভাগ করিয়া বাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিল, সেই মহাপুরুষকে তিনি
নিজে কবিতাসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

বিজ্ঞান সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে ।
করুণার সিদ্ধ তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনেব বদ্ধ !— উচ্ছল জগত
হেমাদ্রি বহেমকান্ধি অন্নান কিবাণ ।
কিন্তু ভাগ্য বলে পেয়ে সে মহা পর্জতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণ,
সেই জানে কত অণু ম'ন কত মতে
গিবাণ । কি সেবা তাব সে সুখ সমানে ।—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী,
যোগ্য অমৃত ফল পরন আমরে
দীর্ঘ শিরঃ তরু দল, দাস রূপ ধরি ,
পরিমলে ফুল-ফুল দশদিশ ধরে,
দিবসে সীতল স্বাসী ছায়া, বনেধরা,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে !

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখে মধুসূদন নিরুপায় হইয়া যে পত্রের দ্বারা “সুবর্ণচরণে” আশ্রয় লইয়া আশ্রয়কার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সেই সুবহুৎ পত্রের কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—

“আমাব দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি অনিচ্ছা চমকিত ও গভীর দুঃখে অভিভূত হইবেন যে, দুই বৎসর পূর্বে উচ্ছাসপূর্ণহৃদয়ে আপনার নিকট যে ব্যক্তি বিদায় লইয়াছিল, আজ এইক্ষণে আমি সেই সবলকার ও প্রশান্তিত্ব ব্যক্তির ভগ্নাবশেষ যাত্রা, এবং করেক জন লোকের নিঃসৃততা, বোধাতীত নিঃসৃত ব্যবহারের জন্ত আমি এইরূপ দুর্দশাপাক মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ; আক্ষেপের বিষয় এট যে, ইহাদেব মধ্যে এক জন আমাব আমাব হিতাকাঙ্ক্ষা ও সুহৃৎ। * * *

আমার ৪০০০ টাকা স্বদেশে পাওনা, তবু আমি অশ্রুভাবে এ দেশীয় কোন কাবাগারে যাওয়াতছি, আর আমাব স্বা ও সম্মানেবা কোন অনাথ-আশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে।

যে দুববস্তার মধ্যে আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধার কবিয়া আপনি একমাত্র সুহৃৎ এবং ইহা সম্পন্ন কবিত হইলে যে বিশাল কষ্ট নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তাহা আপনাবই অস্থির চিন্তা ও প্রতিভার নিত্য সহচর। একটা দিনও বিলম্ব কবিলে চলিবে না।

আপনাকে যে ক্রেশ দিতেছি, সে জন্ত কি ক্ষমা প্রার্থনা কবিব ? আমি তাহা আবশ্যক বোধ করি না, কারণ আমি আপনাকে বেশ জানি ও সর্বদা : করণে বিশ্বাস করি যে, একজন বন্ধু ও স্বদেশীয়কে আপনি এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া মরিতে দিবে না।

দয়া করিয়া করাসী দেশে উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন, কাবণ দৈবানুগ্রহ ও দৈবানুগ্রহীত আপনার করুণা ব্যতীত এখান হইতে স্থানান্তরিত হইবার অজ্ঞ কোন পার্থিব সম্ভাবনা নাই।

শ্রিয় মহাশয়,

আপনাব চিব বিশ্বাসভাজন,

(স্বাক্ষর) মডিকেল মধুসূদন দত্ত ।”

* You will be startled, I am sure, grieved to learn, that I am at this

এই পত্র পাইয়া বিভাগসমূহ মহাশয়ের অসীম হৃদয়বলার আর কুল কিনারা রহিল না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিভাগসমূহ মহাশয়ের অসঙ্কলভার মধ্যস্থতায় তিনি নিজে সে সময়ে ঋণ জালে জড়িত, অভাব ও অনটনের মধ্যে বহু কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন, সামান্য অর্থ পাইলে, তাঁহারই আর্থিক অসঙ্কলতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিতে পারেন। এক্ষণে তিনি প্রবাসী মধুসূদনের দারিদ্র্য ও ভবিষ্যৎ সমূহ বিপদের আশঙ্কা অবগত হইয়া তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বিষয়তঃ মধুসূদনের বন্ধুগণের আচরণের কথা অবগত হইয়া আরও ক্লান্ত হইলেন। তাঁহার নিজের প্রতি লোকের যে আচরণ দেখিয়া তিনি স্বামশ্রীর গণের আচরণে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, বিদেশবাসী মধুসূদনের বিপদের বার্তা ও বন্ধুজনের বিকৃত ভাব তাঁহার পূর্ক সংস্কার আরও বন্ধন করিল। তিনি মধুসূদনের বন্ধুগণের নিকট ও অন্তঃকরণে নানা স্থানে চেষ্টা করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে নিকটবর্তী হইয়া নিজের ঋণভার বন্ধি করিয়া, মধুসূদনের উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হইলেন। বহু কষ্ট পরবর্তী ডাকে ১৫০০ টাকা মধুসূদনকে পাঠাষ্টলেন এবং অর্থ প্রাপ্তিমাৎ ইংলণ্ডে গমন পূর্ক নিজের প্রয়োজনীয় কাপড় বাপ্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। যে দিন ডাক পৌঁছবার কথা, সেই দিন প্রাতঃকালে ভার্সাইস নগরে দত্ত

moment the wreck of the strong and hearty man who had founded two years ago with a bounding heart and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least, I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher. * * *

I am going to a French jail, and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution though I have fairly Rs. 4,000 due to me in India.

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which I have been brought, and in this you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost.

Shall I apologise for the trouble I am giving you? I do not think so; for I know you enough to believe with all my heart that you would not allow a friend and countryman to perish miserably.

Kindly address in France, as above, for there is no earthly chance of my leaving this country before God and you, under God, help me to do so.

I am, my dear Sir,

Ever yours faithfully,

Michael M. N. Datt.

পরিবারে যে কাতর ক্রন্দনের ধ্বনি উথিত হইরাছিল, তাহা মধুসূদনের নিজের উক্তিভেদেই পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে :—

“ভার্সেলিস্, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪।

প্রিয় সুহৃদ—বিগত ২৮শে আগষ্ট রবিবার প্রাতঃকালে আমি আমার সুদূর পাঠাগারে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার দুঃখিনী স্ত্রী অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার নিকট আসিয়া বলিল, ‘ছেলেটা মেলা দেখিতে বাইতে চাহিতেছে, কিন্তু, আমার হাতে তিন ফ্রাঙ্ক * মাত্র আছে; তোমার দেশের লোকগুলি কেন আমাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন?’ আমি বলিলাম, ‘আজ ডাক আসিবার দিন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কোন না কোন সংবাদ পাইব, কারণ যে লোকের নিকট অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছি, তিনি আর্থাৎ স্বামীর দ্বারা প্রতিভাশালী ও বিজ্ঞ, ইংবাজের দ্বারা কার্যকুশল ও বাক্যালী জননীরা দ্বারা কোনলজদর।’ আমি ঠিকই বলিয়াছিলাম, কারণ এক ঘণ্টা পরেই ১৫০০ টাকা সমেত আপনার পত্র খানি প্রাপ্ত হইলাম। হে সুজন, কীতিমান, পরম সুহৃদ! আপনাকে কেমন করিয়া আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইব? আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন * * *।’ মধুসূদন এই পত্রে অনেক দুঃখের কাহ্না কাঁদিয়া, বাঁহাদের নিকট টাকা পাইতেন, তাঁহাদের নাম ও টাকার হিাব দিয়া শেষে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন :—

“কেমন, আমি কি ঠিক বলি নাই যে, আপনার হৃদয় বাক্যালী মায়ের মত?” +

* এক ফ্রাঙ্ক পূর্বাফসাতে আট আনারও কম। আজ কাল আট আনার বেশী।

Versailles, 2nd September, 1864.

My dear Friend,

On the morning of last Sunday, 28th ultimo, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears in her eyes and said “the children want to go to the Fair, and I have only 3 Francs : why do those people in India treat us this way ?” I said - “The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.” I was right ; an hour afterwards I received your letter and the Rs. 1,500 you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend ; you have saved me. * * * * am I not right in thinking that you have the heart of a Bengali mother ?

মধুসূদনের বন্ধুগণের নিকট টাকা আর কোন কিনারা করিতে না পারিয়া বিভাগাগর মহাশয় নিতান্ত বিগত হইয়া পড়িলেন । মধুসূদনকে আরও অনেক টাকা পাঠাইতে হইল । কিন্তু ততক্ষণে যেমন আপন লাগানিহিত কোষখণ্ডে আপনাকে আবদ্ধ করে, তেমনি বিভাগাগর মহাশয় গুণের চুড়োস্ত বৃদ্ধ রচনা করিয়া জুড়াতে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর কোন উপায় রহিল না । গুটিপোকা যেমন আত্মবিনাশ করিয়া জনগণের শোভা ও লৌকিক্য হৃদি করিয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপ আত্মবিনাশ করিয়া মধুসূদনের কলাগাথাধন কবিতা লাগিলেন । মধুসূদন বিভাগাগর মহাশয়ের অবস্থা অবগত হইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ :—

“ভাসলিস্ ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ ।

প্রিয় ব্রজ—২৪২০ ফ্রাঙ্কের চতুর্দশ আপনার পর বখাসময় পৌঁছিয়াছে, এই টাকা নিতান্ত চুঃসময়ে আসিয়াছে, কারণ হাতে কিছু ছিল না, আমরা অতি ব্যাকুল ভাবে আপনাব সংবাদ পাইবার জন্য পথপানে তাকাইয়া ছিলাম । আমি যে সর্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আপনার পত্র পাঠে আমি অস্তরে দারুণ বেদনাও পাইলাম, যেমন কেহ আমাদের মাতৃভাষার বলিতে পারে :—“আমি বিলক্ষণ হৃদিত্তে পরিতোষিত যে, হতভাগার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিসম বিপজ্জালে পড়িয়াছেন । কিন্তু কি করি ! আমার এমন একটা বন্ধু নাই, যে তাঁহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি । আপনি এখন অতিমাত্রায় মত্ত মহাদুঃখ ভোগ করিয়া কোরব-দলে প্রবেশ করিয়াছেন, আমার এমন শক্তি নাই যে, আপনাকে সাহায্য প্রদান করি ? অতএব আপনাকে স্ববলে শ্রমদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক । এ কথাটা যেন সর্বদা স্মরণ থাকে ।” •

* Versailles, 18th December, 1884. - My Dear Friend, - Your kind letter with a draft for 2400 Francs, reached me in due course and in very good time : for we were without money and eagerly looking out to hear from you. I need scarcely tell you how sincerely I thank you. But your letter has pained me no little as one would say in our mother-tongue

পত্রের শেষ অংশটুকু বাঙ্গালার লিখিত । চতুর্থের বিষয় যে বিজ্ঞানাগর মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়া মধুসূদনের উদ্ধারসাধনে অগ্রসর হইয়া দীর্ঘকাল অগত্যা হইয়া আসিয়াছিলেন । মধুসূদন, ঠংগেও অবস্থান কালে কিংবা এদেশে প্রত্যাপন করিয়া কোন দিনও ঈশ্বরচন্দ্রকে অগত্যা হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাট । বিজ্ঞানাগর মহাশয়কেই, সে অগত্যা ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে হইয়াছিল । বিজ্ঞানাগর মহাশয় বিবিধ বিপদের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও মধুসূদনের বিপদহার করিয়াছিলেন । অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাকে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার উত্তীর্ণ করাষ্টয়া স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যিনি এত অসুবিধা ভোগ করিয়া একপ বিপুল অগত্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দেশে আনাষ্টয়াছিলেন, স্বদেশে পদার্পণ করা অবধি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এক দিনের জন্য তিনি বিজ্ঞানাগরহইন সুসুন্দর পরামর্শে কিংবা উপদেশে চলিতে প্রয়াস পান নাই । বিজ্ঞানাগর মহাশয় অপ্রাপ্ত নরনে আমাদের নিকট বলিয়াছেন, “মাতৃকল আসিয়া সুখে বাস করিতে পারেন, একপ একখানি পছন্দসই বাড়ী পূর্ণ হইতে ভাড়া লইয়া, একজন বিলাতপ্রত্যাগত সন্ন্যাস লোকের বাসাপ্রার্থনা করিয়া সাজাইয়া রাখিলাম ; বড় সাধ মধুসূদন আসিয়া সেই বাড়ীতে বাস করিবেন, কিন্তু আমার নির্দোষ ও সুসজ্জিত গৃহ পড়িয়া রহিল মধুসূদন আসিয়া স্পেন্স হোটেলে উঠিলেন।” বিজ্ঞানাগর মহাশয় সাক্ষাৎ করিয়া আনিতে গেলেন । বিফলমনোরথ ও ভয়ঙ্কর হইয়া ফিরিয়া আসিলেন । মধুসূদন ভারতে আসিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিয়া ফিরিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । বলা বাহুল্য যে-প্রতিভার প্রসূতিত “শতদল কমল—মধুসূদন চলচ্চিত্র বাঙ্গালী ছিলেন । বিজ্ঞানাগর মহাশয় “বাঙ্গালী মাতের হৃদয় শক্তি”-পরিচালিত হইয়াই মধুসূদনের অবজ্ঞার ভাব উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সর্ববিধ সুবিধার উপায় করিতে লাগিলেন । মধুসূদনের জীবনচরিত্র প্রণেতা বলিয়াছেন :—“যে মহাশয়, তাঁহার প্রবাসকালে সাহায্য করিয়া অপরিশোধ্য অগত্যা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, ছিলেন, এখনও তাঁহার দ্বারা বিরাম ছিল না । বিজ্ঞানাগর মহাশয়, মধুসূদনের ব্যবসারের সুবিধার জন্য পূর্ণ হইতে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন । তাঁহার এবং অন্যান্য বহুদলের সাহায্যে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক

অভিগ্রহণ করিয়া, তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন ।”

বিভাগসম্বন্ধে মহাশয় আপনি অগত্যাতে জড়িত হইয়া মধ্যস্থতাকে স্বয়ং বিহীন ছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন, নাইকেল স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, যে কোন উদ্ভায়ে হইক স্বয়ং পরিশোধ করিবেন । কিন্তু বিভাগসম্বন্ধে মহাশয়কে বরার সে আশায় বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল । মধ্যস্থতের নিকট টাকা আদায় হওয়া কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছিল এবং সে অল্প তাঁহাকে কিরূপ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত পত্র পূর্ণরূপে পরিবাক্ত হইতেছে :—

“সাদর সম্ভাবনাবোধনম্—অন্ত সাত দিন হইল বন্ধমান আসিয়াছি, এগারো তালুশ উপকার বোধ হয় নাই । আসিবার পূর্বে আপনাকে কিছু বলিবার চেষ্টা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটয়া উঠে নাই, একত্র লিপি দ্বারা জানাইতেছি । অনেকের একরূপ সম্বন্ধ আছে, আমি বাহা বলি, কোন ক্রমে তাহার অল্পতা তাহা ঘটি না, সুতরাং তাহার অসম্ভব চিন্তা আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কাটা করিয়া থাকেন । মোকর একরূপ বিশ্বাসপ্রদান হওয়া যে প্রাপ্য, তাহার সম্বন্ধ নাই । কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ণ লক্ষণ ঘটিয়াছে ।—

যৎকালে আমি অনুকূল বাবুর (অজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) নিকট টাকা লই, অস্বীকার করিয়াছিলেন, আপনি প্রত্যাগমন করিলে পরিশোধ করিব, তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যৎকালে টাকা না পাঠিলে পাঠে আপনার কতি বা অনুবিধ হয়, এত আশঙ্কায় অজ কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের (শ্রীশচন্দ্র বিভাগসম্বন্ধে) নিকট কোম্পানির কাগজ দ্বারা করিয়া টাকা পাঠাইয়াছি । তাহার দ্বারা বরার পরিশোধ করিব এই অস্বীকার ছিল । কিন্তু উত্তর মতেই আমি অস্বীকারপ্রস্তুত হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূল বাবু সত্ত্বর টাকা না পাঠিলে বিলম্ব অশেষ ও অপমানপ্রস্তুত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই ।

একপক্ষে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই চর্চাবনার সর্বজন্য আমার

অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে
রাজিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই,
সবিশেষ বন্ধ ও মনোযোগ করিয়া দ্বারায় আমার পরিভ্রাণ করেন। পীড়া শান্তি
ও স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল
তথায় থাকা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে বাইব হিব
করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোন মতেই যাইতে পারিব না।
এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন, অধিক
আর কি লিখিব, আমি নিজ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কাৰী শেষ করিয়া লইব।
আমার শরীরের যেকোন অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না। অনেক
লিখিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ পারিলাম না। কিম্বদিকমিতি—

ভবদীয়শ্চ—

(স্বাক্ষর) শ্রীদেবচন্দ্র শর্মাণঃ । ”

শ্রিয় বিজ্ঞানাগর মহাশয়,

এইমাত্র আপনার পত্র পাঠলাম, এই পত্র পাঠে প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ পাইলাম
আপনি জানেন, পৃথিবীতে এমন কোন কর্ম নাট, যাহা আমি আপনার জন
করিতে কুণ্ঠিত হইব। এই অপ্রীতিকর ঋণভার হইতে মুক্তিলাভের জন্য আপনি
যাহা আবশ্যক বোধ করেন, তাহাই করিবেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি
আছে। শ্রী ২১০০০ হাজার টাকা ঋণ দানের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এক
পত্র লিখিয়াছিলেন। আপনি কি মনে করেন, অনুকূল উক্ত সম্পত্তি বন্ধক
রাখিয়া আরও কিছু বেশী টাকা ঋণ দিতে পারেন না? সুদের বাড়তি টাকাট
আমি নিজ হইতে দিতে পারি, আমি তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করিব কি?
এইরূপে যদি সম্পত্তিটা বাচান যায় ভালই, না হয় ত শেষে ছাড়িয়া দিব।
আমার ইচ্ছা হইল এখনই ছুটিয়া আপনার নিকট যাই, হয়ত আগামী শনিবার
আমি যাইব।

মহাশয়ের একান্ত প্রত্যাশিত,

(স্বাক্ষর) মাইকেল মধুসূদন দত্ত । *

* My dear Vidyasagar,

1, Spence Hotel.

Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great
pain. You know, that there is scarcely anything in this world that I

টাকা আদায় হইল না। মধুসূদন টাকাকড়ি সবক্কে কোন প্রকার খুন্সী জানিতেন না। টাকা পাইলে বিবেচনা করিয়া খরচ করিতে, কিংবা রাখিয়া ঢাকিয়া চলিতে জানিতেন না। অর্থ বিষয়ে হাজার হাজার কি দশ হাজার, কথার স্বকথার বলিয়া কেলিতেন। তাঁহার কোন পদ্ধতিতে হুই দশ টাকার উল্লেখ নাই, হুই পাঁচ শত টাকারও উল্লেখ বড় বেশী দেখা যায় না। টাকার কথা বখনই পড়িরাছে, তখনই হাজারেব এমিকে নামাইতেন না। ছুই দশ বিশহাজার টাকা লেখনীর অগ্রভাগে সগুদাই বিরাজ করিত। অথচ, টাকা পাইলেই আর নাই, এরূপ লোকের হাতে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বেক্স হুদখা হুইবার কথা, পাঠক তাহাই অনুমান করিয়া গউন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের তাহাই হইয়াছিল। মধুসূদনের দ্বন্দ্ব পরিণোধ করিতে তাহাকে সংকট বহুর তিন ভাগের দুই ভাগ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। তাহাতেও তিনি কাতর হন নাই। তিনি মধুসূদনকে রক্ষা করিতে না পারিয়া কাতর হইয়াছিলেন, মধুসূদন তাঁহার কথা না শুনার রূপ পাইয়াছিলেন। শেষে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করার পরেও, স্বদেশে নিত্য অসহায় ও বিপন্ন অবস্থার তিনি বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের নিকট সময়ে সময়ে অন্ন অন্ন সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিপুল দণ্ডার হঠতে যুক্ত হইবার অল্প তাঁহা'ক পত্র লেখায় তিনি মধুসূদনকে যে উক্তর দিয়াছিলেন সেই পত্র খানি এই :-

শ্রিয় কৃত, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি এবং আমার এই দৃঢ় সংকল্প অন্বিরাছে যে আপনার অবস্থার পরিবর্তন একবারে অসম্ভব। আমার কোন প্রকার চেষ্টা কিংবা ধনকুবের ব্যতীত অন্য কোন লোকের আগণ চেষ্টা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাপি দিয়া রাখিবার অবস্থা পার হইয়া

would hesitate to do for you, of course you have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden. Srish has written to me offering Rs. 21,000. But don't you think Onookool would advance fresh money enough to pay off that man and hold the property by way of mortgage - usufructuary mortgage - I paying him the difference in the interest? If we can in this way save the estate let us do so, if not let them go. I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do so next Saturday.

With affectionate regard,
Sir, yours
(Sd.) M. S. Dutt.

গিয়াছে। আমি অমুহু এবং সেই জন্য অধিক লিখিতে অক্ষম। ৩০শে সেপ্টেম্বর ৭২। আপনার বিশ্বাসভাজন (স্বাঃ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মাণঃ। *

এইরূপ দুর্কিপাক ও দুঃস্বপ্নের মধ্যে পড়িয়া মধুসূদন দ্বারায় পীড়িত ও শোকে লোকাভ্যস্ত হন। মধুসূদনের লোকান্তর গমনের দীর্ঘকাল পরে ‘সিটি কালেক্টর’ অধ্যক্ষ অধুনা স্বর্গীয় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক আহৃত, মধ্যাহ্নকাল ১১ ঘটিকা যশোহর-খুলনা সন্মিলনীর মিলিত সভার উদ্বোধনে মধুসূদনের অস্তিত্বের রক্ষা ও তত্তপরি কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা হয়। উক্ত সভার অনুরোধক্রমে আমরা বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বহু আলাপ ও বিলাপের পর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন, “দেখ, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাহার জান রাখিতে পারি নাই, তাহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই। তোমাদের নূতন উৎসাহ ও আগ্রহ স্নেহে, তোমরা করগে।” এই কথাগুলি বলিয়া শেষে যে বিলাপ করিয়াছিলেন, অন্তরবেদে গভীর পরিতাপ ও আক্ষেপের পরিচয় পাড়িয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া কোন ক্ষমারবান ব্যক্তিই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না।

মহাস্মরণ—সন ১২৭২ (১৮৬৭ খ্রষ্টাব্দ) সালের অনাবৃষ্টি নিবন্ধন উক্ত বৎসরের শেষ ভাগে বিশেষতঃ ১২৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় প্রভৃতি কয়েক মাস এ দেশে যে ভীষণ কালু সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার নহে। বৈশাখের প্রচণ্ড মার্কিও যখন সমগ্র বঙ্গভূমিকে সমস্ত ও বর্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন আর এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে সমগ্র দেশ দগ্ধ হইয়াছিল। আদিত্য-প্রভাতে বঙ্গভূমি নীবস ও গুরু, আর অষ্টরানল জ্বালায় বঙ্গসহস্র বিস্তৃতমুখে ও দীর্ঘ ক্রমেবরে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। ছুটিয়া কে কোথায় গিয়াছিল, তাহার নিশ্চয়তা নাই। উপস্থিত পুত্র বৃদ্ধ পিতা মাতাকে

* My Dear Dutt,

I have tried my best and am sadly convinced that your case is utterly hopeless one. No exertion of mine, or that of anybody else who is not a moneyed man, however, strenuous it may be, can save you. It is too late to mend matters by patch-works. I am very unwell and am therefore unable to write.

Yours sincerely,

30th Sept. '72.

Isvara Chandra Sarmā

জাগ করিয়া, বুঝী জননী কোমলকলেবর শিশু সন্তানকে পথ-পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া কোন অপরিচিত পথে, কোন অজ্ঞাত দেশে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার নিশ্চয়তা নাই। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি, এক মুঠী আগ্নেয় জন্তু স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ লগ্নায়িত। অস্বাভাব্য লতাপাতা ও বৃক্ষমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিভক্ত করিতে শেষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। উকিচু ও বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চলের লোক অত্যধিক বিপন্ন হইয়া বিদেশে, অতি দূরদেশে গিয়া পড়িয়াছিল। এই চুক্তিতে বঙ্গবীর মহাপুরুষ ষোলোচন্দ্র দখলকর্য্য ব্যতীত করিয়া বীর হুঃখীর কুখানল নির্মূল্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ নিরস্ত্র প্রজামণ্ডলার দক্ষিণ অভাবে প্রকৃত বিবরণ রাজকর্ণচারীদের গোচর করিতে এবং তদ্বারা রাজপুরুষদিগের দ্বারা হুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুযায়ক্রমে অনুসন্ধান এবং মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার নানা স্থানে সরকারী খরচে অন্নদ্রব্য খোলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠে নাট। মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে লোক অস্বাভাব্য প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং বীরসিংহ ও তদ্বিকটবর্তী গ্রামের লোক সকল অস্বাভাব্য কাতর হইয়া বিভাগসমূহ মহাপুরুষের দ্বারা হাহাকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই অস্বাভাব্য ও আত্মনাশের সংবাদ কলিকাতার বিভাগসমূহ মহাপুরুষের নিকট পৌঁছিবামাত্র তিনি চুক্তিকলীভিত্ত লোকমণ্ডলীর অস্তরানল নিবারণের ব্যবস্থা করিবার জন্ত তৎক্ষণাৎ বাটী গমন করিলেন। ঠাণ্ডা নিজ ব্যয়ে যে কত লোক প্রাণধারণ করিয়া কৃতাপ হইয়াছিল এবং যে জন্তু তাঁহার যে কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ এক্ষণে সংগৃহীত হওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। তবে তিনি যে অন্নদ্রব্য পুষ্টিয়া অকাতর ৪৫ ক্রাস অন্ন দান করিয়া ছিলেন, তাহার মোটামোটা বিবরণ জানা যাইতে পারে, অসংখ্য অন্নক্লিষ্ট লোক আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ১২ জন পাচক নিযোজিত রন্ধন করিয়াছে। ২০ জন লোক অবিলম্বে পরিবেশন করিয়া অবসর হইয়া পড়িয়াছে। মধো মধো ইহাদিগকে পরিবর্তিত করিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হইত। একজন অবিলম্বে পরিভ্রমে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন ও শ্রাবণ মাস কাটিয়াছে।

প্রথম প্রথম ১০০।২০০ লোক খাইত। ক্রমে যখন অত্যাচারের আশঙ্কা চারিদিকে পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল, তখন অস্বাভাব্য লোকের সন্ধ্যাও অগণ্য

হইয়া পড়িল। শেষে এমন হইল যে, দিবারাজি অন্ন বিতরণ করিয়াও কুলার না। বিভাগাগর মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া সেখানকার ভারপ্রাপ্ত সহোদর শত্ৰুচক্ৰ বিভাগর মহাশয়কে লিখিয়া পাঠান, “বস্তু টাকা ব্যয় হয় হউক, কেহ যেন অতুক্ত না থাকে। সকলেই যেন খাইতে পারা।” এই সময়ে বিভাগাগর মহাশয় প্রায় সর্বদাই বাটা খাইতেন। একবার নাটী গেল, অন্নার্থী লোকেরা তাঁহাকে এই বলিয়া ধরিল যে, খেচরায় খাইতে খাইতে আহারে অল্পচি জন্মিতেছে, মধ্যে মধ্যে এক একদিন চারিটা সাদা ভাত হইলে ভাল হয়। যেমন জানান হইল, অমনি বিভাগাগর মহাশয় সপ্তাহে একদিন অন্ন ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই ভাতের ব্যবস্থার প্রথম দিনই একটি নিতান্ত জদয়বিদারণ চুর্ঘটনা ঘটে,—অন্ন ব্যঞ্জনের আরোজনে এক ব্যক্তি দ্রুত মনে ভাত খাইতে গিয়া তরকারির স্রষ্ট্র অপেক্ষা অসহ্য হওয়াতে, সে শুক অন্ন মুখে দিয়া দম আটকাইয়া তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়! এই চুর্ঘটনার, আনন্দকর ব্যাপার সহসা নিরানন্দে পরিণত হইল। বিভাগাগর মহাশয় দৈহ মৃত্যুব্যক্তিকে ক্রোড়ে লইয়া অনেকক্ষণ রোদন করেন। তাহার ভাত খাওয়া হইল না, অনাহারে মৃত্যুর দিনে, আশাব করিতে গিয়া বেচারী মরিয়া গেল। এই দুঃখ চিরদিন শক্তিশেলের স্থায় তাঁহার জদয়ে বিদ্র ছিল।

উত্তরজাতীয় দরিদ্রলোকদের প্রতি পাছে কোন প্রকার অগ্ন হয়, এই আশঙ্কায়, তিনি নিজে দুঃখী ও দুঃখিনীর মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন হাড়ি, ডোম প্রভৃতি ইতব জাতীয় লোকদেব কক্ষ মাথায় তৈল দিতে কেহই অগ্রসর হইত না, তাই তিনি নিজ হাতে তৈল লইয়া তাহাদের মাথায় মাখাইয়া দিতেন। তিনি নিজে এইরূপ করিতেন বলিয়া কেহই আর তাহাদের প্রতি কোন প্রকারে অবজ্ঞ করিতে সাহস করিত না। তাহার জৈশূষ আচরণ গ্রামে, বেশে বেশে প্রচারিত হওয়াতে দীনদুঃখী লোক তাঁহাকে দয়ার অবতার বলিয়া ঘোষণা করিত। যে অসংখ্য স্ত্রীলোক এই ছত্রের অশ্রু প্রাণ ধারণ করিত, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের সন্তান সম্ভাবনা ছিল। গৃহে থাকিলে এসবের প্রোক্তালে এসেবে যে সকল অতুষ্ঠান হইয়া থাকে, বিভাগাগর মহাশয়ের আদেশে অন্নহস্ত্রেই সেই সকল অতুষ্ঠান দখারীতি সম্পন্ন হইল। ইহার কারণ এই যে, পঞ্জীব লোক, গৃহে পরিজন-পরিবেষ্টিত থাকিলে, যে সকল অতুষ্ঠানে জুবাভূত

করিতে পার, দুর্দিনে অন্নহস্তে আছে বলিয়া, সে সুখে বসিত হইবে কেন ? পাঠক একবার *নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা কর, কিরূপ উচ্চ উন্নয়ন মহাপ্রাপ্ত থাকিলে, একজন মানব-প্রেমের উৎস উৎসারিত হইতে পারে ! বিভাগসম্বন্ধে মহাপ্রেমের গৃহ যেরূপ সমগ্র সংসারের লোকের পাদুশালা, তাহার আত্মীয় স্বজন যে তাহার লোকসেবার সহায়তা এবং তিনি যে সংসারে পদের দ্বংস দূর ও তাহারে সুখসাধন করিবার জন্যে অগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সমগ্র জীবনের বিবিধ আচরণে তাহার শতপ্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার প্রাণ মহাপ্রাণ—নরদেহে বিধাতার দয়ার দ্বারা কিরূপে সংসারের দ্বংস হরণ করে, তাহার অত্যাশ্চর্য আশ্রয় দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নহস্তে তাহার লোক-সেবার অন্তরালে দেখিতে পাউতেছি।

এই সমগ্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের দারুণ হাহাকারে যখন চারিদিক নিরাসিত হইয়াছিল, তখন বিভাগসম্বন্ধে মহাপ্রেম নিজের অর্থব্যয়ে এবং রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ করিয়া নানা প্রকারে বঙ্গসম্রাটের অন্তরালে নির্মাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি অসংখ্য নরনারীকে স্বকীয় মুক্তা হইতে রক্ষা করিয়া সমগ্র দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। দীন দরিদ্রজন তাহাকে এই সময় হইতে দয়ার সাগর বলিয়া ডাকিতে শিখিল। রাজপুরুষগণ তাহার সদয়তা ও সুপরামর্শ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক পত্রখানি এষ্ট :—

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগসম্বন্ধে,

বীরসিংহ।

মহাপ্রম, বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর ১৮৯৭* খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখের আদেশনামত আপনাকে জানাইতেছি যে, বিগত মহাস্থব্রের সময়ে হুগলী জেলার দরিদ্র লোকদিগের অভাব মোচনে নানা প্রকারে সাহায্যের জন্য গত-মেন্টে আপনার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

(স্বাক্ষর) সি, টি, মন্টগুমের, কমিশনার বঙ্গবাসি বিভাগ।*

* To Pandit Isvara Chandra Vidyasagar, Beersingha.

Sir, I have been instructed by the Secretary to the Government of Bengal, under order of the 20th instant, to express to you the warm

বর্দ্ধমান।—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেলওয়ে খুলিবার পূর্বে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বিভাগাগর মহাশয়, ৮ রামগোপাল ঘোষ ও রাজা সত্যশরণ ঘোষাল মহোদয়দ্বয়ের সঙ্গে বর্দ্ধমান যাত্রা করেন। ঘোষ মহোদয় ও রাজা বাহাদুর বর্দ্ধমানাধিপ মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান। বিভাগাগর মহাশয় ভ্রমণে যান। পূর্বোক্ত মহোদয়দ্বয় মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বিভাগাগর মহাশয় সহোদয়াদিক ঘোষের পাঠ ৮ ভ্রামাচরণ দে মহাশয়ের ভদ্রীপতি ৮ প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করেন। মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর বিভাগাগর মহাশয়ের আগমন সংবাদে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে রাজবাটীতে আনাইবার জন্ত লোক প্রেরণ করেন। বিভাগাগর মহাশয় সে যাত্রা মহারাজ বাহাদুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রথমে অসম্মত হন। কিন্তু বাব বার অনুরোধ করিয়া সম্মত হইয়া বঙ্গচৌরী-দিগকে তাঁহার অভ্যাগমনের জন্ত প্রেরণ করাতে পরিশেষে বাধ্য হইয়া রাজবাটীতে গমন করেন। মহারাজ তাঁহার সন্মানার্থে এক ছোড়া শাল ও ৫০০ টাকা বিদায় দেন, কিন্তু বিভাগাগর মহাশয় তাহা গ্রহণ করেন নাই। সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহার এই গোড়শ্রুতায় তিনি মহারাজের অধিকতর ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। ইহাব পর তিনি স্কুল ইন্সপেক্টরের কার্যভার গ্রাপ্ত হওয়াতে অনেকবার স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিদর্শনার্থে বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন। বখনই যাইতেন, রাজসমাদর টপেকা কবিতা বন্ধুবর প্যারী বাবুর বাটীতেই অবস্থিতি করিতেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কুমারী কার্পেন্টারের সহিত উক্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় দর্শনার্থে গমন করিয়া পথ যে দক্ষিণ আঘাত প্রাপ্ত হন, এবং যে আঘাতে তাঁহাকে দীর্ঘকাল শয্যাশরী করিয়াছিল, সেই পীড়া হইতে কবচিং আরোগ্য লাভ করিয়া স্বাভ্যোন্নতির জন্ত বর্দ্ধমান যাত্রা করেন। এই acknowledgment of Government for your generous exertions in relieving the poor during the recent scarcity in the Hooghly District

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

(Sd.) C. T. Montrisor,

Commissioner, Bardwan Division.

বার তিনি মহারাজ মহাশাপটানের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া রাজ-বাটীতে পুনরায় পদার্পণ করেন। মহারাজ তাঁহাকে রাজভবনে থাকিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। ‘কোথায় আছেন’ জিজ্ঞাসা করার ব্যতীত প্যারী বাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, “প্যারী বাবুর হোটেলে।”* শুকালে বঙ্কমানই স্বাক্ষো-রতির পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান ছিল। জগদীশ পরিবর্তনের জন্য বঙ্কমান অতিক্রম করিয়া বাইবার প্রয়োজন হইত না। সুতরাং অনুস্থতানিবন্ধন যখনই কলিকাতা ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইত, বিভাগাগর মহাশয় বঙ্কমানে সিয়া অবস্থিতি করিতেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিভাগাগর মহাশয় স্বাস্থ্যশাণ্ডের জন্য বঙ্কমান যাত্রা করেন। এটাবার বঙ্কমানে অবস্থানকালে সহরের নানা স্থান দর্শন করেন। একদিন পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার জ্যোৎস্নাবিধৌত কমলসারার ও তাহার চতুঃপার্শ্ব উপবন সকল সন্সর্শন করিয়া তিনি পরম তৃপ্তি উপভোগ করেন। উপবন পরিবেষ্টিত কমলসারার তীরে মহারাজের এক অতি মনোরম উদ্যানগুচ দেখিয়া তাহাতে বাস করিবার অতিশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, মহারাজ বাগড়র ঐ বাটী ভাড়া দিতে পারেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তৎক্ষণে মহারাজ বাগড়র তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি ভাড়া দিবেন না, তবে বিভাগাগর মহাশয় অনুরোধ করিয়া উক্ত বাটীতে বাস করিলে নিতান্ত সুখী হইবেন। রাজামাত্যবর্ণের অনুরোধ এবং বঙ্কগণের পরামর্শে পরিশেষে তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং সে যাত্রা চারি মাস কাল কমলসারার নিকটবর্তন বিভাগাগর মহাশয় বাস করিয়াছিলেন। এট কমলসারারে বাস হইতেই তাঁহার বঙ্কমানে প্রাপ্তি প্যারী শ্রীতির সূত্রপাত হইল।* এট উপবনের সন্নিগটে অনেকগুলি দরিদ্র মুসলমানের বাস। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেই সকল দরিদ্র লোক তাঁহার আত্মীয়স্বজন মতো—পোদ্দবর্ণের মতো পরিগণিত হইয়া উঠিল। ঐ প্যারী ছোট ছোট বালক বালিকা তাঁহার বিশেষ মেহের পাত্র

* “হোটেল” কথাটি ব্যবহার করার একটু অর্থ ছিল। ১ জামাচরণ বিখ্যাত, ২ প্যারীচরণ সরকার, ৩ মামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি সে সময়ের অনেক লোক ব্যক্তি বাহু পরিবর্তন জন্য বঙ্কমান যখন পুণিক যাত্রা করতেন তখনই আত্মীয়স্বজন করিতেন। সে পূর্বে এই বিধানমণ্ডলীর মতনিস হইত, সে পূর্ববর্তি এখনও বর্তমান আছে।

হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে প্রতিদিন খাবার কিনিয়া দেন, তাহাদের বেহ-
নুত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের পিতা মাতা প্রভৃতিরও নানী অভাব মোচন
করিতে প্রবৃত্ত হন। অনেকের প্রগতি ও ইচ্ছার অনুরূপ ব্যবসায়াদি চালাই-
বার মত মূলধনও দিয়া সর্বদা স্থায়ী অন্নসংস্থান করিয়া দেন; এইরূপে এই
পল্লীর দরিদ্র লোক তাঁহাকে পরমাত্মীয়—আপনার জন করিয়া লইল।

বর্দ্ধমান দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বাস্থ্যোন্নতিব উপযোগী স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল,
১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের সে মৌভাগ্য অন্তর্মিত হইবার সূত্রপাত হইল।
১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বশোহরের অন্তর্গত মহেশ্বরপুর গ্রামে যে সংক্রামক জ্বরের সূচনা
হয়, তাহা পরবর্তী ৪৪ বৎসর কাল ধরিয়া নদীয়া, বারাণস, ২৪ পরগণা প্রভৃতি
জেলার অসংখ্য গ্রামে ভীষণ কাণ্ড ঘটাইয়া, বহুলোকের প্রাণসংহার করিয়া
সহস্র সহস্র গৃহ অরণ্যে পবিণত করিয়া পরিশেষে ভাগীরথী গার হইয়া হুগলী
ও বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হয়। এই ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া জ্বরে সমগ্র বঙ্গদেশ
শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে, এই সংক্রামক ব্যাধির সমাগমে যখন বর্দ্ধমানের সুখ ও
স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ করিল, তখন বিভাগসাগর মহাশয়
হৃৎকৃত্ত দরিদ্রবাৎসল্যনিবন্ধন বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন, পূর্বের জ্ঞান প্যারী
বাবুর বাটীতে না থাকিয়া তাঁহার বাটীর নিকটে একটা বাগানবাড়ী ভাড়া
লইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রোগাক্রান্ত লোকমণ্ডলীর যত্না নূর
করিবার মানসে তিনি প্রথমে রাজপুরুষদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।
তাঁহার প্রমুখ্যৎ বর্দ্ধমানের দরিদ্র লোকমণ্ডলীর দুঃশার বিষয় অবগত হইয়া
এবং পূর্ব হইতে বর্দ্ধমানের সিভিল সার্জন উপযুক্তরূপ মনোযোগ দেন মাই
বলিয়া, তাঁহার স্থানে যোগ্যতর চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে সহরে
ও মকঃমলে আরও অনেকগুলি উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া পবর্ণমেট
ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। মহারাজের সাহায্যেও অনেকের
চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু বিভাগসাগর মহাশয়ের নিকট নিত্য নিঃখ
লোকদিগের জন্ত ঐ সকল ব্যবস্থা যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় মাই, তাই তিনি
নিজে অর্থব্যয় করিয়া বর্দ্ধমানের বিদ্য দরিদ্রদিগের স্তুচিকিৎসার ব্যবস্থা
করেন। পরোপকারপ্রিয় ডাক্তার প্ৰজ্ঞানারায়ণ মিত্র মহাশয় বিভাগসাগর
মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য ঔষধালয়ে চিকিৎসার ভার লইয়া তদীয় কার্যে

বিশেষ সহকারিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তা না পাইলে, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বহু অর্থের সম্ভার হইত কি না সন্দেহ।

এই দীর্ঘকালব্যাপী সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বরে বদ্ধমানের অসংখ্য লোক যখন মৃত্যুমুখে পতিত, বিপন্ন ও শ্রীমুগ্ধ, বিজ্ঞানাগর মহাশয় তখন দরিদ্র জনের দ্বারে দ্বারে আভিবর্ণনির্বিশেষে সঙ্কলের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে দেখিয়াছেন, রুশ ও রুয় মুসলমান শিশু সন্তান তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাঠরাছে, কেহ বা আয়ুচেষ্টায় তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবাব চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার উপবীত ও উপবীত পরিশোধিত দেহ অপবিত্র হয় নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের এক্ষণ চিত্ত কি সুন্দর! কি উদার! এইরূপে পীড়িত হইয়া অনেকে তাঁহার সত্তারতর জীবন লাভ করিয়া যখন কোন প্রকার সংস্থানের অভাবে চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিল, তখন তাহাদের অতৃপ্তি অভাব দূর করিয়া তাহাদিগের মিনাতিপাত করিবার নানা প্রকার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। *

খণ্ডাটাড়।—নানা প্রকার পারীক্ষিক ক্লান্তি ও মানসিক শ্রমকর কার্যে দীর্ঘকালের জন্ত ব্যাপৃত থাকিয়া যখন নিত্যন্ত শান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন বিশ্রাম লাভের জন্ত সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইতেন; সেই বাগনা পূর্ণ করিবার মানসে টেট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জামতাড়া ও মধুপুরের মধ্যবর্তী খণ্ডাটাড় স্টেশনের সমিহিত পুরাতন ও ভগ্নপ্রায় বাটী সমেত একখণ্ড ভূমি জমা লইয়া সেখানে নিজের মনের মত বাসোপযোগী একখানি গৃহ নির্মাণ করেন। প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে সেইখানে গিয়া বাস করিতেন, কিন্তু বিশ্রাম তাঁহার তাগো ছিল না। তাই নির্জনবাসেও বিশ্রাম করিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রকৃতিগুণে খণ্ডাটাড়ের নির্জন বাসস্থান স্বয়ং জনতাপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসী সাঁওতাল। তাঁহারা অতি সরল প্রকৃতির লোক। বহু সমতা, আদর বহু ও মিষ্ট কথাই পোলাব, কিন্তু চরিত্র বিষয়ে স্বী পুরুষ অধিকাংশই খুব খাঁটী লোক। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মিষ্ট কথা ও দয়া দ্বারা দেখিয়া সেখানকার সমগ্র সাঁওতাল অধিবাসী তাঁহার আপনাদিগের লোক হইয়া পড়িল।

* ঐহিক পদান্যায়াল দ্বিত্ব মহাশয় প্রবৃত্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

বিজ্ঞানাগর মহাশয় খন্দাটাড় অবস্থান কালে প্রায় সর্বদাই লেখা পড়া করিতেন। লেখা পড়া করিতে করিতে যদি তিনি দেখিতেন, কেহ আসিয়া পাড়াইয়া আছে, অমনি নিজের কাজ রাখিয়া তাহার নিকট আসিতেন ডাকার কি অভাব তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। রোগ হইলে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ দিতেন; বস্ত্রাভাবে বস্ত্র, অন্নভাবে অর্থ দিতেন। এতদ্বিধা থালা, বাটি, বাটি যে বাহ্য চাহিত, তাহাকে তাহাই দিতেন। আমাদের দশ হাত কাপড় হইলে চলে সাঁওতালদের বার হাত কাপড় চাই, কেহ কেহ ১৩১৪ হাতও লইত।

সাঁওতালদিগকে বিজ্ঞানাগর মহাশয় এত ভাল বাসিতেন যে, বর্ধমান হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন ইহাদের অল্প লইয়া যাইতেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের ত্রেহুত্রে স্নানক হইয়া খন্দাটাড়ের সাঁওতালগণ বর্ধমানের সীতাতোপ ও রসগোল্লার আশ্রয়ন পাউয়াছে। একবার কিছু খেজুর জর করিয়া লইয়া যান। তাহারা এই খেজুর খাইয়া, আরও চাহিয়াছিল; তাই একবার ১০১২ বস্তা খেজুর লইয়া গিয়া ইহাদিগের প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে দেন। ইহারা তাঁহাকে এক্রূপ আপনার লোক মনে করিত যে, তাঁহার হাত হইতে খাবার জিনিস কাড়াকাড়ি করিয়া লইতে কুণ্ঠিত কি ভীত হইত না। সাঁওতাল বালিকা ও যুবতী স্ত্রীলোকদের চপলতার তাঁহাকে সময়ে সময়ে এক্রূপ ভ্রমাদি বিতরণের সময়ে ধাক্কা খাইতেও হইত। তাহারা তাঁহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িত। ইহারা স্নেহে সংবাদ দিতে, বিপদ আশ্রয় ও আপনাদের পরামর্শের মধ্যে কলহে পরামর্শ লইতে এক বিবাদ মিটাইতে আসিত, রোগে ঔষধ ও অভাবে অন্নবস্ত্র লইতে আসিত। পুষার সময়ে তিনি ইহাদের সকলকেই নূতন কাপড় দিতেন। অনেক আসিয়া পাছে কাড়াকাড়ি করে, তাই পূর্বে হইতে এতদ্ব্যতিরিক্ত নামে নতুন গাঁটুরি বাঁধিয়া রাখিতেন; তাহারা আসিবামাত্র নামে নামে কাপড় বিতরণ করিতেন।

এই অকালে মন্তব্যবসারী কেহ নাই। কারণ এই যে, মন্তব্য করিবার লোক অতি অল্প। বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিয়া যেন যে, মন্তব্য আশ্রয়ই করিবে। তবুনাহে তিনি যখন খন্দাটাড়ে থাকিতেন, তখন মন্তব্য ধরা, অর্থোপার্জননের একটা পন্থা হইত। যে যত সাহায্য করিয়া আসিত, তিনি

সে সমস্তই জ্ঞেয় করিতেন। নিজের প্রয়োজনমত রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই টেননের বাবুদিগকে ও পোষ্টমাস্টার বাবুকে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি তখন থাকিলে কর্মোপলক্ষে অবস্থিত প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুদের আহ্বারের বেশ জুঝিা হইত। * মধ্যে মধ্যে বিবিধ আয়োজনে নিমন্ত্রণ খাওরাটাও ঘটত।

বিজ্ঞানাগর মহাশয় যেখানে যখন থাকিতেন, সঙ্গে সর্বদা ঔষধ থাকিত; এজন্ত অনেক সময়ে তাঁহার নিকট থাকাটাট লোকে নিরাপদ মনে করিত। তাঁহার সাঁওতাল স্ত্রীদিগের রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অধিক কলপ্রদ হইত। ইহাদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণের জন্ত সর্বদা প্রচুর পরিমাণে ঔষধ ও ঔষধ দিবার জন্ত অসংখ্য শিশি মজুত থাকিত।

পশ্চাটোড়ের সাঁওতাল ও অজ্ঞাত দরিদ্র লোকদিগের শিক্ষা বিধানের জন্ত নিজ ব্যয়ে একটা ছাত্রবৃত্তি স্থল করিয়া দিয়াছিলেন।

এইখানে নির্জন বাসের প্রারম্ভ হইতেই অস্ত্রিয়ার মণ্ডল নামক একজন যুবককে বাটা ও উত্তান রককদের প্রধান রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লোকটা নিজের আচরণের গুণে তাঁহার নিজস্ব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। সে ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে। তাহার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস থাকায় অনেক সময়ে সেখানকার লোকদিগের মাসহারার টাকা ও বস্ত্রাদি তাহারই নিকট পাঠাইতেন। এক্ষণ মাসহারা পাঠাইবার জন্ত বে সকল পয় দিখিতেন, তাহার একখানি এই :—

“শ্রীচরিত্র: শরণম্—

সুতাশিব: সন্ত।—এই পত্রের মধ্যে দ্রিশ টাকার নোট পাঠাইতেছি, সকলকে দিবে। আমি বাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু অল্প ও কাজের কাজটি এই ছই কারণে বাইতে পারিতেছি না।

সুতাকাজিকণ:—শ্রীচরিত্র শরণম্।”

এই কৃত্যের পূর্বে রামচরণের বিবাহের সময় সমস্ত ব্যয়তার নিম্নে গ্রহণ করেন; নিজ ব্যয়ে সে বালককে লেখা পড়া শিক্ষা দেন।

উত্তরপাড়া বাইতে পথে শকট হইতে পতনে বে ব্যাভ্যস্ত হইয়াছিল তাহা আর কখনও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় নাই। সর্বদাই অসুস্থ থাকিতেন।

ক্রমে বয়োধিক্য সহকারে পেটের গীড়াই প্রবল হইয়া উঠে। চিকিৎসকের পরামর্শে একটু একটু লাডেনন্ সেবন করিতে আরম্ভ করেন। ঝর্ঝাটাড়ে অবস্থান কালে একবার ভ্রমক্রমে অধিক মাত্রায় লাডেনন্ সেবন করার, বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। অত্যন্তক্ষণ পরেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিবিধ প্রক্রিয়া ধোঁগে বমন দ্বারা তাহা উঠাইয়া ফেলেন। তাই অল্পে অল্পে রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তবুও বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে দেওঘরে রাজ-নারায়ণ বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এই :—“বুকের দোষে যে শারীরিক উপদ্রব ঘটাইয়াছিলাম, তাহা হইতে নিরুত্তি লাভ করিয়াছি বটে কিন্তু অত্মাপি সচ্চন্দ্রশবীব হইতে পারি নাই। উদয় ও মস্তক অত্মাপি প্রকৃতিস্থ হয় নাই।”

ঝর্ঝাটাড়ে অবস্থান কাল, তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইতেন। এই উপলক্ষে অনেকের সংবাদ লইয়া গৃহে ফিরিতেন। তাঁহার সঙ্গে বাহারা থাকিত, তাঁহার সঙ্গে চলিতে তাহাদের প্রাণ ওঠাগত হইত। তিনি সর্বদাই সোজা পথে চলিতেন, যেখানে পথ ঘুরিয়া গিয়াছে, সেখানে লতা গুল্ম, উচু নীচু, উপেক্ষা করিয়া সোজা যাইতেন। ছুতা অচল হইলে, খালি পায়ে চলিতেন, পায়ে আঘাত লাগিলে গ্রাহ্য করিতেন না। সঙ্গের লোকদিগকে সর্বদাই ছুটিতে হইত।

মাওতলক্ষ্য তাঁহাকে এত ভালবাসিত যে তপায় তাঁহার গমন সংবাদ প্রচারিত হইলে, প্রাতঃসন্ধ্যা ইত্যাদি তাঁহার পৌছান সংবাদ পাইবার জন্য অতি ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করিত। প্রাত্যহিকভাবেই তাঁহার সহিত প্রথম দেখা করিতে আসিবার সময়, বাতাব যাহা থাকিত, তাঁহার জন্য উপহার লইয়া আসিত। তরকারি ও শাকসবজির ভাগই অধিক। এক ব্যক্তির কিছু না থাকার সে একটা মুরগীর ছানা লইয়া আসিলে, বিভাসাগর মহাশয় তাঁহার উপবীত দেখাইয়া বলিলেন, “আমি ত উহা লইব না।” সে ব্যক্তি মর্ম্মাহত হইয়া রোমন করিতে লগিল। বিভাসাগর মহাশয় নিরুপায় হইয়া সেই কুকট-পাথক হাতে করিয়া লইলে পর সে ব্যক্তির মনঃক্লেশ দূর হইল। তিনি এইরূপ সুকল্যাব ও উদার আচরণেই সকল লোকের প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন।

এই উপবন-পরিশোধিত নির্জন বাসভবন অতি রমণীয়। ইহার সৌন্দর্য্য

বিষয়ে তৃত্য অভিরামকে লইয়া তিনি নিজে অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন । সে উজানের অনেক বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও কুম্ভকুম্ভ তাঁহার স্বহস্ত-রোপিত । আমরা যখন এই উপবন-পরিশোধিত গৃহ ও ইটাব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম, সেই উজানের স্রীতিপূর্ণ নিপুণতায় আমাদের প্রাণে বিস্ময়মাধা গাভীর্থ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল । বোধ হইয়াছিল, তিনি যেন সংসারের শত শোক মুক্ত হইয়া স্মল কলেবরে পরমানন্দে সেই সাধের নির্জন বৃক্ষবাটিকার মহাযানে স্বর্গস্থ গম্যগ করিতেছেন । বোধ হইয়াছিল যেন, সে উজানের প্রত্যেক তৃণলতা পর্শ্যস্ত তাঁহার সাকার সহবাস সূখে বঞ্চিত হইয়া মনের দুঃখে নত মস্তকে বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে চাঞ্চিয়া আছে ।

হোমিওপ্যাথি।—কলিকাতা বহুবাজারনিবাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বঙ্গবাসীদিগের মাধ্যম সর্ব প্রথম হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসার সুপ্রপাত করেন । বিভাগাগর মহাশয় সর্ব প্রথম ইতার নিকট হোমিওপ্যাথি মতের উপকারিতা ও উপযোগিতা বেশ বুঝিতে পারেন । তিনি যখন বুঝিলেন যে, এই বিদ্যু বিদ্যু ঐষ সেবনেও উপকাব হইয়া থাকে, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । ঐষধের উৎকৃষ্টতা, তাহার অগাধতা এবং সেবনের সুবিধা সন্দর্শনে তিনি ইহার সুপ্রচারে প্রাণপণে সাহায্য করিতে লাগিলেন ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় আমাদের নিকট বলিয়াছেন যে, একদিন বহুবাজারবিত্ত ও শুকবিত্তকের পর শেষে বিভাগাগর মহাশয় তাঁহাকে স্বীকার করাইলেন যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কোন ফললাভ হয় কি না, ইহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক । অনুসন্ধানার্থ ডাক্তার সরকার মহাশয় বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপকারিতা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া, স্বরায় ইহার বিভাগ-সম্মত মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অত্যন্ত কাল মধ্যে তাঁহার এই সন্ধান—ক্রমে এই বিশ্বাস জন্মিল যে, এই পদ্ধতি অনুসারে অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে লোকে রোগমুক্ত হইতে পারে । বিশ্বাস অভিব্যক্তি অসমি সেই পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন । এই পরিবর্তনের জন্ত তিনি বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । ডাক্তার বিহারীলাল ভাট্টা, ডাক্তার অরুণচরণ খাতিরি প্রভৃতি অনেকেই বিভাগাগর মহাশয়ের

অনুরোধ ও পরামর্শে ক্রমে ক্রমে এই পথে একে একে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হোমিওপ্যাথির সুপ্রচারে তিনি এতই অনুরাগী ছিলেন যে, পল্লীগ্রামের নানান্যানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিতেও সহায়তা করিয়াছেন। তাত্তাড়া নিবাসী কমিদার বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন, “বিতরণের জন্য আমি হোমিওপ্যাথি ঔষধালয় স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করার ত্বিনি উদ্যোগী হইয়া এখানে শুভাগমন করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন।” হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসার সুপ্রচার সাধিত হইলেও এখনও লোকের ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু বিজ্ঞানাগর মহাশয় এই পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসায় বোল আনা নিভর করিতে পারিতেন। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক বহুসংখ্যক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যখন থাকিতেন, সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স ও পুস্তক থাকিত। চিকিৎসা করিতে করিতে বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে পঠদশা হইতেই পীড়িত ছাত্র ও অস্থির লোকের রোগশয্যার পার্শ্বে যে কত সময় ব্যয় করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। হোমিওপ্যাথির প্রচারের পূর্বে পীড়িত দরিদ্রজনের চিকিৎসায় তিনি ডাক্তার চূর্ণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্মাধিকারী, বিহারীলাল ভাট্টা, নোলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক চিকিৎসকের সাহায্য পাইয়াছেন। ডাক্তার সর্মাধিকারী মহাশয় বলিয়াছেন যে, তাঁহার অনুরোধক্রমে দিবারাত্রি কত সময়ে কত বার যে দুঃখী লোকের চিকিৎসাথে গিয়াছেন, তাহার ধারাবাহিক বিবরণে একখানি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, কিন্তু সে সকল ধারাবাহিক রূপে স্মরণ নাই।

হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসাপদ্ধতিতে বিশ্বাস হওয়ার্তে যেমন তাঁহার আগ্রহ ও উদ্যোগে অনেক গুলি যোগ্য চিকিৎসক ঐ মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, অল্প দিকে তিনি নিজে দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধান ও অনুশীলনে একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন, এবং ক্রমে অল্প চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে অতি কঠিন পীড়াক্রান্ত রোগীদিগের চিকিৎসায় কৃতকার্য হইতে লাগিলেন। হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসা আরম্ভ করার তাঁহার এই সুবিধা হইল যে, যখন যখন বাকে তাকে দেখিতে বাইতে পারিতেন, এবং সময়ে অসময়ে কত লোক যে, তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া

গিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। এরূপ ঘটনা আমরা অনেকবার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। তিনি লোকের রোগযন্ত্রণার এতই ক্লেশ পাইতেন যে, তাহা নিবারণের জন্য সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। শূল ও হাঁপানি কান্নার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সর্বদা বিতরণ করিতেন। যে যখন গিয়াছে বিনা মূল্যে ঔষধ পাইয়াছে।

অর্থ গ্রহণ না করিয়াও তিনি লোকের উপকারার্থে চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেন এবং সেই কার্যে তাহার কিরূপ নিষ্ঠা ছিল, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে খণ্ডাটোড় হটতে লিখিত পত্রখানিতে তাহার স্মরণ প্রমাণ পাওয়া যায় :—“আমি কলা অথবা পবন আপনাকে দেখিতে যাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ দুইটী রোগীর চিকিৎসা করিতেছি যে, তাহা-
বিস্তকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কোন মতে উচিত নহে। একজ্ঞ ২৪ দিন শোষের যাওয়া রহিত করিতে হইল।” বলা বাহুল্য যে তিনি তাঁহার গরীব সাঙতালদের জন্য বাহ্য করিতেন, অনেক চিকিৎসাব্যবসায়ী টাকা লইয়াও সেরূপ নিষ্ঠার সহিত কার্য করেন না।

মধুসূদনের জায় সম্ভ্রান্ত লোকের বিপত্তিকার, অনমনে মৃত্যুমুখে পতিত লোকমণ্ডলীর আশ্রয়কা, ম্যালেরিয়াক্রান্ত মুসলমানের গৃহে গৃহে ঔষধ ও পথ্য দান ও সাঙতালগণের সহিত আত্মীয়তা এ সকলই তিনি একটী সাধু প্রকৃতির উদ্ভেজনাশ্রয় হইয়া সাধন করিতাছেন। তাহার লোকান্তর গমনে একদিকে অনেক বিপন্ন সম্ভ্রান্ত লোক বন্ধুহীন হইয়াছেন, অপর দিকে দুঃখী লোক অবলম্বনচ্যুত হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে।

হিন্দুপারিবারিক বৃত্তিভাণ্ডার দাহারা পরের হুঃখ অনুভব করে সন্মারে তাহারাই চুঃখী। যাহা বা বহুতটে ২।১০ টাকা উপার্জন করিয়া কার্যক্লে-
আপ ধারণ করে, প্রাতঃসন্ধ্যা নিজের অদৃষ্ট নিন্দা করিতে করিতে অজাব-
জনিত অশ্রুজলে গৃহভল সিক্ত করিতে করিতে দাহারা দিন যাপন করে,
তাহারাই চুঃখী। বঙ্গের মধ্যবিত্ত দরিদ্র তত্র পরিবারই এই শ্রেণীর চুঃখী
লোক। একজন সামান্ত উপার্জনক্ষম লোকের উপর বহুপরিবার নির্ভর করে।
দৈবক্রমে সেই একটী লোক লোকান্তরিত হইলে বহুলোক নিরুপার হইয়া পড়ে।
তাই বিভাগায় মহাশয় অল্প কোন কোন সদাশয় মহাপ্রের সাহায্যে উপরোক্ত

বৃত্তিভাণ্ডার স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকরূপে স্ত্র মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, স্ত্র রমেশচন্দ্র এবং উদ্যোগিকরূপে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সন্তানের বাবু নবীনচন্দ্র সেন, রায় রাজেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর প্রভৃতি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আর এই বৃত্তি ভাণ্ডারের সাহায্যে অসংখ্য পরিবার অসময়ে অনটনের মধ্যে মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণে সক্ষম হইতেছেন। এই বৃত্তি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার পর, কয়েক বৎসর কাজ কর্ত্ত বেষ আশানুরূপ উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় আফিসের একজন কর্মচারীকে লইয়া বাবু নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত বিভাগসাগর মহাশয়ের প্রথমে মতান্তর ও পরে মনান্তর ঘটে। এই ঘটনার তাঁহার এতই বিরক্তি ও অপ্রীতিশ ভাব অনিয়াছিল যে, আর কোন ক্রমেই একত্র কাজ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনি নিজ সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সম্পাদক বাবু নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়কে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার এইরূপ সংস্রব ত্যাগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সকলেই নিতান্ত বিষম ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সকলে সমাবেশ হইয়া তাঁহার সঙ্কল্প পরিবর্তনের জন্য বিমমত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পাবেন নাই। তাঁহার সংস্রব ত্যাগে স্ত্র মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও স্ত্র রমেশচন্দ্র ফণের টুটির পদ ত্যাগ করিলেন। অপর সকলের মাথার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু বিধাতার রূপায় ক্রমে ক্রমে সকল আশঙ্কা তিরোহিত হইল এবং সেট বৃত্তিভাণ্ডার, অত্যাধি জীবিত থাকিয়া অসংখ্য গৃহ ও বিপন্ন লোকের অভাব মোচন করিতেছে। বিভাগসাগর মহাশয় বক্তৃগত কলহের অধীন হইয়া নিজ প্রতিষ্ঠিত বৃত্তিভাণ্ডারের সহিত 'সকল সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া ভাল করেন নাই। তাঁহার মত লোকের নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করা স্বাভাবিক। তিনি আবার অত্যধিক মাত্রায় নিজের সঙ্কল্পের অধীন হইয়া চলিতেন। তাঁহার জ্ঞান প্রতিভাশালী লোকের দুই একটা আবদার সহ্য করিয়া তাঁহার সহকারিতার কোন সাধারণ অনুষ্ঠানের শ্রীযুক্তি ও উন্নতি হইতে দেওয়া উচিত; আশায়ের দেশের লোকের সে শিক্ষা এখনও হয় নাই। আবার তিনিও অপর দশ জনের দোষাভ্যাস সহ্য করিয়া দশ জনের সহিত মিলে মিশে কাজ

করিতে পারিতেন না। দশ জনের মিলিত কাজে তাঁহার অধিক বিশ্বাস ছিল না, জুই একাকীই অনেক কাজ করিতেন, এবং যাহা করিতেন তাহাতেই কৃতকার্য হইতেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত যন্ত্র ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিই যখন তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল, তখনই মধুসূদনের জগদ্বাস হইতে মুক্তিলাভের জন্য ছাপাখানার ১/২ অংশ বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করেন। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরির কার্যকলাপ নিজে পরিদর্শন করিতেন না। নানা বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন এক সময়ে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ডিপজিটরির দ্বয় ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। একদিন এইরূপ আক্ষেপের সময় তাঁহার পরমায়ী রুক্মণ্য নবাসী ৮ ব্রহ্মনাথ সুখোপাধ্যায় বলিলেন, “আপনি বিরক্ত না হইয়া যদি ত্যাগ করেন, যদি সন্তুষ্ট হইয়া দেন, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করি। আপনার পক্ষান্তর চালাইতে পারি। যে সম্পত্তি বিক্রয় করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ অনেক সহস্র টাকা পাইতেন, যে সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য পর দিন অনেক অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাগ সেই মজ্জিলে বসিয়া সুখের কথাই ব্রজ বাবুকে দান করিলেন। বলিলেন, “আচ্ছা আপনাকেই নিলাম।” এই কথা বলার পরদিন প্রাতঃকালে সত্য সত্যই লোকের টাকা লইয়া সাধাসাধি করিয়াছিল! কিন্তু তিনি যে কথা মুখ হইতে বাহির করিয়াছিলেন, তাহা আর কিবাইলেন না। বলিলেন, “উহার বিশ হাজার টাকা মূল্য হইলেও, দান করিয়াছি।”

আমাদের দেশে তাঁহার অপেক্ষা ধনবান লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় যখন বিজ্ঞান চর্চার জন্য ভারত সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন অনেক সম্পন্ন লোকের দানের পরিমাণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার দানের অঙ্ক উঠিয়াছিল। তিনি জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের সুদৃঢ়পক্ষে এই সদমুষ্ঠানের সহপাঠে ১০০০ টাকা দিয়াছিলেন।

একবার বর্ডমান হইতে বীরসিংহ ঘাইবার সময়ে পথে এক স্থানে পাল্কী নানাইলে পর, একটা বালক নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। শিশুর বক্তব্যসমূহ মহাশয়ের দৃষ্টি বালকের উপর পড়িবামাত্র বালক বলিল, “বাবু একটা পরলা দেখেন?” তিনি বলিলেন, “এক পরলা কি কর্ণি?” “কেন বাবার বাব।”

“যদি ছুটা পরসাদি?” “আজ এক পরসাদি কাল এক পরসাদি খাব।” “যদি চার পরসাদি?” “হাটে জাব কিনে গাঁয়ে বেচে দু'আনা করবো, লাভের পরসাদি খাবো, আসল পরসাদি ঐ রকম করে কেনা বেচা করবো।” বিজ্ঞানাগর মহাশয় বালকের কথার খুসি হইয়া তাহাকে কিছু বেশী পরসাদি দিয়া বলিয়া যান যে, “এই পরসাদি যদি তুই বাড়াইতে পারিস্ তোকে টাকা দিয়া দোকান করিয়া দিব।” কিরিবার সময়, সে পরসাদি থেকে টাকা করিয়াছে দেখিয়া তাহাকে দোকান করিয়া দেন, আর তাহার বিবাহের সময় সমস্ত খরচ দেন।

মেট্রপলিটন কালেজে বিনাবেভনে যে কত ছাত্র পাঠ করিত, তাহার সংখ্যা হয় না। যে কখন কোন প্রকার সন্তোষজনক প্রমাণসহ নিজের দারিদ্র্য জানাইয়া তাহাকে ধরিয়াছে, সেট বিনাবেভনে পড়িতে পাইয়াছে। কেবল ত্রি পড়িতে পাইয়াই কি বালকেরা তাহাকে অব্যাহতি দিচ্ছিল? তাহা নহে। সময় সময় পরিধানের বস্ত্র ও উদরের অন্নের জন্তও তাহাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। এইরূপ দরিদ্র ছাত্রবর্গকে সাহায্য করিতে কত সময়ে তাহাকে যে প্রবঞ্চিত হইতে হইত, তাহার সংখ্যা হয় না। তাহার জননীও লোকান্তর গমনের পর এক একে অনেক বালক কেবল “মা নাই” বলিয়া তাহার সহানুভূতিপূর্ণ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিয়াছিল। দুই তিনটা বালক “মা নাই” বলিয়া সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহার মনে সন্দেহ হইল। অনু-সন্ধান জানিতে পারিলেন যে, বাটার নিকটস্থ যুদ্ধির দোকানের মালিক প্রথমোক্ত বালকের কৃতকার্যতা জানিতে পাবিয়া সাহায্যপ্রার্থী অপরাপর বালকগণকে এরূপ বলিতে শিখাইয়া দেয়।

কলিকাতার কো। সন্ন্যাস লোকের অনুরোধে একটা অনাথ বালককে বিনা বেতনে বিজ্ঞানায় পড়িতে অনুমতি দেন। কয়েক দিন পরে নিজে বিজ্ঞানায় শিখা টিকিনের সময়ে দেখেন, সেই স্নানর বালকটা বহুদূর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। প্রথমে বিশ্বাস হইল না, পরে অনুসন্ধান জানিলেন যে, সেই অবৈতনিক বালকটাই বটে; কিন্তু তখনও তাহার বিবক্তির কারণ উপ-স্থিত হয় নাই। কারণ সে বালককে শিড়মাতৃহীন অনাথ বালক বলিয়াই জানিতেন, এবং পূর্ব সঙ্কলতার শেষ চিত্তরূপে ঐ সকল পরিচ্ছদ থাক। অসম্ভব নহে, এটরূপই মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাহাকে একটা বাড়ি দ্বন্দ্ব ও

সন্দেশ খাইতে দেখিলেন এবং অমূল্যকান করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার যে সম্পদ বহু ঐ উপায়দ্বীন বালকের অল্প তাঁহার নিকট অনুরোধপত্র দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অনুরোধের উপর নিষ্ঠর করিয়া তিনি উক্ত বালককে বিনা বেতনে পড়িতে দেন, সেই সুপরিচিত সম্রাট লোকটী ঐ বালকের ভগিনীপতি । বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মুখে এই ঘটনা এবং এই ঘটনামণ্ডল ব্যক্তির নাম অবগত হইয়া আমরাও দেশের লোকের অপদার্থতা স্বরণ করিয়া লজ্জা ও কোভে মন্তক অবনত করিয়াছিলাম । অভাবে পড়িয়া লোক প্রবন্ধনা করিতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে ; কিন্তু এইটী যোগ্য কাব্য, তাঁহার পক্ষে শ্রমলককে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বিজ্ঞানগরে বিনা বেতনে পড়াইয়া, মৃত্যুকাল লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাওয়া কিরূপ কার্য্য সহজেই বোধগম্য হইতে পারে ।

বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের দীনবৎসলতার প্রতি কত লোকে যে অভ্যাচার করিয়াছে তাঁহার সংখ্যা হয় না । একবার একটী বালক উত্তরপাড়া স্কুলের কোন এক নিম্নশ্রেণীর ঠিকানা দিয়া পত্র লেখে । পত্রের মর্ম্ম এই :—“আমি পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক । সংসারে কেহই নাই, পরের বাড়ীতে এক ঘুঠো ভাত খাইয়া বহুকষ্টে লেখাপড়া শিখিতেছি । এমন একটা পরশা নাই যে পার হইয়া কলিকাতার গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করি । যদি দয়া করিয়া নিম্ন নিখিত পুস্তক গুলি পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে নিশ্চিন্ত মনে একটা বৎসর লেখা পড়া করিতে পারি ! পত্রের ভাবভঙ্গিতে বিশ্বাস করিয়া অল্পকৃত পুস্তক ক্রয় করিয়া স্বরচিত পুস্তকের সহিত একত্র করিয়া নিজ হইতে ডাক খরচ দিয়া সেগুলি পত্রোক্ত ঠিকানার পাঠাইলেন । বৎসর বৎসর এইরূপে সেই বালক উচ্চশ্রেণীতে উঠিয়াছি বলিয়া, নতুন নতুন পুস্তক তাঁহার নিকট হইতে লইয়াছে । যে বার পুস্তক লইবার শেষ বার, সেইবার উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন । কল্যাণপ্রসঙ্গে বিজ্ঞানাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“নামের একটী বালক এই বার তোমার স্কুলে ১ম শ্রেণীতে পড়িতেছে, সে ছেলে কেমন পড়ে বলত ?” শিক্ষক বলিলেন, “কই এ নামের ছেলে আমার স্কুলের ১ম কি ২য় শ্রেণীতে নাই ?” বিজ্ঞানাগর মহাশয় রহস্যের স্বরে বলিলেন, “তুমি বেশ মাঠার ড ! একটা ছেলে পঞ্চম শ্রেণী হইতে বৎসর বৎসর ‘ক্লাসে উঠিয়াছি বলিয়া’ আসার

নিকট বই লইতেছে, স্কুলের ঠিকানায় ডাকে বই পাঠাইয়াছি সে পাইয়াছে, আর তুমি বল কিনা এ নামের কোন ছেলে নাই? তুমি কি তবে সকল ছেলেকে চেন না নাকি?” মাষ্টার মহাশয় অতি ভালমানুষ লোক। তার উপর আবার বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করেন, কাজেই “বেশী কিছু না বলিয়া বলিলেন, “আচ্ছা আমি সন্ধান করিয়া কল্যাণ আপনাকে জানাইব। এমন হ’তে পারে যে ছেলেটীক ছুটা নাম আছে।” পরদিবস হেড্ মাষ্টার মহাশয় ১ম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস অনুসন্ধান করিয়া ঐ নামের ছেলে পাইলেন না। কিন্তু ঐ নামের একজন পুস্তক বিক্রেতা বিজ্ঞানাগরের অতি নিকটে পুস্তক, কাগজ, কলম প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহাকে পীড়াপীড়ি করায় সে নিজকৃত অপরাধ স্বীকার করিল এবং বলিল ঐরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের নিকট হইতে বৎসর বৎসর পুস্তক আনাটাইল বিক্রয় করিয়াছে। বিজ্ঞানাগর মহাশয় এই ঘটনার উল্লেখ কালে চুপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “যে দেশের বালক একরূপ প্রবঞ্চক, সে দেশের কি সমাজ ভাল হইবে?”

লোকে পিতৃমাতৃদ্বয় জানাইলে, তিনি যথাযথ সাহায্য করিতেন, কল্লার বিবাহ দিতে পারিতেছে না বলিয়া তাঁহার নিকট বিপদ জানাইলে, তিনি সাহায্য করিতেন, সংসারের মৈনিক উদরারের জন্ত ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইয়া সংসারের সমস্ত সংস্থান বিনষ্ট করিয়াছে, মাথা রাখিবার স্থানটুকু বন্ধক দিয়াছে, আর ২৪ দিন পবে ঋণদাত্ত ঘব বাড়ী, ও ভূগম্পত্তিটুকু বিক্রয় করিয়া লইবে, একরূপ বিপদে লোককে তিনি সাহায্য করিয়াছেন। একরূপ সাহায্য গ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রুতভ্রতা প্রকাশ আমরা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। জটনৈক সম্ভ্রান্ত লোক (চিকিৎসক) স্বৈগ শোক প্রভৃতি নানা বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সকল অভাব মোচন করিয়াছেন। *

বিজ্ঞানাগর মহাশয় পরোপকার সাধনে আপনার সর্বনাশ করিতে ইচ্ছন্তঃ করিতেন না। একবার এক ভদ্রসন্ধান (নাটোরের গুণিস স্বেইনস্পেটর) বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, “গত কল্য অপরাহ্নে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

* গার রাখিকা মসর সুখোপাখার বাহাঙ্কর মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাদী শুনিবাছি।

আসিয়াছলাম, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। এই ভয় লোক বড়ই বিপন্ন হইয়াছেন। এক মোকদ্দমার ইনি নিরপরাধী হইয়াও ছয় মাসের জন্ত কারাবাসের আদেশ পাইয়া অব্যাহতি লাভের জন্ত হাইকোর্টে মোশান করিয়াছেন। সাত শত টাকার মনোলোহন ঘোষ মহাশয়কে ইহার পক্ষ সমর্থনের জন্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাটী হইতে গত কল্যা টাকা আসিবার কথা, কিন্তু আসে নাই। আজ প্রথম গুনানির দিন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঘোষ মহাশয়কে একটু পত্র দিলে, তিনি অস্ত্রকার কাজটা করেন, ইত্যবসরে টাকা আসিলেই তাঁহাকে দেওয়া হইবে। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা অবশ্যই আসিবে।” বিভাগাগর মহাশয় ব্যাপারটা অবগত হইয়া ক্ষণকাল নীরবে অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, “এ কর্ম আমার দ্বারা হইবে না। এক জনের এক পা জেলে, আর এক পা বাহিরে, তাহার টাকা বাকি রাখিয়া কাজ করিতে বলা কেমন দেখায়? আর তিনিই বা কি মনে করিবেন? তাহার পর ঘোষের বিলাত যাওয়ার সময়েই তাঁহার সতিত আত্মীয়তা, তাহার পর আর বড় বেশী দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, একরূপ স্থলে সহসা একরূপ একটা অনুবোধ করিয়া পাঠান কেমন কেমন দেখায়, এটা কি করা যায়? তুমিই কেন ঘোষকে ইহার কথা বল না! তিনি ত গুনি পরোপকারী ও বিপন্নের বন্ধু। আমি এট দীর্ঘকালের মধ্যে কখন কাহারও জন্ত তাঁহার নিকট একরূপ অনুরোধ করিলে, আজ অসংজ্ঞাচ তাঁহাকে এ কথা বলিতে পারিতাম।”

বিপন্ন ভয়লোক এই কথা শুনিয়া সানন্দমনে সাগরের পানে তাকাইয়া বলিলেন, “তুনিয়াছি, কোথাও যাহার কিনারা না হয়, সে এখানে আসিয়া, পার, আমার তাহাও গেল!” সাগর সংজুক হইলেন। আজ সন্ধ্যার পর লিখিতে বসিলেন।

“My Dear Ghose” পর্ষান্ত লিখিয়া আর লেখনী অগ্রসর হয় না। এক মিনিট দু মিনিট করিয়া বহুকণ কাটিয়া গেল। তখন বলিলেন, “না, এ কর্ম আমার দ্বারা হইবে না।” বিপন্ন ব্যক্তি কানিতে কানিতে বলিলেন, “তবে কি আমি জেলেই বাটব?” আত্মের এই নিশাকণ হতাশবাক্য বিভাগাগর-সদয়ে শেলের দ্বার বিদ্ধ হইল, তিনি চুই বিশ্ব অপ্রপাৎ করিয়া কি করিলেন, পাঠক! তুমিতে চাও? সেদিনকার কপলকপল বিভাগাগর বাক্স হইতে বাকের ঢেক

বই বাহির করিয়া সাত শত টাকার একখানি চেক হাতে দিয়া বলিলেন, দেখ, আমার ব্যাঙ্কেও টাকা নাই, এই চেকখানি ধোঁকে দিয়া বলগে, তিনি যেন কাল বেলা ১১ টার পূর্বে এই চেক ব্যাঙ্কে না পাঠান। আমি আজ দিনের মধ্যে যেমন করিয়া হটক, এই টাকা ব্যাঙ্কে মজুত করিয়া দিব।”

সুকৃতিবলেই হটক, আর স্বপক্ষে প্রবল প্রমাণ ছিল বলিয়াই হটক, সর্ব ইনস্পেক্টর বাবু হাইকোর্টের বিচারে অব্যাহতি পাইয়া চতুর্থ দিবসে সাত শত টাকা লটরা দ্বারা সাগরের ত্রীচরণ দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে সেই বকুটী। প্রণামান্তে টাকাগুলি সম্মুখে রাখিয়া হাসিমুখে বলিলেন, “আমি হাইকোর্টের বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছি, আর আজ প্রাতঃকালে বাড়ী হইতে এই টাকাগুলি আসিয়াছে, তাই সুসংবাদটী আর টাকাগুলি দিতে আসিলাম।”

বিজ্ঞানাগর মহাশয় এই সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিবেন প্রত্যাশায়, বন্ধুসহ দারোগা বাবু বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া আছেন, এমন সময় বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিলেন, “তুমি ভদ্র সম্মান হইয়া আমাকে বকনা করিলে, আর তুমি (বকুটীকে) আমার পরিচিত হইয়া আমার সঙ্গে চাতুরী করিলে?” দুই জনেই হতবুদ্ধি ও শুদ্ধতালু হইয়া নগ্নায়মান। অল্পকাল পরে বিজ্ঞানাগর মহাশয় পুনরায় বলিলেন, “তুমি না বলেছিলে, তুমি পুলিশে কর্ম কর?” (সভয়ে উভয়ের উত্তর,) “আজ্ঞে হাঁ।” “না, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না, তুমি আমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছ।” উত্তর—

“আজ্ঞে না মহাশয়, অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আমি নাটোরের পুলিশ সর্ব ইনস্পেক্টর।” বকুটী তখন কথার ভঙ্গিমায় কিঞ্চিৎ আশঙ্ক হইয়া বলিলেন, “আপনি কি বলিতে চান?” তখন বিজ্ঞানাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, “মিথ্যা কথা ছাড়া আর কি মনে করিব? এই দীর্ঘকালে অনেক লোক ‘দিব’ বলিয়া টাকা লইয়া আর দেখা দিল না, নিরুপায় লোকদের কর্ণা না হয় নাট ধরিলাম, কিন্তু সুপরিচিত সম্পন্ন ব্যক্তিরাত্ত প্রয়োজন সাধনের জন্য টাকা লইয়া সকল সময় কিরাইয়া দেন নাই, আর অন্তরঙ্গের ত কথাই নাই। যে দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে দেশে তুমি পুলিশের দারোগা হইয়া সাত দিনের কড়ারে টাকা লইয়া চতুর্থ দিবসে কেবল দিতে আসিয়াছ, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?” দারোগা

বাবু উচ্চ পুরস্কারে পুরস্কৃত হইয়া নত মস্তকে দণ্ডায়মান । তখন তাঁহাকে বহুসহ বসিতে বসিয়া বলিলেন, “হাইকোর্টের জজেরা অনেক সময় মোকদ্দমা না বুঝিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেয়, তোমারও দেখছি তাই হ’য়েছে, তোমার ত জেলে বাওন্না উচিত ছিল । সাত দিনের কড়ারে টাকা লইয়া চারিদিনের দিন যে ফেরত দেয়, সে পুলিশের দারোগাগিরি চাকরি করে, জেলে যাবে না ত জেলে যাবে কে ?” রহস্যের সুযোগ পাইলে, বিভাগাগর মহাশয়ের পরিচিত অপরিচিত বিচার ছিল না ; লোককে অপ্রস্তুত করিতেও ছাড়িতেন না । উপর্যুক্ত ভদ্র লোকের নিম্নতি লাভে অশেষ প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পরে টাকাগুলি তুলিবার সময় বলিলেন,—“ওহে আট আনা কম দিলে কেন ?” দারোগা বাবু অপ্রস্তুত হইয়া ভাবিতেছেন, বোধ হয় টাকার মধ্যে কোন প্রকারে একটা আঙুলি থাকিয়া গিয়াছে । সঙ্গে বহুটী বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিবামাত্র বিভাগাগর মহাশয় বলিলেন, “আমি যার নিকট টাকা লইয়াছিলাম, তাঁহাকে টাকা দিয়াছি, এখন এট টাকা বাস্তব্ধে রাখিতে গেলে, গাড়ী ভাড়া কি আমাকে দিতে হবে ? অব আট আনা না পেলে আমি ও টাকা বাস্তব্ধে তুলিব না ।” অপ্রকাশ এইরূপ রহস্যে সম্মতিপাত করিয়া বলিলেন, “যখন আমার লোকসান করিলে, তখন আর কিছু লোকসান করা” পাঠক, এখন বুঝিয়া লউন, এ লোকসানে দারোগা বাবুর রপনার কিক্রম পরি-
তৃপ্তি হইয়াছিল । *

অসুস্থ অবস্থার বিভাগাগর মহাশয় অনেক সময় ফরাসভাস্কর অবস্থিতি করিতেন । এক দিন তিনি জালুবাঁতীয়ে রাজপাথ পাদচারণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একটা ত্রীলোক একটা বাগকে ক্রোড়ে লইয়া সেই পথে বেড়াইতে আসিয়াছে । ছেলেটিকে দেখিতে দেখিতে বিভাগাগর মহাশয়ের দৃষ্টি সেই বাগকের পারের উপর পড়িল । তাহার দুখানি পারের আকার সমান নহে দেখিয়া তিনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বাগকের দুখানি পাই এক রকম ছিল ; কিন্তু বয়স্কটির সঙ্গে সঙ্গে একখানি পাই শীর্ণ ও ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । বিভাগাগর

* হাইকোর্ট মণ্ডলনের কর্তারী বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট এই বিবরণ শুনিয়াছি । তিনিই দারোগা বাবুর সঙ্গে ছিলেন ।

মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার কে আছে, এবং ইহার চিকিৎসা হইয়াছে কি না?” প্রত্যুত্তরে ত্রীলোকটী জানাইল যে, ইহার বাপ দী সামান্য অবস্থার লোক হইলেও, ছেলেটির পাখানির এই দোষ দূর করিবার জন্য সর্বস্বাস্ত হইয়াছেন, ইহাদের আর কিছুই নাই।” বালকের পিতামাতা বালকের রোগ শাস্তির জন্য যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া নিরাশ হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। সেই অসুস্থ শরীরে ইহাদের বাড়ী গিয়া সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাদের বাড়ী গিয়া বালকের পিতার সহিত কথাবার্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, করাসডাক্সর থাকিয়া সেখানকার চিকিৎসক ও হুগলীর সিভিল সার্জন দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছে, কোন ফল লাভ হয় নাই। লাভের মধ্যে সর্বস্বাস্ত ও কণগ্রস্ত হইয়াছে।

তখন অনুকম্পার উদ্ভেজনার আয়বিস্তৃত বিজ্ঞানাগর মহাশয় স্থান, সময়, অবস্থা ও লোক বিচার না করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া বলিলেন, “ইহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ভাল ডাক্তার দেখাইলে ত ভাল হইত।” এই অস্যাচিত বিজ্ঞানোচিত উপদেশ দান শ্রিয়া বালকের পিতা এই মোটা চাবব গায়ে উড়িয়া আশ্রয় চেষ্টার অপরিচিত লোকটিকে বাতুল ভাবিবে কি না, মনে মনে তাহারই সীমান্সা করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ বালকের পাখানি আর একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “আমার বোধ হয়, মেডিকেল কলেজেব ডাক্তারগণের দেখাইলে কিছু না কিছু উপকার হইত।”

তখন বালকের পিতা বলিল, “কলিকাতায় লইয়া গিয়া ডাক্তার দেখান আমার সাধ্যাতীত।” তখনও বিজ্ঞানাগর মহাশয় পূর্ববৎ পরমাস্বীয়ের দ্বার বলিলেন, “আচ্ছা, যদি কেহ কলিকাতায় যাওয়া আসা, সেখানকার থাকা, আর ডাক্তার ও ঔষধের ব্যয় বহন করে, তা হ'লে তোমরা ছেলেটিকে নিয়ে কলিকাতায় বেড়ে পারি কি না? বালকের পিতা ব্রাহ্মণের বাহিরের অবস্থা ও প্রস্তাবের গুরুত্ব এতদূতরের বৈষম্য গ্রহণ করিয়া কি উত্তর দিবে, ব্রি করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে গৃহস্থের দ্বারে ক্রমশঃ জনতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন তিনি ধরা পড়িবার ভয়ে সংবাদ দিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া দ্বার অগ্ৰস্ত হইলেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের দ্বারে

জনতা ও জনতাজাত কোলাহলের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল, উপকৃত জনগণের কেহই বিভাগসগর মহাশয়কে চিনিতে না বটে, কিন্তু তিনি যে বাড়ীর ঠিকানা দিয়াছিলেন, তাহাতেই গেল বাবুয়া গেল। ঐ পল্লীর এক জন সন্ন্যাস্ত ভ্রম লোক অপরচিত ভ্রাস্ত্রণের উক্তি সকলের পুনরাবৃত্তি শ্রবণ করিয়া এক নিমিষ্টে বাটা অবগত হইয়া বলিলেন, “তোমরা কেহ চিনিতে পার নাই, বিভাগসগর মহাশয় আসিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এমন কথা আর কে বলিতে পারে ? অপরাহ্নে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এবং তিনি যেক্ষণ বলিবেন, তাহাই করিলে উপকার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে জানিবা।” তখন চারিদিকে ‘বিভাগসগর’ বিভাগসগর’ বলিয়া একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, এবং অতি অল্প সময় মধ্যে ঐ বালাকের শব্দ ও বিভাগসগর মহাশয়ের নাম নানা আকারে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বালাকের পিতা বালাকের মাতার সহিত পবানশ কবিতা সঙ্ঘার সময় নিমিষ্টে বাটাতে ভ্রাস্ত্রণের সহিত সাক্ষাৎ কবিত্তে গেল। কিন্তু আগন্তুক কিছুক্ষণ পলাস্ত কোন কথাই বলিতে পারিতেছে না দেখিয়া, বিভাগসগর মহাশয় বৃত্তিতে পারিয়াছেন যে, যে টুকু গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেটুকু ধরা পড়িয়াছে ; তিনি যে তিনি, তাহা ইহারা বৃত্তিয়াছে। তখন বিভাগসগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কি ঠিক করিলে ?” বালাকের পিতা করজোড় কমা চাহিয়া বলিল, “আজ আমার দরজার আপনাব পারদর ধূলা পড়িয়াছিল, আমিবা এ সৌভাগ্য জানিতে না পারায় আপনাব প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি, আগে আমায় সে অপরাধ ক্ষমা করুন, তাহার পর অস্ত্র কথা।” সাধার স্বাভাবিক সঙ্গশরতার বশবর্তী হইয়া বলিলেন, “তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর নাই, স্ততরাঃ তোমায় অপরাধও হয় নাই। এখন বল দেখি, কি দ্বির্ করিয়াছে ?” বালাকের পিতা বলিল, “আমরা নিরুপায়, মহাশয় কোন বাবুয়া করিয়া, আমরা মাথা পাতিয়া তাহা শ্রবণ করিব।” তখন হর্ষোৎফুল্ল নয়নে বালাকের পিতার দিকে ডাকাইয়া সাগর বলিলেন, “তবে তোমাদের এখানকার সব বন্ধোবন্ধ করিয়া কলিকাতার বাইবার ও সেখানে কিছুদিন থাকিবার আয়োজন কর। আর কহে বাবে, তাহা আমাকে বলিয়া দাটবে, তাহা হইলে আমি গিয়া সব বাবুয়া করিয়া দিয়া আসিব।” তখন বালাকের পিতা পুনরায় বলিল, “আজ্ঞা, সেখানে

থাকিতে হইবে ? তা হইলে অনেক টাকা খরচ হবে, এত টাকা—।” দয়ার সাগর বলিলেন, “সে ভাবনা তোমার কেন ?”

আমরা এই ঘটনার সমগ্রভাগ তাঁহার নিকটে না শুনিলেও ঘটনাটা সত্য কি না, জানিবাব জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “করাসভাকার সেট ছোট ছেলেটার পা খানি, কি সারিয়াছে ?” তৎক্ষণে তিনি বলিয়াছিলেন, “না, একেবারে সারে নাই, তবে যেমনটা ছিল, অন্ততঃ তেমনটাই থাকবে, আর বাড়বে না, এইটুকু লাভ।” মানুষের সুখ সুবিধাটা তিনি এতই দেখিতে শিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা মানুষের যেখানে যে টুকু লাভের সম্ভাবনা ছিল, প্রাণপণে সে টুকু করিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা জানি এই বালকটীও চিকিৎসার ঔষধ, ডাক্তারের ভিজিট, ইহাদের তিন চারি মাসের প্রাসঙ্গ্যাদান ও বাড়ীভাড়া ইত্যাদিতে চারি পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মানুষ স্বস্ত শরীরে সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক, একজন তাঁহার অঙ্গের কিছুই ছিল না।

কলিকাতা রাজধানী ও বাংলাদেশের নানা স্থানে অসংখ্য নীন দরিদ্র লোক ১০, ২, ২, ৩, ৪, ৫ টাকা সাহায্য দীর্ঘকাল ধরিয়া পাইয়াছে। সময়ে সময়ে এক্রপ বিপন্ন লোকদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য আমরাও তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি, এবং তিনি দয়া করিয়া এক্রপ অনেক লোককে আমাদের অনুরোধে অনেক দিন ধরিয়া সাহায্য করিয়াছেন। গাধারা একবার তাঁহার করুণাশ্রুতি লাভ করিত, তাহারা যে কেবল মাসে মাসে কিছু কিছু পাইয়া উপরুত হইত, তাহা নহে, তাহাদের বিপদ আপদে সামগ্রিক সাহায্য এক পুজা প্রভৃতিতে বস্তাদিও এক প্রকার পাওনার মধ্যে দাঁড়াইয়া বাইত।

সম্পন্ন কি দরিদ্র, ভ্রূ কি ইতর, আহাদের সময়ে কিংবা কিকিৎ পূর্বে কি পরে, তাঁহার নিকটস্থ হইলে, অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, আহার হইয়াছে কি না ? একবার একটা দূরদেশীর লোক কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া শেষে খুঁটিয়াছে সিরা তাঁহার নরন পায়। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে সে ব্যক্তি বাটার নিকটে দাঁড়াইয়া বাটার দিকে ডাকাইতেছে, এমন সময়ে বিভাগসাগর মহাশয় তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সেই ব্যক্তি তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বিভাগসাগর মহাশয় তাহাকে সর্ব প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার আহার

হইয়াছে কি ?” লোকটী নানা দেশ পর্যটন করিয়া বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তাহার মহিমা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের এই সম্বন্ধে সম্ভাবণে সে ব্যক্তির হৃদয় আর্দ্র ও চক্কু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী? কেন ?” সে ব্যক্তি বলিল, “এত ক্লেশ পাইয়া এত যোকের নিকট গিয়াছি, কিন্তু কই কেহ ত খাওয়া হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করে নাই।” বিজ্ঞানাগর মহাশয় সর্বাঙ্গে তাহার আহারের আয়োজন করিয়া দেওয়াইলেন পরে তাহার আর্থনা পূর্ণ করিলেন।

বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলের এক জন লোক বড় আশা করিয়া কলিকাতার গুই জন বড় লোককে দেখিতে আসেন। এক স্থানে কয়েক দিন দরবার করিয়া সাক্ষাৎ না হওয়াতে তৃতীয় কি চতুর্থ দিবসে বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে পুনঃ পুনঃ পানার্থে জল আর্থনা করিয়া না পাওয়াতে ক্রোধে কম্পিত কলেবরে ও আরক্ত নৈত্রে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় আহারাঙ্কে অনাকৃত দেখে একটা হাঁকা হাতে নীচের এক ঘরের দ্বারে দণ্ডারমান। লোকটী আসিয়া বিরক্তির ভাববাক্যক মুখে ও কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “বিজ্ঞানাগরের সঙ্গে দেখা হবে ?” বিজ্ঞানাগর মহাশয় কিছু ঠাট্টনা কল্পনা করিয়া বলিলেন, “হাঁ দেখা হবে বইকি, আপনি বসুন।” সে ব্যক্তি বলিলেন, “হবে বইকির কর্ণ নয়, এক জনকে সেরে এলুম, একেও সেরে চলে যাই, হরত হোক।” বিজ্ঞানাগর মহাশয়, তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে কি না, জানিয়া তামাক দিতে বলিলেন। তামাক খাইতে খাইতে লোকটার মেজাজ একটু নরম হইলে পর বিজ্ঞানাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আহারাদি করেছ কি ?” সে ব্যক্তি বলিলেন “আর আহায়ে কাজ নাই, তুমি একবার ড্রেকে লাগ, দেখে চলে যাই।” তিনি বলিলেন, “আহারাদি না হলে থাকে ত এখনই ঘোণাড় হতে পারে।” ইতিমধ্যে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের টব্বিতে জলযোগের আয়োজন হইয়াছে। লোকটীকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া কিঞ্চিৎ জল পাওয়াইলেন। জল খাওয়ার পর তামাক খাইতে খাইতে লোকটী বলিলেন, “একবার ডাকিয়া দিলে এঁকেও বেধে চলে যাই, আর এমন চক্কু করিব না।” অনেক পীড়া-পীড়িতে বিজ্ঞানাগর মহাশয়, সমস্ত ঘটনাটী শুনিলেন, এবং অপরিচিত যোকের নিকট বিনামূল্যে তাহার ভিন্নভারভাজন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাও

বুলিলেন। তারপর অতিথির পীড়াপীড়িতে আয়শরিচর দিতে না দিতে, সে ব্যক্তির মনের উদ্বেজন ও মুখের আয়ত্টিম ভাব পলক মধ্যে তিরোহিত হইল। লোকটা নিতান্ত বিষয় বিজ্ঞিত ভাবে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “আ—মি—আ—মি—আ—গ—না—কে আপ—না—কে।” বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিলেন, “আপনার কোন দোষ নাই মানুষ একরূপ অবস্থায় পড়িলে, মনের ঐরূপ অবস্থাই হইয়া পাকে, ইহাতে কোন দোষ নাই। শুধন লোকটা বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মহিমানয় নামের উপবৃত্ত পরিচয় পাইয়া পরমানন্দে আপন আলয়ে গমন করিলেন।* পাছ লোকের এইরূপ অনুবিধা হয়, এট ভায় বিজ্ঞানাগর মহাশয় প্রাণান্ত ও নিজের গৃহ দ্বারে দারবান রাখিতেন না। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্ত যাতায়াতের মুক্ত পথ কখনও বোধ করিতেন না। একবার কেবল কয়েক মূহুর্তের জন্ত এক পরিচারককে প্রহরিক্রমে দ্বারে বসাইয়াছিলেন। কোন এক সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রবেশের সময় দ্বার দ্বারবানের নিষেধ অপমত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। নিমন্ত্রণকারীগকে শিক্ষা দিবার জন্ত গৃহে আসিয়াই একজনকে প্রহরিক্রমে দ্বারে বসাইয়া বলিয়া দেন যে, ‘আমার বিনা হুকুমে কাঠকেও এখন বাড়ীতে আস্তে দিবে না।’ ক্ষণকাল পরেই তাঁহারা আসিলেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের গৃহের মুক্তভাবে প্রবেশ করিতে গিয়া বাধা পাইলেন। সাক্ষাৎ হইল না, তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন।

এক বাক্ষব ও পরিচিত লোকদের কাছাবও পীড়া নিবন্ধন কাজ করণে অপটু হইল, তাহার সংবাদ লষ্টেন; কেমন করিয়া চলিতোছ, এ সংবাদটা সর্বত্র জিজ্ঞাসা করিতেন। অচল হইলে, কোন না কোন উপায় সাধ্যা দান করিতেন। একবার অত্যধিক পীড়া নিবন্ধন আমাকে কণ্ঠস্থান হইতে দীর্ঘকালের জন্ত বিদায় লষ্টতে হয়। বিজ্ঞানাগর মহাশয় লোকমুখে এট সংবাদ অবগত হইয়া মোট দোহিত্রের দ্বারা আমাকে ডাকিয়া পাঠান। দোহিত্র ত্রিবুক জরেশচন্দ্র সমাজপতি আসিয়া আমাকে বলিলেন, “দাদামশাই বলিয়াছেন যদি আপনার উত্তিমার শক্তি থাকে, তবে একবার যাইবেন, তিনি

* ৪৭৭ দ্বাংযোহন দাস মহাশয়ের মুখে এই ঘটনাটি শুনিয়াছি। ঘটনা-সংঘট ব্যক্তি পরিচয়লাসী।

শয্যাগত তা না হলে, তিনি নিজেই আপনাকে দেখিতে আনিতেম।” আমি তাঁহার এই দেহস্পর্শ আহ্বানে অনুগৃহীত হইয়া তাঁহার চরণ দর্শনার্থে বাই। আমি গিরাহি গুনিয়া আমাকে তাঁহার শরণকক্ষে শয্যাপার্শ্বে আহ্বান করিলেন। আমি প্রণত হইয়া চরণসমীপে দণ্ডায়মান হইতে না হইতে নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। তাঁহার বাক্যক্ষুণ্ণ এক ক্ষীণ বলিয়া বোধ হইল যে, তাহাতে আমার প্রাণে ত্রাস ও গভীর ক্লেশ সঞ্চার হইল। তিনি বসিতে বলিয়া বলিলেন, “তোমার কি খুব বেশী অসুখ?” আমি বলিলাম, “হাঁ।” “ছুটি লইয়াছ, বেতন পাও ত?” আমি বলিলাম “অর্দ্ধেক।” “চলে কি রকমে?” “কণ ক’রে।” “মাসে এরূপ কত টাকা কণ হইতেছে?” “মাসে ৩০।৪০ টাকা।” “এ টাকার স্তন দিতে হত?” “হাঁ হয়।” “তোমরা আত্মকালকার ছেলে, কোন কথা বলতে ভয় হয়, শেষে কোন কথাই ইনস্ট্রুমেন্ট (instrument অবমাননা) হইবে তাহার ত ঠিক নাই।” আমি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, “আমার যাহা জিজ্ঞাসা করিবার হয় কখন, আমাকে ঐরূপ বলিলে, আমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশের কথা, কারণ আপনার কোন আদেশই আমার কাছে ঐরূপ উপেক্ষার বিষয় নহে।” তখন বলিলেন “স্তন দিয়া অল্প টাকটা কর্জ করা অপেক্ষা বিনামূল্যে আমার নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ মাসে মাসে লইলে হইতে না? যখন সুবিধা হইবে ২।১ টাকা ২।৪ টাকা করিয়া পরিশোধ করিলেই ত হইতে পারে।” আমি বলিলাম, “আপনার মত মহাজনের নিকট ঐরূপ কড়ারে টাকা লইলে, সে টাকা কি আর পরিশোধ করিতে পারিব?” উত্তরে বলিলেন, “নাট পারলে?” আমি বলিলাম, “আপনার টাকার আমার অপেক্ষা অনেক পরিবেশ অল্প সংস্থান হয়, তাহাদিগকে বঞ্চিত করা কি উচিত?” তিনি সেই পূর্ববৎ সরল সুখ ভ্রমিয়ার বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, “আমি বুঝিতে পারি নাই, তুমি যে চে বড় লোক।” এই কথায় বলিতে না বলিতে আমি নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম, “না—আমি তা বলি নাই;” অমনি বলিলেন “তা হোক, না হয় তুমিও আমার কিছু বেলে।” আমি বলিলাম, “যদি আমার নিতান্ত অচল হইলে, আমিই আপনাকে বলিব।” “বলি, অচল আর কাহকে বলে?” “যে কয় দিন চলে চলুক।” “তার পর সাব্যস্ত হ’রে যাবে।” “সাব্যস্ত হবার মত হয় ত আমিই আপনাকে বলিব।” তিনি হাসিতে

হাসিতে বলিলেন, “ঐ সাবাড় হবার অবস্থা বুকে আমার টাকাটা নিও, তাহ’লে আর শেষ দেবাব নাম করতে হবে না। তা হবে না বাপু, তুমি যদি এখন অ্যাড থাকতে থাকতে না গও, ত সাবাড় হবার সময় আমি কিছু করবো না। তখন কিছু করা আর জগে ফেলে দেওয়া এক কথা। তা হবে না। বাঁড়ী গিন্না হিসাব করে কতগুলি টাকা মাসে বেশী লাগছে আমাকে জানাবে, আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিব।” আমি প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া দীর্ঘকালের ভ্রম্ভ গা ঢাকা দিলাম। আত্মপাখ্যলাভ করিয়া সর্বাঙ্গ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, “আমি কিছুই কাজকর্ম প্রবৃত্ত হইব, অশুখ সারিয়াছে।” তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, “তুমিও বাটিলে, আমিও বাটিলাম।” কিন্তু বলা বাহুল্য যে, এট হটতে আমি বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের অত্যধিক স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলাম। এট ঘটনাব পর যখন যাহা বলিয়াছি, তাগাই অনুগ্রহ কবিয়া জনিয়াছেন।

কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকের প্রবন্ধনা, প্রভাবনা, মিথ্যাচরণ প্রভৃতি দেখিয়া মানুষের আচরণের প্রতি তাঁহার এক প্রকাব বিজ্ঞাতীয় ঘণার সঞ্চার হইয়াছিল। একদিকে প্রেমিকহৃদয় বিজ্ঞানাগর মহাশয় মানবের প্রতি মহা প্রেম অনুপ্রাণিত, অপন্থদিকে মানুষের আচরণ ভগ্নহৃদয় ও বিশ্বাসবিহীন। একপ অবস্থা যে, কতদূর বহুলাঙ্গনক, মানুষকে বাহারা প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছেন, আকাশসদৃশ বহুবিস্তৃত সমবেদনাব প্রাপ্তবে বাহারা কখন চুটাছুটি করিয়াছে, তিনিই কেবল বুঝিতে পারিবেন, মানুষের নিম্নম ব্যবহারে—নিম্নরাচরণে জন্মের সরস ভাব কতদূর বিনষ্ট হয়।

বিজ্ঞানাগর মহাশয় জীবনের শেষ দশার অতি আন্তরিকভাবে নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলিছেন “এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ দেশের ভাল হয়। তাঁহার প্রাণে যে একপ দারিদ্র্য নরবিষয় অন্ত্রিয়াছিল, তাহার ভ্রম্ভ আমরাই অনেক পরিমাণে দারী, কারণ আমাদের আচার আচরণ দেখিয়াই তাঁহার ঐকপ ধারণা অন্ত্রিয়াছিল; আর আমরাও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে, সহজেই বুঝিতে পারিব যে, আমাদের অবস্থা কিরূপপরিমাণে তাঁহার ধারণার পোষকতা

করিচ্ছে। কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছে বলিলেই, তিনি বলিতেন, “রও, ভেবে দেখি, সে ব্যক্তি আমার নিন্দা করিবে কেন? আমি ত কখনও তাঁহার কোন উপকার করি নাই।” তাঁহার শেষ ধারণা এই জন্মিয়াছিল যে, উপরূত ব্যক্তিরূপের অধিকাংশই কৃত্রিম হয়। বহু লোকের আচরণ দেখিয়াই তাঁহার ঐক্সা সঙ্কার জন্মিয়াছিল।

নানা প্রকার সমুদ্রতানে আশানুরূপ ফল দর্শনে বঞ্চিত হইয়া একদিন চুঃখ করিয়া মানুষের আচরণের কথা বলিতে বলিতে একটা উদ্ভট শ্লোকের আৱৃতি করিয়া বলেন, মানুষ ইতর জন্তুর অপেক্ষাও অধম! তাঁহার প্রমাণ :—

কুরঙ্গমাতঙ্গপত্তঙ্গভূমীনা হতাঃ পক্ষভিরেব পক্ষ।

একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্ততে যঃ সেবতে পক্ষভিরেব পক্ষ ॥

এই শ্লোকের আৱৃতি করিয়া বলিলেন, “এক একটা ইঞ্জিরের অধীন হইয়া জীবগণ বিনষ্ট হয়; আর যে মানুষের এষ্ট পাঞ্চস্থির মুক্তভাবে কার্যা করিতাত্ত, তাঁহার বিনাশ কত সহজ, আর কত সাবধান হইলে, তবে মানুষ আপনাকে বক্ষা করিতে পারে, মানুষ কি ভা ভাব? মানুষ দিবানিশি এষ্ট পাঞ্চস্থিরের অধীন হইয়া আপনাকে ইতর জন্তু অপেক্ষা করে, ঘৃণিত, অধম করিতেছে। ইতর জন্তু কা’রা? মানুষ যাহাদিগকে ইতর জন্তু বলে, তাহারা না মানুষ নিজে? মানুষ সকল অপকণ্ঠই করিতে পারবে; তবে সে শৃগাল, কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র, গো, মেঘ প্রভৃতি জীবদিগকে কেন ইতর জন্তু বলিবে?” সে দিন তাঁহাতে সে উত্তেজনা, যে অভ্যমান, যে ক্ষোভ দেখিয়াছিল সেৱণ অতি অল্পট দেখিয়াছি। শ্লোকটী বড়ই ভাল লাগিল, তাই তাঁহার দ্বারা শ্লোকটী লিখাইয়া লষ্টয়াছিলাম।

চুঃখ এষ্ট যে, তাঁহার দ্বারা মহানুভব ব্যক্তি লোকের সেবা, লোকের সুখ সাধন করিতে গিয়া পদে পদে জনয়ে বাধা পাইয়াছেন; আর তাঁহার সেই শান্ত হৃদয়—সেই কোমল গ্রাণ বারবার সন্তুষ্ট ও দগ্ধ হইয়াছে।—ক্লেশ? জীবনব্যাপী ক্লেশ পাইয়াছেন। কিন্তু কখনও লোকের চুঃখ নিবারণে বিমুগ্ধ হন নাই। মানুষের চুঃখ তিনিই তাঁহার সরল গ্রাণ দ্বারা সঞ্চার হইত। ধনবান কি দরিদ্র, ভয় কি ইতর, পুরুষ কি স্ত্রীলোক, সত্য কি বৈকিণী, দয়া করিবার সময় তিনি এ বিচার করিতেন না। মানুষ কেন, তাঁহার সরল প্রাণে

পশুপক্ষীরাও বশ হইয়াছিল। বিহঙ্গকুলের মধ্যে কাক অতি বৃহৎ বলিয়া বিদিত এবং তাহাদের আচার আচরণও তাহার প্রামাণ্য পাওয়া যায়। এই কাক তাঁহার ভালবাসার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিকটে দাঁড়াইয়া ইহাদিগকে যাহা দিতেন, ইহারা অস্বস্তিতে তাঁহার হাত হইতে তাহাই লইয়া খাইত। একবার বাবু ক্ষুদ্রিরাম বসু মহাশয়কে বিজ্ঞানাগর মহাশয় কমলালেবু গাইতে দিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রিরাম বাবু লেবু খাইয়া তাহার ছিব্ড়াগুলি ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া, বিজ্ঞানাগর মহাশয় তাঁহাকে সে গুলি ফেলিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, “দেখ ও গুলি ফেল না, খাটবার লোক আছে।” তখন ক্ষুদ্রিরাম বাবু অবাক হইয়া বলিলেন, “কমলার ছিব্ড়া কে খাবে?” তখন তিনি বলিলেন, “জানালায় বাহিরে এখানে রাখ, দেখিবে যাগরা খায়, তাহারা আসিবে। ঋণকাল ঐরূপে রাখার পর কেহই আসিল না দেখিয়া ক্ষুদ্রিরাম বাবু বলিলেন, “কই, কেউত এল না।” তখন বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিলেন, “তোমার চোগাচাপকানের জাঁকজমক দেখিয়া তাহারা আসিতেছে না; তুমি সর দেখি, বলিয়া তিনি নিজের গিয়া জানালায় নিকট দাঁড়াইবামাত্র অমনি চিবলিচিভের জ্বর কাকেরা আসিয়া তাঁহার প্রদত্ত সেই খাদ্যগুলি গ্রহণ করিল।”
 “যাহার প্রেমে পশু পক্ষী বশ হয়, মানুষ তাহাতে বশ হইল না। মানুষ সে প্রেমের মধ্যাদা বুঝিল না!! সে সবল আভাবিক প্রেম মানুষের নিষ্ঠুরাচরণে যে কত বিকৃত ও স্তান হইবে ইহা আর বিচিৎ কি? তাই তিনি অহঙ্কার করিয়া বলিতেন, “তোমাদের মত কল্পবিশ্বাসী আধাসন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল ভাল লোক।”

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বিবিধ বিষয়ে বিজ্ঞাসাগর ।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অথবা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে বঙ্গদেশীয় জমিদার ও রাজস্ব বর্গের নাবালক পুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়ার্ড ইন্সটিটিউশন নামে একটি বাসভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশীয় রাজকুমার ও জমিদারতনয়গণ এইখানে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতেন। বিজ্ঞাসাগর মহাশয় এই ইন্সটিটিউশনের কর্তৃপক্ষগণের প্রধান একজন ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। একবার এক সময় ওয়ার্ডের বালকগণের আহারাদি ও অন্ত্যস্ত ঐরূপ বিষয় লইয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত মতান্তর ও শেষে মনান্তর হয়। বিজ্ঞাসাগর মহাশয় ও মিত্র মহাশয় উভয়েই সমান স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, সুতরাং উভয়ের স্বাধীনতার সংঘর্ষে একটু অধ্যুৎপাত হয়। অধিকাংশ স্থলে এইরূপ অশ্রিয় সংঘটন হইলে, বিজ্ঞাসাগর মহাশয় নিজে থাকিয়া অশান্তির মাত্রা হ্রাস করিতে কিংবা অন্তকে সরাইতে চেষ্টা করিতেন না। নিজেই সংসবৎ্যাগ করিয়া অশান্তির স্থানে শান্তিহাসনে আগ্রসর হইতেন। এখানেও তিনি তাহাই করিলেন। ইন্সটিটিউশনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগের অতিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই পদত্যাগ পত্র কিরাইরা লইতে পুনঃ পুনঃ অমুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে সন্মত হন নাই। তাহাকে এইরূপ হিরণ্যকিঞ্চিৎ দেখিয়া কর্তৃপক্ষ অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

পীড়িত হইয়া রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কান্দীর রাজত্ববনে বাস করিতে-
 ছিলেন। বিবিধ গুণাগুণত রাজা প্রতাপচন্দ্রের আত্মীয়তাবশত্বে আবদ্ধ হইয়া
 বিজ্ঞানাগর মহাশয় অনেক সময়ে কান্দীর রাজত্ববনে বাস করিয়াছেন।
 এবারেও রাজার কঠিন পীড়ার সংবাদে বহু অর্থব্যয়ে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল
 সরকার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কান্দীতে গমন করেন, এবং সূচিকিংসার
 দ্বারা তাঁহার রোগশাস্তির চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।
 অবশেষে রাজা বাহাদুর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র
 মৃত্যুর অন্তর্যকাল পূর্বে বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির ট্রাষ্ট ও
 নাবালক পুত্রদিগের একমাত্র অভিভাবক নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন।
 বিজ্ঞানাগর মহাশয় রাজার এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত নিজের অভিপ্রায়
 প্রকাশ করিলেন। বহু চেষ্টাতেও রাজা তাঁহার উপর এই কার্যের ভার অর্পণ
 করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে অল্প কোনরূপ সুব্যবস্থা করিবার পূর্বেই
 রাজা কাল্পীপুরে গঙ্গাতীরে দেহ ত্যাগ করেন। রাজাবাহাদুর বিজ্ঞানাগর
 মহাশয়কে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতে অনুরোধ করিয়া যান। বিজ্ঞানাগর মহাশয়
 রাজার শোকান্তর গমনের পূর্বে শোকদগ্ধ আত্মীয়রূপে দীর্ঘকাল সমস্ত কার্য
 পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। রাজ-সম্পত্তি যাছাতে সুরক্ষিত ও সুশরিচালিত হয়
 এবং রাজকুমারেরা যাছাতে সুশিক্ষাগুণে পিতার জায় সন্মানসমাজের বরণীয় হইতে
 পারেন, সে বিষয়ে তাঁহার যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। ইংরাজ রাজের
 তত্ত্বাবধানে রাজসম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। নাবালক রাজকুমারদিগকে
 ওয়ার্ডে না রাখিয়া বাটীতে জননী ও পিতামহীর নিকট রাখাইবার জন্য
 বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে ছোট লাট বিডন সাহেবের নিকট দরবার করিতে
 হইয়াছিল। তাঁহারই অনুরোধে জনৈক রাজকুমারের অভিভাবকরূপে করেক
 জন সম্মান্য খাজানী ও ইংরাজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় রাজা
 প্রতাপচন্দ্রের পরম বন্ধু বলিয়া গভর্ণমেন্ট তাঁহাকেই প্রধানরূপে নিযুক্ত
 করিয়াছিলেন।

সম্ভূত কালেজের অধ্যাপক ৮ প্রেসিডেন্সি ডক্টরবংশীয় মহাশয় অবসর গ্রহণ
 করিলে পর, তাঁহার সহোদর রামময় ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত পদের প্রার্থী হন।
 অপর দিকে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র জারজর মহাশয়ও উক্ত পদের প্রার্থী হইয়া

আবেদন প্রেরণ করেন। উত্তরেই যোগ্য পাত্র, এজন্য সকলেই মনে করিয়া ছিলেন, রামময় ভট্টাচার্য মহাশয়ই সহোদরের পদে নিযুক্ত হইবেন। ভ্রাতার মহাশয় সন্তত কালেক্সের ছাত্র না হইলেও কাব্য ও অলঙ্কারে সর্বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বর্দ্ধমানে সে সময়ে সর্বাধিক সমধিক প্রতীপত্তিভাজন হইরা ছিলেন। এতকমাত্র শূন্য পদের প্রার্থী হইরা ছই জন পণ্ডিত আবেদন করিয়াছেন। অধ্যক্ষ কাউন্সেল সাহেব কাহাকে নির্বাচন করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই বিপন্ন হইলেন। পরিশেষে তিনি বিভাগাগর মহাশয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিভাগাগর মহাশয় বলিলেন, “অলঙ্কার শ্রেণীতে ‘কাব্য-প্রকাশ’ পড়াইতে হইলে ভ্রাতা ভাল জানা থাকা আবশ্যক। মতেশ ভ্রাতার সমগ্র ভ্রাতা শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। অতএব আমার মতে ভ্রাতারই ঐ পদ পাঠবার উপযুক্ত পাত্র।”^{*} বলা বাত্য় ভ্রাতার মহাশয়ই উক্ত শূন্য পদে নিযুক্ত হইলেন।

বোম্বাইএর এক জন সম্ভ্রান্ত লোক কলিকাতা পরিদর্শন মানসে আসিয়া ছিলেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে বিভাগাগর মহাশয় তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা যাত্রার সেবারিতে যান। তিনি এমিরাটিক মোসাইটির সন্ততরূপে বহবার ঐ বাটীতে গিয়াছেন, কিন্তু কখনও কেহ তাঁহাকে তাঁহার পাছকা ভাগ করিতে বলে নাই। এবার কি কারণে বলা যার না, সেখানকার যার-বানেরা তাঁহাকে পাছকা ভাগ করিয়া যাত্রার যাইতে বলে। তিনি অস্থ-সন্ধান করিয়া জানিলেন, যাত্রার চটি তৃতীয়া যাত্রার নিয়ম মাই। অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া সেই বিদেশী ভ্রাতৃলোকটিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন; তাঁহাকে বলিলেন, “আপনাকে অল্প কোন বস্তুর সন্তিত পাঠাইয়া দিব। আমি আর ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব না।” এষ্ট বলিয়া যখন চলিয়া আসেন, তখন যাত্রার কৰ্ত্তৃপক্ষ সাহেব (কিউরেটর) এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া বহুধাধাধনাতেও আর তাঁহাকে কিরাইতে পারিলেন না। তিনি তখন আর ঐ গৃহে প্রবেশ করিবেন না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। কৰ্ত্তৃপক্ষবিশেষের নিকট এই ব্যাপার অবগত করায় তাঁহারা ক্রমা প্রার্থনা ও চুঃখ প্রকাশ করিয়া পর লিখিলেন। তাঁহারা

* শতচন্দ্র বিদ্যাসুত একটী ভীষনচরিত, ২১০ পৃষ্ঠা।

বিভাগাগর মহাশয়কে জানাইলেন যে, তিনি যখন যে পরিচ্ছদে ইচ্ছা বাস্তব ও সোসাইটির আকিসে আসিতে পারিবেন। কিন্তু বিভাগাগর মহাশয় তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া লিখিয়া পাঠান যে, আমার জন্ত স্বতন্ত্র নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণের জন্ত এক নিয়ম এবং আমার জন্ত আর এক নিয়ম, এইরূপ নিয়ম বিপর্যয়ের প্রশ্ন দিতে আমি কোন মতেই সম্মত নহি। যদি সাধারণের জন্ত এরূপ নিয়ম করা সম্ভব হয়, তবেই কেবল আমি সেই সাধারণ নিয়মের অধীন হইয়া বাতায়ান্ত করিতে পারি, নতুবা বিশেষ নিয়মের সুযোগ লইয়া অপরের সঙ্গে নিজের এরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করিতে সম্মত নহি। এই বলিয়া যাহুবর ও সোসাইটির কর্তৃপক্ষ, তৎপরে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট, ক্রমে টাণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত পত্র লেখালেখি হইয়া শেষে সরকারি জেদ বজার রহিল। বিভাগাগর মহাশয় সাধারণের পক্ষ সমর্থনে প্রায়সী হইয়া যখন বিকলচেষ্ঠে হইলেন, তখন প্রতিক্রিয়া করিলেন, আর কখনও যাহুবরের দ্বার অতিক্রম কবিবেন না। ১৮৮৩—৮৪ গৃহীনের শীতকালে মহানতি লর্ড রিপনের রাজত্ব কালে যখন কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল, তখন পৃথিবীর যাবতীয় বিচিত্রতার সন্নিবেশ সে স্থান এক অপূর্ব শ্রীলবণ করিয়াছিল। রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোক বিভাগাগর মহাশয়কে সনন্দ বাপার অবগত করিয়া একটীবার দেখিতে যাইবার জন্ত অনুরোধ করেন। বিভাগাগর মহাশয় বলেন, “লোকের মুখে শুনিয়া ও তোমাদের অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া একবার যাঁতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু শুনিয়াছি সেই বড় বাড়ীটার বড় দরজা পার হইয়া নাকি প্রদর্শনীতে যাইতে হয়, তা হলে আর আমান কেমন করে যাওয়া হয়? আমি ত এ জীবনে সে দরজার ‘আর পা’ দিব না!” এরূপ লোকবৎসলতা ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা কয়জন লোকের পক্ষে সম্ভব?

বিভাগাগর স্কলং হরিস্চন্দ্র সুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বঙ্গালী-পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় চূড়া ভগ্ন হয়। সেই শূঙ্কহীন পূরণের ভার মহাহুতব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ইংরাজ সম্পাদক রাখিয়া কার্য চালাইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরিশেষে বিভাগাগর মহাশয়কে ইহার চুড়ী নিযুক্ত করিয়া ইহার উপযুক্ত পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ

করেন। বিভাগাগর মহাশয় সর্বপ্রথমে ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পরে বার কৃষ্ণকান্ত পাণি বাহাদুরকে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন। তাঁহারই নির্দাচনে রায় বাহাদুর পেটিটরট সম্পাদকরূপে স্বদেশে ও বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন। এই পরিবর্তন অল্প ডাক্তার মুখোপাধ্যায় চিরজীবন বিভাগাগরের উপর বিরক্তির ভাব পোষণ করিতেন।

মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সহিত নানা সূত্রে বিভাগাগর মহাশয়ের আত্মীয়তার বৃদ্ধি হয়। সিংহ মহোদয়ের অক্ষয় কৌত্তি মহাভারতের অনুবাদে বিভাগাগর মহাশয়ই পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাই সিংহ মহাশয় সর্বপ্রকারে কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হন।

সংস্কৃত কালেজের দ্বিতীয় গৃহে সংস্কৃত কালেজের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ প্রয়োজন বশতঃ সেট গৃহ চাহিয়া বসিলেন এবং নীচের অন্ধকূপসম একটি অপরিষ্কার গৃহে, বহুকাল হইতে সংগৃহীত ও দুশ্রাব্য সংস্কৃত গ্রন্থগুলির স্থান নির্দেশ করিলেন। সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ৬ প্রসন্নকুমার সর্দাধিকারী মহাশয় এই অনুচিত আব্দারে আপত্তি উপাধন করিলেন। তিনিও বিভাগাগরী মরণে গতিত হইয়াছিলেন। স্বদেশীয় সুদূরভ পাশ্চাত্যগুলি নীচের ঘরে অথচ বন্ধিত হইয়া 'ক্রমে বিলুপ্ত হইবে, ইত্যাদি তাঁহার প্রাণে সঙ্ক হইল না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, লাইব্রেরী-গৃহ ত্যাগ করা অসম্ভব; কারণ তাহা হইলে বহুশ্রম গ্রন্থসকল অস্বাভাবিক হইবে। এই সংগ্রামে কৰ্ত্তৃপক্ষের নিকট সাহেব বানী অরলভ করিয়া, বখন সংস্কৃত পুঁথিগুলি নীচের ঘরে নামাইতে লাগিলেন, তখন সর্দাধিকারী মহাশয় কৰ্ম্মত্যাগের অভিজ্ঞতা জানাচর্য্য বিভাগাগর, সদনে পরামর্শ প্রার্থী হইলেন। বিভাগাগর মহাশয় উভয়পক্ষের মধ্যমা রক্ষা করিবার মত কোন উপায় করিতে কৰ্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়াতে সর্দাধিকারী মহাশয় কৰ্ম্মত্যাগ করিলেন। কৰ্ত্তৃপক্ষ এই পদত্যাগ পত্র লইয়া বিঘ্ন বিভ্রাটে পড়িলেন। কলহে একপক্ষ পরাধীন বাদাণী, অপর পক্ষ স্বৈতিক রাজপুরুষ। ভ্রাতা বিচার করিতে গেলে সর্দাধিকারী মহাশয়েরই অর্থ হইত, তিনি এই অস্ত্রের প্রয়োগ দিতে না পারিয়া কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কালেজের প্রাচ্য সাহিত্য রক্ষার জন্য তাঁহার আকার

পূর্ণ করা নিত্যন্ত হীনতার পরিচায়ক বোধে, কর্তৃপক্ষ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। কিন্তু অপর দিকে কি কারণে এবং কি হুত্রে বলা যায় না, বিভাগসাগর মহাশয়ের নামে নানা স্থানে এই মর্মে সংবাদ প্রচার হইতে লাগিল যে, সর্বাধিকারী মহাশয় সম্পূর্ণরূপে বিভাগসাগর মহাশয়ের পরামর্শে এই কার্য্য করিতেছেন। ছোট লাট বিডন সাহেব বাচনিক ও গোপনীয় পত্রাদির দ্বারা বিভাগসাগর মহাশয়কে বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্ত যে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং বিভাগসাগর মহাশয় তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, সেই সকল পত্রের প্রয়োজনীয় অংশ সকলের প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া গেল।* ছোট লাট বিডন সাহেবের নিকটেও

* My dear Sir—When I had the pleasure of waiting upon you last, you were pleased to allude to the resignation of the Offg. Principal, Sanskrit College. But as I was not aware of all the circumstances connected with the affair, I could not tell you anything regarding the matter. I have since made myself acquainted with the facts of the case and am inclined to think that the treatment of the Principal by—has been unnecessarily and unbecomingly harsh, as will, I believe, appear to you also on perusal of the papers enclosed. * * *

I have therefore tried my best to persuade him to withdraw his letter of resignation. But he says * *

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

My dear Pundit— I am sorry you have not been able to induce P. C. Sarbadhicari to withdraw his resignation, because I feel sure it is a step which he will hereafter regret and am always sorry to lose the services of good officers specially if it be for an inadequate cause. * * *

As to the fitness of the room for the reception of the Sanskrit Mss. I will make enquiry.

Believe me, yours sincerely,
(Sd.) Cecil Beadon.

My dear Sir,

As I am inclined to suspect that he may have also represented the matter to you in the same light I beg to assure you that I had no hand whatever in inducing Babu P. C. Sarbadhicari in forming his resolution. On the contrary as I was under the impression that the severance of his connection with the Sanskrit College would be injurious to that institution I tried my best to make him withdraw his resignation.

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

My dear Sir,

You may be quite sure that if I had had the least suspicion that Babu P. C. Sarbadhicari had acted under your advice in resigning his appointment in Sanskrit College I should not have asked you to try and induce him to reconsider what I thought a hasty and unasked for step.

Yours sincerely,
(Sd.) C. Beadon.

উপরিউক্তরূপ নিম্নপ্রচারণের সন্বেহ করিয়া বিভাগাগর মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহারও কিয়দংশ দেওয়া গেল ।

কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্ভ্রান্তেরা দুই সহোদরে শৈথিল্য সম্পত্তি লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন । হাইকোর্টের উকিল কাউন্সেলেরা রাষ্ট্রকৃত অর্থ শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । বিভাগাগর মহাশয় কোন কারণ বশতঃ পূর্ব হইতে তাঁহাদের উপর বিরক্ত থাকিয়াও বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জে ও অকারণ অর্থব্যয় নিবারণে অগ্রসর হইলেন । উভয়েই বিভাগাগর মহাশয়ের বিচারে নত মস্তকে সম্মত হইবেন বলিয়া আশ্বাস দেওয়াতে তিনি বিষয় বটনে প্রবৃত্ত হইলেন । যেক্রম ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে জ্যেষ্ঠ সম্পূর্ণ সম্মত হইলেন ; অপর জন কনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্টি রাখিয়া বিষয় ভাগ করিলেও তিনি অপর কোন কোন বিষয় বেনীমর ভাগ প্রার্থনা করিলেন । বিভাগাগর মহাশয় বলিলেন, “তুমি ছোট বলিয়া তোমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখান হইরাছে, ইহার উপর আরও অধিক কিছু করিলে, তোমার দামার প্রতি অস্ত্রার বিচার করা হয়, অধর্ম করা হয়, ইহার অধিক আমি পারিব না ।” কনিষ্ঠের অসঙ্গত আবদারে, সামান্য পরিমাণ যদি মুক্তা প্রভৃতির অনুরোধে বটন কাঁচা স্থগিত হইরাও হয় নাই । শেষে রাজ্যসংক্রান্ত কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিভাগাগর মহাশয়ের ব্যবহার একটু এদিক ওদিক করিয়া মিটাইয়া দিলেন ।

বর্তমান জেলার অন্তর্গত চক্ৰদীঘিনিবাসী বিখ্যাত জমিদার পরিবারের সহিত বিভাগাগর মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল । উক্ত জমিদার পরিবারের প্রধান ৮ সারদাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত আত্মীয়তার চিত্তরূপে চক্ৰদীঘি ইংরাজী বিভাগলয়টী অস্ত্রাপি বিভ্রমনি রহিয়াছে । এখানকার দান্তব্য ঔষধালয়টির পরিচালনাতার বাহাদুর উপর ভূক্ত ছিল, বিভাগাগর মহাশয় তাঁহাদের প্রধান ছিলেন । এই জমিদার পরিবারের সম্পত্তি রক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন বিষয়ে বিভাগাগর মহাশয় সময়ে সময়ে যথেষ্ট সফলতা করিয়াছেন ।

সিরায়সোলের রানী হরমুন্দরী দেবীর পিতার সহিত বিভাগাগর মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয়তা থাকায় রানীর সম্পত্তি রক্ষা ও সর্বস্বাধীন কুশলচিত্তে

করিতেন। প্রয়োজন হইলে সুপারামর্শদানে কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতেন। এদিকে সম্ভ্রান্ত ধনীদিগের সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন, অপরদিকে সর্বদাই দুঃখীর সহিত সমবেদনা প্রকাশ ও আত্মীয়তা স্থাপনে আপনাকে নিযুক্ত রাখিতেন।

একবার মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের (বর্তমান ক্যাশেল স্কুল) তদানীন্তন অধ্যক্ষ ছাত্রগণকে মেকলে বর্ণিত কতকগুলি ক্ষুধিষ্ট বিশেষণে অভিহিত করেন। ভক্তিতাজন স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সেই সময়ে মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে পড়িতেন। তিনি এং অপরাপর কয়েকজন ছাত্র অধ্যক্ষের এইরূপ অসদাচরণে মর্দ্যাহত হইয়া দল বাধিয়া বিজ্ঞালয় ত্যাগের সঙ্কল্প এবং ছোটলাট সমীপে, অধ্যক্ষের এইরূপ অশিষ্ট ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করিয়া কোন প্রকার প্রতিকার হয় কি না, তাহার চেষ্টা করেন। বালকেরা দলবদ্ধ হইয়া গোলদাঁবির ময়দানে সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, সাহেব যতক্ষণ নিজ অপবাদ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করিবেন, ততক্ষণ স্কুলে যাওয়া হইবে না। অধিকাংশ বালককেই বিজ্ঞালয়ের প্রদত্ত মাসিক রুস্তিতে জীবিকা নির্বাহ কবিতো হইত। ইহাদের রুস্তি বদ্ধ হওয়াতে দিন চলাও ভার হইয়া উঠিল। উপর্যুক্ত সঙ্কল্প সকল কার্যে পরিণত করিবার জন্য সকলে সমবেত হইয়া শেষে বিজ্ঞানাগর মহাশয় সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় পূর্বেই সমস্ত ঘটনা শুনিয়াছিলেন। বালকগণকে প্রথমতঃ বুঝাইয়া স্কুলে পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বালকেরা সুবিধা অপেক্ষা মর্দ্যাদার অধিক পক্ষপাতী, গোস্বামী মহাশয় সকলের অগ্রদূতরূপে তাঁহাকে ইহা বুঝাইয়া বলায়, তিনি ছোটলাট সমনে তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইয়া রীতিমত অনুসন্ধান করাইয়া অধ্যক্ষের দ্বারা বালকগণকে ডাকাইয়া বিবাহ মিটাইয়া দেন।* হুই, তিন মাস রুস্তির টাকা বদ্ধ থাকায় অনেক বালককে যে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা দূর করিতে তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ও সম্মানের সূত্রপাত হয়।

বিজ্ঞানাগর মহাশয় এক সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত জমিদার বন্ধুর বাড়ির নিকটস্থ

* পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাদি শুনিরাছি।

এক পূর্ব পরিচিত হুদির আহ্বানে তাহার দোকানে পদার্পণ করেন। তাহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া দোকানের সমুখস্থ প্রাঙ্গণে এক খুণ্ট চটের উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে সেই সম্ভ্রান্ত ধনী বন্ধু সুবৎস অব্যোজিত রাজপক্ষে সাক্ষ্য সমীক্ষণ সেবনে বহির্গত হইয়া তদবস্থাপন্ন বিভাগাগর সমীপে রাজপক্ষে উপস্থিত হন। বিভাগাগর মহাশয়কে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাওয়া যেমন একদিকে অসম্ভব, অপরদিকে সত্বমশালী লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ স্থানে উপবিষ্ট বিভাগাগরকে সপ্রণাম সত্বম প্রদর্শনও উত্তোষিক অপমানজনক ! কিন্তু শেষোক্ত অপমানের কার্য্যই ধনীর সন্তানকে করিতে হইল ! পরে এক সময় সাক্ষ্য হওয়ার্তে বিভাগাগর মহাশয় বলিলেন, “সে দিন বড় বিপদে পড়েছিলে।” প্রত্যুত্তরে বন্ধু বলিলেন, “আপনি পথে ঘাটে যেখানে সেখানে ঐবকম বলেন, ওতে বড় লজ্জা বোধ হয়।” বীরপুরুষ অমনি বলিলেন, “লজ্জা বোধ হয় ? আমার সঙ্গে পরিচয় না রাখিলেই সব চুকে যায়, তোমাকে পথে ঘাটে অপদস্থ হইতে হইবে না। সে ব্যক্তি গরীব বলে কি তোমার অপেক্ষা অল্প আদরের পাত্র হইবে ?”

একবার সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ক একটা ভক বিতর্কে বিভাগাগর মহাশয়কে ছোট লাটের প্রয়োজন হয়। সংবাদ আসিলে পর বিভাগাগর মহাশয় প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, “আমি অল্প কয়েকদিন পিতৃহীন হইয়া আতি দীনভাবে দিনযাপন করিতেছি, আমার মনের অবস্থা ও বৈশত্ব্য কোথাও সাইবার উপযোগী নহে। যদি আপনাদের অপমান বোধ না হয়, তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, আমি অনাবৃত দেহে বেলভেড়িয়ারে আপনার সহিত সাক্ষ্য করিতে পারি।” গরজ বড় বালাই। ছোট লাট উত্তরকে গাটবার জন্ত অহুরোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “আপনি যেমন আছেন তেমনিই আসিবেন। আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।” বিভাগাগর মহাশয় বীরের জ্ঞান নির্ভীকভাবে খালি পায়ে ও খালি গায়ে ছোট লাট সমীপে উপস্থিত হইয়া বাহা বলিবার বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন।* কাট কোট, চোপা চাপ্কান, আন্তর সোলাপ ও সুকৃতিসমস্ত কেশবিভ্রাসে কি একদমেক্ষ এক বিদু অধিক জাতীয় তাব—হিন্দু আদর্শ কাহারও জীবনে স্মরিত হইয়াছে ?

* ঐহুক বারোপঞ্চ বিখ্যাত মহাপুরুষ :মকট এট খটমারী গনিয়াত ।

অথচ তিনি সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। পাঠক! এখন চিন্তা কর, তাঁহার সমাজসংস্কারের তার কত উচ্চ আদর্শে গঠিত ছিল।

ব্রাহ্মসমাজে জাতীয় ভাব সুরক্ষিত হয় নাই বলিয়া তিনি অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশ পাঠতেন। ক্লেশের কারণ এই যে, তিনি অপর দশ জনের ভার ব্রাহ্মসমাজকে অপ্রিয় দৃষ্টিতে, নিন্দার চক্ষে, শত্রুভাবে দেখিতেন না। তিনি ব্রাহ্মসমাজেই জাতীয় জীবনের পুনরুত্থানের আশা ভরসা করিতেন। তাই ইহাকে বিপক্ষে ঘাইতে দেখিয়া প্রাণে গভীর ক্লেশ পাঠতেন। ব্রহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত কথোপকথনের সময়ে একবার বলিয়াছিলেন, “আগনারা (আদি-ব্রাহ্মসমাজ) একটা গলির মধ্যে পড়েছেন, আর সেই গলির একদিকে হিন্দুরা অল্পদূর অত্যাশ্রয়গামী ব্রাহ্মেরা চাপিয়া ধরিয়াছে।” তিনি ব্রাহ্মসমাজকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। ভালবাসিতেন বলিয়াই, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের স্বপক্ষতা করিয়াছেন। যে সময়ে ব্রাহ্মবিবাহবিধি লইয়া দেশ মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, যখন চারিদিকের আপত্তি নিবন্ধন বর্তমান ব্রাহ্মবিবাহ আইন এক কিছুতকিমাকার রূপধারণ করিয়াছিল, সে যোগ্যতায় আপত্তি ও আন্দোলনের দিনে বিভাগসংস্কার মহাশয় আইনের স্বপক্ষতা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে নিজে অস্বল্প অস্তিত্ব দিয়াছিলেন এবং কালীর অধ্যাপক মণ্ডলীর নিকট হইতে আইন প্রার্থী ব্রাহ্মদের প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী ব্যবস্থা আনাটবার জন্য অস্বল্প হইয়া তিনি ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এই :—“আমার বিবেচনার ঐকম আইন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ও আবশ্যিক। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে মধ্যে বিবাহ হইতেছে • • • আমার নিকট ও কতকগুলি পণ্ডিতের নিকট নূতন ব্রাহ্মেরা ব্যবস্থা চাতিয়াছিলেন, আমরা সকলে এই ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছি।” এক সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধী-ভাবনিবন্ধন ডাক্তারের পাক্ষিক সংবাদ পত্র প্রস্তুত হইবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। বিভাগসংস্কার মহাশয় নিজে কয়েক সংখ্যার সুপ্রস্তুত প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হলে ১৭৯১ শকের ১লা আশ্বিনের পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে :—“দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেশবচন্দ্র বিভাগসংস্কার মহাশয় অনেক দিন হইল হুইথানি বর্তমান পত্রিকা বিনামূল্যে তাঁহার সুপ্রস্তুত হইয়াছে।

করিয়া দেন।" ত্রাঙ্ক সমাজের গণনীর ব্যক্তিগণের অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পূজাপাদ রামতত্ত্ব লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি পরমাত্মীয় মনে করিতেন, তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। লাহিড়ী মহাশয় যখন যে বিষয়ে অনুরোধ করিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইত। বিভাগাগর মহাশয়কে কোন কার্যে প্ররক্ত করিতে পৃথিবীতল লোক পরাস্ত হইলেও পূজাপাদ লাহিড়ী মহাশয়ের অনুরোধ ও উপদ্রাব চলিত। কখনও উপেক্ষিত হইত না। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বাবু, পূজাপাদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি সেকালের অনেকের প্রতি তাঁহার যেমন অনুবাগ ও শ্রদ্ধা ছিল, নবাবদের অগ্রণীগণের প্রতিও আবার তদ্রূপ শ্রীতি ও মেহ ছিল। সকল বিষয়ে মতে না মিলিলেও স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। প্রতিবৎসর মাঘমাসের সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র ও তৎসহ একখানি করিয়া গোয়াম তাঁহার নিকট আসিত। পণ্ডিত বিজয়রূপ গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত মেহ করিতেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে পুত্রনির্কিংশেবে মেহ করিতেন, বাবু চুর্ণামোহন দাস মহাশয়কে তিনি যে কত ভাল বাসিতেন তাহার উদাহরণ নাই। যখন চুর্ণামোহন বাবুর শেষ বিবাহ গটরা সর্বত্র স্তুতী ও সমাগোচনা চলিয়াছিল, তখন তাঁহার সমাগোচনিক স্তব্ধস্থানীয় পরম পূজনীয় বিভাগাগর মহাশয় বিবাহ সন্ধ্যাবে পরিভ্রষ্ট হইয়া লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীশ্রীচরিত্রঃ—পরশম্—

প্রিয় ভাতঃ—তোমার মনস্থামনা পূর্ণ হইয়াছে, এটি সত্যম্ যৎপরোনাস্তি আশ্বাসিত হইলাম। আমার আত্মরিক বাসনা ও প্রার্থনা এই, যে কয়েক দিন জীবিত থাক, নবগ্রন্থিনীর সহিত সুখে কালযাপন কর। তোমার নবগ্রন্থিনীকে আমার আশীর্ব্বাদ ও মেহসম্ভাষণ জানাইবে; ইতি—২রা টিষাও, ১২৯৮।

বিভাগাগর মহাশয় একদল উদার ও উচ্চ গ্রাম এবং গভীর সমদয়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তিনি সর্বদা সর্বত্র সকল লোকের স্নেহসাধন করিতে পারিলেই ও সকলকে সুখী দেখিতে পাইলেই পরম কুণ্ঠিত অনুভব করিতেন; তাই চিরদিন মানবের স্বাধীন জন্মের—মুক্ততাবের—পক্ষপাতী

ছিলেন। সমাজ এবং সম্প্রদায়, শাস্ত্র এবং বিধি, যখন তাঁহার অনুকূল, তিনিও তখন তাঁহার পক্ষপাতী, যখন তাহারা মানবের জ্ঞাতি সুখের বিরোধী তিনিও তখন সে সকলের ঘোর শত্রু !

বিভাগসগর মহাশয় নিজের কর্তব্য পরায়ণ লোক ছিলেন, কাজেই অপরকে কর্তব্য কর্ষে উদ্বাসীন দেখিলে, জ্ঞায়পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেখিলে, বাহার প্রতি নেক্রপ ব্যবহার করা উচিত তাহার অন্তর্থা দেখিলে, ক্ষোভ ও অভিমানে অগিয়া উঠিতেন ; এমন কি, এইরূপ কোন কোন ঘটনায় এমন খেঁচাচুড়িও হইত। যাহা তাঁহার মহিমাময় প্রতিষ্ঠার পক্ষে “চাঁদে কলঙ্ক” এর মত—সুত্রো-জ্বল তুমারমণ্ডিত হিমালয়শিখরে ‘ভস্মকণার মত প্রতীয়মান হয়। ৮মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত আশৈশব সৌহার্দ্য হুইবে আবদ্ধ ছিলেন। বিষয় কর্ষে গিপ্ত হওয়ার পব সংস্কৃত বঙ্গ লইয়া মনোমানিস্ত্রের কাব্য উপস্থিত হয়। এই বক্তৃতিব্রহ্মদ্র এতদূর বন্ধি পাইয়াছিল যে, বিভাগসগর মহাশয় তাঁহার সহিত সর্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পর লিখিলেন, তদনুসারে সংস্কৃত বঙ্গ ও তথার মুদ্রিত পুস্তকাদি খটন কার্য শেষ হইলে পর, তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষায় বিভাগসগর মহাশয়ের সম্প্রতিভূক্ত হইয়া যায়। বিভাগসগর মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জননী, স্ত্রী ও বিধবা কঙ্কালঙ্কার প্রত্যেকের মাসিক ১০ সাহায্য করিতেন। তাহারা অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন মন্দের সময়ে অত্যন্ত ক্রোশ পাঠিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ব জামাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় শিশুশিক্ষায়, তর্কালঙ্কার পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হইতে পারে, এই বিশ্বাসে বিভাগসগর মহাশয়ের নিকট পুস্তকাদি তর্কালঙ্কারের মধ্যমা বিধবা কঙ্কালঙ্কার নামে লান চাচিবামায় “বিভাগসগর মহাশয় প্রকৃত লানবীরের পরিচয় দিয়াছিলেন।” শিশুশিক্ষায় চাচিবামায় তিনি বলিলেন :—“তথাক্ত.” *

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, এই “তথাক্ত”র অন্তর্থা হইল কেন ? বিভাগসগর মহাশয়ও বলিতেছেন, “আমি যোগেন্দ্র বাবুকে বলিলাম, কুম্ভমালাকে বলিবে আমি তাহার প্রার্থনা অনুসারে শিশুশিক্ষার তিন ভাগ তাহাকে দিলাম。” †

* বিদ্যুত লাত সম্বন্ধে বিবরণ, ১১ পৃষ্ঠা।

† বিদ্যুত লাত সম্বন্ধে, ১০ পৃষ্ঠা।

উত্তরপক্ষের কথাই, এক। তবে কি কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটয়াছিল? বিভাগসগর মহাশয়ের “নিষ্কৃতি লাভ প্রায়স” এবং যোগেন্দ্র বাবুর “নিষ্কৃতি লাভ প্রায়স বিকল” এই উত্তর পুস্তিকা পাঠ করিয়া আমাদের যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যোগেন্দ্র বাবুর অতিবাস্ততাই বিভাগসগর মহাশয়ের মত পরিবর্তনের কারণ। যাহা হউক যোগেন্দ্র বাবুর বাস্তবতা ও বিরক্তিকর ব্যবহারে বিভাগসগর মহাশয়ের স্থির-প্রতিজ্ঞার যে বিপর্যয় ঘটয়াছিল, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। তিনি মুখ হইতে যে কথা বাহির করিয়াছিলেন, শত প্রকারে নিগ্রহ-গ্রস্ত হইয়াও তাহা রক্ষা করিলেই ভাল হইত। কারণ যাহাট হউক, তিনি যে দান করিয়া অথবা দান করিতে চাহিয়া নিজ অভিপ্রায় পরিবর্তন করিয়া ছিলেন, টহা আমাদের পক্ষে অসহনীয়। তবে এই অপ্রীতিকর ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের সাধনা এই যে, তিনি সামান্য কাৰণে নিজের উচ্চির প্রত্যাখ্যান করেন নাই, শুকুত্তর মর্শ্ববেদনার বাধ্য হইয়াই তাহাকে ঐরূপ মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল।

বিভাগসগর মহাশয়ের বৈবয়িক কার্যকলাপ এত নিষ্ঠার সহিত সম্পাদিত হইত যে, তাহাতে কোন প্রকার স্বার্থপরতার লেশ মাত্র স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি দীর্ঘকাল পরে অদাচিত ভাবে স্মরণমেত ৪২১১।/৪ গভর্ণ-মেন্টের প্রাণ্য বলিয়া পরিচোধ করিলেন; এই টাকা গভর্ণমেন্টের প্রাণ্য কি না, তাহা গভর্ণমেন্ট কেবল জানিতেন না এমন মতে, বরং তাহাদের হিসাবপত্র মধ্যে কোথাও ঐ টাকার অনাদায়ের উল্লেখ কিংবা হিসাবে কুল পাওয়া যায় নাই। বিভাগসগর মহাশয় স্বতঃপ্রসূত হইয়া এই টাকা পরিচোধ করিয়া তাহার মনুষ্য, জীবনিতা ও পরস্ব বিষয়ে গোল্ড স্মরণের অত্যাধিকট দ্রষ্টব্য রাখিয়া গিয়াছেন। যিনি চিরজীবন পরস্ব বিষয়ে এতদূর সাবধান হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তাহার কার্যকলাপের প্রতি কেহ অথবা নিকার কাণী মাখাইলে, প্রাণে গভীর ক্রোধের সকার হয়, কিন্তু দেশকালপাত্র বিবেচনায় এ সকল সহ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

অতি প্রাচীন কাল হইতে গ্রীস, রোম, মিসর ও ভারতবর্ষে মানবশরীরজাত বস্তুবীজ হইতে টাকা দিয়া বস্তু রোগ নিবারণের পদ্ধতি (নুমহুধাধান) প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ এক্ষণে বিশ্বাস করেন যে, অতি পূর্বকালে

ভারতবর্ষে গোবীজ হইতে টাকা দিয়া বসন্ত রোগের বহুবিস্তৃতি নিবারণের পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। পরে নানা কারণে এ দেশ হইতে তাহা লোপ পাইয়াছিল। পরিশেষে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগভর্ণমেন্ট এই নিয়ম করেন যে, মানবদেহজাত বসন্তবীজ হইতে টাকা না দিয়া গোবীজ হইতে টাকা দেওয়া প্রোত্বেয়। কিন্তু লোকের কুসংস্কার নিবন্ধন দীর্ঘকাল এই পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত হয় নাই। বিভাগাগর মহাশয়ই বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কৃষ্ণনগর গমন পূর্বক হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয় নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের সহায়তায় দেশে ইংরাজী টাকার প্রচলনে সাহায্য করিয়াছিলেন।

এ দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোক সকল চৈত্র সংক্রান্তিতে দেহের নানা স্থান বিদ্ধ করিয়া সন্ধ্যা সমাপন করিত। কেহ কেহ সর্কাক ক্ষতবিক্ষত করিত! আমরা শৈশবে গল্পীগ্রামে চড়কের সময় এরূপ ব্যাপার অচক্ষে দর্শন করিয়াছি। এইরূপ সর্কাকবিদ্ধ নৃত্যশীল লোকদিগের ক্রধিবাক্ত কলেবর দর্শনে আমরা তরে জড় সড় হহহা থাকিতাম। ১৮৬৪/৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্টের আদেশানুসারে এষ্ট কুপ্রথা রূপিত হয়। বিভাগাগর মহাশয় এই কুর্য্যতির নিবারণে বিশেষ ভাবে গভর্ণমেন্টের স্বপক্ষতা কবিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে বিভাগাগর মহাশয় জামশেদপুর অন্তর্গত লিপ্সিক নগরে সমবেত মনস্বিমুণ্ডলীর প্রদত্ত সম্মানচিহ্নে সম্মানিত হন। সে বহু সম্মানের পরিচায়ক পত্রখানি জাম্বাণ ভাষায় লিখিত।

বিভাগাগর মহাশয় যে কত প্রকারে কত লোকের গুণ সাধনে চিরজীবন নিযুক্ত ছিলেন, তাহার বহুবিস্তৃত তালিকা প্রদান করা নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহার কৃত উপকার স্বরণ করিয়া যে সকল সজদর বঙ্গসন্তান ভক্তিচর্চিত্তিতে তাঁহার পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের এবং অজ্ঞ কোন কোন ভক্তিমান মুসলমানের পূজার নিদ্রালা পুষ্প ছই একটী আমরা এখানে উপহার দিতেছি।

বিভাগাগর মহাশয় অধ্যাপকরূপে কখনও কুত্রাপি বিদ্যার প্রেণ করিতেন না। কিন্তু মাতৃভক্ত মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃভ্রাতৃ-পলক্ষে একটী রোপানিষিত পানশায়ে (সেলাস) নিয়নিষিত রোকটী অঙ্কিত করাইয়া উপহার দিয়াছিলেন। মাতৃভক্ত বিভাগাগর মহাশয় মাতৃভক্ত সন্তানের এই দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। জড়িতে প্রেণ করিয়াছিলেন :—

“পানপাত্র মিবং দত্তং বিদ্যাসাগরশৰ্ম্মণে ।

স্বৰ্গকামনয়া মাতৃগুরুদাসেন প্রক্কয়া ॥”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেহতাজন স্বর্গীয় বাবু কৈলাশচন্দ্র বহু মহাশয় * বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সর্গীয় স্মরণ প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহ করিয়া তুলিয়ে নিম্নলিখিত সংকৃত শ্লোকটী সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বর্গ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন :—

শ্রীমানীশ্বরচন্দ্রোহয়ং বিদ্যাসাগর-সংজ্ঞকঃ ।

ভূদেবকুলসমুতো মূর্তিমদৈবতং ভূবি ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় এষ্ট শ্লোকের রচনানৈপুণ্য দর্শন করিয়া বহুবিধ ব্যাকোক্তির পর শ্রীতি প্রকাশন করিয়াছিলেন । এই সংগ্রহে লিখিত পত্রখানি এষ্ট:—

মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে ছবি বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে, সেই ছবির নীচে লিখিবার নিমিত্ত, উক্ত সংকৃত শ্লোক বিয়চিত হয় । ছবির নীচে শ্লোক লিখিত এবং ছবি কাটা হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখাইতে পটয়া গিয়াছিলাম । তিনি দেখিয়া, তাঁহার নিজ অভ্যস্ত সসিকতা সহকারে কহিলেন, “শ্রীমানীশ্বরচন্দ্রোহয়ং” ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর নাই । “শ্রীমান” না হইলে, কি এমন উড়্বেচকারীর রূপ হয় ? “মূর্তিমদৈবতং ভূবি” এ কথার আর প্রতিবাদ নাই । সাক্ষাৎ দেবতা না হইলে, এমন কর্ত্তব্যোগ আর কাহার ভাগ্যে ঘটয়া থাকে ? এইরূপে আমার শ্লোকের ঢীকা করিয়া, পরিশেষে নিজ মহোদ্যাক্ষ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, “তোমরা যে আমাকে স্নেহ করিয়া থাক, ইহাষ্ট আমার জীবনের লাত ; আমি অবতার হইতে চাহি না ।”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বাহাদুর বনিষ্ঠতা ছিল, আমিও তাঁহাদের অকৃত্রিম, ভরসা করিয়া এ কথা কহিতে পারি । আমি তাঁহার জীবনের অনেক দৈনন্দিন ঘটনা অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । তাহাতে তাঁহাকে মানবসেবধারী দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি । বাবু

চতুর্চরণ, আপনার পুস্তক, বিভাগাগরের সেই দেবতাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইরাছে, ইহাতে পরমাণ্যায়িত হইরাছি এবং মুক্তকণ্ঠে আপনাকে ক্ষম্যবাদ দিরাছি ।

খুলনার নৈহাটি,)
কৈলাস-কুটার ।)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু ।

কবি মধুসূদন “বীরাজনা কাব্য” রচনা করিয়া তাহার মঙ্গলাচরণে লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

মঙ্গলাচরণ—বঙ্গকুলচূড়া—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর মহাশয়ের চিরস্মরণীয় নাম—এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপ—স্থাপিত করিয়া কাব্যাকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট—যথোচিত সম্মানের সহিত—উৎসর্গ করিল, ইতি সন ১২৬৮ সাল, ১৬ই ফাল্গুন ।

তৎপরে বঙ্গের অগ্রতম সুপ্রসিদ্ধ নাটককার ও কবি, রাগ দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর মহাশয় তাঁহার রচিত “দ্বাদশ কবিতা” নামক গ্রন্থের বিরোভাগে, নিম্নে প্রদত্ত, উৎসর্গ পত্র স্থাপন করিয়াছেন :—

স্বদেশানুরাগী দীনপালক বিভাগাবিশারদ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর মহাশয়

পরমারাধ্যবরেণু ।

মহাশয়,

কল্পনা কাননে প্রবেশ পূর্বক যত্ন সহকারে কয়েকটি কবিতাকুতুম্ব চরন করিয়া “দ্বাদশ কবিতা” নামে একছড়া মালা সঞ্চলন করিয়াছি ! আপনি বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়। ভক্তিসহকারে মালা ছড়াটি মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলাম। যদি যোগ্য বিবেচনা করেন, আপনি তনয়ার করে দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন। ইতি

দেহাভিলাষী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র ।

“পলাশীর বৃদ্ধ” নামক কাব্যশিরে কবির নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন :—

“দরার সাগর—পূজ্যতম—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঐশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর ।

দেব !—যে বৃক ছঃবের সময়ে অশ্রুক্ষেপে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই বৃক আপনাব শ্রীচরণে উপস্থিত হইল ; কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদে, ততোধিক আপনার অমুগ্রহে, আজি তাহার বন প্রসন্ন, ক্ষদ্র আনন্দে পরিপূর্ণ। আপনার দরার সাগরের বিন্দুমাত্র দিকনে দরিত্রতা-দাবানল হইতে যেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কানন-প্রসন্ন একটা কুসুম কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল ; এই কারণ তাহার এত আনন্দ। বজ্রকবিরত্নগণ স্বীয় মানস-উজানজাত যে চিরজ্বলিত কুসুমবাশির দ্বারা আপনার ভারতপূজা পবিত্র নাম পূজা করিয়াছেন, আমি তদ্রূপ পবিত্র পরিমলবিশিষ্ট কুসুম কোথায় পাইব ? আমার ক্ষদ্র—কানন আমার উপহার—বনকুল। কিন্তু মহর্ষিগণ পারিজাত কুসুমে যেই দেবপদ অচ্চনা করেন, দরিত্র-চক্ৰবর্ত্ত অপরাজিতাও সেই পদে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। আমার এটমাত্র সাহস—এটমাত্র ভরসা।

১লা মাঘ সন ১২৮২ ।

আপনার চিরানুগত,

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন ।”

শ্রীযুক্ত গিৰিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত “সীতার বনবাস” শীর্ষক কাব্য গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে লিখিত হইয়াছে :—“উৎসর্গ পত্র—পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঐশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর মহাশয় শ্রীচরণেষু।—গুরুদেব—দীননাথ।—মাহুড়াবা জানিনা বলা, ভাল নয় মন্দ, মহাশয়ের “বেতাল” পাঠে বৃন্দলাম। আচার্য্য। আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি ॥”

কলিকাতা বাগবাড়ার, মাঘ ১২৮৮ ।

দেবক,

শ্রীগিৰিশচন্দ্র ঘোষ ।

তৎপরে আর এক জন প্রবন্ধকার তাঁহার রচিত কোন একখানি গ্রন্থের শিরোনামে লিখিয়াছেন :—“উৎসর্গ—লোকসেবারতরত ও অশেষ গুণসম্পন্ন-পণ্ডিত পুত্ৰ—শ্রীযুক্ত ঐশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর মহাশয়ের পবিত্র করকমলে জক্তি, শ্রীতি ও প্রাণের সন্মিলনের চিহ্ন স্বরূপ এই প্রবন্ধখানি উপহার প্রেরিত হইল।”

বিপন্ন রোগগ্রস্তপাশ্রস্ত ও অনাহাররুক্তি হুঃখী নরনারীমণ্ডলী তাঁহাকে “মহাব সাগর” উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

গভর্নমেন্টও তাঁহাকে সংস্কারপ্রিয় হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিনায়ক—মুখপাত্র বলিয়াই স্বীকার করিতেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে প্রথম সম্মানের চিক্সরূপ প্রশংসা-পত্রে অতি স্পষ্ট ভাষায় গভর্নমেন্ট এই কথাই উল্লেখ করিয়াছেন :—ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে, রাজ-প্রতিনিধি ও গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের আদেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয়কে বিধবাবিবাহ পক্ষীয় দলের অগ্রণী এবং সমাজসংস্কারপ্রিয় হিন্দুগণের পরিচালক বলিয়া এই প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতেছে। (স্বাক্ষর) রিচার্ড টেম্পল। * তৎপরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে, সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা গভর্নমেন্ট বিভাসাগর মহাশয়কে রাজসম্মানে অধিকতর সম্মানিত করেন। † ইহার পর স্বর্গীয় ভারতরত্ন মহাশয়ের অতিপ্রিয় ৬ উপদেশে গভর্নমেন্ট দেশীয় অধ্যাপক মণ্ডলীর মধ্য হইতে যোগ্যতর ব্যক্তি নির্বাচন পূর্বক “মহা-মহোপাধ্যায়” রূপ জম্কালা উপাধি দানের ব্যবস্থা করেন। ভারতরত্ন মহাশয় সর্বপ্রথমে বিভাসাগর মহাশয়কে এই উপাধি সম্মানে অলঙ্কৃত করিতে কর্তৃপক্ষ্যরূপে পরামর্শ দেন, তদনুসারে বিভাসাগর মহাশয়ের নিকট ঐ উপাধিদানের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে পর, তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া “মহামহোপাধ্যায়” মহিমাবিত্ত হইতে অসমর্থতা জ্ঞাপন পূর্বক অব্যাহতি লাভে কৃতকার্য হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন “যাহা চাপান আছে ফিরাইয়া লইলে রক্ষা পাই, এই অসুস্থ অবস্থায় প্রত্যেক দরবারে ‘দাঁড়িতে পারিব না’ বলিয়া পত্র লিখিতে ও ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠাইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।”

* To Pundit Javara Chandra Vidyasagara in recognition of his earnestness as leader of the widow-marriage movement, and position as leader of the more advanced portion of the Indian Community. Richard Temple.

† Grant of the dignity of a Companion of the Order of the Indian Empire. To Pundit Javara Chandra Vidyasagara.

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

—•—•—

ধর্ম্মমতে বিদ্যাসাগর ।

অনেকের ধারণা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল না । কিন্তু আমরা তাঁহার সহিত এই বিষয়ে কথাবাত্তা করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এবং তাঁহার আচার আচরণ হঠতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এতরূপ বোধ হয় যে, তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী লোক ছিলেন । তবে তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস, সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোন এক পদ্ধতির অধীন ছিল না । হৃদয়তরঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার নিত্য জীবনের আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আত্মবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান গ্রন্থের লক্ষণের পরিচয়ও কখন পাওয়া যায় নাই ।

এক অনাদি অনন্ত পুরুষ স্রষ্টারূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পূর্ণরূপে পরি-বাস ও প্রকাশিত রহিয়াছেন, তাহাবট মঙ্গল নিয়মে বিশ্বব্রাহ্মা নিয়মিত ; জীব সকল তাহা হঠতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে, আবার কাল পূর্ণ হইলে তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইতেছে, মহাতারতকার মহর্ষি, ব্যাস কর্তৃক অভিষাক্ত এই হৃদয়তরঙ্গ ধর্ম্মপুত্রে বিশ্বাস করিতেন । বিশ্বাস করিতেন বনিরাই পূজাপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ন্যেযুক্তমে উদ্ভাসিত ধর্ম্মাঙ্গোদানে যখন ব্রাহ্ম সমাজ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছিল, সেই সময়ে তিনি জীবনের প্রথম উত্তম ও আগ্রহ ব্রাহ্মসমাজের সেবার নিয়োগ করিয়াছিলেন । তিনি নিজে আত্ম-দের নিকট বলিয়াছেন যে, “মান্যপ্রকার মতভেদে নিযুক্তন যখন অগ্নির সজ্জাটন হঠতে লাগিল, তখন আর সেই সকল গোলোঘোষের মধ্যে থাকিয়া অশান্তি বৃদ্ধি

করিতে আমার প্রযুক্তি হইল না। ব্যক্তিগত মতভিন্নতার অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া আমি আস্তে আস্তে বিদায় লইলাম। এ ছুনিয়ার একজন মাদিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। লোককে বুঝিয়ে শেখটা কি ক'রাস্যে পড়ে যাব? একতো নিজের কত শত অজ্ঞার কাজ করিয়া নিজের পাপের বোঝা ভারী করিয়া রাখিতেছি, আবার অজ্ঞকে পথ দেখাইতে গিয়া তাকে বিপথে চালাইয়া কি শেখটা পরের অজ্ঞ বেত খাইয়া মরিব? নিজের অজ্ঞ বাই হোক, পরের অজ্ঞ বেত খেতে পারবো না বাপু। এ কার্য্য আমাকে দিবে হবে না। নিজের সেমন বুঝি, সেই পথে চলিতে চেষ্টা করি, পীড়াপীড়ি দেখিলে বলিব, “এর বেশী বুঝিতে পারি নাট।”

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোককেই তিনি অন্তর্ভাবন সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত ভাণ বাসিতেন। তিনি একবার বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বোধোদয় সম্বন্ধে বলেন, “মহাশয়, অনেক আমার নিকট বলেন, বিজ্ঞানাগর মহাশয় ছেলেদের অজ্ঞ এমন সুন্দর একখানি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন কথা নাট কেন?” বিজ্ঞানাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “যাহারা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাহাদিগকে বলিও, এটোবার বে বোধোদয় ছাপা হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।”^{*} ইহার পরবর্তী সংস্করণ হইতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা পাঠ বোধোদয়ের সন্নিবিষ্ট হইল। নিজ ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ হইলে, তাহার মত শিক্ষার সুন্দর, বালকগণের পাঠ্যপুস্তকে ঈশ্বর-বোধক পাঠ সন্নিবিষ্ট করিতেন না। বোধোদয়ের মতট তাঁহার ধর্মমত। গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, বিজ্ঞানাগর মহাশয় অতি প্রবল ধর্মবিশ্বাসবিশিষ্ট লোক ছিলেন, কিন্তু কাহাকেও নিজের ধর্মমত কিংবা বিশ্বাস দেখাইতে কিংবা জানিতে দিতে চাহিতেন না। ধর্মমত ও বিশ্বাস সর্বদাই গোপন করিয়া চলিতেন। গোস্বামী মহাশয় ধর্মপ্রচারকের ভ্রাত গ্রহণ করিলে পর বিজ্ঞানাগর মহাশয় একদা তাঁহাকে

* আশেবা শব্দীয় গোবিন্দ মহাশয়ের নিকট এই বৃত্তান্তটি শুনিয়াছি।

বলিয়াছিলেন, “তুমি নাকি কি একটা হয়েছ ?” এই প্রচারক হওয়াটাকেই তিনি একটা বিভীষিকা মনে করিতেন। তিনি মনে করিতেন, প্রচারক হইলে, উপ-দেষ্টা হইলে মানুষের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হয়। তাই গোদানী মহাশয়কে ঐক্লপ বলিয়াছিলেন। একদা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক শ্রীমুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয় গিটী কালেক্টরের বর্তমান অধাক্ষ শ্রীমুক্ত হেরবচন্দ্র মৈত্র এম্. এ, মহাশয়ের পিতা ৮ চাঁদ মোহন মৈত্র মহাশয়কে বিভাগাগর মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বাহুড় বাগানে বিভাগাগর মহাশয়ের বাটীর চারি পাশে অন্ধ ঘাটীর উপর খুরিয়া ফিরিয়াও বাড়ী বাহির করিতে পারেন নাই। পরে বন্ধ মৈত্র মহাশয় কাছাকেও কাছাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীর সন্ধান করিয়া লন। বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে মৈত্র মহাশয় ঐ বিপদবাস্তা জ্ঞাপন করিলে পব বিভাগাগর মহাশয় পথ-প্রদর্শক সঙ্গীটার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যেই তুলিলেন যে পথ-প্রদর্শক বাহুড় বাগানেই বাস করেন, এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক, অমনি চমকিত ও কৃত্তিত ভাবে বলিলেন “নিকটের ঐ বাড়ীতে তুমি বাস করিয়া বন্ধকে আমার বাড়ীতে আনিতে এত বেগ দিয়াছ, তবে, তুমি মানুষকে কি করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেছ ? এথেন থেকে এথেনে যখন তোমার এত গোলযোগ, তুমি সেট অজানা পথে কেমন করে লোক চালান পাও ? আমি বুঝছি, তুমি শু বাবসা দ্বারা ত্যাগ কর। ও তোমার কণ্ঠ নয়। বাব জানা পথে এত গোল, সে অজানা পথে না জানি লোকের কত দুর্ভাগ্যই করিয়া থাকে। তুমি বাপু ও কাজ আর করো না।” এই বিক্রমের কথা শুনি হঠাৎ তাঁহার ধর্মমত বিষয়ক ধারণা যে” স্মরণ ভাবে বুদ্ধিতে পাবা যায়। তিনি যে ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না, তাহা তাঁহার নির্জনপরি যোগিসদৃশ সূক্ষ্ম ৮ কালীকৃত্ত মিত্র মহাশয়ের সহিত গভীর আত্মীয়তা হইতেই বুদ্ধিতে পাবা যায়। বিভাগাগর মহাশয় জালা বরণায়র সঙ্গারের ভীত তিক্ততা পরিহার মানসে বাগাসতে মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে অনেক সময় কালব্যাপন করিতেন, এবং তাঁহার নির্জন কূটরে নিষ্ঠাপূর্ণ তপস্যার সুব্যতাসে অনেক সময়ে স্নেহে বাস করিতেন। কিন্তু সময়ে সময়ে সীলকে বিধাতার প্রেরিত গভীর আক্ষেপ ও আত্মকোপ প্রকাশ করিতে তুলিয়াছি। নানাদেশীয় অসংখ্য মরনারীসহ “স্তর জন লয়েল” নামক তাঁহার থানি যখন

জলদয় হন, তখন তিনি আমাদের সমক্ষে গভীর মনস্তাপ সহকারে সাক্ষরনয়নে বলিয়াছিলেন “ছনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর? যে নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্র ডুবাইলেন! আমি বাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলালয় হইয়া কেমন করিয়া এই ৭০০।৮০০ লোককে একত্র এক সময়ে ডুবাইয়া ধরে ধরে শোকের আগুন জালিয়া দিলেন? ছনিয়ার মালিকের কি এই কাজ! এই সকল দেখিলে, কেহ মালিক আছেন বলিয়া সরাসা বোধ হয় না।” সময়ে সময়ে তাঁহার মুখে এইরূপ তীব্র গভীর আক্ষেপোক্তি শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরবিশ্বাসবিহীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু গেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, এইরূপ নিদারুণ মর্ষণীভায় ঈশ্বরের অনেক ভক্তসন্তান অন্তরের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিবার সময় এইরূপ ভাবের পরিচয় দিয়া ফেলেন।

বিভাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত প্রণয়নার্থ যে সকল পত্রাদি আমাদের হাতে পড়িয়াছে তাহার সকলগুলিতেই “খ্রীষ্টিয়ঃ শরণম্” লিখিত আছে। তিনি কেবলমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হইয়া কোন কাজই করিতেন না। বাহা নিজস্বদের অনুমোদিত, তাহাই অসঙ্কোচে সম্পন্ন করিয়াছেন।

অনেকে অনেক সময়ে তাঁহার ধর্মমত জানিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মবিষয় সহজে কাহাকেও স্পষ্টরূপে নিজ অভিপ্রায় জানিতে দিতেন না। প্রায়ই বেত খাইবার গল্প এক ঐরূপ আনন্দজনক রহস্যের উপর দিয়া প্রেক্ষারীতির প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কোন প্রেতভাষন প্রিয় জনের সনির্বন্ধ অনু-
 'রোধ উপেক্ষা করিতে না পারিলেই, নিজের প্রকৃত মত প্রকাশ করিতেন। একবার তাঁহার প্রেতভাষন ডাক্তার খ্রীষ্ট অমূল্যচরণ বহু মহাশয় তাঁহাকে ধর্মমত বিষয়ে প্রকৃত তর্কবিজ্ঞান হইয়া অনেক অমূল্য বিনয় করার শেষ বলিয়াছিলেন, “গীতার উপদেশ অনুসারে চলিলেই ভাল হয়।”

রামকৃষ্ণ পরমহংস ধর্মগতপ্রাণ সাধুগণের সন্ধান লাভে বড়ই সুখানুভব করিতেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে এরূপ ধর্মনিরত সাধুগণের সঙ্গে মিলিত হইতে দেখিয়াছি। একদা তিনি শিষ্যবর্গকে বলিলেন “একবার বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব।” শিষ্যবর্গ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, “বিধাতার কৃপা ও বিধাতার তত্ত্ব তির

তৎসমুদ্র মহাপুরুষের অভ্যাগত হয় না ।” অনন্তর একদিন অপরাহ্নে বিভাসাগরকে দেখিতে আসিবার ব্যবস্থা হইল । পরমহংস আসিবামাত্র বিভাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সমাধুয়ে গ্রহণ করিবার অস্ত্র যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি পরমহংস বিভাসাগর সমীপে গৃহস্থলে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “খানা ডোবা খাল বিল পার হইয়া এইবার সাগরে আসিয়া পড়িলাম ।” প্রকৃত্তরে বিভাসাগর মহাশয় বলিলেন, “এসে পড়েছেন, আর ত উপায় নাই, তুই এক ঘটা নোনা জল তুলিয়া লইয়া যান, এ সাগরে নোনা জল ভিন্ন আর কিছুই পাইবেন না ।” পরমহংস বলিলেন, “সাগর ত কেবল লবণের নহে, কীর সমুদ্র, দধি সমুদ্র, মধু সমুদ্র প্রভৃতি আরও ত অনেক সমুদ্র আছে ! আপনি ত আর অবিভার সাগর নহেন, আপনি বিভার সাগর । আপনাতো রক্ত লাভই হইয়া থাকে, যখন আসিয়াছি তখন রক্তই লইয়া যাইব । নোনা জল কেন তুলিব ?” এইরূপ কথা কাটাকাটির পর পরম্পরের কথাবার্তা খুব অমিয়া গেল, আলাপও বহুক্ষণ ধরিয়া হইল । নিকটস্থ সকলে সে আলাপে পরম তৃপ্তি অনুভব করিলেন ।*

তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক পরিচয় দিয়া আমরা বিষয়ান্তরে অগ্রসর হইব । তিনি একদিন কয়েক জন বন্ধুর সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে অখিলদ্বিন নামে এক অন্ধ ও খল্ল ককির একটা গান করিতে করিতে যাইতেছিল । গানের প্রথম চরণ “কোখার ভূলে রয়েছ ও নিঃশব্দ” শুনিবামাত্র তিনি তাহাকে ডাকাইলেন । সে ব্যক্তি আসিলে, তাহাকে বসাইয়া ঐ গানটা আড়োপান্ত পুনঃপুনঃ শ্রোণ করিয়া শুনিলেন । যতক্ষণ গান শুনিয়াছেন, ততক্ষণ অবিরল ধারে অশ্রুবিসঞ্জন করিয়াছেন । গান শেষ হইলেও অনেকক্ষণ নীরবে সঙ্গীতজাত ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন । তাহার পর সেট লোকটাকে বোধ হয় † আট আনা দিয়া বিদায় করিলেন এবং তাহাকে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিয়া দিলেন । আমরা বহু অনুসন্ধানে এই •

* এই বিষয়টী আমরা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি ।

† কারণ সে অনেক দিনের কথা, সে লোকটি বলিতে পারে না এক টাকা কি আট আনা ।

ককিরকে পাইয়া অনেক সাধ্য সাধনার পর কিছু বেশী পরয়া দিয়া গানটী •
লিখিয়া লইরাছি। সে ব্যক্তি বলিল, “বিভাসাগর বাবু আমাকে বড়ই ভাল
বাসিতেন, আর এই গান শুনিয়া খুব খুসী হইতেন। তাঁহার নিকট অনেক
পরয়া পাইরাছি।”

* ১। কোথায় তু লে রয়েছ ও নিরঞ্জন মিলন কর্কে রে কে,

তুমি কোন খানে যাও কোথায় থাক রে মন অটল হয়ে,

কোথায় তু লে রয়েছ— - ।

২। তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি ঝাঁড় আপনি মাঝি,

আপনি হওয়ে চন্দনগারজ*, আপনি হওয়ে নাচের কাছ,

আপনি হওয়ে হাটল মেঠা ।

৩। তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা,

আপনার নামটা রাখা কোথা, সে নাম জনমে গাঁথা,

আমার পোস্টফ্রিটাম বাড়লে বলে সে নাম তুলব নংবে গ্রাণ গেলে ।

৪। তুমি আপনি অসার আপনি হও সার,

আপনি হওয়ে নদীর ছায়া, আপনি নদীর কিনারা,

আমি অগাধ তলে দূব জাতি বাই, সে নাম তুলব নংবে গ্রাণ গেলে ।

৫। আপনি ভাবা আপনি সারা, আপনি জর আপনি যদা,

আপনি হওয়ে নদীর পাড়া অথবা আপনি হওয়ে অশান কঠা গো,

আপনি হওয়ে জলের মীন, ও নিরঞ্জন তোর কোথায় গো সাক্ষর,

আমি ভেবে চিন্তে হলেম কণৈ ।



પણી - દિનચણી દ્રવી ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।



স্বর্গারোহণ ।

নব্য ভারতের পরম গৌরবত্বল বঙ্গজননীর বীৰপুত্র ঐশ্বরচন্দ্রের জীবন গীতা শেষ হইয়া আসিল । বিধাতার বরপুত্র ঐশ্বরচন্দ্র সংসার-সংগ্রামে জীবনের মহাএত উদ্দ্যাপনে, জীবনের বিন্দু বিন্দু ব্যয় করিয়া একপে মজা-পরনের সমীপে উপস্থিত হইলেন । তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির ঠিক একবৎসর পূর্বে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী দিনময়ী দেবী ছুরারোগা রক্তাতিসার রোগে একবারে শয্যাপ্ত হইলেন । ১২৯৫ সালের ১লা ভাদ্র সন্ধ্যার পর পতি, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতি বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজনের সেবা ও সমারম্ভে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তও সুখে কাটিয়া সকলের অশ্রুসারাদিক্ত হইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন । সংসার জীবনে নানা বিষয়ে সামান্ত সামান্ত ঘটনার অনেক সময়ে নানাপ্রকার অশান্তি ভোগ করিতে শুইয়াছে । এই সকল স্বরণ করিয়া প্রেমিকবর বিজ্ঞানাগর মহাপুত্রের প্রাণে বিচ্ছেদের আশ্রয় শত শত স্তনে প্রবল হইয়া উঠিল । তিনি এই পত্নীবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন । এই ঘটনা তাঁহার প্রাণে এতই প্রবলরূপে আঘাত করিয়াছিল যে, তিনি শারীরিক কি মানসিক কোন শক্তিই পুনরায় যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করিতে পারিলেন না ; তাঁহার হৃৎকমর জীবন ক্রমে নিঃশব্দ হইয়া পড়িতে লাগিল । এই সময়ে আমাদের সমক্ষে কতবার গুণ করিয়া বলিয়াছেন, “আমি কেন ? এখন গেলেই হয় ।”

এইরূপ শোকজন্যরিত অবস্থার আরও ছুটি বৎসর অস্বাভাবিক রোগ ভোগ করিতে করিতে কাটাইয়া দিলেন। অনেক সময়েই অনেক দিন শয্যাগত থাকিতেন, এবং উপবাস ও বার্লি ভক্ষণ একমাত্র ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ অসুস্থ অবস্থাতেও যখনই একটু ভাল থাকিতেন, তখনই উঠিয়া আপনার বসিবার আসনে বসিতেন এবং খণ্ডাসম্ভব কৰ্ম্মকালও করিতেন। নিকশী বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

তিনি এতটাই কল্পপ্রিয় ছিলেন যে, এষ্ট প্রকার জীর্ণ জীর্ণ ও অসুস্থ অবস্থাতেও যখনই শরীরে এক বিশু শক্তি অনুভব করিয়াছেন, তখনই তাঁহার পরম প্রিয় শেষ কীষ্টি মেট্রপলিটন কালোজের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেন। এরূপ যাত্রায় কত সময়ে আনন্দা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। • ইহার পর ১২৯৭ সালের শেষ ভাগে তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শাস্ত্রোপনিতির মানস ক্ষীণতের সময়ে করাসডাকার বিশ্রামভবনে বাস করিতে গেলেন। কিন্তু কাম্বন মাসের শেষে বৃষ্টিলেন যে, তথায় শরীর ভাল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইত্যন্তঃ করিতে করিতে চৈত্র বৈশাখ মাস কাটিয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় আসিয়া ব্রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। চিকিৎসকদিগের পরামর্শমত অর্ধেকেন সেবন ভাগ কবা নিত্য আবশ্যক বোধ হওয়াতে হাকিমী চিকিৎসার দ্বারা আস্থ্যায়িত ও অর্ধেকেন সেবন ত্যাগের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ২১:০ দিন একটু উপকার বোধ হইলেও তাহা স্থায়ী হইল না। ক্রমে যতট দিন গত হইতে লাগিল, ততট শরীর দুর্বল ও রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আবার শেষভাগে ডাক্তার হীরলাল বোষ এবং বাবু অমূল্যচরণ বস্তু মিলিত হইয়া রোগ পরীক্ষা করেন। পরে ডাক্তার ম্যাকনেল সাহেবকে আনাইয়া রোগ পরীক্ষা করার যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ নির্দিষ্ট হইল। শেষে অমূল্য বাবু, হীরলাল বাবু, ম্যাকনেল ও বাবু সাহেব মিলিত হইয়া পরামর্শ করেন। কিন্তু পরামর্শে সকলের সংস্থার অঙ্গিল যে, রোগ চরারোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সঙ্কট অবস্থায় চিকিৎসা চলা সম্ভব বলিয়া বোধ না হওয়াতে সাহেব ডাক্তারের রোগীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন

• মেট্রপলিটন কালোজের অধ্যক্ষ এন্. এন্. বোষ মহাশয়ের বাৎসরিক সভার প্রকৃত বক্তৃতা হইতেও কৃত।

নাই। মধ্যে কয়েক দিন অমূল্য বাবুই চিকিৎসা করেন। পরিশেষে পরাকর্ষ করিয়া ডাক্তার সাল্জারকে আনাইয়া হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। সাল্জার সাহেবও পরীক্ষা করিয়া পীড়া গুরুতর—রোগমুক্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প, এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। পীড়া বড়ই গুরুতর হউক, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, দুর্বলতা ও বার্ডকাই আশঙ্কার প্রধান কারণ, তাহাও বলিলেন। অনেক মতান্তর ও কথাবাত্তার পর ডাক্তার সাল্জার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন এবং কিছুদিনের অল্প যেন কিছু উপকার বোধ হইতে লাগিল। নানা প্রকার উপসর্গের মধ্যে হিকাই প্রধান। ইহাই অত্যধিক ক্লেশনায়ক ও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। এই হিকা ঔষধেব গুণে কখন কমে, কখন বাড়়ে, কিন্তু একবারে বন্ধ হইল না। ইহার উপর অর অর অর হইতেছিল, ক্রমে প্রবল হইতে আরম্ভ করিল। অর ও বহুগার জ্বালায় শরীর এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সরল উজ্জল চক্ষু ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া দীনতার পরিচয় দিতে লাগিল। যে মুখে মধুর হাসি সন্দর্শনে কত শত লোক পরিতুষ্ট ও মুগ্ধ হইত, তাহার সেই মুখখী আজ মলিন,—প্রতিদিন বোধ হইতেছে যেন কোন অলঙ্কিত চন্দ্র সে মুখের শোভা ও সৌন্দর্য্য চুপে চুপে হরণ করিতেছে। আবার চলিয়া গেল, শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ ধার। ডাক্তার সাল্জার রোগীর অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইলেন। অল্প কোন চিকিৎসায় আর কোন প্রকার ফল লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নিজের ব্যবস্থামত যে ঔষধ বিভাগাগার মহাশয় পূর্বে ব্যবহার করিতেন, তাহাই পুনরায় আরম্ভ করিলেন। তাতেও একটু উপকার হইল বটে কিন্তু কল দ্বাষ্টী চল না, ক্রমে আসন্ন কালের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে জ্বরের তুষ্টি ও বহুগার হাস হইতে লাগিল। এইরূপ জীবন মুক্তার দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের মধ্যেও তাহার জীবনের শেষ সুহৃৎ পর্যন্ত সুন্দর জ্ঞান ছিল। ইহার দীর্ঘকাল, পরেও সাক্ষাৎ করিতে আনিয়াছেন, তাহান্নিকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া বসিতে বসিয়াছেন, কোন কোন স্থলে অতি কষ্টে হু একটী কথাও কহিয়াছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় দেখিতে আসিলে পর, অতি মিষ্টভাবে তাহাকে নিকটে বসিতে ইচ্ছিত করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী আত্মীয়তার বন্ধন ও ভাষা, ছিল ওওয়ার কারণ শ্রবণ করিয়া কাতর ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহুকষ্টে

তু একটা কথা কহিতে পারিয়াছিলেন। বাগ্মীর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবালা তাঁহার স্নেহের পাত্র। সিভিলিয়ানী পরীক্ষার বয়সের প্রব্রবিরে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের সন্মেলনজন অল্প বিভাগাগর মহাশয়ের স্বপক্ষতার প্রয়োজন হইয়াছিল। বিভাগাগর মহাশয়ই কলিকাতা পুলিশ কোর্টে সুরেশ বাবুর বয়সের নিষেধ করার কর্তৃপক্ষ তাহাই স্বীকার করিয়া লন। সিভিল সার্ভিস হইতে অসময়ে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়া যখন সুরেশ বাবু পুনরায় চারিদিক শূন্য দেখিয়াছিলেন, তখন সেট জুর্দ্দিনে বিভাগাগর মহাশয়ই দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্বক সুরেশ বাবুকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সুরেশ বাবু আপন বুদ্ধি কোশলে চেষ্টা ও যত্নেব বলে এবং প্রাণপণ অধ্যবসায় যোগে যখন রিপন কালেক্টর স্বাধিকারী, তখন বিভাগাগর মহাশয় জীবনের শেষ সীমায় সমুপস্থিত। তখন আর তাঁহার বাক্যক্ষরণ হয় না। সুরেশ বাবু দেখিতে আসিয়াছেন। অতি স্নেহ নিকটে বসিতে ইচ্ছিত করিয়া স্বাভাবিক বহুত প্রিয়তা পবিচালিত হইয়া নিজেব পরিপক্ক আশ্রয় পাই করিয়া টকিতে বলিলেন “তোমাবও এত দীর্ঘ কেশ পক হইল?” এইরূপে যত যত লোক দেখিতে আসিয়াছিলেন, সকলকেই শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত স্নেহ ও সনানব প্রদর্শনে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

সন ১২৯৮ সালের ১৩তম প্রাবণ বিকালে ও সন্ধ্যার পরেও তাঁহার প্রবল জ্বর ছিল। ১৩তম প্রাবণের কাল রাতি ১টা ১৮ মিনিটের সময় বঙ্গজননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া—বঙ্গনীর অঙ্গকারে বিবাদবাণি ঢালিয়া দিয়া—বালানীর গৃহে গৃহে হাহাকার শব্দ তুলিয়া দেহবচ্চর অমরধামের পথে আগ্রসর হইলেন। গৃহে পুত্র কঙ্কারা সম্মানসহ ধূলাবলুষ্ঠিত হইয়া রোদিন করিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজন শোকে হিরণ্ময় হইয়া মৃত্যুশয্যার চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান, অসঙ্গর চুঃখীজন অবলম্বন-শূন্য হইয়া ছিন্ন তরুর স্তম্ভের হৃৎপটে পতিত—কিন্তু অমরধামের পথে কসীর বিছাতের আলো জ্বলিল, দেবতার অমরায়ার সন্তাষণার্থে আগ্রসর হইলেন, দেবকণ্ঠে জরসীত—মঙ্গলধ্বনি—আনন্দকোলাহল উখিত হইল। ইহলোকে বিবাহের যখন অঙ্গকাব—পরলোকের পথে আনন্দের সৌভাগ্যমিনীলীলার সূচনা। একদিকে অমাবস্তা—অস্তমিকে পৌর্ণমাসী বামিনীর জ্যোৎস্নাধারা। একদিকে যগন্মুক্ততা চারিদিক প্রাস করিল—অস্তমিকে পবিত্রজনতাজাত মধুর কলনিদানে চারিদিক

নির্দাশিত হইল ! তাহারই একটি রেখা দৈবক্রমে মর্ত্যধামে বহুগৃহে ঈশ্বরচক্রে
পদন ককে প্রতিভাত হইল । সেই রেখাটি এই :

ঐকিরে সহসা স্বরগ হইতে নামিয়া আসিল পুষ্পকরথ !
পারিজাতফুল করি বরিষণ ঢাকিল কে, যেন গগন পথ !
বিজলী চমকে রথের ঢাকায়, চুড়ায় স্বর্গীয় কেতন ছিল !
আশে পাশে শোভে মণিমুক্তাচয়, বিমল স্বর্গীয় বিভাস খুলে !
চারিধারে তার, চারিটী বালিকা, বিশদ বসনে আবৃত দেহ !
কেহ আনিয়াছে মন্দাকিনী বারি, কেহবা চামর চন্দন কেহ !
অপর্য্যাপ্ত বালার সুকোমল করে স্বর্ণপটে লেখা কি জানি কথা !
ধীরে ধীরে তারা নামি রথ হ'তে দাঁড়াল প্রাচীন তাপস বধা !
চরণ কমলে নোয়াইয়া শির স্বর্গীয় বীণায় তুলিয়া তান,
কি জানি কহিল সবে সমস্বরে স্বর্গীয় ভাষায় গাহিয়ে গান ।

* * * *

'হে তাপসবর ! সাধনা তোমার, হঠাৎ শেষ চলতে তবে,
নিতে ঈশ্বর চল দেবপুংবে দাঁড়ায়ে দূরারে দেবতা সবে !
নিজে কীর্তিদেবী গাথি ফুলমালা করিছে প্রতীক্ষা আকুল মনে,
বসাবে তোমায়ে বসন করিয়া বসে নাট কেহ যে সিংহাসনে ।

* * * *

চল চল দেব স্বরা করে গাই করোনা করোনা বিলম্ব আর,
মন্দাকিনী জলে ধৌত করি দেহ সুচাও, ধরার প্রবেশের তার ।
এ দিব্য চন্দন দেই মাথাটরে চরণরাজীবে আমরা সবে ।
উঠ উঠ দেব ! স্বরা করে রথে সুখা এ বিলম্ব কাজ কি তবে ?
এই স্বর্ণপটে রয়েছে লিখিত তোমার মহিমা অগদ্যকরে,
আছে অনুমতি পরম পিতার তোমার স্বরগে নিবার তরে ।
মিলিয়ে অমনি চারিটী বালিকা ধরিয়ে তাপসে তুলিয়া রথে
আবার ফুলস্রব্দে অঙ্গরে বরবে দেবতা পদন পথে ।

অগ্রসর হয়ে আপনি চক্ৰমা বরণ করিয়া লইল ভার,
 আনন্দ স্বরূপে অমৃত কিরণ অমর নগরে ভাসিয়ে ধার।
 একবিন্দু প্রাণ অনন্তের সনে মিশিয়া লভিল অনন্ত প্রাণ
 বাজিল স্বরগে বিজয় হৃদয়িত গাহিল দেবতা বিজয় গান!

বিভাগাগর মহাশয়ের অমর আত্মা ১৩ই জ্যৈষ্ঠের বিপ্রহারা রজনীর
 নিশ্চলতার মধ্যে মর্ত্যধাম পশ্চাতে রাখিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইলেন।
 রজনী প্রভাত হইবার পূর্বে, বঙ্গবন্ধে শোকস্রব্ধের বিবাদরাশি চারিদিকে
 বিক্ষিপ্ত হইবার পূর্বে, অসংখ্য বঙ্গনরনারীর শোকোচ্ছ্বাসে চারিদিক পূর্ণ
 হইবার পূর্বে, তাঁহার শব স্মরণে লইবার আয়োজন হইল। পথে তাঁহার
 চিরপ্রিয় মেট্রপলিটন কালোজের সম্মুখে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কলিকাতার
 মহানন্দ্রশান নিমন্তলার ঘাটে আত্মীয় স্বজনেরা মৃতদেহ বহন করিলেন। চন্দন-
 কাষ্ঠনির্মিত পর্ষাঙ্গে বিভাগাগর দেহ শায়িত, আর চারিদিকে আত্মীয় স্বজনগণ,
 বিষমমুখে দণ্ডায়মান! প্রভাতে এই দৃশ্যের একখানি ফটোগ্রাফ লওয়া হইলে
 পর অব্যোহিতিক্রিয়ার আয়োজন হইতে লাগিল। সেই সন্ধ্যায় চিত্রে অঙ্কিত
 সুখমণ্ডলে মৃত্যুর ছায়া যে ঘন বিবাদ রাশি ঢালিয়া দিয়াছে, সে দিকে তাকাইলে
 প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়—জন্ম অবশ হইয়া পড়ে—অন্তরে কেমন এক উদাস অগ্নির
 ভাবের সঞ্চার হয়, তাই আমরা সে শায়িত চিত্রের প্রতিলিপি দিতে বিরত
 রহিলাম। ইহার পর চারিদিক অপেক্ষাকৃত সুশরিকৃত হইলে দান করাষ্টয়া
 চিত্রা শয্যায় শয়ন করাইবার পূর্বে যে ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল, তাহারই
 ঐতিহ্য পৃষ্ঠক তোমার সমক্ষে উপস্থিত। রোগে জীবী জীবন্ত মৃত্যুর করাল
 করে বিরক্তিপ্রাপ্ত মুখে, সেই শান্তি ও কমলীয়তা, দেহে সেই দৃঢ়তা, দক্ষিণ হস্তে
 সেই লোকসেবার ভাব পরিস্পষ্ট!

হে বীরবর! আঁধা তোমার কি বলিয়া, কোন প্রাণে আমরা বিদায় দিব?
 তুমি যে অভাগিনী বঙ্গজননীর প্রিয় সন্তান! তুমি যে শিশুশ্রমজীবনের
 অগ্রণী! হে দেব! তুমি চলিয়া গেলে, শিশুশ্রমজীবনের জীবন্ত আদর্শ যে
 চলিয়া যায়! তুমি বিদায় লইলে আদর্শ ছাত্রজীবনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইতে



James S. Gifford

বাক্সালীবাগকগণ যে ব্যক্তি হইবে ! তুমি চলিয়া গেলে মিষ্ট কথায় ভুট্ট করিয়া কে আর হৃৎখী জনের হৃৎখ দূর করিবে ? তাই বলি, তুমি যেওনা,—তুমি আমাবিগকে ছেড়ে না,—তুমি গেলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে বাক্সালার আশা ভরসা, সুখ সৌভাগ্য চলিয়া যাইবে ! তাই বলি, তুমি যদি যাও, তবে বল কোথায় যাইবে ? আমরা সেই সুখের রাজ্যে গিয়া তোমার দেহ মমতা ও মিষ্ট হাসির আলোকে বাস করিয়া সুখে কাল যাপন করি। তুমি ত পরম বিজ্ঞ, তবে কি বুঝিতেছ না, তোমার অভাবে আমাদের কি সর্বনাশ হইবে ? কত শত নিকৃপায় লোক অস্বেচ্ছাভাবে কাতর ক্রন্দনে চারিদিক নিনাদিত করিবে ? তুমি জীবদ্দশায় একদিন অক্লপূর্ণনরনে অভিমানভরে দরিদ্রের মাসহারার পুস্তক খানি আমাদের সমক্ষে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলে, “আমার কি যাবার পথ রেখেছি ? এট এক কাজে আমি আপনাকে এমন জড়িয়ে কেলেছি যে কোথাও যাইবার উপায় নাই।” হে দেব ! তবে আজ সকল কষ্ট কেলিয়া, সকল মারা কাটাইয়া, হৃৎখী জনের হৃৎখ ভুলিয়া কোথায় যাও ! যদি আমাদের ক্রন্দন—আমাদের প্রাণের সজীব তোমাকে ধরিয়া রাখিতে না পারে, তবে :—

“যাও দেব স্বর্গপুর করসে বিশ্রাম !

পাউয়া দেবের দয়া ভুলোনা সকল মারা

অরিও অরিও দেব ভারতের নাম ।

অভাগিনী বক্তাভাষা, করিও মঙ্গল আশা,

বালবিধবার প্রতি হ'য়োনাকো বাস ।

দরিদ্র বাক্সালী গণে, জাগাও জাগাও মনে,

মরণে না হয় যেন চির পরিণাম ।” •

পূণ্যতোয়া ভাগীরথী ! আজ তোমার সুপ্রভাত—তাই তুমি প্রাতঃসমীরণ-সজ্জাধনে আনন্দে নৃত্য করিতেছ ! আজ তোমার পূণ্যানীরে পুস্তকলবণ জীবরচনের মহামূল্য তত্ত্বরাশি ভাসিবে, তোমার তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিবে, তুমি গর্জন্তরে সেই দেবনেতের তত্ত্বকণা লইয়া সাগর সজ্জাধনে বাইবে বলিয়া আজ আনন্দে শিশাহারা হইয়াছ ! সুগুণান্তরে তোমার ললাটে যে স্বর্ণ মুকুট

উঠে না, আজ তাহা পরিধান করিয়া অপূর্ণ স্রীধারণ করিবে বলিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছে ! দেখ যেন এই মহানুভাব রত্নরাশির অনাদর না হয় ! তুমি যে কত প্রাণের আশা ভরসা, কত লোকের সুখ সম্পদ, কত লোকের আনন্দ ও আরাম হরণ করিয়া লইয়া চলিলে, তাহা হরত জান না ! আজ তোমার অসীম সৌভাগ্যের সমাগম দেখিয়া আমরা শত্ৰুদ্বয়ে তোমারই পানে চাহিয়া আছি—অসমর্থ ও অসহায় লোকমণ্ডলী পশুর ভায়, তোমার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে, দেখ যেন কেহ নিরাশ না হয় ! তাহাদের আদরের—পরম বস্ত্রের ঈশ্বরচন্দ্রের তম্বু রাশি পরম যত্নে তোমার সঙ্গম-গর্ভে রক্ষা করিও !

যাহারা শব বহন করিয়াছিলেন, যাহারা সঙ্গে মিয়াছিলেন, তাহাদের খোঁজে আশান ক্রোড়ে শাহিত বিজ্ঞানাগর দেখিবার জন্য যাহারা ছুটিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সাধের পুতুল ভাঙাইয়া দিয়া স্নানসুখে, অশ্রুপূর্ণনয়নে ও শূন্য হৃদয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন । বিজ্ঞানাগর মহাশয় নীরব কাধাগ্রিয় লোক ছিলেন, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহার আত্মস্ফটিকিয়াকাল অল্প কোন শব সমাগত হয় নাই । নানা প্রকার উৎপীড়ন ও নির্ঘাতনমধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে, শেষে আশানে একাকা ভস্মীভূত হইতে পাইয়াছিলেন, ইহাও কণকিৎ সুখের বিষয় । এখানেও তাহার জীবনের স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত ।

১৮ই শ্রাবণ প্রাতঃকালে চিতাঘি প্রজলিত, ও তৎপরে নির্দোষিত ও চিতাভস্ম বিধৌত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে—বাক্সালার জেলার জেলায়—বাক্সালীর গৃহে গৃহে—ভারতবর্ষ বিভিন্ন দেশের লোকের সময়ে এক মহাশূন্যতার সূচনা হইল । ধনী দরিদ্র, চৈতন্য হীন, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলেই সন্তপ্ত-হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে চারিদিক অন্ধকার দেখিল । সমগ্র ভারতবর্ষ বিবাদ পূর্ণ হইল । একদা সমগ্র জনমণ্ডলীর শোকোচ্ছ্বাস ইতিপূর্বে কখনও ঘটে নাই । বিজ্ঞানবীরের চারুগণ পিতৃহীন হইয়াছে মনে করিয়া পাশ্চাত্যগণ করিল, সংবাদপত্র সকল বিবাদের চিত্র ধারণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে লোকের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইল ; চারিদিক ভীষণ হাহাকার ও ক্রন্দনে পূর্ণ হইয়া গেল । বাক্সালার সমাজ-মেয়ের প্রাণবায়ু যে নিঃশেষ হয় নাই, বাক্সালী যে স্তম্ভ-শোকে সমবেত হইয়া সত্য সত্যই কাঁদিতে পারে, বাক্সালী যে বীরপুঞ্জের আত্মবলি দিতে এখনও সক্ষম, তাহার আভাস বিজ্ঞানাগরবিরোধে প্রকাশ

পাইরাছে। বিধাতা কৃপা করুন, এই সুজ্ঞপ্তিশোক হইতে, বীরপূজা হইতে, জাতীয় জীবনের উত্তম হৃদনার সূত্রপাত হউক। বাঙ্গালার জাতীয় জীবনীর পক্ষে পক্ষে বীরচরিত্র লিখিত হউক। বিভাগাগর মহাশয়ের স্বর্ণারোহণে ভারত-সংসারে যে জাতীয় শোক, কোভ ও মনস্তাপের অভিনয় দেখা গিয়াছিল, কোন সহপায়ে তুহা ধরিতা রাখিতে পারিলে, জাতীয় জীবনের গঠন ও সমুন্নত করিবার পক্ষে সে শক্তি পরমোৎকর্ষিত কার্য করিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর শক্তির সম্মিলিত সুরূপে জাতীয় অভিনয় প্রদর্শনের এখনও বহু বিলম্ব আছে, তাই বিভাগাগর বিরোধে ভারতের নানান্যানে সভাসমিতির আহ্বান ও প্রতিচ্ছিন্ন স্থাপনের স্বত্ত্ব স্বত্ত্ব আরোহণ হইরাছে। কলিকাতার গৃহে গৃহে ও বিভাগরে বিভাগাগর জ্ঞানায়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইরাছে, বঙ্গের নানা স্থানে নানা আকারে তাঁহার স্মরণ চিত্র রক্ষা করা হইরাছে। ঢাকার অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকার ধনী দরিদ্র, ছোট বড় সমগ্র সহরবাসীর উৎসাহ ও আগ্রহে এক মহতী সভা আহুত হইরাছিল। বান্ধব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সভাপতিরূপে বিভাগাগর মহাশয়ের বিবিধ গুণের কীর্তন করিয়াছিলেন। সাহিত্যাহুরাণী শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর ঢাকা কাগজে বিভাগাগর-কলারসিন্ নামে মাসিক দশ টাকা একটী বৃত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বর্তমানে সাধারণের উচ্ছ্রাসে এবং বিভাগাগর-ভক্ত শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের আগ্রহে একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইরাছে, কিন্তু বিভাগাগর হেল সুজ্ঞপ্তির জন্ত কেবল এই পর্য্যন্তই কি যথেষ্ট? চুঃখ এট দে, কলিকাতার বিরাট সভার বহু লোকের অঙ্গজালে কেবল আট দশ হাজার টাকা মাত্র সংগৃহীত হইরাছে। যিনি দশ বার লক্ষ টাকা দরিদ্র দেবার ও সমুন্নতানে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, যিনি সনাতন-সংস্কারে, সাহিত্য-চর্চার ও লোকসেবার জীবনদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুজার মূল্য নৈবেদ্যের মূল্য দশ হাজার টাকা মাত্র ॥

প্রাণের অকৃত্রিম স্নেহ স্বত্বকলসের কসিকান নেপোলিটান যখন স্বজন ও স্বজাতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেন্টহেলেনার নিরুত নিবাসে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন বিনা আত্মবলে নীরবে বোনাপার্টের বেহ কবরস্থ করা হইরাছিল, তখন করাসী জাতি জাতীয় গুণতার বৃত্তিতে পারে নাট, জাতীয়

কর্তব্য বুদ্ধির তীব্র ভিত্তিকার ক্ষমতায় পরিণত পারে নাই সত্য, কিন্তু :—
 “তাহার পরলোক প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে যখন তবীর নৃত্যসেইটাকে, সমুদ্র-
 বেষ্টিত সেন্টহেলেনার লোকশূন্য কারানিবাস হইতে দেবদেহের জ্ঞান পবিত্র
 বস্তু জ্ঞানে উদ্ধার করিয়া ফরাশি রাজ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন, তখন ফ্রান্সের
 এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশই এক তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, এক
 শব্দে শব্দিত, এক ভাবে উন্মাদিত এবং একমেহব্যং উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃশোকাতুর
 পুত্রের জ্ঞান হাহাকার করিয়া কঁদিয়াছিল এবং কিবা প্রাণাদে কিবা কুটীরে
 কিবা ধর্ম্মাধিকরণে কিবা প্রেমোদগৃহে যে যেখানে ছিল, সেই সেখানে হইতে
 পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া লোকায়ণ্যের শোভা বাড়াইয়াছিল। তখন
 ফ্রান্সের গ্রাম ও নগর, অরণ্য ও জঙ্গল এক হইয়া গিয়াছিল এবং সেট
 একীভূত, অদৃষ্টের, অদৃষ্টপূর্ণ উন্মাদময় লোকায়ণ্যের উন্মাদিনী শোভা দেখিয়া
 সমগ্র ইউরোপ বিস্মিতকমরে ও ভীত-ভীত ভাবে মাথা নোয়াইয়াছিল।” *
 পরাধীন ভারতে বিভাগসঙ্গর বিরোধে জাতীয় শোকোচ্ছ্বাসের তরঙ্গে তরঙ্গে
 বীরপূজার পুশরাশি নৃত্য করিয়াছে :—“টহা দেখিয়া আমাদের মনে পড়ায়
 আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এতদিনে জাতীয়
 সজীবন কার্য আরম্ভ হইয়াছে। * * * বাহার জন্ত আজ সকলে কঁদিতেছে,
 তিনি যে মহাপুরুষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যিনি এত লোকের চিত্ত
 আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা যে বিশাল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ
 নাই। সাঙ্গর না হইলে কে আর প্রোভাষিনী সকলকে নিজাতিমুখিনী করিতে
 পারে ?” † কিন্তু হুঃখ এই যে, প্রোভাষিনী সকল সাঙ্গরাত্তিরূখে ধাবিত হইয়া
 পশ্চিমধ্যে সামাজিক জটিলতার উত্তপ্ত মরুক্ষেত্রে অকৃত হইল। আমরা জীবন্তে
 মরা হইয়া রহিলাম! বি এক দাক্ষণ অবসাদবিষে আমাদের সর্গাধার অবসর
 হইয়াছে যে, আমরা সহজে উঠিতে, উঠিলে দাঁড়াইতে, দাঁড়াইলে ছুটিতে,
 ছুটিলে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারি না। তাই কত দেশে কত জাতি উঠি-
 তেছে দেখিও আমাদের চেতনা হয় না, আমরা অবসাদ-শকার অবসর ভাবে

* উদ্ধৃত হায় কালী প্রসন্ন বোম বাহাদুর সি, আই, ই, এন্ড কনফিডেন্স ১৯৪ পৃষ্ঠা।

† কবীর বোমেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, লিখিত বীরপূজা।

শারিত হইয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর দ্বার শত প্রকার দুঃখ-দুঃখ দেখিতেছি, এবং বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণতার প্রকাশ বকিতেছি ।

বিধাতা আশীর্বাদ করুন, এই ঘোর অমানিশার ঘন অন্ধকারে “সাগর চরিত” পার্শ্বে বাঙ্গালী পাঠক-স্বয়ং যেন জাতীয় জীবনের লালসা, নিষ্ঠার সহিত কর্তব্যসাধনে অধ্যবসায় এবং বীরোচিত জগৎবন্দীর অহুসরণে প্রবৃত্তির সক্ষম হয় । তাহা হইলে এ জাতি ধন্য হইবে, জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আবল্লা আবার নূতন করিয়া নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতে সক্ষম হইবে ।

উপসংহার।

পৃথিবীর ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন জাতির উত্থান পতনের দ্বারা প্রতিধ্বনিত
যাত্রা। এই জাতীয় উত্থান পতনের মধ্যে বাহারা ইহার উন্নতি সাধনে অথবা
ইহার অধঃপতনে সহায়তা করেন, তাঁহারা লোকসমাজে অনন্তকাল ধরিয়া
নিজ নিজ কৃত কর্মের জন্য পুরস্কার বা তিরস্কারের ভাজন হইয়া থাকেন।
কিন্তু দেহেব শোণিতপাতে, কদরের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের বিন্দু বিন্দু দানে
এবং জীবনের মহামূল্য সময় ক্ষয়ে বাহারা জাতীয় জীবনের গঠন ও সমৃদ্ধি
সাধন করেন, তাঁহারা, বিভিন্ন কৃতি, বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন প্রেক্ষিতির লোকপূর্ণ
এই বহুসংখ্যক সমাজে চিরদিন পরম পুণ্যবীর্যের দেবচরিত্রের লোক বলিয়া অভিহিত,
আদর্শ মানব বলিয়া সমাদৃত। তাঁহারাষ্ট জনসমাজের উন্নতিপথে পরম সহায়
বলিয়া পরিগণিত ও পূজা প্রাপ্ত হন। এতদূন পূজ্য বোধ্য মানব সন্তানের
আবির্ভাব পৃথিবীর সকল জাতিই অসাময়িক গৌরবান্বিত, কিন্তু বর্তমান
সময়ের বলবান ও সৌভাগ্যবর্ধিত জাতি সমাজের উপেক্ষার পাণ্ডা ভাবত-
সন্ধানই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। সত্য, ওয়াশিংটনের নামে
আমেরিকাবাসিগণের প্রাণে কি এক স্বাধীন বৈজ্ঞানিক আলোকের রেখা পাত
হয়, কমনীয়তার কোমল ফোড়ে প্রস্ফুটিত ভাবনিচয়ের আধার ইমার্সনের
নামে প্রকৃতিচর্চাশির নানবন্দ্যেই চিরযুগে, থিওডোর পার্কসের বিখ্যাত
পুস্তককারেব স্বরণে মানব স্ববনতমস্তক, সাময়িক কৃতি কুর্জলতা ভুলিয়া, ফ্রান্স-
বাসিগণ নবা চটোরাগের জয়লাভ। নেপোলিয়নের নামে উদ্ভূত, বর্তমান প্রত্যক্ষ-
বাসিগণের পঞ্চপ্রদর্শক মহাদ্বী কোম্ব্ত ও বেনথামশিক্ষাপ্রবর মহামতি মিল
মানবসমাজের চিরসুখকল্পে পরিণত হইয়াছেন। ধর্মসংস্কারক মহাদ্বী
লুথার আধর্ম্যনা-রাশির নবা হইতে সুউৎসর্গকে উত্তোলন করিয়া নবজীবনের পথে
অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়া পাশ্চাত্য সমাজের মহোপকার সাধন করিয়া
সিয়ারছেন। এ সকলই সত্য, কিন্তু তবুও বলি, ভাবত সন্তানের সৌভাগ্যের
সীমা নাই। তাই বিদেশীর মহাদ্বাদের দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত

নিকটতর আত্মীয় হলে উপস্থিত হওয়া বাউক। স্বরণাভীত কালে বাহারা অনুমিত হইরা আমাদের প্রিয় মাসভূমি ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিয়া-
 গিয়াছেন, তাঁহাদের বিবর ধারাবাহিকরূপে অত্র কথারও উল্লেখ করা অসম্ভব।
 তথাপি একথা বলা নিতান্ত আবশ্যক যে, বাহাদের জাতীয় জীবনের পথে পূর্ণ-
 ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, ত্রৈতার আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের
 চরিত-মাদুরী অলঙ্কিতভাবে আপনা আপনি অন্তরে উদ্ভিত হই এবং রামা-
 রণোক্ত চরিত কাহিনী নীরবে নিশার শিশিরপাতের জায় জাতীয় জীবনের
 স্মৃতিসন্ধান সাধন করে, সে জাতির সোভাগ্যের সীমা নাই। স্বপ্নের ধর্মক্ষেত্র
 কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণে শরশয্যার শারিত মহাহুতব দেবত্রয়ের ত্রাতোদ্যাপন
 ও উপদেশ দান যে দেশের চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়াছে, বাহাদের রাজনীতি,
 সমাজনীতি ও ধর্মনীতির পরিদৃষ্টনে শ্রীকৃষ্ণের জায় মহাপুরুষ আদর্শরূপে
 দণ্ডায়মান, সেই দেশবাসী নরনারীমণ্ডলীর শিখিবার ও শিখাটবার, তুলিবার
 ও তুলনাইবার অনেক অমূল্য রত্ন আপনাদের পর্ণকুটীরের আবর্জনারাশির
 মাধ্যম লুক্কায়িত; এই অস্ত্রই তাহা কোন কোন স্থানে উপেক্ষিত, কোথাও বা
 পরিত্যক্ত আর প্রায় সর্বদ্রষ্ট অনাগত। ঠেংরাধী শিক্ষাপ্রাপ্ত বিক্রমশূলীর
 অনেকের মুখেই শুনিতে পাঠি, রাজা রামমোহন রায় ও বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের
 জায় প্রতিভাশালী ব্যক্তির ঠেংগ ও আমেরিকার জন্ম না হইরা ভারতে কেন
 জন্ম হইল? ইহার সহজ ও স্বাভাবিক উত্তর এই যে, যে দেশ শাক্যসিংহের
 জন্ম-ভূমি বলিয়া চিহ্নিত, যে দেশে শঙ্করাচার্য্যের বিশাল প্রতিভা ও পরাক্রমের
 উৎস উৎসারিত, যে দেশে শ্রীচৈতন্যের ধর্মাকোলনে টলমল করিয়াছে, রঘু-
 মোহনের অনুগত ও কৈবল্যচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র সে দেশ না হইরা অন্য দেশ কেন
 হইবে? ভারতবর্ষের বিশেষত্বের বলে, বঙ্গভূমিক বহু পুণ্যোই, রামমোহন ও
 কৈবল্যচন্দ্র, বেবেত্রনাথ ও কেশবচন্দ্র, বঙ্গজনমীর অঙ্কশোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন।
 বহু শতাব্দীর সাধু সন্ধান, ও কবি তপস্বীর তপতায় কলে রত্নসন পুত্রধন লাভে,
 আমাদের জন্মভূমির অস্তিত্ব সার্থক হইয়াছে।

পূর্বতন মনসী আধা ধ্বিসপের প্রবর্তিত কালবিভাগ অনুসারে সভ্য,
 জ্ঞেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ
 সন্ধানানুগত শ্রীকৃষ্ণ দানবীর রমেশচন্দ্র নর, সি. এস. সি. আই. ই. মহোদয়

এই চারি যুগের সঙ্গে সঙ্গে, এক নূতন ঐতিহাসিক কালবিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ঐতিহাসিক কাল ছয় যুগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা :—১ম। বৈদিক যুগ। ২য়। মহাকাব্য যুগ। ৩। দার্শনিক যুগ। ৪র্থ। বৌদ্ধ যুগ। ৫ম। পৌরাণিক যুগ। ৬ষ্ঠ। রামমোহন রায় যুগ। ইহার প্রত্যেকটাই সুবিবেচনার সহিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেকটাই আরও সমধিক সুবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিতেছে। রামমোহন বর্তমান যুগের জন্মদাতা। ঐহারা দেখিতে পাইবেন, যে, যতপ্রকার চিন্তাশ্রোতে আজ বঙ্গসমাজ প্রাবৃত হইতেছে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল ধারা সকল রামমোহনের জুড় ও সমুদ্রত চন্দ্র-কন্দর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। শাস্ত্র-চর্চা ও ধর্মালোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীর শক্তি সংরক্ষণ ও অন্নহীন কৃষক ও শ্রমজীবীগণের অবস্থার উন্নতি সাধনাদি প্রত্যেক বিষয়ের সহিত তাহার সমান সঘর্ষ রহিয়াছে। তিনি সকল বিষয়েরই যুগান্তরের প্রবর্তক।

মহাছা রামমোহন রায় যে যুগের প্রবর্তক, পূজাপাদ বিভাগাগর মহাশয় সেই যুগের দ্বিতীয় মহাপুরুষ। মাননীয় অজ্ঞ শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিভাগাগর মহাশয়ের বিরোগান্তে মেট্রপলিটন কালেক্টর কর্তৃক আহুত সভার সভাপতিত্বশ্রেণে বলিয়াছিলেন :—বর্তমান কালের সমগ্র অবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মৃত মহাছা, মহাছা রামমোহন রায় ভিন্ন তুলনার অপর কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র পৃথিবীর লোকমণ্ডলীর জাতীর উন্নতি ও ঐশ্বর্যের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। পৌরাণিক আধ্যাতিকার গুনি, ভগ্নদেহ বহু তপস্বী করিয়া গঙ্গা আনিয়া শিঙালোকের তর্পণ করিয়া স্বর্গকণ্ঠের সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মানবজাতির সঙ্গতি সাধনের জন্য বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভকালে যে সকল মহাপুরুষ তপস্বীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের সাধনের বলে মহাজগতের সুখ-সৌভাগ্যের তমসাক্ষর পূর্ণাকাশে সম্পদ-স্বর্ষের ভাবী অভ্যুদয়ের আভাস প্রাপ্ত হইয়া সে সময়ের জ্ঞানিগণ পুলকে পূর্ণ হইয়াছিলেন। যে সময়ে,

* He was second to none except one—The Great Rammoohan Roy.

আমেরিকার মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিন ও পুরুষপ্রবর ওয়াশিংটনের পুরুষকারের বলে পরাধীনতার দৃঢ় সিঁক তর হওয়ার, জাতীয় জীবনের স্রোত কেবল মাত্র একল বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, যে সময়ে পার্কীর ও গ্যারিসন হতভাগ্য কাত্তি ক্রীতদাসদিগের হৃৎখে দুরীকরণমানসে স্বার্থপর লোকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অমর ঘোষণার সূত্রপাত করিতেছিলেন, যে সময়ে ইংলেণ্ডে বার্ক, কল প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদগণ প্রবলের অসুস্থিত বিবিধ অভ্যাসের নিবারণে প্রাণপাত করিয়াছিলেন, যে সময়ে উইলবারফোর্স প্রভৃতি সন্ত্রাস মহাত্মাগণ চর্তুলের পক্ষসমর্থনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে সময়ে বিরাট পুরুষ নেপোলিয়ন সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যক্ষে নির্দেশ করিতে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উত্তোলন করিয়া ধরাকে নীরব করিতে চাহিয়াছিলেন, যে সময়ে কত মত্ত সন্ত্রাস মহাত্মাগণ, পৃথিবীর নানা স্থানে, অসংখ্য মানবসন্তানসমূহের চঃখকরণ ও সুখসাধনে জীবন গণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ভারত-বর্ষে আড়ম্বরের কোলাহল, তামসিক রসরস, ধর্মের নামে অসুস্থিত বিবিধ চর্তুতির পূর্ণ-প্রতিষ্ঠার মধ্যে উদয়চল শিখরে নবদুগের সমাগমসঙ্গীত শ্রুত হইয়াছিল। বিধাতার বিধানে রাজর্ষি রাম-যোহন, সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া ভারতের পূর্ণ প্রান্তে অত্যাশিত হন। তিনি প্রাণপাত করিয়া যে সকল সমসুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন, তিনি অকালে লোকান্তরিত হওয়ার সেই সকল স্তম্ভাশ্রয় অসম্পূর্ণ ছিল, করেকটী বীরপ্রভৃতি বঙ্গসন্তান সেই আরম্ভ প্রত্যের উদ্বাপনভার গ্রহণ করেন।

যে সময়ে ম্যাটিনি ও গ্যারিবল্ডি স্বদেশের উদ্ধারসাধনে বঙ্গপরিচর হইয়াছিলেন, যে সময়ে ডাকটস্‌বারী, ব্রাইট, কব্‌ডেন প্রভৃতি মহাত্মাগণ ইংলেণ্ডে লোকহিতৈষণাপ্রভে নিযুক্ত, যে সময়ে কুমারী কার্পেণ্টার ইংলেণ্ডের পরিভ্রমক দূরক দূরতী ও বাণকবালিকাদিগের চর্তুনা দর্শনে কাতর হইয়া লোক-সেবার আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং জুজটিস প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সকলকাম হইয়া বাসক বালিকাদিগের অস্ত সংশোধন বিভাগ-বিধি (Reformatory School Act) বিবিধ ভর্তুকিতেছিলেন, যখন কুমারী কব্ ও কুমারী সাইট-ইকেল সারীহিত সাধনে কুমারীত্বপ্রহণে প্রস্তুত হইতেছিলেন, যখন কথ সন্মতি আলোকজাগার সিংহাসনারোহণ স্তম্ভের নিম্নরে দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ

মানবসন্ধানকে দাসত্বস্থল হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন, যে সময়ে মানব-দেহতা স্নিকলন নিজ জীবনের বিনিময়ে দাসদিগের স্বাধীনতার সনাকপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শতপ্রকার সামাজিক নিপীড়নে নিগ্রহগ্রস্ত হইয়া বহুবীর জৈবরক্তে ভারতীয় রমণীকুলের সুখসাধনে জীবনপণ করিয়া সময়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

একদা যে শুণে, যে বীণা ও বীরত্বের বলে, যে সাহস ও পুরুষকারের পরিচয়ে তিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম এক ব্যক্তি হইয়াছিলেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব।

সম্পন্ন লোকের উপবন ও লতা-মণ্ডপে ভূত্যের জল-সেচন ও পরিচর্যা প্রাদুর্ভূত শোভনলব্ধ মার্শাল নীল *, স্তর ওয়াল্টার কট *, কিংবা ডিক্টোরিয়া রোজের * জ্ঞান তিনি বহু সমাদরে লাগিত পালিত হন নাই। অযত্ন-সঙ্কত বনকুমুম যেমন আপনি উঠে, আপনি ফুটে, বিভাগসাগর মহাশয় তরুণ বীর-সিংহের গ্রাম্য-গৃহে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনা আপনি কুটীরা উঠিয়াছিলেন। দরিদ্র পিতা ঠাকুরদাস কিরণ ক্রেশে তাঁহাকে লালন পালন ও শিক্ষাদান করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনার বিষয়ে অভিভূত হইতে হয়, সে দুঃখ-কাহিনী শ্রবণে অশ্রু সংবরণ অসম্ভব। অপরিচিত দরিদ্র বালক বোবনে পদার্পণ করিয়া, সংসারে প্রবেশ করিয়া, স্ত্রুখ সংস্রাগ ও মান সঙ্কমের অধিকারী হইয়া প্রায়ই “ধরাকে শরা জ্ঞান” করে, কিন্তু বিভাগসাগর মহাশয়ের জীবনে এরূপ অঘটন কখনও ঘটে নাই। তিনি বহুবিচার আধার হইয়া, প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, প্রচুর ধন, সম্পদ ও সম্মানের অধীশ্বর হইয়া, একদিন এক যুহুর্ন্তের জন্তও বিকৃত হন নাই যে, তিনি বীবসিঃবাসী দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। পর্ণকুটারে শৈশব কাল কাটাইয়াছিলেন, এটা সর্বদাই দৌরবভরে স্মরণ করিতেন। একাহার ও অনাহারে ছাত্রজীবন বাপন করিতে হইয়াছিল এ কথাই উল্লেখে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ তাঁহার সময়ে তাঁহার অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত লোক অতি অল্পই ছিলেন।

আমরা আজ যে বাঙালা ভাষা পাঠ করি এবং যাহার অজ্ঞাতিক আলোচনার ভূমি অহুঃব করিয়া থাকি, ইহার জন্ত আমরা তাঁহারই নিকট বিশেষভাবে

* এগুলির প্রত্যেক ক্রীট ভিন্ন ভিন্ন ভগবিশিষ্ট খেলাপ পুস্তক।

কনী । তিনি এবং তাঁহার সহযোগী ৮ অক্ষয়কুমার দত্ত বর্তমান বালালাভাষার সৃষ্টিকর্তা । উভয়েই বালালা সাহিত্যের বেরূপ পরিচর্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে বালালা সাহিত্য বঞ্চিত হইলে, ইহার একরূপ স্বরিতপদে উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়া বহু বিলম্বসাধ্য হইয়া পড়িত । সাহিত্য সেবাতেও তাঁহার কার্য-গত মৌলিকতার প্রচুর প্রমাণ আছে । একদিন কয়েকঘণ্টার পরিভ্রমের কালে উপক্রমণিকা রচিত হইয়াছিল । উপক্রমণিকার তাঁহার বিশেষত্বের বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায় । বেতাল, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস যে লেখনীর গৌরব সাধন করিয়াছে, সেই লেখনীর বিশেষত্ব এই যে, তাহাই সূকুমারমতি শিশুগণের পাঠ্যপুস্তক সয়ল গ্রন্থ সকলের জনপ্রিয় । আবার সেই লেখনী হইতেই বর্ণমালা ও সহজ শব্দবিজ্ঞাসের পরিচয় স্থল বর্ণপরিচয়েরও সৃষ্টি হইয়াছে ; তাহাও আবার বিভাগের পরিদর্শন উপলক্ষে পথে পাল্‌কীতে বাইতে বাইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিরচিত হইয়াছিল । কোমলকাঠিঙ্কের সমাবেশই বিভাগাগর মহাশয়ের সাহিত্যবিষয়ক বিশেষত্বের পরিচয় স্থল ।

তিনি বালাকাল হইতে পরসেবার রাত হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে যখন সঙ্গের উচ্চশিখরে উপবিষ্ট, তখন হইতেই তিনি গুণবানের গুণের আসর এবং কৃষী জনের কৃষকরণ ও সুখসাধন করিতে সঙ্গ ব্যস্ত ; তাঁহার যে সময়ের সর্বোচ্চ অধিকার মানব সেবার নিয়োগ করিয়াছিলেন । গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে “হার্ডিঞ্জ-বিভাগলয়” প্রতিষ্ঠা করাইয়া ছিলেন । এইরূপ প্রেমপূর্ণ সেবার ভাব লইয়া তিনি জীবনের মহারত উদ্‌ঘাটনের সূত্রপাত করেন । যে ভূবনবিজয়ী কার্যকলাপের ভারে সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার সমক্ষে নত মস্তক, যে সমাজসংস্কারবাণীতে তিনি সংস্কার, সত্যনিষ্ঠা ও যত্নস্বত্বের পূর্ণ পরিচয় দান অক্ষর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহারও কৃত্রিম অঙ্কুরটী তরীর কিশোরবয়সে ছাত্রজীবনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল । বালক জৈবরত্নে বালিকা আত্মীয়বিশেষের বৈধবা ও তন্নিকটস্থ বিবিধ কৃষক কষ্টের চিত্র লক্ষনে ক্রমে নারীস্বত্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ! বৈশাখের প্রচণ্ড মার্কণ্ডে যখন চারিদিক বহু কর্কশ, বালিকা বিধবা আত্মীয়স্বজনদের শুক কণ্ঠে কুমিল্যবার উত্তমতঃ অঙ্গসংকলন লক্ষনে বালক জৈবরত্নে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, “যদি কখন স্নেহোপ হই, তবে কোমলপ্রাণা রমণীকুলের এ কৃষক চন্দ্রিকা নিবারণের চেষ্টা করিব ।”

তাঁহার অধ্যাপক বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ের বালিকা ক্রীড়ে দেখিয়া তিনি দারুণ মনতাপে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন। তিনি একটা মাত্র বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের জার রোদন করিয়াছিলেন, সে সময়ের ঐ প্রকার শত শত অমুঠান যে তাঁহার চিন্তাকর্ষণ করিয়াছিল এবং তিনি যে ক্রমে ক্রমে অসহ্য অবাগানের পরম বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মত ক্ষয়-বান লোকের পক্ষে স্বাভাবিক ও সম্ভব। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাঁহার কর্মক্ষেত্র নির্মাণ পক্ষে এই ঘটনা এবং এইরূপ অসংখ্য ঘটনা বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

দরিদ্রের গৃহে নানাপ্রকার অভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া জনসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হওয়া এবং চিরদিন দীনজনের সুহৃদরূপে জীবন যাপন করিয়া যাওয়া পুরুষশক্তিবিশিষ্ট মহাত্মা লোকের কার্য। তিনি বিভাগ্যপথে আদর্শ বালকরূপে, কর্মস্থানে নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপারায়ণ কর্মচারীর আদর্শরূপে, বাঙ্গালা সাহিত্যে সরল, সজ্জিত ও শ্রুতিমধুর গদ্য রচনার পথ প্রদর্শকরূপে আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান। সুজ্ঞানসেবায় তাঁহার তুলনা মিলে না। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ সকল অবস্থাতেই সুহৃদরূপে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। বিশ্ববিবাহের আন্দোলনে তিনি অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন। সে আত্মীয়তার লগ্ন তিনি চিরদিন কৃতজ্ঞতাসংস্কারে স্রবণ করিতেন এবং বহুয় লোকান্তরগমনের পর তবীয় নাবালক পুত্রগণের কল্যাণ সাধনের অল্প সর্বপ্রকার অনুবিধাই সহ করিয়াছেন। সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে আজ তাঁহার স্থান অধিকার করিবার কেহই নাই। তিনি যে বীরবেশে অবতীর্ণ হইয়া নাতীয় জীবনের আবর্জনারাশি নির্মাচন, উত্তোলন, ও দূরে নিক্ষেপ করিতে বহু পরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহার সে কার্যকলাপের উপযুক্ত সমাধর আমাদের নিকট হইতেছে না। আমরা সময় ও অবস্থার নিমিত্তে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সে সুকৃশক্তি, সুকৃত্য ভাব, সে অতিমানব ঔল্কাবীর সমাধর কিরূপে করিব? তিনিই তাঁহার কার্যকলাপের তুলনা কল। তাঁহার অল্প তুলনা মিলে না। সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনে তিনি জন্মসমাজ সমক্ষে প্রকৃত আত্মপরিচয় বিদ্যাহেন, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপরিমেষতা, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং জটিল সামাজিক প্রণালিদের অভিজ্ঞতা,

এক তাঁহার স্বপ্ননৈশুখ্য কিম্বদন্তি বিচিত্রতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়হল, তাহা চিরদিনই ভাবী* কংশের পবেষণার বিষয় ও চিরসৌরবহুল হইয়া থাকিবে, এবং কালকব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রমাদুরী আরও সমৃদ্ধল আকার ধারণ করিবে।*

মানব-প্রেম তিনি যেমন অমূল্য করিয়াছিলেন, মানুষকে তিনি যেমন অকৃত্রিম মেহের চক্ষে দেখিতেন, সেজন্য মেহের রসায়নে সুরঞ্জিত মনুষ্যই চক্রে মানুষকে অতি অল্প লোকই দেখিতে শিখে। তিনি যে প্রাণ দিয়া পরোপকার সাধন করিতে সত্যসত্যই সক্ষম ছিলেন, তাঁহার পরিণত বয়সের শতপ্রকার ঘটনাবলী তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে, কিন্তু মানব-প্রেমের ধারা কিরূপে সর্বপ্রথম তাঁহার শৈশববন্দিভূততার ছরতিক্রমণীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া জলপ্রপাতের আকার ধারণ করে এবং প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, আমরা কেবল তাহার গোপন তরঙ্গটুকুর উল্লেখ করিব মাত্র। স্বাধীনবর্ষীয় বালক বিভাগায় নিজে নানা প্রকার ছঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও হৃদয়ের টাকার পর সেবার স্বেচ্ছাপাত করিয়াছিলেন! এত অল্প বয়সে যে বালক এরূপ পরহঃখ-কাতর ও প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, আত্মস্থাপনকা যে বালক পরহঃখে পরিতৃপ্ত, তিনি যে উত্তর কালে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বঃ, পরহঃখ-সাধন-প্রিয় ও পরসেবাপরায়ণ মহাপুরুষে পরিণত হইবেন, ইহাই বিধাতার ব্যবস্থা।

পরোপকারে তাঁহার আত্মপর, স্বজাতি ও ভিন্নজাতি, স্বদেশী ও বিদেশী, ব্রী ও পুরুষ এ সকলের বিচার ছিল না। মানব মাত্রেই তাঁহার প্রেমের পাত্র ছিল। আমরা অনুসন্ধান আনিরাছি, বিশর মাত্রাজী পরিবারলয় মুক্তাযুখে তাঁহার সহায়তার প্রাণ পাইয়াছে—কিরিদি দরিদ্র পরিবার, বহুসন্তান লইয়া তাঁহার সাহায্যে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়াছে—সর্বজনশ্রিত্যক্ত, দুঃস্থ* বৈরিণী তাঁহার সেবার প্রাণ পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছে! গৃহদেব প্রয়োজনে গোবৎস মাকুহুপানে বাধা পাইতেছে দেখিয়া, যে মহারা দীর্ঘকাল হুঃ পানে বিরত ছিলেন, তাঁহার ভ্রমর যে কত কোমল, তাহা আমরা ভ্রমরজন করিতে পারি কি না সন্দেহ! জাই বলি তাঁহার লোকহিতৈষণা ও জীবে দয়ায় অল্প কুলনা মিলে না—তিনিই তাঁহার কুলনা হল।

কলম্রোতে প্রবাহিত জাগ্রতনী নীর শৈলবকঃ অতিক্রম করিয়া, যেমন

কক্ষিণে ও বামে সুখ ও সম্পদ, পুণ্য ও পবিত্রতা বিতরণ করিয়া অনন্তের উদ্দেশে ছুটিরাছে, শতপ্রকারে প্রতিবেশিপীড়নপ্রিয় বালক জৈরচন্দ্রের প্রভাবশালী শৈশব নিষ্ঠুরতার পাবান ভেদ করিয়া লোকসেবার যে মঙ্গলকিনীদার প্রবাহিত হইরাছিল, তাহাও তৎক্ষণ সমগ্র দেশের সুখসাধন করিয়া, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া, কত কোটী কোটী লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইরাছে।

APPENDIX A.

No. 1.

Sir,

When I had the honour to wait on you on Saturday last and solicited permission to make a few suggestions regarding the appointment of an Inspector for South Bengal, you were pleased to direct me to submit a written memorandum upon the subject. I have accordingly availed myself of the permission and beg respectfully to suggest that if you should feel inclined to transfer me to that post, the appointment of a successor in the Sanskrit College may be made in consultation with me, as from an intimate personal knowledge of the several parties from whom the selection may be made, I think, I will be best able to recommend the most proper person for the place. If, however, it should be thought inexpedient to place the division under my charge on account of the Govt. English colleges and schools in it, I would earnestly solicit that at least the districts in which there are model schools, viz., Hooghly, Midnapur, Burdwan and Nuddea, may be placed under me, the colleges and schools being without inconvenience in charge of the person who may be appointed Inspector of the Division.

I have so often troubled you with the subjects connected with Vernacular Education that I really feel ashamed to intrude any further on your valuable time,

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

To—The Hon'ble F. J. Halliday.

(Sd.) Iswara Chandra Sarma.

No. 2.

Darjeeling, 27th May, 1887.

My dear Sir,

You will have seen that before the receipt of your letter I had nominated Mr. Lodge to the vacant Inspectorship.

It was first offered to Lieut. Lees who is in Europe, but he has refused it. I shall hope soon to see you, as I am on my way to Calcutta, and it will give me much pleasure to talk to you again on the subjects which interest us both.

Yours sincerely,
(Sd.) Fred. Jas. Halliday.

To—Pundit Isvara Chandra Sarma, Calcutta.

No. 3.

Calcutta,
Sanskrit College, 29th Augt., 1857.

My dear Sir,

As you are about to leave town for 3 months, I consider this a fitting occasion to intimate to you that I have made up my mind to retire from the public service in a short time. The reasons, which have induced me to come to this determination, are more of a private than of a public nature, and I therefore refrain from mentioning them.

The new arrangements for the Sanskrit College have not yet been fully developed and as I am desirous of completing them which will occupy two or three months more, I wish to continue in my present office until the end of December next, when I shall tender my resignation in due form.

My object in addressing you now is that you may have ample time to consider the arrangements that you may deem most desirable for supplying my place in the Education Department.

I remain,
Yours truly,

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

To—W. Gordon Young, Esq., Director of Public Instruction.

No. 4.

Calcutta, Sanskrit College,
31st August, 1857.

My dear Sir,

Some time ago while talking upon the subject of Education, you were pleased to ask me for a memo on the state of Vernacular Education in Bengal, under the present system of management and I agreed at the time, though with reluctance, to submit it. On subsequent consideration however I feel the task a very delicate one inasmuch as the

required memo cannot but reflect on the actions of my brother officers and others. I therefore earnestly beg to be pardoned for not submitting the memo as I had promised.

I may here be permitted to state that I have made up my mind to retire from the Public Service from January next and that I have intimated my intention to Mr. Young in a demi-official note of which I venture to enclose a copy for your information also.

I remain, my dear Sir,
With every sentiment of respect and esteem,
Yours most faithfully,
(Sd.) Iswara Chandra Sarma.

To—The Hon'ble F. J. Halliday.

No. 5.

31st August, 1857.

My dear Pandit,

I am really very sorry to hear of your intention.

Come and see me on Thursday and tell me why it is that you have come to this determination.

Yours sincerely,
(Sd.) Fred. Jas. Halliday.

To—Pandit Iswara Chandra Sarma.

No. 6.

To W. Gordon Young, Esq.,
Director of Public Instruction.

Sir,

The unceasing mental exertion required by the discharge of my public duties has now so seriously affected my general health, as to compel me to tender my resignation to the Hon'ble the Lieutenant-Governor of Bengal.

2. I feel that I can no longer devote the assiduous attention to my duties which their due performance necessitates. I need repose, and in justice to the public interests, as well as to my own comforts and happiness, can only secure that repose by retiring into private life.

3. The moment my health is restored, it is my intention to devote my time and attention to the composition and compilation of useful works in the Vernacular language of Bengal. Thus, although my direct official connection with the education and enlightenment of my countrymen will have ceased, I venture humbly to hope, that my remaining years will still be devoted to the advancement of a great and sacred

cause in which my deep and earnest interest can only close with my life.

4. Among the minor causes that have led to my taking so serious a step are the absence of all further prospects of advancement and the want of that immediate personal sympathy with the present system of Education, which every conscientious servant of the Department should possess.

5. With regard to the former I can occupy my time more profitably and with infinitely less strain upon mind and body, than in my present position. It would be idle to deny that such considerations must have weight with one who has not yet been able to make any permanent provision for his family and who fears that failing health will prevent his doing so, if he delays longer the severance of his connection with the arduous and onerous duties that belong to the offices he holds.

6. With respect to the other, I feel that I have no right to obtrude my views and opinions upon the Government; yet I could not conceal from those I serve, the fact that my heart is not in my work, and that thereby my efficiency is, and must be, impaired. More I am unwilling to say, less I could not express, with the maintenance of the honesty of purpose which I deem to be an essential quality of a conscientious public servant.

7. I retire with the conscious gratification that I have always laboured earnestly to discharge my duties to the best of my humble ability and I trust that I shall not be deemed presumptuous in tendering my most sincere and heartfelt acknowledgments for the unvarying kindness, indulgence and consideration, which I have always experienced at the hands of the Government.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

The Sanskrit College,
5th August, 1858.

(Sd.) Jawara Chandra Sarma.

No. 7.

My dear Sir,

Is it the case that you desire to make some alteration in your letter, dated 5th of last month. If so, perhaps you had better look in here some day soon and you can either do as you wish in that way or take back the letter and send another (corrected) in its place. But whatever is done should be done on an early day. I shall be here on Saturday and again on Tuesday.

As I understood from you on Saturday that you did not wish to press your application for leave, I have not sent it on to Government.

Yours very truly,
(Sd.) W. Gordon Young.

9th September, 1858.

No. 8.

My dear Sir,

After mature deliberation I find that I cannot either with consistency or propriety omit the parts of my letter which appear objectionable to you. It is true that ill-health is one of the principal causes which have induced me to resign. But I cannot conscientiously say that that is the sole cause. If it were so, I could have applied for a long leave and renovated my health. I had often represented to you, that I frequently felt it disagreeable and inconvenient to serve Government under existing circumstances and that I considered the present system upon which the Department of Vernacular Education was conducted, was a mere waste of money. You are aware that I often met with discouragement in my way. I saw besides no prospects of advancement and more than once I felt my just claims passed over. Thus I hope you will be pleased to admit that I had reasonable grounds of complaint; but I would nevertheless have continued in my present post for sometime longer, if I were not forced to take the step I have taken by prolonged ill-health, which has made me unfit for my responsible duties, and when the above considerations had such a considerable share in the decision to which I have come, their omission in my letter would certainly have made me liable to the charge of disingenuousness. For the same reasons, I feel it very difficult to alter it now.

Further the contents of my letter, since it left my hands, have become known to a great many people and there is as much chance of the fact of the alteration becoming equally known, in which case I shall not only be lowered in the estimation of my friends but of the public generally.

Nothing can exceed the deep regret which I have felt since I have heard from you, that the passage in question may possibly put you to some inconvenience, but words cannot express my feelings of distress when I think that unwillingly I should have given you the least cause for trouble and inconvenience. I should certainly have felt it a great relief if circumstances had permitted me to retract with any degree of consistency; but I humbly hope that you will be pleased to admit after a due consideration of circumstances I have explained at length, in what

an awkward position I have been placed and how delicate and difficult it is for me now to make any alteration in my letter.

With much deference and respect and with many apologies for troubling you in a matter so purely personal to myself.

I remain,

Yours most faithfully,

(Sd.) Isvara Chandra Sarma

15th September, 1858,

To--The Hon'ble F. J. Halliday.

No. 9.

15th September, 1858.

Dear Sir,

I have received your letter of this day's date. You are mistaken in supposing that the retention of the paragraph to which you allude, in your letter of resignation is likely to put me to any inconvenience. To me it is indifferent whether the paragraph be retained or not.

I mentioned that I thought it possible you might be asked to explain the cause of your dissatisfaction with the administration of the department and as you expressed an insuperable objection to do this in a public form, I suggested that it might be better to omit what you were unwilling to account for and merely allude to your illness which though not the *sole*, was certainly a sufficient reason for resignation.

You ask me to admit that you have had reasonable grounds of complaint. I am quite unable to admit this as to what is now assigned as your grievance - namely (1) that you thought the present system of Vernacular Education a waste of money, (2) that you often met with discouragement, and (3) that your just claims to promotion have been passed over.

It will be sufficient to say that I quite differ with you as to the last point and as to the second can see nothing in which you have ever been discouraged by me but the contrary, as to the first point it is a mere matter of opinion and moreover cannot relate to the special system of Vernacular Education with which only you had to do.

I remain,

Dear Sir,

Yours faithfully,

(Sd.) Fred. Jas. Halliday.

To--Pundit Isvara Chandra Sarma.

No. 10.

Monday, 20th Sept, 1858.

My dear Sir,

After a mature deliberation I find that I cannot consistently make any alteration in my letter of resignation.

Hoping to be excused for the delay in replying to your note,

I remain,

Yours truly,

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

To—W. Gordon Young, Esq.,

Director, Public Instruction.

No. 11.

My dear Sir,

I am very glad to learn from your note that the retention of the para. in my letter of resignation therein alluded to, will, in no way, put you to any inconvenience. As far as I can remember I was led to believe from the tenor of our conversation of the other day that the para. might occasion such inconvenience, and were it not for that idea, I would never have alluded to it, in my letter of the 16th instant. I feel now, however, a great weight removed from my mind.

There is only one point upon which I would wish to say a few words. I regret I did not sufficiently explain it in my last. I never for a moment meant to say that I was over discouraged by you. On the contrary, I am fully sensible of the encouragement which I often received from you, and I think I have given vent to my feelings on this point at the conclusion of my letter of resignation. In referring to the discouragement I met with, I meant to say, that obstruction, I often met with in my way, to remove which I was frequently obliged to trouble you. You were always pleased to lend an attentive ear, to my representations and very often those obstacles were removed by your kind interference. I always felt it very disagreeable to my feelings thus frequently to trouble you. But it was merely from absolute necessity that I did so.

I would not again have troubled you, if I did not think it my duty to offer an explanation upon so delicate a point concerning myself.

I remain,

18th Sept., 1858.

With great respect and esteem,

Yours most faithfully,

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

To—The Hon'ble F. J. Halliday.

No. 12.

Extract from a letter No. 1566, dated 25th September, 1858, from the Junior Secretary to the Government of Bengal, to the Director of Public Instruction.

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 2095, dated the 18th ultimo, with its enclosure, and in reply to state that the Lieutenant-Governor is pleased upon your recommendation to accept the resignation tendered by Pandit Isvara Chandra Sarma, Principal of the Sanskrit College and Special Inspector of Schools. It is to be regretted that the Pandit should have thought fit to make his retirement somewhat ungraciously, especially as he can have no fair reason for dissatisfaction. You will, however, be good enough to inform him, that he carries with him the acknowledgments of the Government for his long and zealous service in the cause of Native Education.

(True Extract.)

(Sd.) W. Gordon Young,
Director of Public Instruction.

To - Pandit Isvara Chandra Sarma,
Principal, Sanskrit College.

No. 13.

My dear Sir,

I received your letter No 2461 yesterday noon communicating the acceptance of my resignation. * * * *

I am already in a very disagreeable position for not having yet been able to pay the Pundits of the Female School, and I am afraid that I will be more so, as soon as I leave my post. And though it is very desirable in consideration of the present state of my health, that I should cease from work as soon as possible, yet I would wish, on the above account, to defer making over charge if you see no particular objection, till the decision of Government on my application for the payment of the bill of the Female School is ascertained.

Your very truly,

5th Oct., 1858.

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

To - W. G. Young, Esq.,

Director of Public Instruction.

No. 14.

Thursday Morning.

My dear Sir,

As various arrangements have been made and orders issued in regard to the charge of the College, Normal School, Vernacular Schools, &c.,

which it would be very inconvenient now to cancel, and specially as it is uncertain within what time the Supreme Government may issue final orders in the matter of the Female School, I do not think it will be expedient on public ground to defer carrying out the new arrangements any longer. Had your note of the 5th written a week or two ago I dare say your request could have been complied with, but now I think it is too late.

I trust the matter of the Female Schools will be dealt with justly and generously by the Supreme Government and that before long you will be relieved from your present awkward position in regard to these Schools.

I remain yours truly,

(Sd.) W. Gordon Young.

To—Pandit Isvara Chandra Sarma.

APPENDIX B.

My dear Sir,

Calcutta, 1st October, 1867.

Since we met last, I have made careful enquiries and have thought over the subject, but I regret to say that, I see no reason to alter my opinion as regards the difficulty of practically carrying out Miss Carpenter's scheme of rearing a body of Native Female Teachers either in connection with the Bethune School or independently, such as may be acceptable to the bulk of the Hindu community and worthy of their confidence. Indeed, the more I think about it the more am I convinced that I cannot conscientiously advise the Government to take the direct responsibility of setting in motion a project which, in the present state of the native society and native feeling, I feel¹ satisfied, will be attended with failure. You can easily conceive whether respectable Hindus will allow their grown up female relatives to follow the profession of tuition and necessarily break through the present seclusion, when they do not permit the young girls of ten or eleven years to quit the *zonnana* after they are married. The only persons, whose services may be available, are unprotected and helpless widows, and apart from the consideration whether morally they will be fit agents for educational purposes, I have no hesitation in saying that the very fact of their dispensing with the

zennana seclusion and offering themselves as public teachers will lay them open to suspicion and distrust and thus neutralize the beneficial action aimed at.

I think the Government cannot pursue a better course on this subject than what has been indicated in the India Government's letter lately published in the papers. The best test of popular feeling will be the application of the grant-in-aid principle. If the people are willing to carry out Miss Carpenter's idea, they should be assisted with liberal grants by Government. Although the great bulk of the Hindu community, so far as I can perceive, will not avail themselves of such assistance, still there are particular individuals who seem to be very sanguine on this subject and if they are sincere and earnest they will, at any rate it may be hoped, come forward and with Government aid, begin the experiment.

I am free to confess that I do not place much reliance in them; but they will have no right to complain under the rules announced by the Government of India.

I need hardly assure you that I fully appreciate the importance and desirableness of having female teachers for female learners; but if the social prejudice of my countrymen did not offer an insuperable bar, I would have been the first to second the proposition and lend my hearty co-operation towards its furtherance. But when I see that success is by no means certain and that the Government is likely to place itself in a false and disagreeable position, I cannot persuade myself to support the experiment.

As regards the Bethune School, I entirely go with you that the results are not proportionate to the amount expended upon it, but at the same time I cannot recommend its abolition altogether. As a moment of the services to the cause of female enlightenment in India of the great philanthropist whose name the Institution bears, it has, I submit a claim to the support of Government. In the next place, it is very desirable that there should be a well-organized female school in the heart of the metropolis to serve as a model to sister institutions in the interior. The moral influence of the present institutions in native society has been undoubtedly great. It has, in fact, paved the way to female education in surrounding districts and this, in my humble opinion, is no mean return for the large sums which has been annually expended upon it. But I must say that there is great room for economy and improvement. The expenses, I think, can be reduced to nearly half the present amount without detriment to the efficiency of the Institution.

I intend to go to the North-Western Provinces shortly for prolonged

change for the benefit of my health and if you wish to know my views on the re-organization of the Bethune School, I shall be happy to await your return to Calcutta and confer with you on the subject.

I remain, my dear Sir,

Yours sincerely,

To—The Hon'ble William Grey.

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

October 14, 1867.

My dear Sir,

Sunderbans.

I am greatly obliged to you for your letter of the 1st instant; it is both useful and interesting. I hope you will not, on any account postpone your visit to the N-W. Provinces, and I trust that you will obtain a revival of health from the change.

Should I find you in Calcutta however a few days hence, I shall be most happy to see you and to hear your views as to the re-organization of the Bethune School. Otherwise you can perhaps find leisure to write to me on the subject from the N. West.

If you should desire to have letters of introduction to any of the Government Officers in the N-W. Provinces, I shall be glad to assist you in that way. I shall be at Belvedere from the 18th inclusive.

I am, yours sincerely,

(Sd.) W. Grey.

APPENDIX C.

(Legislative Council—Marriage of Hindoo Widows Petition of certain inhabitants of Bengal, submitting a Draft Bill for legalizing the Marriage of Hindoo Widows.)

To

THE HONORABLE THE LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA,
The Humble Petition of the undersigned Hindoo
inhabitants of the Province of Bengal.

RESPECTFULLY SHEWETH.

1. That by long established custom the marriage of widows among Hindoos is prohibited.

2. That, in the opinion and firm belief of your Petitioners, this custom, cruel and unnatural in itself, is highly prejudicial to the

interests of morality, and is otherwise fraught with the most mischievous consequences to society.

3. That the evil of this custom is greatly aggravated by the practice, among Hindoos of marrying their sons and daughters at a very early age, and in many cases in their infancy, so that female children not unfrequently become widows before they can speak or walk.

4. That, in the opinion and firm belief of your petitioners, this custom is not in accordance with the Shasters, or with a true interpretation of Hindoo Law.

5. That your petitioners and many other Hindoos have no objection of conscience to the marriage of widows, and are prepared to disregard all objections to such marriages, found on social habit or on any scruple resulting from an erroneous interpretations of religion.

6. That your petitioners are advised that by the Hindoo Law, as at present administered and interpreted in the Court of Her Majesty and the East India Company, such marriages are illegal, and the issue thereof would be deemed illegitimate.

7. That Hindoos, who entertain no objections of conscience to such marriages, and who are prepared to contract them notwithstanding social and religious prejudices are by the aforesaid interpretation of Hindoo Law prevented therefrom.

8. That, in the humble opinion of your petitioners, it is the duty of the Legislature to remove all legal obstacles to the escape from a social evil of such magnitude which though sanctioned by custom, is felt by many Hindoos to be a most injurious grievance, and to be contrary to a true interpretation of Hindoo Law.

9. That the removal of the legal obstacles to the marriage of widows, would be in accordance with the wishes and feelings of a considerable section of pious and orthodox Hindoos, and would in no wise affect the interests, though it might shock the prejudices of those who conscientiously believe that the prohibition of the marriage of widows is sanctioned by the Shasters, or who uphold it on fancied ground of social advantage.

10. That such marriages are neither contrary to nature nor prohibited by law or custom in any other country or by any other people in the world.

11. That your petitioners, therefore, humbly pray that your Honorable Council will take into early consideration the propriety of passing a law (as annexed) to remove all legal obstacles to the marriage of Hindoo widows, and to declare the issue of all such marriages to be legitimate.

And your petitioners, as in duty bound, shall ever pray.

AN ACT

To declare the lawfulness of the marriage of Hindoo Widows.

WHEREAS the marriages of Hindoo widows is by long established custom and received opinion prohibited, and whereas this prohibition is not only a grievous hardship upon those whom it immediately affects, but also tends generally to depravation of morals, and the injury of society; and whereas it is believed by many Hindoos that this prohibition is not in accordance with a true interpretation of the Shasters; and whereas it is expedient to declare the lawfulness of such marriages, and to make provision for the consequence of the second marriage of a Hindoo widow as regards her rights in her first husband's estate. It is hereby declared and enacted as follows :

I. No marriage contracted between Hindoos, shall be deemed invalid, or the issue thereof illegitimate, by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person since deceased, any custom or interpretation of Hindoo Law to the contrary notwithstanding.

II. All rights and interests which any widow may by law have in her deceased husband's estate, either by way of maintenance or by inheritance shall, upon her second marriage cease and determine as if she had then died, and the next heirs of such deceased husband then living, shall thereupon succeed to such estate. Provided that nothing in this Section shall affect the rights and interests of any widow in any estate or other property to which she may have succeeded or become entitled under the will of her late husband or in any estate or other property which she may have inherited from her own relations, or in any *stridhan* or other property acquired by her, either during the life-time of her late husband, or after his death.

To

H. Scott Smith, Esq.,

Registrar, Calcutta University.

Sir,

We have the honour to request the favour of laying before the Syndicate this our application for the affiliation of the Metropolitan Institution to the Calcutta University.

We beg to annex hereto the declaration and the statement required by the rules for affiliation.

With regard to the provision proposed to be made for the instruction of the students up to the standard of the B. A. degree, we beg to state that we have decided to organize the instructive staff as indicated in the statement. At present arrangements have been made for

the instruction of the students in the course prescribed for the First Examination in Arts and 30 students have already been admitted to the class which has been opened from the commencement of the current session. Three teachers* have been entertained for this special purpose and additions will be made to the instructive staff as the new department will be developed.

We beg leave to assure the Syndicate that the Metropolitan Institution will be maintained on the proposed footing for five years at least.

We have the honour to be,

Calcutta, the 22nd April, 1864.

Sir,

Your most obedient servants,

(Sd) Protap Chandra Singh.

(Sd) Hara Chandra Ghose.

(Sd) Isvara Chandra Sarma.

(Sd.) Rama Nath Tagore.

(Sd) Ram Gopal Ghose.

Members of the Senate, }
Calcutta University }

To

J. Sutcliffe, Esq. M. A.,

Registrar to the Calcutta University.

Sir,

We, the Managers of the Metropolitan Institution, request that you will be so good as to lay before the Syndicate this our application for its affiliation to the Calcutta University up to the First Arts Examination,

As required by the rules for affiliation, we hereby declare that the Institution has the means of educating up to the First Arts Examination Standard.

We annex statement showing the provision contemplated to be made for the instruction of the students up to the same standard after the sanction for affiliation is accorded. We beg leave to state that we will employ senior scholars of the pre-university era or graduates of the Calcutta University as professors of the Institution.

(1) Babu Ananda Krishna Bose, one of the most distinguished senior scholars of the late Hindu College. He is a man of military as well as a pure scholar.

(2) Babu Hemchandra Lal Sen Gupta graduated in the Calcutta University in January 1864.

(3) Babu Mahesh Chandra Chatterjee, a distinguished senior scholar of the Sanskrit College.

We hereby assure the Syndicate that the Institution, if affiliated, will be maintained on the proposed footing for five years, and trust that this assurance will be deemed satisfactory.

Calcutta Metropolitan Institution,
The 28th January, 1872.

We have the honour to be,
Sir,

Your most obedient servants,

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

(Sd.) Dwaraka Nath Mitter.

(Sd.) Kristo Dass Pal.

Countersigned by Members of the Senate, (Sd.) Rama Nath Tagore.

Calcutta University. (Sd.) Rajendra Lala Mitra.

List of the instructive staff to be entertained.

Professor of the English Language ... One.

Sanskrit One.

Mathematics " " ... One

History and Philosophy One.

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

(Sd.) Dwaraka Nath Mitter.

(Sd.) Kristo Das Pal.

My dear Sir,

I beg to inform you that we have this day sent in our application for the affiliation of our Institution to the University for submission to the Syndicate at their meeting at this afternoon. I need hardly repeat that I would not have moved in this matter, did I not feel persuaded that we would have your kind support. Last year I took no action, because I could not manage to see you. I do not know how the other members of the Syndicate would feel disposed, but I may mention for your information that one of the managers of the Institution saw Mr. Sutcliffe and also Mr. Atkinson, and the latter told him that although he had objections to the course proposed, still he had made up his mind not to oppose the application. If it should be urged at the Syndicate that the character of the instruction to be imparted in the Institution would be inferior in as much as the instructive staff would enlist exclusively of natives. I would take the liberty to remind you that the Sanskrit College, which teaches up to the B. A. Standard, has an exclusively native staff, and that our Professors would be drawn from the same class of men. We feel confident, that native Professors, if elected with care and judgment, would be found quite competent, but should we from experience feel the necessity of entertaining an English Professor for instruction in the English language in which English aid

might be necessary, we would certainly employ one—Our object, it is needless for me to mention, is the good of the Institution, and we will spare no means to accomplish it. I believe there is a desire in certain quarters to know the scale of pay we will allow to our Professors, that is a matter I submit, between the employer and the employee, and the affiliation rules, so far as I can understand them, do not require such details. It will be our aim to combine efficiency with economy, and as I have spent, I may say, my whole life in managing schools, I hope you will allow me to exercise my own discretion in selecting Professors and regulating pay.

I cannot too earnestly impress upon your mind that we strongly feel the necessity of converting our Institution into a High School. The high rate of schooling charged at the Presidency College is prohibitory to many middle class youths, while their parents being opposed to their boys being sent to Missionary Colleges, they are obliged to give up academic education after matriculation. This Institution would be a great boon to them.

The managers of the Institution are myself, Justice Dwaraka Nath Mitter, and Babu Kristo Dass Pal. We are satisfied that the means at our command will be quite sufficient for all the purposes of the Institution. But should any deficiency arise, we will be prepared to supply it from our own pockets. I trust our assurance for the maintenance of the Institution on the proposed footing for five years will be deemed satisfactory by the Syndicate.

Trusting to be excused for the trouble,

The 27th January, 1872.

I remain,

My dear Sir,

Yours sincerely,

(Sd.) Javara Chandra Sarma.

E. C. Bayley, Esq., &c., &c.

APPENDIX D.

শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিহারী মহাশয়ের উক্তির অসারত্ব বিষয়ে অবলম্ব্যাপ্ত
সবজ্ঞ মহারাজ ক্তর বতীভ্রমোহনের ভূতপূৰ্ব্ব কৰ্ম্মাধ্যক্ষ নবদ্বীপনিবাসী
শ্রীযুক্ত রায় ষাণকনাথ ভট্টাচার্য বাহাদুর মহাশয়ের পত্রাবলিই উপযুক্ত প্রমাণ ।

শ্রীজগদীশ—

প্রিয় চণ্ডী বাবু!

আমার শরীর বিশেষ অসুস্থ থাকার আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে।

বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কাছে আমিই হারি বাবুকে সাজ করিয়া লইয়া বাই। পূর্বে তিনি হারি বাবুকে কখন দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি জানি না, কিন্তু ইহা আমার বেশ স্মরণ আছে যে, অনেককাল আগাপ পরিচয়ের পর হারি বাবু বিনায় হইয়া গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, “ও ছোকরা কে হে। ও বে আমাকে কথা কহিতে দিলে না।”—ঠিক এই কয়েকটি কথা কিনা আমি শপথ করিতে পারি না, তবে এই মস্তের কথা, ইহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

হারি বাবু যখন ভগলি কালেজে, আমি কুঞ্চনগর কালেজে এবং শ্রীনাথ দাস হিন্দু কালেজে, তখন শ্রীনাথ বাবুর বাটীতে হারি বাবুর সাজ আমার প্রথম আগাপ হয়, তাহার পর আমি কুঞ্চনগর হইতে তাঁহাকে হুগলিতে পত্র লিখিতাম, তিনি হুগলি হইতে আমাকে কুঞ্চনগরে পত্র লিখিতেন। কতকদিন পরে আমি কুঞ্চনগর তহতে হিন্দু কালেজে এবং তিনি ভগলি কালেজে হইতে হিন্দু কালেজে যান, এক সাজ এক অধ্যাপকের নিকট পড়িতাম, কিন্তু ক্লাস এক ছিল না। তিনি উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন, কিন্তু অনেক বিষয়ে এক পাঠ ছিল। আমার বাসা বহুবাজারে ছিল, তাঁহারও মাকুলের বাটা মেথানে, স্তম্ভরাং সর্বদা দেখা শুনা হইত এবং পরস্পরের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তিনি হাইকোর্টের জজ হওয়ার পরেও আমাকে “My dear friend” পাঠ লিখিতেন—তাহার একখানি পত্র আজিও আমার নিকট আছে। এদিকে বিজ্ঞানাগর মহাশয় আমাকে বখেটে ভাল বসিতেন, এই জন্ত আমি হারি বাবুকে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কাছে লইয়া বাই। তাঁহার সাজ বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বিশেষ আগাপ থাকিলে আমার সাজ তিনি বাইবেন কেন? হইতে পারে পূর্বে কখন দেখা শুনা ছিল, কিন্তু হারি বাবু সে পরিচয়ে সাহসী হইতে পারেন নাই এবং বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের স্তম্ভ স্মরণ থাকিলে বনে করেন নাই। ফলতঃ সে দিনের কথাবার্তীতেও বিজ্ঞানাগর মহাশয় অস্বাক

হইয়া ঐরূপ বলিয়াছেন। ছেলেটী অসাধারণ ইহা তিনি সেইদিন বুঝিলেন এবং সেই তাব প্রকাশ করিলেন। ইতি

ভবদীয়

ঐদ্যাকানাথ শৰ্ম্মণঃ

ঐযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ বিবরে ঐযুক্ত শম্ভুচন্দ্র লিখিত পত্র কয়গনিও এখানে প্রকাশিত হইল। শম্ভুচন্দ্র নারায়ণ বাবুর বিবাহের এক বৎসর পূর্বে সংঘটিত মুচিরামের বিবাহ বিষয়ক ব্যাপারের উল্লেখ স্থলে জ্যোতীর সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমনিরাসের ২য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—“ক্ষীরপাইনিবাসী হালদার বাবুদের অনুবোধে পশ্চাৎপদতার ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইয়া নাই, বরং ঐ সময়ে তিনি ঐ বিবাহের প্রতি বার পর নাই বিতর্কভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।” নিয়ে প্রদত্ত পত্রগুলিতে শম্ভুচন্দ্রের নিজের উক্তিভেদে এক বৎসর পরেও অনেকগুলি বিধবাব বিবাহের আয়োজনের উল্লেখ সত্ত্বেও বিভ্রাসাগর মহাশয়কে “পশ্চাৎপদ” ও “কাপুরুষ” বলিয়া গালি দিয়াছেন। আজীবন জ্যোতীর অল্পে পালিত হইয়া এখনও তাঁহাবটী আনুকূল্যে দেহধারণ করিয়া তাঁহারক ঐরূপ মধুর বিশেষণ অভিহিত কবিচা অদ্বীপগণের নিকট ও জনসাধারণ সমীপে অব্যাহতি পাও। কেবল আনন্দের দোশই সম্ভব।

পাঠক। পত্রকয়গনি নিবিষ্টচিত্ত পাঠ করিলে শম্ভুচন্দ্রের অনেক গুণগন্যার পরিচয় পাষ্টবে। পূৰ্ণ সংস্করণে সমগ্র পত্র মুদ্রিত না করিঁ। কেবল প্রয়োজনোপযোগী পত্রাংশ মুদ্রিত করার তিনি চ্যং প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্ত এটী তিনখানি পত্র পূর্ণাবস্থায় প্রকাশিত হইল। শম্ভুচন্দ্রের সম্মতহানির ভয়ে অল্প অনেক পত্র মুদ্রিত হইল না।

ঐঐঐঐ।

শরণম্—

ঐচরণম্—

প্রণতিপূর্বকং নিবেদনম্

৩৫০ ছয় শত পঞ্চাশ টাকার নোট পইছিল আশোরাহুসারে বিলি করিব অল্পপ্রহ পূর্বক ভৈরবের মাং ঘোঁসহারার খাতা প্রেরণ করিবেন সাবেক

মোসহারার ও খানা খাতা চুড়ামণির হস্তে পাঠাইয়াছি বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। কৃষ্ণনগরের কল্যাণ ভবনস্থলীকে গত রবিবার কলিকাতা পাঠাইয়াছি বোধ করি তাঁহারা পৌছিয়া থাকিবেন। পরম্পরায় অনিতেছি নারায়ণ বাবাজীউ কলকনগরের কল্যাণ ভবনস্থলীকে পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। আমি কল্যাকে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি মহাশয় কর্তা আপনি কল্যাকে যে পাত্রে দিবেন তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই আর নারায়ণের মাতা আমাকে বৃথা দোষ দেন নারায়ণ ছেলে মানুষ নয় যে আমি ভুলাইয়াছি।* কৃষ্ণনগরের কল্যার বিষয় মহাশয়ের যেকোন অভিলাষ হয় তাহাই করিবেন তদ্বিষয়ে আমার কোন কথা বলিবার নাই। যদি নারায়ণের বিবাহ হয় তাহা হইলে জননী দেবীকে যেন পাত্র পাঠাইয়া লইয়া যান জননী দেবীর বিধবাবিবাহে বিশেষ যত্ন আছে। আর ৩টা বিধবা ব্রাহ্মণ কল্যা উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকে এক্ষণে বিদায় করিয়াছি আগামী অগ্রহায়ণ মাসে মহাশয়ের নিকট পাঠাইব গোপাল বাবাজীউ বিধবা বিবাহ কবিত্ত চান অপর ১টা কল্যাও উপস্থিত ফলে মধ্যম দানার বিনা মতে গোপালের বিবাহ হইতে পারে না। ইশান ভায়া বাটা আসিয়াছিলেন ইশান মধ্যম দানার মত কথাটাবেন এতজন্ত পুনরায় পুঙ্কলে গমন করিয়াছেন, গোপাল মৃৎ ও মাতাল ভাণকে বিবাহ করিতে সহসা কেহ রাজী হয় নাই। ইতি ২৪ আষাঢ়।

ভূতা

শ্রীমদ্ভক্ত শরণঃ।

পুঃ—নারায়ণ বাবাজীউ অস্ত কলিকাতা গমন করিবেন।

পুঃ—নারায়ণগরের ৮শ্রীরাম জায়বাসীশের পুত্রকে পুত্রক ও যন্ত্র দিবার জন্ত উমেশ নায়ককে বরাদ্দ করিয়াছিলেন নায়ক এখানে উপস্থিত নাই পুত্রক ও যন্ত্রাভাবে পাঠ বন্ধ হয় এ বিষয়ে যেকোন আদেশ হয় তাহা লিখিবেন।

শঙ্ক।

* বাৎসরিক বাৎসরিক জননী চিত্রাধিন এই পুত্রক লইয়া পুনরায় সঙ্গার করিয়া দিতাহেন।

শ্রীমতী—

পরশন

শ্রীচরণ

প্রগতিপূর্বক নিবেদনম্

শ্রীমতী জননী দেবী প্রগতি নির্দিষ্ট বাটী পৌছিয়াছেন নারায়ণ বাবাজীউ বিধবা বিবাহ করিবেন দেশে প্রচার হইয়াছে এষ্ট নিমিত্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্বগণ আমাকে বিশেষ অনুরোধ করার মহাশয়কে লিখিতেছি ইচ্ছা বশেন আরো ২৪ বৎসর নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিতে কান্ত থাকুক, পরে যদি বিধবাবিবাহ করাষ্ট শ্রেয়ঃকর হয় তাহা হইলে ৭৮ বৎসরের অর্থাৎ অক্ষতযোনি করার সহিত বিবাহ করিলে ভাল দেখায় ও শাস্তসম্মত হয়। আর ইচ্ছা অসংক বালন বিজ্ঞানগব মহাশয় পবের বিবাহ মিউন তাহাতে আমাদের অশক্তি নাই, নারায়ণের বিধবাবিবাহ দিলে আমরা আব তোমাদের সহিত আহার ব্যবহার করিতে পারি এমত বোধ হয় না কারণ তোমাদের সহিত আমরা আহার ব্যবহার করিলাম সমাজে রক্ষিত হইব আর নানা গোণযোগ উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আমাদের পুত্র কন্তার বিবাহ ইচ্ছা হুকার হইবে এই কারণেই নারায়ণের বিবাহ দিতে কান্ত হইতে বলিতেছি এতাবৎকাল মহাশয়দের অনুগত ও আশ্রিত থাকিরা অতঃপর আমাদের কি দশা ঘটবে স্থানান্তরে থাকিলে আমাদেরকে কেহ চাকো দিবে না ও উপহাস করিবেন। ইচ্ছা নারায়ণকে কান্ত করিবার জন্য আমাকে কলিকাতা হারাত বালন আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম অগ্রে অগ্রজ মহাশয়কে পরে লিখি তিনি যেরূপ আদেশ করেন পরে আপনাদিগকে জানাইব এমত

* অতঃপর অ. হারাতের মূলা ধারণা বিজ্ঞানগব মহাশয়কে পুত্রের বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিতে প্রচলিত পত্রিকা কুটুম্বগণের কাণ্ড পত্রিক তাহার বিচার করিবেন। এখানে কেবল বঙ্গীয় এই যে, নারায়ণ বাবুর বিবাহের পর লক্ষ্যভ্রষ্ট নিম্ন পুত্রের বিবাহের সময় জ্যেষ্ঠের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিবার সম্ভব (বিজ্ঞানগব মহাশয়কে লিখিতেছি) ও তাহার জ্যেষ্ঠ কুটুম্বের নিকট গমন করিবার ইচ্ছা হইল যে জ্যেষ্ঠ ও তাহার পরিবার বর্গের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে ইহার কুটুম্বগণের পুত্র সন্তানের সহিত কিস্তি এতদিক বিজ্ঞানগব বাবুর সহিত ইচ্ছা ও তাহার পরামর্শ সামাজিক সংস্কার প্রদান বিজ্ঞানগব

স্থলে যাঁহা কর্তব্য কর করিবেন ও নারায়ণ বাবাজীকে আমার প্রণয় সজ্ঞাবণ
ও আশীর্বাদ জানাইবেন এখানকাব সকল ভাল আছেন । ইতি

২১শে শ্রাবণ ।

ভৃত্য

শ্রীশঙ্কর শর্মাণঃ ।

শ্রীশ্রীচূর্ণা—

শরণম্

শ্রীচরণেশু—

প্রণতিপূর্বকং নিবেদনম্

মহাশয়ের পত্র পাইলাম, ২৭শে শ্রাবণ নারায়ণ বাবাজীউ তবজন্মরীর
পাণিগ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া পরম আশ্লাদিত হইলাম এতাবৎকাল আমরা
অপরেব বিবাহের উত্তোগে প্রবৃত্ত ছিলাম আপনাদের বাটীর কাহারো বিবাহ
দিত সমর্থ হই না এই কারণে লোক বলিত বিদ্যাসাগর মহাশয় পরের
মাথায় কাঁঠাল ভাঙিবেন, অনেক ভণ্ড ও প্রতারক মনে করিত নারায়ণ
বাবাজীও আমাদের সৈত কলঙ্ক ঘুচাইলেন নারায়ণের যে একদূর সাহস হইবে
তাঁহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর বাঁহা হউক নারায়ণকে ধন্যবাদ দিতে হয় ।

আমি যে ইতিপূর্বে নিবারণ পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা কেবল আত্মীয়গণের
অনুরোধে পড়িয়া লিখিয়াছিলাম তাহা পড়েই বাক্য আছে নচেৎ পত্র লেখা
আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না । শ্রীমতা জননী দেবী নারায়ণের বিবাহ
সম্বাদ শুনিয়া পরম আশ্লাদিত হইলেন, ঐতিমধ্যে কলিকাতা ঘাটেরা সাক্ষ্য
করিবার সম্পূর্ণ মানস আছে ও কালীকান্ধ চট্টোপাধ্যায় শিষ্য মহাশয়ের
সাক্ষ্যপত্রকে অগত্যা ২৪ দিন অবস্থিতি করিতে হইল, নারায়ণ বাবাজীউ
ও বধূ মাতাকে অসুখ হই পূর্বক আমার আশীর্বাদ জানাইবেন চূর্ণা প্রভৃক
বিবাহের সময় বাইতে পারি নাই সমাচার পাইলে অবস্ত উপস্থিত হইতাম ।
নারায়ণের জননী দেবী বাটী পঠাঁছিয়াছেন । ইতি ৪ ভাদ্র ।

ভৃত্য

শ্রীশঙ্কর শর্মাণঃ ।

শ্রীরামঃ

নবমঃ ।

বৈশ্বনাথ ২৫শ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ ।

নমস্কার্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় সমীপেষু ।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন দিতঃ

দৃষ্টিবশতঃ অশাশ্বতঃ পুত্র কলা আপনাব 'বিষবাবিধাৎ প্রতিবাদ' পুস্তক পাইয়াছি । আমি এখানে আসিয়া অবশি কোন দিনই পারিত কোন কাহাই করি না' কিন্তু প্রবন্ধকা নিবেদন পণ্ডিত হওয়াতে কলা রাষ্ট্র ১১১ চইতে ১১৬ পর্যন্ত মনোযোগের সহিত আপনাব পুস্তক পানি আখ্যাপনান্ত পাঠ করিয়াছি ।

একবার মাত্ৰ পাঠ করিয়াই যে সমস্তর সন্নিহিত, তাহা আপনাব জানান টি-ম-ন হইয়াছে তাহা জানিতা লিখিত চইতেছে । আপনি আমার একজন গবাক্ষীক, আপনাব প্রবন্ধি ও নিবন্ধে আমাশিব সাংসার ও স্ত্রী আছে । অতএব আপনাব পক্ষে যে যে আ-নন্দ মুক্তি হইল, তাহা প্রকাশ দিয়া সংবাদন করিয়াছি । একজন লোক বা স্ত্রী হইয়া পুস্তক ক্রমা করিবেন ।

আপনাব প্রবন্ধানি পাঠ করিয়া সংবাদন : ১১৬ পরিবর্তন, যে আপনি অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন, অনেক গল্প সংগ্রহাছেন, অনেক প্রকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 'বন্দন পণ্ডিত' পোত অনেক লোক ভূত্বা নিজের পণ্ডিত পদমণ করিতে গতি করেন নাই । তাহা আপনাব আধিকার প্রকাশ মনে করিবেন যে পণ্ডিত হইয়া পুস্তক প্রকাশ করেন । কিন্তু আমার দুই বিষয়, সংবাদন কিছুমাত্র বিবেচনা করিয়াব সমস্ত আ-নন্দ, তাহাদের কিসি মত লক্ষণীয় প্রকাশি নাহি বা তাহাদের স্মৃতিপাঠ 'কলিযুগ'মাণে পড়া আ-নন্দ, তাহারা সকলই বিবেচনায়, এ পুস্তকখানি আপনাব উপস্থিত চর মত, ইত্যাদি আপনাব সম্বন্ধে, গৌরব ও পদের চানি জির প্রভিৎ সংগ্রহনা নাই ।

আপনি এত দিন, বৈশ্বনাথ, এই পুস্তক পানি বচনা করিয়াও তখন দৃষ্টোপায় সম্ভব আপনাবা করিয়াছে যে ক্রমে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিছেন যে বিধবা বিবাহ আদৌ সম্ভাবিত নহে, তাহা আমবা পণ্ডিত সাধারণ নী । এত সিদ্ধান্তী বন্ধা করিয়াও তখন যে কত দুঃখ বান্ধের কত প্রকার নুতন নুতন অর্থ ক হইয়া আসিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়া দিও কি, আপনি 'কলিযুগ' পুস্তক প্রকাশ করিয়া পুনঃ পুনঃ আমবা অর্থ ব্যক্তিকে তত লোভ প্রদ না । কিন্তু তাহারা নিয়মিতকরণপর্ব হইয়া, তাহারা প্রকৃত সাংসারি পোষণ করিয়া সাধারণ ক বাক্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাচিৎসক আমবা মনের সন্তোষ প্রদা করি, একক ও অধ্যাত্মক বলিয়া থাকি । আপনি অনেক দৃষ্টান্তবন্ধ দেখিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বসুন দেখি কোন নিবন্ধকা এতদ 'সিদ্ধান্ত' করিয়াছেন 'বিষবাবিধাৎ আ-নন্দ' সাংসারিকই নহে? আপনি যে নিবন্ধকারক একবার সাংসারিকরূপে লগনা করিয়াছেন, আবার নিজের মতের সহিত তাহার মতের বিরোধ হইলে সেই নিবন্ধকারকেই অস্বীকার করিয়াছেন, যেমন নীলকণ্ঠ ।

'পণ্ডিতবর' বিধেয়তঃ এই বচনটী নিবেদনপর বলিয়া এক সন্মানক অঙ্গসিদ্ধান্ত ও লক্ষণের নিজের অন্তিমজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন । সাংসারিকেরা নিবেদনের স্মৃতি প্রবর্তীক অনুভূতাই একমাত্র কারণ বলিয়াছেন, এক্ষণে আপনাব সিদ্ধান্ত 'অনুগ্রহ' বিবেচনায় সাংসারিক সাংসারিক বা পণ্ডিতের সপুত্রা বীরও নিবেদন চলিবে, এবং আপনি যেজন বলিয়াছেন 'একপুত্র পুত্রই নহে, অতএব বিধিও পুত্রোৎপত্তি পর্যন্ত নিবেদন কাহা চলিবে । আবার

যাহাউ বঙ্গ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যে বিবাহবিবাহ অন্তিমত তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি
কিন্তু তিনি যেসকল অসাবধান ভট্টয়া পবনের বচনের বিষয় প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাহা
বিবাহবিবাহ পাত্রে যল্য হইয়া পড়িতেছে, ইহাও উক্তর আপনি কি দিবেন ? বিদ্যারত্ন মহাশয়
উক্ত পুস্তকের বিরুদ্ধ ভাষা বলিয়া আপনি তাহাও টীকা করিতে দণ্ড করিয়াছেন। কিন্তু “বন
ভদ্র ন পুস্তক” “ভাইপো” ইহা ভাবিবেন কেন ? বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাক্য ত বেন না
বা বিদ্যারত্ন মহাশয়ও ত মন্ত্য নহেন, যে তাহার অসামান্য পরিচয় করিতে “ভাইপো” কি না
“মোড়িয়া” গোচর যা শুদ্ধ তাই তাহাও বাক্যের অর্থ করিতে হইবে।

আপনিও অনুরোধ (১০০ পৃষ্ঠা) বাধ্য হইয়া আমরা বলিঃ উক্ত পুস্তক মহাশয়, নিবন্ধিত
বিচার করিয়া দেখিয়াছি আপনাব পক্ষে প্রত্যেক উক্তক হইবে না।

কিন্তু আমরা দুই আপনাব পড়িয়া, কেটা কথা বলিয়াছি এই জানাই নিবৃত্ত হই।
আপনি পুস্তক পানি মুদ্রিত করিয়া ভাল করেন না, তৎপরে পুস্তকদ্বয়কে পুনরায় “ভাইপো”
যারা সম্পদ হইতে হইবে। “ভাইপো”র বিদ্যুৎ অঙ্কন পুস্তক ইহাও একই ভাষা
ও চিত্রিত হইল।

আপনাব আশ্রয়

শ্রীমতেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

চতুর্থ বিদ্যাসাগর । সংস্করণ

মৃতু লিখিত চিত্র বিশিষ্ট । (জীবনচরিত) । [২য় ও তিন টাকা ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে খ্রীস্টীয় বাজনাবার্ষণ বঙ্গ মহাশয় লিখিয়াছেন :—“মাইকেল
মহত্ব জীবনচরিত এবং বিদ্যানাগর চরিত এই দুই জীবনচরিত বাজনালাভ্যায় সংকলিত কিয়
ভাব্য পণ্ডিত জীবনচরিতের বিষয় গ্রন্থ এই যেহিণী ইত্যাদি এমন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিষয়ব সম্বাদ
যেহিণী ইত্যাদি, যাহাতে চরিত নারায়ণ নিচ পবিত্র বিশেষকণ ব্রহ্মণ গায়া যায় । গ্রন্থ
অঙ্গ কোন বাজনালা জীবনচরিত দেখিতে পাই নাই ।”

বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিত খ্রীস্টীয় স্তর গুরুদাস বাজনালাভ্যায় লিখিয়াছেন :

গুরুদাস বাজনালাভ্যায় ইত্যাদি । বাজনালাভ্যায় অংশেদার গুরুদাস ইত্যাদি
ইত্যাদি গুরুদাস লিখিত পণ্ডিত বাজনালাভ্যায় । গুরুদাস অংশেদার বাজনালাভ্যায়
গুরুদাস লিখিত গুরুদাস বাজনালাভ্যায় জীবন চরিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস
ইত্যাদি গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস
গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত

গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত

গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত
গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত
গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত
গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত

বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত
গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত
গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত
গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত গুরুদাস লিখিত

Extract taken from a long letter written by R. C. Dutta Esq., C. S.,
C. I. R. “You have performed a great task with a great amount of
industry and I hope your labours will be appreciated by our country-
men” and also from a long letter by Bani Brojendra Nath Seal M. A.
Principal Cooch Behar College. “It may be fairly claimed that what
Boswell was to the great English Doctor this biographer has been to
our Vidyasagar

